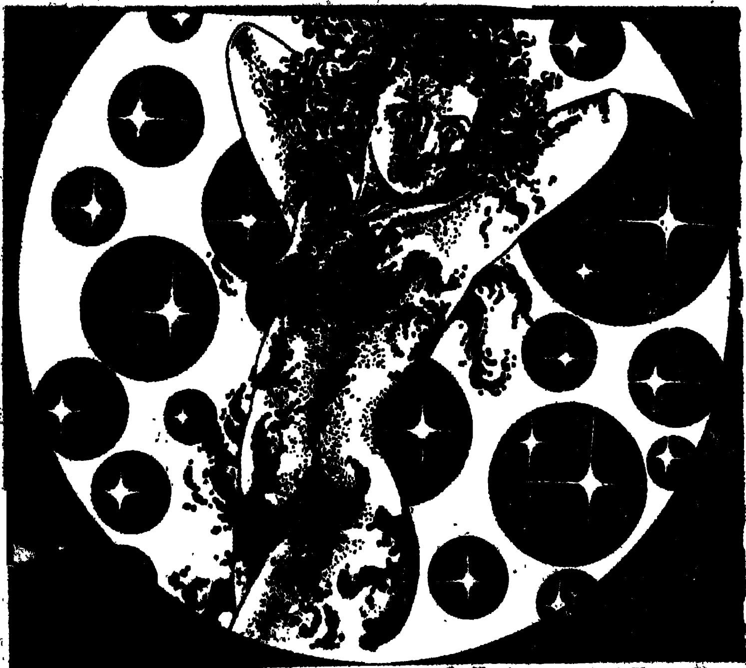
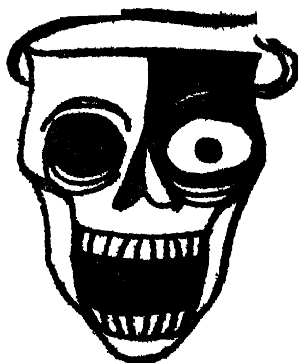


প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশ করেছেন মন্মথ বসু, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে এবং ছেপেছেন অদ্রীশ বর্ধন,
দীপ্তি প্রিন্টার্স, ৪ রামনারায়ণ মতিলাল লেন,
কলিকাতা ৭০০ ০১৪ থেকে।

সূচীপত্র



স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড



বৃটিশ। জন্ম : ব্রাডেনহ্যাম, নরফোক, ২২শে জুন, ১৮৫৬। আইনজীবি, ১৮৮৫। লুইসা মেরিয়ানা মারগিটসন-কে বিয়ে করেন ১৮৮০তে। এক ছেলে, তিন মেয়ে। নাটাল-য়ের লেফটেন্যান্ট-গভর্ণরের সেক্রেটারীরূপে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস, ১৮৭৫-৭৭। ট্রান্সভালের স্পেশাল কমিশনার, ১৮৭৭। ট্রান্সভালের হাইকোর্টের মাস্টার অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রার, ১৮৭৭-৭৯। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন, ১৮৭৯। ১৮৮০ থেকে নরফোকে স্ত্রী-র ভূসম্পত্তি তদারকি। হেনরী বারগ্রেভ ডিয়েন-য়ের চেম্বারে কর্মরত, ১৮৮৫-৮৭। শ্রমিক নেতা এবং কৃষিবিষয়ক নির্বাচন প্রার্থী, পূর্ব-নরফোক, ১৮৯৫। সহযোগী-সম্পাদক, 'আফ্রিকান রিভিউ,' ১৮৯৮। গ্রামীণ কৃষি ও জনসংখ্যা তদন্তের জন্য সারা ইংলণ্ড পর্যটন, ১৯০১-০২। যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক আদর্শে গঠিত ধর্মীয় সংঘের উপনিবেশ-স্থাপন সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করেন বৃটিশ গভর্ণমেন্ট স্পেশাল কমিশনাররূপে ১৯০৫ সালে। উপকূল ক্ষয় এবং বনীকরণ নিমিত্ত জমিদখল ও কর্মহীন শ্রমিক সমিতি, রয়াল কমিশনের চেয়ারম্যান, ১৯০৬-১১। ডোমিনিয়ন রয়াল কমিশনের চেয়ারম্যানরূপে বিশ্ব পর্যটন, ১৯১২-১৭। লেখক সমিতির কমিটি চেয়ারম্যান, ১৮৯৬-৯৮। রয়াল কলোনিয়াল ইনস্টিটিউটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ১৯১৭। স্যার উপাধি, ১৯১২। কে. বি. ই. (নাইট কম্যাণ্ডার, অর্ডার অফ দ্য বৃটিশ এম্পায়ার), ১৯১৯। মৃত্যু : ১৪ মে, ১৯২৫।

সায়ান্স-ফিকশন গ্রন্থাবলী

১৬টি উপন্যাস। নভেল-সিরিজ লেখেন দুটি চরিত্র নিয়ে—অ্যালান কোয়াটারমেন এবং শী।

অন্যান্য গ্রন্থাবলী

৪২টি উপন্যাস। ছোট গল্প সংকলন তিনটি। অন্যান্য গ্রন্থ ১৪টি।

*

মার্ক টোয়েন, রবার্ট লুই স্টিভেনসন এবং লুইস ক্যারল—এই তিন কথা-শিল্পীর ভাগ্যে যা ঘটেছিল, তার অংশীদার এইচ রাইডার হ্যাগার্ড নিজেও। ব্যতিক্রম ঘটেনি। এঁর উপন্যাসগুলি এখন হয় ছোটদের সংস্করণরূপে অথবা হলিউডের ছায়াছবির উপাদানরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য কিন্তু কখনোই কলম ধরেননি হ্যাগার্ড। প্রতিটি গল্প উপন্যাসই অতিশয় প্রাপ্তবয়স্ক-হৃদয়াবেগে পরিপূর্ণ। বহু নভেলের অধিকাংশই ফ্যানটাসি-রোম্যান্স—দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আইসল্যাণ্ড, সেখান থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত তাদের ক্ষেত্র—সময়কাল ব্যাবিলনের আমল থেকে সম-সাময়িক মধ্য আফ্রিকা।

হ্যাগার্ডের প্রথম সার্থক নভেল 'কিং সলোমন্স মাইন্স'। লণ্ডনে ব্যারিস্টারি শুরু করার পর লেখেন। 'দুর্দান্ত শ্বেতকায় শিকারী'র প্রতিচ্ছবি এত সুন্দরভাবে চরিত্রায়িত করেন যে পাঠকমহলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয় হয় এই নভেল। লেখার চাহিদা মেটাতে আইন ব্যবসা প্রায় ছেড়ে দেন এবং বেশীর ভাগ সময় লেখা নিয়ে কাটান। কিং সলোমন্স মাইন্স-য়ের নায়ক অ্যালান কোয়াটারমেন। এক সুন্দরী ইংরেজ মহিলার স্বামী নিখোঁজ হয়েছিল আফ্রিকার জঙ্গলে। মহিলাটির অনুরোধে অ্যালান তাকে খুঁজতে যায় আফ্রিকায়। একটি গুহায় পাওয়া যায় নিখোঁজ স্বামীর কংকাল, সেইসঙ্গে দু-হাজার বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা কিং সলোমনের সঞ্চিত ধনসম্পদ। উপসংহার টানেন 'অ্যালান কোয়াটারমেন' উপন্যাসে। অ্যালানের মৃত্যু ঘটান। পরিণতি হয় কন্যান ডয়ালের মতো। বিখ্যাত ডিটেকটিভ শার্লক হোম্‌স্‌-য়ের কাহিনী লিখে ক্লান্ত হয়ে কন্যান ডয়ালও তার মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ ফিরে পেতে চেয়েছিল হোম্‌স্‌-কে। চাপে পড়ে হ্যাগার্ডকেও ফের বাঁচিয়ে তুলতে হয়েছিল অ্যালানকে। 'আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি' পদ্ধতি অনুসরণ করে হ্যাগার্ড ১৩টি নভেল লেখেন কোয়াটারমেনকে নিয়ে। সমকালের বহু অ্যাডভেঞ্চার ছাড়াও প্রাচীন ব্যাবিলনে পূর্ব জন্মের অ্যাডভেঞ্চারেও ফিরে যেতে হয় কোয়াটারমেনকে।

পূর্বজন্মের মধ্যে ফিরে যাওয়া বা অতীত জীবনকে ফিরিয়ে আনার পদ্ধতিটি হ্যাগার্ড বহুবার কাজে লাগিয়েছেন, বিশেষ করে রহস্যময়ী আয়েশা অথবা 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ মানতেই-হবে' চরিত্র নিয়ে লেখা উপন্যাস-

গুলিতে। এই নভেল-সিরিজের প্রথম নভেল 'শী'। আয়েশা চরিত্রের প্রথম আবির্ভাব। দু-হাজার বছর আগে আয়েশা যে পুরুষটিকে ভালবেসেছিল, সে আর এক নারীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আয়েশা হত্যা করে পুরুষটিকে। কিন্তু দু-হাজার বছর ধরে সে প্রতীক্ষায় থাকে তার ফিরে আসার পথ চেয়ে আফ্রিকায় নরখাদক সম্প্রদায় 'কোর' অধিবাসীদের রানীরূপে। সফল হয় প্রতীক্ষা তরুণ ইংরেজ লিও ভিন্সি তার রাজ্যে আগমন করার পর। লিওকে একবার দেখেই বুঝতে পারে দু-হাজার আগে নিহত ভালবাসার মানুষ ফিরে এসেছে পুনর্জন্ম নিয়ে। অনন্ত জীবন গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ করে লিও-কে—অনন্ত প্রাণ-রহস্য সে আবিষ্কার করেছিল একটা আগ্নেয়গিরির জঠরে অগ্নিঝর্ণার মধ্যে। কিন্তু লিও আর এক নারীকে বিয়ে করায় আবার ক্ষিপ্ত হয় আয়েশা। হত্যা করে লিও-র স্ত্রীকে। লিওকে তার সঙ্গী সমেত নিয়ে যায় আগ্নেয়গিরির জঠরে। অগ্নিশিখায় স্নান করার জন্যে আহ্বান জানায়, বোঝাতে থাকে। কিন্তু জাদুশক্তি কার্যকর হয় একবারই। তাই দ্বিতীয়বার অগ্নিশিখার মধ্যে আয়েশা প্রবেশ করতেই পুরুষ তিনজনের সামনেই বয়স বেড়ে যেতে থাকে তার—দু-হাজার বছর বয়স্কা কদাকার বুড়ি হয়ে যায় অসামান্য সুন্দরী আয়েশা। তিনজনের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে তার মৃতদেহ। আতংকে মারা যায় একজন—বাকী দুজন অভিভূত অবস্থায় ফিরে আসে ইংলণ্ডে। কোয়াটারমেন-য়ের মতো, পাঠকপাঠিকার চাহিদায় ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল আয়েশা-কে বারবার। মৃত্যুর পরেও আয়েশাকে বাঁচিয়ে তোলেন হ্যাগার্ড এবং তাকে নিয়ে লেখেন দুটি নভেল—'আয়েশা' এবং 'শী অ্যাণ্ড অ্যালান'। তারপরেও লেখেন আর একটি নভেল—'উইজডম্স্ ডটার'—প্রাচীন মিশরে আয়েশার জীবন কাহিনী নিয়ে।

হ্যাগার্ডের বেশীর ভাগ গ্রন্থের নাম পর্যন্ত সায়েন্স-ফিকশন অনুরাগীরাও জানেন না। এর মূলে রয়েছে আধুনিক সমালোচকদের কৃতিত্ব। উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা ফ্যানট্যাসি তাঁরা নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছেন। কয়েকটির নাম মোটামুটিভাবে অনেকেই জানেন সিনেমায়িত হওয়ার দরুন। কাহিনী একটু-আধটু পালটালেও রহস্য, রোমান্স এবং চরিত্রাবলী অক্ষুণ্ণই রাখা হয়েছে।

*

বিস্মৃতপ্রায় এই ক্ষমতাবান লেখকের গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডে সন্নিবেশিত হল দু-ধরনের দুটি নভেল। একটি তাঁর সুবিখ্যাত সায়ান্স-ফিকশন 'শী'—যা সংকলিত হয়েছে 'বিংশ শতাব্দীর সায়েন্স-ফিকশন লেখক' সংকলনে।

এই সংকলনে ছ-শোরও বেশী সায়েন্স-ফিকশন লেখকের কীর্তিকাহিনী আছে, আধুনিক সমালোচকদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে। দ্বিতীয় উপন্যাসটি প্রাচীন মিশরের ম্যাজিক এবং রহস্যের পটভূমিকায় লেখা 'মর্নিং স্টার'। হ্যাগার্ডের বিচিত্র লেখনীশৈলীর নমুনা উপস্থাপিত করার জন্যেই সংকলিত হল দু-ধরনের দুটি উপন্যাস।

লক্ষণীয় যে 'মর্নিং স্টার' লেখার দু-বছর পরেই তিনি 'স্যার' উপাধি লাভ করেন।

কর্মবহুল জীবনে সারা বিশ্ব পরিক্রমা করার ফাঁকে ফাঁকে লেখনী যিনি স্তব্ধ রাখেননি, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন সমালোচকের কলমবাজির ফলে তাঁর সাহিত্যকর্ম প্রায় মুছে যেতে বসেছে। ইংরেজীতে তো বটেই, বাঙলাতেও স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড অমনিবাস আজও প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং বিশ্বের প্রথম হ্যাগার্ড অমনিবাস বাংলাতেই প্রকাশিত হল। তাঁর সব বইও পাওয়া যায় না। যেমন, 'মর্নিং স্টার'। কলকাতায় একখানাই বই আছে—বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে। সেখান থেকেই বইটি এনে ১৫ দিনে অনুবাদ করতে হয়েছে। ২য় খণ্ডে আবির্ভূত হবে তাঁর দুটি নভেল-সিরিজেরই দুটি চরিত্র। আয়েশা আবার ফিরে আসবে এবং মহাবীর অ্যালান কোয়াটারমেনকে ভয়াল ভয়ংকররূপে দেখা যাবে।

হ্যাগার্ডের ভাষা অত্যন্ত বর্ণনাবহুল এবং আবেগময়। শ্বাসরোধী এবং জাদুকরী। কঠিনও বটে। মূল রস এবং কাহিনীবিস্তার অক্ষুণ্ণ রেখে ঈষৎ সংক্ষেপিত এবং সহজবোধ্য করতে হয়েছে কলেবরবৃদ্ধি হয়ে গেলে দুর্মূল্যের বাজারে বইয়ের দাম বেড়ে যাবে বলে। □



শী, কিং সলোমন্‌স্‌ এবং আরও অনেক বিশ্ববিখ্যাত রোম্যান্স কাহিনী প্রণেতা রাইডার হ্যাগার্ডের একটি অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ছিল—প্রাচীন মিশরের রহস্য ও ম্যাজিকের গভীরে ডুব দিয়ে আসতে পারতেন। কল্পনা-শক্তি ও দুর্বার লেখনীশক্তির যুগ্ম সহায়তায় সুদূর অতীতের প্রেম ভালবাসা, বিপদ, অ্যাডভেঞ্চার, আশা-আকাঙ্খাকে সঞ্জীবিত করতে পারতেন।

নেতার-তুয়া অথবা মর্নিং স্টার একটি পরমা সুন্দরী মেয়ের নাম। ফারাওর একমাত্র কন্যা সে। জোড়ামুকুট একদিন তাকেই শিরে ধারণ করতে হবে। আমেন-য়ের মূল পুরোহিতঠাকরুণও সে।

বাবার রক্ষীবাহিনীর ক্যাপ্টেন রামিস-কে সে ভালবাসে। নিজের সম্মান রক্ষার্থে একদিন এক ব্যক্তিকে হত্যা করল রামিস—সেই সঙ্গে সম্মান রক্ষা করল সেই মেয়েটির যাকে সে বিয়ে করতে পারবে না কোনদিনই। শাস্তি-স্বরূপ নির্বাসিত হল রামিস। মেয়েটিকে রেখে গেল অরক্ষিত অবস্থায়—শত্রুদের যাদুবিদ্যা আর বিশ্বাসঘাতকার পরিবেশে।

মানুষের হাতে অরক্ষিত ঠিকই, কিন্তু অমানবিক হাতে রইল তাকে আগলে রাখার ভার—যে অমানবিক শক্তিতে পূর্ণবিশ্বাসী ছিল প্রাচীন মিশরের মানুষ।

মর্নিং স্টার শুধু নিছক প্রেমকাহিনী এবং অ্যাডভেঞ্চার-উপাখ্যান নয়—দ্বন্দ্ব হানাহানির ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এমন এক কাহিনী যা পাঠককে ভাবায়, অবাক করে।



[বৃটিশ মিউজিয়ামের মিশরীয় ও আসীরিয় পুরাকীর্তি বিভাগের অধিকর্তা ডক্টর ওয়ালিশবাজ-কে লেখা এইচ রাইডার হ্যাগার্ডের উৎসর্গ-পত্র]

প্রিয় বাজ,

অনেকদিনের বন্ধুত্বের বলে বলীয়ান হয়ে আমি হেন অ্যামেচার প্রাচীন মিশরের এই রোম্যান্স কাহিনী উৎসর্গ করছি তোমাকে।

এ-কাহিনী অনেক দ্বিধা-সংশয় নিয়ে তোমাকে পড়তে দিয়েছিলাম। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অনেক ভুল আছে, এ ভয় আমার ছিল। কিন্তু তুমি লিখে জানিয়েছিলে, একটি পংক্তিও যেন পালটানো না হয়।

তুমিই এই কাহিনীর প্রথম সমালোচক। তাই তোমার পাণ্ডিত্য আর পরিশ্রমের সম্মানে সামান্য এই নিবেদন।

তোমার একান্ত আপনজন

ডিচিংহ্যাম — এইচ রাইডার হ্যাগার্ড

●

এইচ রাইডার হ্যাগার্ডের বক্তব্য

'কা' অর্থাৎ 'সূক্ষ্মদেহ' সিংহাসনে বসে আছে, আর সূক্ষ্মদেহের মালিক অনেক পথ ঘুরে অনেক অ্যাডভেঞ্চার করে বেড়াচ্ছে—প্রাচীন মিশরেও এ-হেন কাহিনী শুনলে লোকে ভাবত সূক্ষ্মদেহ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে—ঠিক এই ধরনের ভাবনা এযুগেও অনেকের মনে আসতে পারে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। উইডারম্যান্ যাকে বলেছেন 'ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিত্ব'—সেই 'কা' বা সূক্ষ্ম দেহের মিশরীয় তত্ত্ব অনুসারে নিজের সত্তা ছিল। দেহ মারা গেলে 'কা' মারা যেত না। কেন না, সে অমর এবং দেহটার ফের বেঁচে ওঠার প্রতীক্ষায় থাকত। তখন আবার দুই সত্তার মিলন ঘটত এবং বসবাস করত অনন্তকাল। উইডারম্যানের উদ্ধৃতিই দেওয়া যাক—'দেহ ছাড়া 'কা' বাঁচতে পারত, 'কা' ছাড়া দেহ বাঁচতে পারত না।...তা সত্ত্বেও 'কা' ছিল দেহের মতই একটা বস্তু।' দেহ-র চাইতেও বেশী শক্তিশালী ও উন্নত ছিল এই 'কা'।

কেন না, মিশরীয় নৃপতিরা প্রায়শঃ অর্ঘ প্রদান করত নিজেদের 'কা'দের—যেন 'কা'রা আসলে দেবতা বিশেষ। মাসপেরো অনূদিত 'সংস অ্যাণ্ড দ্য ম্যাজিক বুক' এবং মিস্টার ফ্লিণ্ডার্স পেত্রি লিখিত 'ঈজিপ্সিয়ান টেলস্' গ্রন্থে দেখা যায় 'কা' য়ের সুস্পষ্ট নিজস্ব অস্তিত্ব ছিল।

এ রকম বিশেষ কোনো ঘটনা আমার জানা নেই ঠিকই, কিন্তু বলপূর্বক

বিবাহ রোধ করার জন্যে এবং নেভার-তুয়াকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর অতি-শয় ক্ষমতাবান সূক্ষ্মদেহ যদি একটু বেশী সক্রিয় হয় এবং রাণীর পিতৃহন্তা খুড়োমশায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ পণ্ড করা থেকে আরম্ভ করে চূড়ান্ত প্রতি-হিংসা নেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কর্মকাণ্ড অলৌকিক পন্থায় সাঙ্গ করে গল্পের খাতিরে—তবে তাই হোক। বিস্ময়কর সেই ঘটনা পরম্পরা নিয়েই রচিত হ'ল এই উপন্যাস।

আপন খুড়োর সঙ্গে ভাইঝির বিয়ের কাহিনী শুনে মিশরীয়রা যদি আঁৎকে ওঠেন তো আমি নাচার। প্রাচীন মিশরীয় নৃপতিরা নিজেদের ভাইবোনকে বিয়ে করত—এ নজীর ভূরি ভূরি আছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এমন বিবাহ প্রচলিত ছিল। এই কাহিনীতে মারমিস বিয়ে করেছে তার সৎবোন আন্তি'কে ঐ কারণেই।

যাদু মোমের মূর্তি দ্বারা নরহত্যা অথবা বিকলাঙ্গ করে দেওয়ার ঘটনার উল্লেখ আছে প্রাচীন মিশরে—এই কাহিনীতে যাদুকর কাকু যেভাবে ফারাওকে খতম করেছে—সেইভাবে তিন হাজার বছরেরও আগে রামেসিস তৃতীয়-র আমলে রাজাকে বধ করার একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল। 'মোম দেবতারা মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্বল করে দিত···দেশের সবচেয়ে নোংরা, সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ।' এছাড়াও বিশেষ একটা যাদু দলিলের সাহায্যে দেবতাদের যাদুশক্তিকে প্রয়োগ করা হত।'

এই ধরনের যাদুকরদের পরিণামটা কিন্তু অন্যের পক্ষে খুব উৎসাহজনক হ'ত না। অপরাধ তাদের ধরা পড়ত এবং শেষকালে নিজেরাই নিজেদের হনন করত।

'কা' য়ের ক্ষমতা আমি একটু সম্প্রসারিত করে লিখেছি ঠিকই, কিন্তু মিশরে যারা বেড়াতে যায় অথবা প্রাচীন মিশর নিয়ে যারা চর্চা করে, তাদের কাছে অতীতের সেই দিনগুলো যেমন সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এই কাহিনীতেও আমি সেই পরিবেশ, সেই বর্ণসমারোহ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আর মোমের মূর্তির যে ভয়ংকর যাদুকরী ক্ষমতার কথা রয়েছে গল্পের মধ্যে, সেরকম ঘটনা তো আধুনিক যুগেও ঘটছে। পশ্চিম আফ্রিকায় আজও দেখা যায় পুতুলের গায়ে নখ বা আলপিন ফুটিয়ে দেওয়া হয়।

পাঠকের কৌতূহল বৃদ্ধির জন্যে জানিয়ে রাখি. নেভার-তুয়ার প্রেম-কাহিনীর মত একটা ঘটনা খুঁজে পেতে উদ্ধার করেছি প্রাচীন মিশরের ইতিহাস থেকে। সমস্ত বিপদ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল পবিত্র প্রেমের শক্তি দেবতাদের সহায়তায়—ঘটিয়েছিল অনেক অলৌকিক কাণ্ড। হাজার

হাজার বছর ধরে মানুষ এই ধরনের ব্যাপারে বিশ্বাসী হলেও বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এমনটা কখনো ঘটতে পারে না।

'বুক অফ এক্সোডাস' গ্রন্থটি পাঠ করলেই জানা যাবে কিভাবে রহস্যজনক যাদুশক্তি অনেক ভয়াবহ ক্রিয়াকর্মের মধ্যে দিয়ে প্রভাবিত করে এসেছে প্রাচীন মিশরের জীবনধারা। প্রাচীন মিশরের সমগ্র ইতিহাসেও এই একই বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে। তৎকালীন মিশরীয়রা ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী ছিল, বহু নামে এবং রূপে সেই সর্বশক্তিমানকে উপাসনা করত—ঈশ্বরের নির্দেশ প্রতি পালন করার নিমিত্ত এবং মানুষের জীবনে সেই প্রভাব আনয়ন করার উদ্দেশ্যে অনেক রহস্যজনক পন্থার শরণ নিত। □



(১) আবির ষড়যন্ত্র

হাজার হাজার বছর আগের ঘটনা। মিশরে তখন সন্ধ্যে নেমেছে। নীলনদের ধারে এযুগে যে শহরকে বলা হয় লাক্সর অথবা কার্নাক, সুবৃহৎ সেই উয়াস্ট বা থিব্‌স্ শহরের সুবিশাল প্রাচীরের পাশে প্রিন্স আবির জাহাজ পৌঁছোলো।

আবির মা ঘৃণিত হিক্‌সোস জাতির মেয়ে। তাই আবির গায়ের রঙ কালো। চেহারাটা বিরাট। ডেকে বসে পাহাড়ের আড়ালে সূর্যাস্ত দেখছে আবি।

ভীষণ রেগে আছে আবি। চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মত লাল হয়ে উঠেছে, কর্কশ মুখেও রাগের প্রতিফলন ঘটেছে। দু-পাশে দাঁড়িয়ে ব্যজন করতে করতে আবির এই রাগী চেহারা দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে আছে দুই ক্রীতদাসী। থিব্‌স্ শহরের সুউচ্চ মন্দির আর প্রাসাদের দিকে এই সময়ে চোখ পড়ল একজন ক্রীতদাসীর। বহুশ্রুত অপরূপ শহরের শোভায় মুগ্ধ হয়ে অন্যমনস্ক হতেই হাতের পাখার পালক ঠেকে গেল আবির মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে সবেগে মেয়েটাকে চপেটাঘাত করল আবি—ডেকের ওপর ছিটকে গেল মেয়েটা।

'বেড়ালের বাচ্চা কোথাকার!' সে কি চিৎকার আবির। 'ফের যদি এমনি হয় তো চাবকে জামা পিঠে সেঁটে দেব!'

মেয়েটি চড় খেয়ে তখন কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে বললে—'ক্ষমা করুন, প্রভু। হাওয়ায় পাখা নড়ে গেছে।'

'দূর হ! দুজনই বেরো এখন থেকে। তোদের কদাকার মুখ দেখতেও চাই না। জ্যোতিষী কাকুকে পাঠিয়ে দে।'

জাহাজের সিঁড়ির দিকে ভোঁ দৌড় দিল মেয়ে দুটি।

চড় যে খেয়েছিল, তার নাম মেরিত্রা। দাঁতে দাঁত পিষে বললে—'আমাকে বেড়ালের বাচ্চা বলা বার করব। আমি যদি বেড়াল হই তো আমার ধর্ম-মা হ'ল সেখেত—যার মুখ বেড়ালের মত। প্রতিহিংসা-দেবী সেখেত!'

সঙ্গিনী মেয়েটি ফোঁস করে বললে—'আমাদের কদাকার বলা! রাজসভার প্রত্যেকে আমাদের রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—আর আমাদের বলা হ'ল কদাকার! কুমীরঠাকুর গিলে খায় যেন কালা শুওরটাকে!'

'এতই যদি রূপের প্রশংসা তো কিনে নিলেই পারে আমাদের। টাকা

পেলে নিজের মেয়েদেরও বেচতে পারে আবি—ক্রীতদাসীদের তো বটেই।'

'টাকা না দিয়েই একদিন পেয়ে যাবে আমাদের—এই আশাতেই বেচল না। এ-জীবন আর সইতে পারছি না, মেরিত্রা। যদি পারিস, পালা। নইলে মরতে হবে দুজনকেই।'

'চুপ! ধড়িবাজ জ্যোতিষীটা এদিকেই আসছে। মুখখানা অত শুকনো কেন রে?'

হাতে হাত দিয়ে দুই ক্রীতদাসী শীর্ণ পণ্ডিত প্রবরের সামনে পরম শ্রদ্ধায় প্রণাম করল মাথা নুইয়ে।

মেরিত্রা বললে—'হে নক্ষত্রপ্রভু, অমন করে আমার গালের দিকে চাইবেন না। পাঁচ আঙুলের ছাপটা আমাকে দান করেছেন প্রিন্স আবি—যাঁর বাবা ফারাও, যাঁর মা-কে স্রষ্টা দেবতা 'তা' কালির গামলায় ডুবিয়ে নিয়েছিলেন।'

'চুপ! চুপ!' সভয়ে আশপাশে তাকাতে তাকাতে বললে কাকু—'কেউ শুনলে মহামুস্কিল হবে। রাজা আবির পছন্দ নয় কেউ বলুক তাঁর মায়ের গায়ের রঙ কালো। কিন্তু চড় খেলে কেন বাছা?'

কারণটা বলল মেরিত্রা।

চোখ টিপে কাকু বললে—'আমি হলে অমন সুন্দর গালে বরং একটা চুমু দিতাম।'

'কিরে বোন? বলিনি তোকে শক্ত খোলার মধ্যে মিষ্টি বাদাম থাকে? হে জ্ঞানের প্রভু, প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ। কানাকড়ি না নিয়ে দয়া করে বলবেন আমাদের বরাতে কি লেখা আছে?'

'বলতেই তো চাই। কিন্তু বাজে কথা এখন থাক। প্রভুর মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে মনে হচ্ছে?'

'সাংঘাতিক সপ্তমে। ঐ শুনুন!'

ওপরের ডেক থেকে শোনা গেল একটা হু-হুংকার।

'গেল কোথায় বজ্জাত জ্যোতিষীটা?'

'কী! বলিনি আপনাকে? আলখাল্লা বোঝাই অনেক কাগজের রোল নিয়েছেন—আর নিতে হবে না। তাড়াতাড়ি যান।'

সিঁড়ির দিকে পাঁই পাঁই করে দৌড়োতে দৌড়োতে কাকু বললে—'তা না হয় যাচ্ছি, কিন্তু কাগজে যা লেখা আছে, তা জানলে প্রভুর মাথা কি ঠিক থাকবে?'

'ভগবানের নাম জপ করতে করতে যান!' পেছন থেকে চিৎকার করে

বলল একটি মেয়ে।

'জ্যান্ত ফিরে এলে টাকাকড়ি কিছু দিয়ে যাবেন।' বললে আর একটি মেয়ে।

মিনিট খানেক পরেই ওপরের ডেকের প্যাভিলিয়নে আবির পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল বক্র-নাসিকা দীর্ঘকায় গগনসন্ধানী পুরুষটি—টাক মাথা থেকে ঠিকরে গেল সিরিয়ান টাইপের টুপি।

গজরে উঠল আবি—'এত দেরী কেন?'

'আমাকে খুঁজে পাচ্ছিল না আপনার ক্রীতদাসীরা। কেবিনে ছিলাম।'

'আমি তো শুনলাম বাঁদীগুলো খিলখিল করে হাসছে তোমার সঙ্গে। কিজন্যে আসছিলে আমার কাছে?'

'হে সূর্যের রাজনন্দন—

'ও নাম তো খোদ ফারাওয়ের। কিছু পেয়েছো নাকি?'

'ঠিক ও রকম কিছু পাইনি। তাছাড়া, যা মোটামুটি অবধারিত, তা যাচাই করারও দরকার বোধ করিনি।'

'মোটামুটি মানে? কি বলতে চাও? সমগ্র মিশরের ফারাও হব, না, সামান্য কতকগুলো প্রদেশের প্রভু হয়ে থাকব, এই চিন্তা নিয়ে যখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হবার উপক্রম হয়েছে আমার, তখন মোটামুটি শব্দটা বলা হ'ল কেন শুনি?'

'সঠিক কি জানতে চান, যদি বলেন মহারাজা, তাহলে সঠিক জবাবটা দিতে পারি,' সবিনয়ে বললে কাকু।

'মহারাজা! মহারাজা বললে কেন শুনি? মেমফিসের প্রিন্স আমি! আমাকে মহারাজা বলা হ'ল কেন? গ্রহ নক্ষত্র বিচার করে কিছু জেনেছো মনে হচ্ছে! ভবিষ্যৎ জানতে হুকুম দিয়েছিলাম, হুকুম মেনেছো মনে হচ্ছে?'

'হুকুম না মেনে উপায় আছে কি? কাল রাতে গ্রহ নক্ষত্র দেখে যা জেনেছি, তাই নিয়েই হিসেব করছিলাম এতক্ষণ। প্রশ্ন করুন, জবাব দিচ্ছি।'

'জবাব তো দেবে, কিন্তু কি জবাব দেবে বলো তো? সত্যি নিশ্চয় বলবে না, কারণ পয়লা নম্বরের কাপুরুষ তুমি। অথচ সত্যি জানবার ক্ষমতা কেবল তোমারই আছে। মিথ্যে যদি বলো তো বিশ্বাসঘাতক বলে মুণ্ড কেটে নিয়ে পাঠিয়ে দেবো ফারাওকে—ধড়টা তোমার তৈরী অতীব চমৎকার সমাধিমন্দিরে কিন্তু থাকবে না—যাবে কুমীরের পেটে—যেখান থেকে পুন-

জীবন আর সম্ভব নয়। বুঝেছো? এবার কাজের কথায় এসো। ঐ দ্যাখো সূর্য ডুবছে রাজাদের সমাধির ওপর দিয়ে। খুবই অশুভ লক্ষণ। পুনর্জীবনের প্রতীক্ষায় ওখানেই সমাধিস্থ হন ফারাওরা। এ শহরে যারা আসে তারা ভোরবেলা আসে—যখন রা থাকে পূবদিকে, জীবনের ঘরে। পশ্চিমদিকে যখন রা মৃত্যুর ঘরে ঢলে পড়ে তখন এ শহরে আসে না কেউ। কিন্তু টাইফোন এমন পাজী হাওয়া লেলিয়ে দিল আমার পেছনে যে ঠিক এই সময়ে জাহাজ পৌঁছোলো শহরের ধারে। আকাশ-পর্যবেক্ষক পণ্ডিত মশায়, এবার বলো তারা দেখে কি বুঝলে? রাজাদের ঐ সমাধি উপত্যকায় আমি ঠাঁই পাবো তো?'

'মনে তো হয় তাই। মানে, গ্রহনক্ষত্র তাই বলে।' ঠিক এই সময়ে অস্ত যাওয়া সূর্য ঘিরে একটা জ্যোতির্বলয় দেখা দিতে আঙুল তুলে দেখাল কাকু—'দেখেছেন?'

গনগনে চোখে ফেটে উঠল আমি—'কি যেন লুকোবার চেষ্টা করছো? সোজা কথায় বলো, রাজাদের উপত্যকায় আমার নিজের হাতে তৈরী অনন্ত সমাধি-মন্দিরে মৃত্যুর পর শয়নের সৌভাগ্য হবে কিনা।'

'হে রা-নন্দন, সঠিক বলা মুস্কিল। আপনার ভাগ্যাকাশে একটা অশুভ প্রভাব পড়েছে। অন্য একটা নক্ষত্র আপনার জীবনের ঘরে ঢুকে পড়ছে। দীর্ঘদিন তাকে দাবিয়ে রাখবেন আপনি, শেষপর্যন্ত আপনাকে সে গ্রাস করবে।'

'কোন নক্ষত্র? ফারাও-য়ের?'

'না, প্রিন্স। আমেনের নক্ষত্র।'

'আমেন! কোন আমেন?'

'দেবতা আমেন। দেব-জনক আমেন।'

'দেব-জনক আমেন! মানুষ কি লড়তে পারে দেবতার সঙ্গে?'

'শুধু একজন দেবতার সঙ্গে নয়, প্রিন্স। দুজন দেবতার সঙ্গে লড়তে হবে আপনাকে। আমেনের নক্ষত্রের সঙ্গে জুটবে হাথোরের নক্ষত্র—প্রেমের রাণী হাথোর। হাজার হাজার বছর এরা কাছাকাছি হয়নি। হবে আপনার ভাগ্যাকাশে থাকবে আপনার জীবদ্দশা পর্যন্ত। ঐ দেখুন।'

পূব আকাশে দেখা গেল একটা জলজলে তারার ওপর গিয়ে পড়েছে পশ্চিমের রক্তরাগ। ঠিক তার নিচেই দেখা যাচ্ছে আরও একটা তারার আভাস। যেন যুগল তারকা। কিছুক্ষণ সমুজ্জ্বল থাকার পর দুটো তারাই মিলিয়ে গেল দিগন্তের নিচে।

'আমেনের ভোরের তারা আর সেইসঙ্গে হাথোরের তারা,' বললে জ্যোতিষী।

'মূর্খ, ওরা রয়েছে আমার তারার কাছ থেকে অনেক তফাতে। তাছাড়া, ওরা তো ডুবে গেল, কিন্তু আমি তো উত্তরোত্তর ওপরে উঠছি।'

প্যাপিরাসের একটা গুটোনো কাগজ খুলতে খুলতে কাকু বললে—'বছর বিশেক আপনি ওপরেই থাকবেন। তারপর ওরা আপনাকে গ্রাস করবে। কাগজে এঁকে দেখিয়েছি ওরা কোন্ পথে কি ভাবে আসবে। এই কুড়িটা বছর আপনার পোয়াবারো।'

রোল-টা ছিনিয়ে নিয়ে দলা পাকিয়ে কাকুর মুখে ছুঁড়ে মারল আবি।

'ঠগবাজ! তোমার ছবি এঁকে প্রবঞ্চনা করা বার করে দোবো আমি। এই হ'ল আমার তারা।'

ফস্ করে ব্রোঞ্জের তরবারি টেনে বার করে কাকুর নাকের ডগায় নাড়তে নাড়তে বললে আবি—'ফের যদি ধাপ্পা দিতে চেষ্টা করো তো আমার এই তারা গ্রাস করবে তোমাকে।'

আত্মমর্যাদা অটল রইল কাকুর। বললে—'সত্যি বললাম, কিন্তু আপনার পছন্দ হ'ল না। তবে যদি চান, এখন থেকে আপনার ভাল-লাগা কথা বলব। তাছাড়া, আমার তৈরী আপনার এই কোষ্ঠীতে খুব একটা খারাপ তো কিছু দেখছি না। কুড়ি বছর আপনার সুসময় যাচ্ছে। ক'জনের ভাগ্যে এমন সুযোগ আসে? বিশেষ করে আপনার এই বয়েসে কুড়িটা বছরের ভোগ কি কম? তারপর আসুক না দুর্দৈব, ক্ষতি কী?'

ঈষৎ শান্ত হল আবি—'তা ঠিক। আজ আমার মেজাজটা খিঁচড়ে রয়েছে। সত্যি গণনা করার পুরস্কার পাবে আমার নিজের সোনার কাপ। মিথ্যে বলে আমার মন যোগাতে হবে না—যা সত্যি, তাই শুধু বলবে। সত্যি ছাড়া আর কিছু আমি শুনতে চাই না।'

স্বর্ণপাত্র প্রাপ্তির সংবাদে উল্লসিত হয়ে দোমড়ানো প্যাপিরাস রোল কুড়িয়ে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হল কাকু। ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল, নীল-নদের কাদা-পাড় বেয়ে কয়েক ব্যক্তি আসছে জাহাজের দিকে। নক্ষত্রলোক ঠিকরে যাচ্ছে তাদের ব্রোঞ্জ-হেলমেট থেকে।

'কাকু', পেছন থেকে ডাকল আবি—'যেও না, আমার রক্ষী-ক্যাপ্টেন ফারাওয়ের জবাব নিয়ে আসছে। শুনে যাও, প্রয়োজন হলে পরামর্শও দিয়ে যাও।'

দাঁড়িয়ে গেল কাকু। ক্যাপ্টেন এসে স্যালুট করল আবিকে।

'আমার ভাই, মহান্ ফারাও, বলে কী?'

'যদিও আপনি না জানিয়ে এসেছেন, তাহলেও দেখা করবেন আপনার সঙ্গে। কিন্তু মরুভূমির বর্বরদের যুদ্ধে হারিয়ে তাদের যে মুণ্ডগুলো নুন মাখিয়ে এনেছেন ওঁকে দেখাবেন বলে, সেগুলো দেখাবেন না।'

অবজ্ঞার সুরে আবি বললে—'মহান্ ফারাও দেখছি এ ব্যাপারে মেয়েমানুষের বেহদ্দ। অধীনস্থ সেনাপতিরা শত্রুদের লড়াইয়ে হারিয়ে কিভাবে কচাকচ মুণ্ডগুলো কেটে আনে তাও দেখতে চায় না। ঠিক আছে, কাল যাবো ফারাওয়ের দরবারে।'

'প্রভু,' বললে ক্যাপ্টেন—'আরও বার্তা আছে। উনি শুনেছেন আপনি তিনশ রক্ষী নিয়ে এসেছেন। পাঁচজন দেহরক্ষী ছাড়া আর কাউকে ওঁর সামনে নিয়ে যেতে উনি নিষেধ করেছেন।'

সঘৃণ হাসি হেসে উঠল আবি—'তাই নাকি? এত ভয় ফারাওয়ের? মাত্র তিনশ সৈন্য নিয়ে আমি সৈন্যবোঝাই এত বড় শহর দখল করে তাকে গ্রেপ্তার করব, এই ভয়ে বুঝি কাঠ হয়ে আছে?'

সটান বলে দিল ক্যাপ্টেন—'আজ্ঞে না, প্রিন্স। ওঁর বিশ্বাস, আপনি ওঁকে হত্যা করে ফারাও হয়ে বসবার ফিকিরে আছেন। কারণ, ফারাওয়ের রক্ত কেবল আপনার ধমনীতেই আছে।'

'তার মানে ফারাওয়ের রক্ত ধমনীতে নিয়ে তার কোনো ছেলেমেয়ে এখনো হয়নি?'

'না, প্রিন্স। ফারাওয়ের মহীয়সী স্ত্রী আহমোর কোলে বা পায়ের কাছে কোনো বাচ্চা দেখিনি—ফারাওয়ের অন্যান্য পরমাসুন্দরী বউ আর বাঁদীদের কোলেও কোনো বাচ্চা দেখিনি। ফারাও আজও নিঃসন্তান।'

প্যাভিলিয়নের পর্দা অপসারিত হয়েছিল। ধীরপদে হেঁটে গিয়ে জাহাজে গলুইয়ের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আবি।

ততক্ষণে রাত হয়েছে। চাঁদের কিরণ পড়েছে সীমাহীন থিব্স্ শহর, সুদূরবিস্তৃত নীলনদ, পাহাড় আর মরুভূমির ওপর। সুউচ্চ মিনার আর দীর্ঘ চতুষ্কোণ সূক্ষ্মাগ্র স্তম্ভের সোনা আর পেতল থেকে চন্দ্রকিরণ ঠিকরে যাচ্ছে। রাজ প্রাসাদের জানলা আর দশহাজার গৃহের প্রদীপগুলো অগুন্তি নক্ষত্রের মত জলজল করছে। বাগান, পথ, চত্বর থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীতের ক্ষীণ শব্দ; শহর প্রাকারের শীর্ষে প্রহরীরা ঘোষণা করছে প্রহর বার্তা।

অপূর্ব দৃশ্য। জমকালো দৃশ্য। উত্তাল হল প্রিন্স আবির বক্ষ।

অপরিসীম সম্পদ আর ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েও ফারাও আজও নিঃসন্তান। অসিরিসের সিংহাসনে আজও তার উত্তরসূরী নেই। অদূর ভবিষ্যতে কি ঘটবে বলা যায় না, কেন না ফারাও সত্যিই বড় রুগ্ন, কিন্তু তার আগেই অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পুরুৎরা অঘটন ঘটিয়ে দিতেও তো পারে—ফারাওয়ের উত্তরসূরী অন্বেষণ করে নিতে পারে। সিংহাসনে বসবার মত কেউ একজন এসে যেতে পারে। কারণ, ফারাওকে সবাই ভালবাসে—বাসে না আবিকে—কেন না তার ধমনীতে রয়েছে ঘৃণিত বর্বর-রুধির। ভয়ংকর হিস্‌কোস্‌দের রক্ত—তার মায়ের দিক থেকে। কি কুক্ষণেই যে হিস্‌কোস্‌ মেয়েকে বিয়ে করেছিল বাবা!

কেন, পৃথিবীতে এত সুন্দরী মেয়ের একজনকে তার মা করলে কি ক্ষতিটা হত? এই হিস্‌কোস্‌ রক্তের জন্যেই পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে সে—অথচ এই হিস্‌কোস্‌ রক্তের দৌলতেই তার শৌর্যবীর্য অপরের ঈর্ষণীয়।

তবে কেন দেরী করবে আবি? বাহুবলে ভাগ্য গড়ে নিতে ক্ষতি কী? সঙ্গে রয়েছে তিনশ বাছাই করা দুর্মদ পুরুষ—সমুদ্র এবং মরু অঞ্চলের বেপরোয়া সন্তান। উৎসবের সাজে সেজেছে এখন থিব্‌স্‌ শহর, আরক্ষা ব্যবস্থা তত কঠোর নয় তোরণগুলোয়। রাত্রি নিশীথে তরবারির ভেল্কী দেখিয়ে ঢুকে পড়লেই তো হয়। সটান রাজপ্রাসাদে পৌঁছে ফারাওকে তার চোদ্দপুরুষের কবরখানায় পাঠিয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে গেল। ভোর হলেই দেখা যাবে ফারাওয়ের জবর সিংহাসন জাঁকিয়ে বসে আছে আবি। ভাবতে ভাবতেই বুক ফুলে উঠল আবির, শক্ত হল নাকের পাটা এবং এমনভাবে ঘাড় নাড়তে লাগল যেন জোড়ামুকুটের ভার আর সইতে পারছে না মাথা। দীর্ঘ পদক্ষেপে ফিরে এল প্যাভিলিয়নে।

বললে—'ঝাঁপিয়ে পড়বার মতলব আঁটছি। আজ রাতে যাবে শহরে সৈন্যসামন্ত নিয়ে? পরিণামে মিলবে সিংহাসন—অথবা কবর। প্রথমটা যদি পাই, তুমি হবে আমার সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি! কাকু, তোমাকে করে দেবো আমার ভিজিয়ার। ফারাওর পর তোমরাই হবে এ দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ।'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে খাবি খেল দুই অধস্তন কর্মচারী।

অনেকক্ষণ পরে বললে ক্যাপ্টেন—'খুবই দুঃসাহসের কাজ, প্রিন্স। কিন্তু পারিতোষিকের লোভে চেষ্টা করব কথা দিচ্ছি। সৈন্যদের কথা অবশ্য বলতে পারছি না। আগে তো ওদের খুলে বলতে হবে প্ল্যানটা। তখন

কার কি মতি হবে জানছি কি করে ? একজনও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তো কালকেই শেয়ালরা অথবা মলম-মাখানেওয়ালারা ব্যস্ত থাকবে আপনার আর আমার শরীরগুলো নিয়ে।'

কাকুর দিকে তাকাল আবি।

কাকু বললে—'প্রিন্স, মন থেকে এ-মতলব তাড়ান। ভুলেও আর ভাববেন না। নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এই রকমই একটা ব্যাপারের আভাস পেয়েছিলাম—স্পষ্ট ধরতে পারিনি। এখন তো দেখছি পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিচ্ছেন। ফারাওর বিরুদ্ধে অঙ্গুলিহেলন করলেই নরকবাস অনিবার্য। এখনও বহুবছর রাজত্বের সুযোগ আপনি পাচ্ছেন। জোড়ামুকুটের লোভে সর্বস্ব হারিয়ে ঈশ্বরের বিরাগভাজন হতে যাবেন না।'

একদৃষ্টে কাকুর মুখের দিকে চেয়েছিল আবি। তাই দেখল, মন জুগিয়ে নয়—অন্তর থেকে কথা বলছে সে।

বললে—'ঠিক আছে। পরামর্শ মেনে নিলাম। ফারাও আরও কিছুদিন বাঁচুক। আমার সৈন্যবল তেমন নেই—তলায় তলায় বরং প্রস্তুত হয়ে নিই। কালকেই আমি ওঁর উত্তরাধিকারীর প্রসঙ্গ তুলব ফারাওর সামনে। নামটা বলতে হবে সবার সামনে।'

স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলল জ্যোতিষী। কিন্তু মুখ চুন হল ক্যাপ্টেনের।

বললে—'তাহলে তাই হোক। ঘাড়ের ওপর মাথাটাকে অনেক শক্ত মনে হচ্ছে এখন। বুদ্ধির জোর অনেক সময়ে বাহুর জোরের চাইতে বেশী কাজ দেয়। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন প্রিন্স। কাল সূর্য ডোববার দু-ঘণ্টা পর ফারাও আপনাকে দর্শন দেবেন। এখন তাহলে আসতে পারি ?'

কোমরের তরবারি স্পর্শ করে আবি বললে—'মুখে চাবি দিয়ে থাকতে হবে কিন্তু। ফিসফাস করলেও আমার অবস্থা হবে শোচনীয়।'

দৃষ্টি বিনিময় করল কাকু আর ক্যাপ্টেন। তরবারির হাতলে হাত রাখল ক্যাপ্টেন।

বললে মিষ্টি করে—'প্রিন্স, জীবন জিনিসটা সবার কাছেই প্রিয়। আমাদের সন্দেহ করার কোনো কারণ আদিনেও কিন্তু পান নি।'

'তা ঠিক। সেরকম হলে কথা পরে বলতাম, আগে তলোয়ার চালাতাম। কিন্তু তোমাদের দুজনকেই শপথ করতে হবে—মরণে বা জীবনে আজকের ব্যাপার যেন মুখ দিয়ে না বেরোয়।'

আসারিসের পবিত্র নামে শপথ করল দুজনে।

'ক্যাপ্টেন,' বলল আবি—'তোমার মাইনে আজ থেকে ডবল করে

দিলাম। এ ছাড়াও কথা দিচ্ছি, ফারাও যেদিন হব, আমার সেনাপতি হবে তুমি।'

মাথা নুইয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল ক্যাপ্টেন।

কাকুকে বলল আবি—'আমার সোনার কাপ আজ থেকে তোমার। আর কিছু বাসনা থাকলে বলে ফ্যালো।'

'আপনার ঐ ক্রীতদাসীটা—যাকে এইমাত্র চড় মারলেন—'

'তুমি কি করে জানলে চড় মেরেছি আমি? আকাশের তারা গুণে নাকি? যাক গে, ছেঁড়া কথা আর ভাল লাগে না। নিয়ে যাও ওকে—দুদিনেই তোমার গালটাই চড়িয়ে ফাটাবে।'

মেরিত্রাকে কিন্তু আর খুঁজে পেল না কাকু।

উধাও হয়েছে সে।

(২) ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

থিব্স্ শহরের উষাকাল। ভোরের সূর্যকিরণে ঝলমল করছে বিশাল নগরী। বিরাট একটা বজরায় ক্যাপ্টেন, কাকু আর তিনজন অফিসারকে নিয়ে বসে আছে আবি। আর একটা বজরায় রয়েছে গোলাম, কিছু শ্বেতাঙ্গনা যুদ্ধবন্দিনী আর নুন মাখানো কাটা মুণ্ড আর হাত—ফারাওকে অর্ঘপ্রদান করার জন্যে।

শ্বেতবসন দাঁড়িরা ঝুঁকে পড়ে দাঁড় টেনে চলল দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। নীলনদের বুক কেটে ধেয়ে গেল দ্রুতগামী বজরা। দুপাশে সারি সারি যুদ্ধ জাহাজ ভর্তি সেনানীদের দিকে তাকিয়ে প্রমাদ গুণল প্রিন্স আবি। ভাগ্যিস কাকুর কথা শুনেছিল। ফারাও তার উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে। সৈন্য সাজিয়ে রেখেছে দুধারে। জেটিতে বজরা দাঁড়ানোর পর কাতারে কাতারে সৈন্য দেখা গেল সেখানেও। সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে প্রাকার শীর্ষেও। লৌহ কঠিন এই সৈনিক ব্যূহ ভেদ করা সম্ভব হ'ত না তার পক্ষে মাত্র তিনশ রক্ষী নিয়ে—প্রাণ যেত নির্ঘাৎ।

সোপান শ্রেণীর ওপর দিয়ে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল পুরুৎরা। সসম্মানে মাথা নুইয়ে জানালো অভিবাদন। পথে বেরিয়েও বিরাম নেই অভ্যর্থনার। মন্দির-মিনারের চূড়ায় উড়ছে পতাকা। দুপাশের উদ্যান শোভিত গৃহগুলিতেও হয়েছে অভ্যর্থনার আয়োজন। প্রাসাদ তোরণের সামনে পৌঁছে ফের দেখা গেল সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী। ক্ষণেকের উন্মাদনায় এই ব্যূহভেদ করার দুরাশা পোষণ করেছিল আবি—ভাবতেই কাঁটা দিল

গায়ে। তোরণের পর সুদীর্ঘ পথের দুপাশে সারি সারি গাছ। ফলে ফুলে বর্ণে গন্ধ অপরূপ। সবশেষে বিরাট বিরাট থামওলা অবায়েৎ-কক্ষ।

আলো থেকে হঠাৎ যেন অন্ধকারে এসে পড়ল আমি। প্রায়ান্ধকার বিরাট হলঘরের ওপরের একটা গবাক্ষ দিয়ে সূর্যকিরণ এসে পড়েছে যেখানে, ঠিক সেইখানে বসে আছেন মুকুটধারী ফারাও এবং তার রাণী। সিংহাসনটা হাতীর দাঁত আর সোনা দিয়ে তৈরী। নকলনবিস, পরামর্শদাতা আর ক্যাপ্টেনরা ঘিরে বসে আছে তাঁকে। অন্যান্য রাণীরা বসে আছে সারি সারি বাঁকানো চেয়ারে—মহার্ঘ পরিচ্ছদআবৃত গৃহস্থালীর রমণীরা সেবা করছে তাদের। সিংহাসনের পেছনে থামগুলোর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দু-শ সুবিখ্যাত নুবিয়ান রক্ষী। বিশ্বস্ততা আর সাহসিকতার ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়েছে প্রত্যেককে।

নয়নমনোহর এ-হেন জাঁকজমকের মধ্যে আসীন রয়েছেন ফারাও। শুকনো রুগ্ন চেহারা। বছর চল্লিশ বয়স। উৎকণ্ঠিত মুখ। রাজকীয় সর্প প্রতীক আঁকা ফোঁপরা সুবর্ণ জোড়ামুকুটের ভারে ঘাড় যেন নুয়ে পড়ছে। সোনালী পরিচ্ছদের ওপর অস্থির হয়েছে স্নায়ুদুর্বল দু-খানি হাত। বিশ্বের সবচেয়ে পরাক্রমশালী নৃপতি ফারাও ইনি—লক্ষ লক্ষ মানুষের শাসক—যারা তাঁকে স্বচক্ষে কখনো দেখেনি—কিন্তু পূজা করে দেবতাজ্ঞানে।

বিস্ফারিত চোখে কুঞ্চিতচর্ম শুষ্ক উদ্বিগ্ন মুখখানির দিকে চেয়ে রইল আমি। তার নিজের শরীর ঠিক উল্টো। গাঁট্টাগোঁট্টা, কৃষ্ণকায়, গোল-চক্ষু। একই বাবার ঔরসে জন্ম দুজনের। হিসুকোস্ উপপত্নীর গর্ভে জন্মেছিল আমি। রাজপ্রাসাদে ছেলেবেলায় কত খেলা খেলেছে দুজনে। তারপর দেখা হয়নি অনেকদিন। দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে দুজনের মধ্যে। বিস্ময় উপচে ওঠা দুই চক্ষু নিবদ্ধ রইল ফারাও নামক ক্ষীণকায় দুর্বল এই প্রাণীটির ওপর—যার বাবা আর মা ছিল ভাই আর বোন; ঠাকুরদা ঠাকুমাও ছিল ভাই আর বোন। কৃশ রুগ্ন হলেও ফারাওয়ের চাহনির মধ্যে এমন একটা বস্তু আছে যা শারীরিক দুর্বলতার গণ্ডীর অনেক ঊর্ধ্বে—চোখে চোখে চাইলে মাথা আপনি থেকে নুয়ে আসে—সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়। একশ রাজার বংশধরের গর্বিত আত্মার নিবাস পল্কা ঐ বপুর মধ্যে—চাহনির মধ্যেই তার প্রকাশ ঘটেছে।

সোপান বেয়ে উঠে গিয়ে সিংহাসনের সামনে নতজানু হয়ে বসল আমি। ক্ষণেক পরে তরবারি এগিয়ে দিলেন ফারাও। চুম্বন করল আমি।

দ্রুত লঘুস্বরে বললেন ফারাও—'স্বাগতম ভাই। ছেলেবেলায় অনেক

কলহ করেছি। কিন্তু কালের স্রোতে সব ক্ষত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই স্বাগতম জানাই আমার বাবার পুত্রকে। ভাল যে আছো, তা তোমার শরীর দেখেই বুঝতে পারছি।' বলে, আবির বিরেট বপুর দিকে ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ফারাও।

গুরুগম্ভীর গলায় জবাব দিল আবি—'ঈশ্বরের বরপুত্র মহারাজার জয় হোক! শক্তি আর স্বাস্থ্য আপনার অক্ষয় হোক।'

নরম গলায় ফারাও বললেন—'ধন্যবাদ, প্রিন্স। অসিরিসের পদতলে ঠাঁই পেলেই আবার ফিরে পাব আমার শক্তি আর স্বাস্থ্য। কিন্তু আমার কথা এখন থাকুক। কাজের কথা হোক। আমার অনুমতি না নিয়ে তুমি মেমফিস শহর ছেড়ে আমার এই তোরণ-নগরীতে এসেছো কেন?'

বিনীতভাবে আবি বললে—'রাগ করবেন না। কিছুদিন আগে আপনার নির্দেশে মরুভূমির দামাল প্রজাদের শায়েস্তা করতে গিয়েছিলাম। যুদ্ধদেবতা মেনথু-র মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম বিদ্রোহীদের ওপর। হঠাৎ হানা দিয়ে হাজারে হাজারে শত্রু বধ করেছিলাম। দুজন দলপতিকে তাদের সমস্ত বউ সমেত ধরে এনেছি—বাইরে দাঁড় করিয়ে এসেছি—আপনার হুকুম হলেই তাদের শিরশ্ছেদ হবে। আপনার সামনে আমার এই বিপুল জয়লাভের প্রমাণ স্বরূপ এনেছি তাদের একশ ক্যাপ্টেনের কাটা মুণ্ড আর পাঁচশ সৈনিকের কাটা হাত। হুকুম দিন সেগুলো সাজিয়ে রাখি আপনার পায়ের তলায়। বিদ্রোহীরা আর নেই। অন্ততঃ এক পুরুষের মধ্যে আর কারো সাহস হবে না আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার। অনুগ্রহ করে এদের কাটামুণ্ডু আর কাটা হাত প্রত্যক্ষ করুন, গণনা করুন, বিচ্ছিন্ন অঙ্গের সুরভি ঘ্রাণে নাসিকারন্ধ্রকে পরিতৃপ্ত করুন।'

'না, না,' ঝটিতি বললেন ফারাও। 'আমার অফিসাররা ও কাজ করবে'খন বাইরে—রক্তারক্তি আমি দেখতে চাই না। মিশরের সবচেয়ে উত্তর অঞ্চল সুরক্ষিত রাখার কি পারিতোষিক আশা করো, বলো ভাই।'

জবাব দেওয়ার আগে রাণী আহমা এবং অন্যান্য রাণীদের দেখে নিল আবি।

বললে—'আপনার ছেলেমেয়ে কাউকে এখানে দেখছি না। হয়ত রাজঅন্দরে রয়েছে। অনুগ্রহ করে তাদের এখানে আনান। দেখে নয়ন সার্থক করি। মেমফিসে ফিরে গিয়ে ওদের খুড়তুতো ভাইবোনেদের কাছে প্রত্যেকের বর্ণনা যেন দিতে পারি।'

মুখ লাল হয়ে গেল দুই ভূমির রাণী আহমার। কী অপমান! কী

অপমান! অন্যান্য রাণীরাও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে গুজগুজ ফিসফাস আরম্ভ করল নিজেদের মধ্যে। অপমান স্পর্শ করেছে তাদেরকেও। ফ্যাকাশে মুখে মর্যাদা-গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন ফারাও।

বললেন—'রমণীদের এ হেন অপমানের জন্যে ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন না। তুমি জানো আমি নিঃসন্তান। জেনেশুনেও তাদের দেখতে চাও কেন?'

'গুজব শুনেছিলাম—সঠিক জানতাম না। ভেবেছিলাম, এত যাঁর স্ত্রী, তাদের কেউ না কেউ মা হয়েছে। তাই যাচাই করে নিয়ে আমার আর্জি আপনার সামনে পেশ করব মনস্থ করেছিলাম। সবার সামনে বলব কী?'

কঠোর কণ্ঠে ফারাও বললেন—'বলো। মিশরের স্বার্থে বলো।'

মাথা নুইয়ে আবি বললে—'ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয়েছেন বলেই আজ আপনি নিঃসন্তান। অসিরিস সমীপে যখন মহাপ্রয়াণ করবেন, তখন কিন্তু শূন্য সিংহাসনে বসবার মত একজনও থাকবে না। একটি মেয়েও যদি আপনার থাকত, তাহলেও মুখ খুলতাম না আমি। কিন্তু এত মন্দির নির্মাণ করেও আপনার ভজনায় কর্ণপাত করেন নি ঈশ্বর। এত বউয়ের গর্ভেও আসেনি একটিও সন্তান। এমন কি আপনার জনক আমেন, যাঁর নাম আপনি বহন করে চলেছেন আজও, তিনিও সদয় হন নি আপনার ওপর এ ব্যাপারে। সিংহাসনে আজও আপনি একক নক্ষত্র—আমেনের ইচ্ছায় নিশ্চয়।'

তন্ময় হয়ে এতক্ষণ শ্রবণ করেছিলেন রাণী আহমা। এবার বললেন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে।

'ঈশ্বরের কি অভিপ্রায়, তা তো তোমার জানার কথা নয়, প্রিন্স। দীর্ঘকাল পরেও তো ঈশ্বরের ইচ্ছায় অনেকের সন্তান হয়। আমাদেরও হবে, মিশরের সিংহাসন আলো করে সে আসবে।'

মাথা নুইয়ে আবি বললে—'তাই যেন হয় মহারাণী। দেবরাজদের অভিপ্রায় কি, তা আঁচ করার সাধ্য আমার নেই। একটি মেয়েও যদি হয় আপনার, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নেব। রাজমাতা উপাধিটাও ফিরিয়ে দেব। আজ পর্যন্ত কিন্তু তা মিথ্যে হয়ে রয়েছে—সিংহাসনে আর স্মৃতিস্তম্ভে উৎকীর্ণ এত বড় মিথ্যে আর হয় না।'

বিদ্রূপের জবাব দেওয়ার জন্যে মুখ খুলতে গেছিলেন রাণী, হাঁটুতে হাত রেখে বাধা দিলেন ফারাও।

বললেন—'প্রিন্স, এতক্ষণ যা বললে, আমরা তা জানি। সত্যিই আমরা

নিঃসন্তান। এবার বলো আমরা যা জানি না। কি অভিপ্রায় গুপ্ত রয়েছে তোমার মনের কন্দরে?'

'ফারাও, আমার জন্ম আপনার পিতার ঔরসে—একই ঐশ্বরিক রক্ত বইছে আমার ধমনীতেও—'

ঝটিতি বললেন আহ্‌মা—'কিন্তু মায়ের রক্ত তো ঐশ্বরিক নয়। মায়ের রক্তে রয়েছে তো খেম-য়ের অভিশাপ। আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলেই বুঝবে।'

কথা কানে না তুলে আবি বলে গেল—'ফারাও, আপনি কাহিল হয়ে পড়ছেন। স্বর্গের পথ আপনার সুগম হচ্ছে। মর্ত্যের নিবাস বিলীন হতে চলেছে। উত্তরে আর দক্ষিণে অনেক বিপদ মিশরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। উত্তরাধিকারহীন অবস্থায় সহসা আপনি দেহ রাখলে উত্তর আর দক্ষিণ থেকে বর্বর বিদ্রোহীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছারখার করে দেবে সোনার মিশরকে। কিন্তু আমার শক্তি আছে। আমার অনেক সন্তান আছে। আমার দুর্মদ সৈন্যরা বিশ্বাস রাখে আমার বাহুবলে। আমার দুর্গ নির্মিত হয়েছে পাহাড়ের ওপর। আমাকে আপনার উত্তরাধিকার নির্বাচিত করুন। আমার ছেলেমেয়েরা সেই উত্তরাধিকারের সুফল অর্জন করুক। তাহলেই পুরুষানুক্রমে সুরক্ষিত থাকবে মিশর—সিংহাসন কখনোই শূন্য থাকবে না। ফারাও, এই আমার বক্তব্য।'

শিউরে উঠল সভাসদরা। রাগে হাতের পদ্ম আছড়ে ফেললেন রাণী আহ্‌মা। অটল রইলেন কেবল ফারাও। মাথা হেঁট করে, চোখ মুদে যেন ধ্যানস্থ হলেন। মিনিট কয়েক যেন প্রার্থনা জানালেন ঈশ্বরকে। তারপর শুষ্ক, পাণ্ডুর মুখ তুলে মৃদু হাসলেন।

বললেন স্মিত মুখে নরম সুরে—'ভাই আবি, এই সিংহাসনে আগে যাঁরা বসে গেছেন, তোমার এই বক্তব্য শুনে কিন্তু তাঁরা তরবারি ধরতেন তোমার সামনে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে তুমি সবংশে। কিন্তু স্পর্ধা তোমার চিরকাল অপরিসীম বলে আমি ক্ষমা করলাম। তবে সব কথা এখনো তুমি বলো নি—'ঝুঁকে পড়লেন ফারাও। নিস্তব্ধ হয়ে গেল বিরাট হলঘর—'গতকাল রাতে তোমার রক্ষীপ্রধানের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলে আমার রক্তে নেয়ে উঠে এই প্রাসাদ দখল করে কিভাবে ফারাও হতে চাও।'

কথা শেষ হতে না হতেই তুমুল হট্টগোলে ঘর যেন ফেটে গেল। হুহুংকারে ঘর কাঁপিয়ে তরবারি উন্মোচন করে নামী অফিসাররা খেয়ে এল সামনে। ফারাও তরবারি আন্দোলন করতেই শান্ত হল তারা।

নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ধ্বনিত হল আবির ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'কার সাহস এত বড় জঘন্য কদর্য মিথ্যে বলার?' বলেই জলন্ত চোখে চাইল পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা কাকু আর রক্ষী-প্রধানের দিকে। সে বেচারীরা তো ভয়ে কাঠ। আবির কণ্ঠস্বরও রুদ্ধপ্রায় ভয়ে অথবা রাগে—অথবা দুই কারণেই।

ফারাওয়ের মুখে তখনো হাসি লেগে রয়েছে। হাসি মুখেই বলে চললেন—'প্রিন্স, নিজের অফিসারদের সন্দেহ কোরো না। আমি রাজরক্তের অধিকার নিয়ে বলছি, ওরা নির্দোষ। প্রিন্স, জাহাজের ডেকে প্যাভিলিয়ন তৈরী হয় না রাজা-হত্যার ষড়যন্ত্র করার জন্যে। ফারাওয়ের গুপ্তচর অনেক। খবর এনে দেয় দেবতারাও। ফারাও যখন ঘুমোয়, তখন কানে কানে বলে যায় অনেক কথা। তাই বলছি, অফিসারদের খামোকা সন্দেহ করছ। তোমার ঐ জ্যোতিষীর কাছে যদিও আমি কৃতজ্ঞ। সে সৎ পরামর্শ না দিলে এতক্ষণে তোমার হাতে আমি খুন হয়ে যেতাম। জ্যোতিষী, তুমি জ্ঞানী। সৎকর্মের পুরস্কার আমি তোমায় দেব। যা তুমি হারিয়েছো, আমার এই পুরস্কার সেই স্থান পূরণ করলেও করতে পারে। কাল রাতে তোমার প্রভু অকারণে একজন ক্রীতদাসীকে শাস্তি দেওয়ার পর তোমার হাতে তুলে দিয়েছিল পুরস্কার স্বরূপ—তাকে চাও তো?'

কাকু সটান আছড়ে পড়ল মহামহিমের পদতলে। এতক্ষণে বুঝল বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মেরিত্রা মেয়েটা—সব ফাঁস করে দিয়েছে ফারাওয়ের কাছে। তাই তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি জাহাজে।

মহামহিম কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে সুমিষ্ট বচনে মর্মান্তিক আপ্যায়ন করে গেলেন সাপের মত বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতাকে—'প্রিন্স, ভাই আমার, যা করবে মনে করেছিলে, তা শেষ পর্যন্ত না করার জন্যে ক্ষমা করলাম তোমাকে। ঊর্ধ্বতন পুরুষরা এবং দেবতারাও যদি পারেন যেন ক্ষমা করেন তোমাকে। এবার আলোচনা করা যাক তোমার দাবী নিয়ে। যেহেতু তুমিই আমার একমাত্র জীবিত ভ্রাতা, তোমার দাবীর গুরুত্ব বিচার করব বই কি। দৈবাৎ যদি আমি মারা যাই, তখন যদি আমার সন্তানাদি না থাকে, তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হবে—কারণ তোমার সাহস আছে, শক্তি আছে, ধমনীতে প্রাচীন রক্ত আছে। যদিও সে রক্তে এমন রক্তের মিশেল আছে যা মিশরের মানুষ ঘৃণা করে, যদিও তুমি দেশের রাজা এবং তোমার প্রভুকে হত্যা করার জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছিলে—তবুও এই সিংহাসনে বসবে তুমি যদি আমার ছেলেমেয়ে না হয়। কিন্তু এখনো তো আমি মরিনি, ছেলেমেয়েও হতে পারে ভবিষ্যতে।

সুতরাং অসিরিস আমাকে ডেকে নেওয়ার দিন পর্যন্ত তুমি কারাগার বাস করবে, না, ধর্মের নামে অঙ্গীকার করবে?'

'অঙ্গীকার করবো,' ভাঙা কর্কশ গলায় বললে আবি। মাথার ওপর যখন ধিক্কার আর বিপদের খাঁড়া ঝোলে—তখন এ ছাড়া তো আর পথও নেই।

'তাহলে হাঁটু গেড়ে বসো. ভয়াবহ নাম নিয়ে শপথ করো আমার বিরুদ্ধে কোনদিন হাত তুলবে না—ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না। শপথ করো, ঈশ্বর যদি কোনোদিন আমাকে পুত্র অথবা কন্যা উপহার দেন—তুমি সেই শিশুকে তোমার প্রভু এবং আইনসঙ্গত ফারাও হিসাবে সেবা করে যাবে—তা সে ছেলেই হোক কি মেয়েই হোক। সবার সামনে এই শপথ নাও—যদি কোনোদিন তার অন্যথা ঘটে, তাহলে দেবলোকের সমস্ত দেবতাদের অভিশাপ যেন বর্ষিত হয় তোমার শিরে—জীবনে এবং মরণে সীমাহীন নরকযন্ত্রণার আর যেন অবসান না ঘটে।'

উপায় কী? তরবারি চুম্বন করে ভয়াবহ নাম নিয়ে এই শপথই করল প্রিন্স আবি।

রাত্রি। আমেনের মন্দিরে বাদামী পরিচ্ছদে সর্বাঙ্গ আবৃত করে সাধারণ মানুষের মত প্রবেশ করলেন ফারাও এবং আহুয়া। এ মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আছে কেবল প্রধান পুরুৎ এবং রাজবংশজাতদের। পালকের মুকুট মাথায় আমেন-রা'য়ের স্ট্যাচুর সামনে নতজানু হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিলেন দিলেন দুজনে। আমেন-রা যে দেবতাদের দেবতা—তাঁর কৃপা হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। তবে কেন একটি সন্তান উপহার তিনি দেবেন না ভাগ্যহীন এই দম্পতিকে?

কাঁদতে কাঁদতে নিস্তব্ধ মন্দির-কক্ষে নিজেদের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করলেন স্বামী-স্ত্রী। হাজার হাজার বছর পাথর-কঠিন মুখে শিলাময় চোখে তাকিয়ে শীতল চাহনি নিক্ষেপ করে এমনি অনেক হর্ষ-বিষাদের কাহিনী শুনেছেন পাথরের দেবতা, এখন শুনলেন মহামহিম ফারাওয়ের বুকভাঙা হাহাকার। আবি বিদ্রূপ করে গেছে তাঁদের সন্তান নেই বলে। জনগণ ভয় দেখাচ্ছে সিংহাসনের উত্তরাধিকার না থাকলে গণ অভ্যুত্থান অনিবার্য। পবিত্র এই সিংহাসনে হাজার হাজার বছর অবিমিশ্র বিশুদ্ধ ফারাও রক্ত নিয়েই কেবল বসে এসেছেন ঐশ্বরিক ফারাও বংশজাতরা। আজ কি মহান সেই বংশ লোপ পাবে ধরাধাম থেকে? আরও মন্দির, আরও জমি, আরও অর্ঘপ্রদানের জন্য প্রস্তুত ফারাও এবং

আহুয়া—বিনিময়ে চাই কেবল একটি সন্তান।

পাথরের বেদীতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে হাহাকার করে উঠলেন রূপসী রাণী—'শুধু একটি সন্তান। বিদ্রূপের বাণে যে জর্জরিত হয়ে গেলাম দেবাদিদেব। শুধু একটি সন্তান এনে দিন আমার গর্ভে—তারপর যদি মনে করেন—বিনিময়ে নিন আমার জীবন।'

কিন্তু কথা ফুটল না শিলামূর্তির অধরোষ্ঠে। বহুক্ষণ পরে শ্রান্ত ক্লান্ত দম্পতি বেরিয়ে এলেন বাইরে। দরজার কাছে দেখা হ'ল জ্ঞানবৃদ্ধ প্রধান পুরুতের সঙ্গে।

বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন ফারাও—'দেবতা কথাও বললেন না, কোনো নিশানাও দিলেন না। শুনলাম না কোনো দৈববাণী।'

ক্রন্দনরতা মহিষীর পানে তাকালেন প্রধান পুরুৎ, করুণার্দ্র হল নয়ন, দ্রব হল চিত্ত।

বললেন—'আপনাদের পথ চেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে কিন্তু একটা দৈববাণী আমার কানে এসেছে। অস্পষ্ট বলে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। প্রাসাদে ফিরে যান, পাশাপাশি শুয়ে রাত্রিযাপন করুন। আমার বিশ্বাস আমেনের নির্দেশ আসবে ঘুমের সময়ে। তিনি দয়ালু—ভক্তদের ভালবাসেন। তাঁর নির্দেশ মত নির্ভয়ে নিঃসংশয়ে কথা বলুন আবির সঙ্গে। যা ঘটবার তা ঘটবেই। ভয় কিসের?'

হাতে হাত দিয়ে রাজদম্পতি বেরিয়ে এলেন মিনার দরজার বাইরে। দোলায় উঠে নিস্তব্ধ রাজপথ বেয়ে পৌঁছোলেন রাজপ্রাসাদের পেছনে—সাক্ষী রইল কেবল বিকটাকার মেষমুখো স্ফিংক্স মূর্তিগুলো। গোপন দরজা দিয়ে অন্তর্হিত হলেন প্রাসাদের মধ্যে।

মধ্যরাত্রি। নিঃসীম তমিস্রা আর নিবিড় নৈঃশব্দ্যে আবৃত গোটা থিব্‌স্ শহর। মাঝে মাঝে নিথর নিস্তব্ধতা খান্ খান্ করে কর্কশ গলায় ডেকে উঠছে রাস্তার কুকুর—প্রাকার শীর্ষে দ্বন্দ্ব-আহ্বান জানাচ্ছে নৈশ প্রহরী। সোনার খাটে পাশাপাশি শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন রাজদম্পতি। ক্ষণপরেই ঘুম ভাঙল আহুয়ার। সচমকে জেগে উঠলেন, সভয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ফারাওর বাহু খামচে ধরে কানে কানে বললেন রোমাঞ্চ-জাগানো গলায়—'জাগো! জাগো! যা পাবার, তা পেয়েছি—শোনাই শোনো সেই কাহিনী।'

আহুয়ার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে ঘুম উড়ে গেল ফারাওয়ের চক্ষু থেকে।

'কি হয়েছে, আহ্‌মা ?'

'ফারাও, এইমাত্র একটা স্বপ্ন দেখলাম—জানি না তা সত্যিই স্বপ্ন কিনা। মনে হল যেন অন্ধকার চিরে দু-ফাঁক হয়ে গেল। সেই ফাঁকে আবির্ভূত হ'ল একটা জ্যোতির্ময় পুঞ্জ—নিরাকার, নিরাবয়ব। তা সত্ত্বেও একটা মৃদু, মিষ্ট কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল সেই আলোকপুঞ্জের মধ্যে। সে বললে—'রাণী আহ্‌মা, মেয়ে আমার, আজ রাত্রে আমার মন্দিরে যার বেদীর সামনে প্রার্থনা জানিয়ে এলে—সেই আমি এসেছি তোমার সামনে। তোমাদের দুজনেরই মনে হয়েছে প্রার্থনা বোধহয় আমার কানে যায়নি। কিন্তু তা নয়। প্রধান পুরুৎ তা জানে রাণী আহ্‌মা, তুমি আর তোমার স্বামী ফারাও বৃথাই কি আমার ওপর এতদিন ভরসা করে এসেছো ? শীগগিরই একটি কন্যারত্ন উপহার পাবে তোমরা—আমার সত্তা থাকবে তার মধ্যে। আমি স্বয়ং তাকে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য আর জ্ঞানসমৃদ্ধ করে পাঠাবো—কাজেই তার সমতুল্য রমণী সারা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় থাকবে না। উত্তর ও পশ্চিম ভূমিখণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি হবে সে—বহুবছর জোড়া মুকুট শিরে ধারণ করবে সে—যে তাকে অনুসরণ করবে না বা তার সামনে নতজানু হবে না—পদানত হয়েই তাকে থাকতে হবে। সমস্যা আর বিপদকণ্টকিত হবে তার জীবনপথ—কিন্তু আমার যে সত্তা তাকে দান করব, সে-ই সত্তাই আগলে রাখবে তাকে। শত্রুদের পদদলিত করবে। যথা সময়ে সে লাভ করবে একজন রাজপ্রেমিককে, মিলন ঘটবে দুজনের এবং বহু রাজা ও যুবরাজের সূচনা ঘটাবে দুজনে। তার নাম হবে নেতার-তুয়া—ভোরের তারা—মর্নিং স্টার—আমেনের প্রধান পুরুৎঠাকুরানি হবে সে-ই-; কারণ আমিই তাকে স্বর্গ থেকে নামিয়ে আনছি মর্ত্যে—আমারই সন্তান সে—আমার সেবা করার অধিকার শুধু তারই থাকবে—কারণ সে হবে আমার পরম প্রিয়পাত্রী। আমার স্নেহাশীষ ও আশীর্বাদধন্যা। স্বর্গের দেবীরা হবে তার সঙ্গিনী এবং আমার হুকুমেই অসিরিস তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে জীবনের সায়ংকালে।

'যা বললাম, তার নিদর্শন স্বরূপ আমার প্রতীকচিহ্ন এঁকে দিয়ে গেলাম তোমার বুকে—এই একই প্রতীকচিহ্ন দেখতে পাবে তারও বুকে। ফারাওকে ঘুম থেকে তুলে সব বলো— তাকে দিয়ে সব লিখিয়ে নাও—যাতে ভবিষ্যতে কোনো কথা বিস্মৃতির গহ্বরে হারিয়ে না যায়।'

'ফারাও,' বললেন, আহ্‌মা, 'এরপরেই আলোকপুঞ্জের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা হাত। হাতে রয়েছে জীবনের প্রতীকচিহ্ন—অগ্নিময়

এবং উজ্জ্বল। প্রতীকচিহ্নটা আমার বুকের ওপর চেপে বসিয়ে দিল হাতটা—বুক জ্বলে গেল যেন আগুনের ছ্যাঁকায়। ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, চারিদিক অন্ধকার। পাশে অকাতরে ঘুমোচ্ছো তুমি।'

শুভ লক্ষণ, শ্রবণ করেই কাহিনীর তাৎপর্য উপলব্ধি করলেন ফারাও। চুম্বন করলেন রাণীকে। করতালি দিয়ে আহ্বান জানালেন পুরনারীদের। আলো নিয়ে ছুটে এল তারা। এসে দেখল, রাণীর গলার ঠিক নিচে বুকের ওপর জ্বল জ্বল করছে জীবন-চিহ্ন—ফর্সা চামড়ায় লাল প্রতীক চিহ্ন। একটা ফাঁস, ফাঁসের নিচে একটা ক্রশ।

প্রধান নকলনবিসকে কাগজ-কলম নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন ফারাও—সেই সঙ্গে আসুক প্রধান পুরুৎ। অচিরেই প্রধান পুরুতের সামনে নকলনবিস লিখে নিল দৈববাণীর প্রতিটি শব্দ—একটা কথাও বাদ গেল না। তলায় সই দিলেন ফারাও এবং রাণী—সাক্ষী হিসেবে সই করলেন প্রধান পুরুৎ। বেশ কয়েকটা অনুলিপি বানিয়ে নেওয়া হল তৎক্ষণাৎ এবং লুকিয়ে রাখা হল আমেনের গুপ্তকক্ষে। কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রশ চিহ্ন রয়ে গেল রাণীর ফর্সা বুকে।

ভোর হল। আবিকে ডাকিয়ে আনলেন ফারাও সভাকক্ষে।

সহৃদয় কণ্ঠে বললেন ফারাও—'প্রিন্স, আমার পিতার পুত্র, মিশরের সিংহাসনে তোমাকে অধিষ্ঠিত করার আর্জি আমি বিবেচনা করে দেখে তা খারিজ করছি। আমার একটি মেয়ে হবে—তার নাম হবে মর্নিং স্টার—ভোরের তারা। মিশরের সিংহাসনে ফারাও রূপে বসবে সে এবং তার সন্তান-সন্ততিরা। এ বার্তা আমার এবং রাণী আহুরার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছেন দেবগণ—তাঁদের ইচ্ছাতেই কন্যারত্ন লাভ করব যথাসময়ে। সুতরাং আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেশে ফিরে যাও; আমাদের এবং দেবগণের ভালবাসার বখরা নিয়ে সুখী হও।'

আবি কিন্তু রাগে অগ্নিশর্মা হ'ল। নিশ্চয় চালাকি জুড়েছেন ফারাও—এই ধারণা হ'ল তার। কিন্তু যার ভাগ্য ফারাওর হাতে, তার পক্ষে বেফাঁস কিছু বলা শোভন নয়। তাই বিনীতভাবে বললে, মর্নিং স্টারের আবির্ভাবে প্রাণ ঢেলে সেবা করে যাবে সে, যদিও জ্যোতিষী কাকুর কাছে আগেই সে শুনেছে—এই মর্নিং স্টারই শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যাকাশের তারাকে গ্রাস করবে।

অপমানাহত স্বরে ফারাও বললেন—'প্রিন্স আবি, তোমার বিশ্বাস তাহলে আমি মিথ্যা বলছি। ক্ষমা করলাম সে জন্যে। দেশে ফিরে গিয়ে মর্নিং

স্টারের ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকো। কিন্তু আমি যে সত্য বলছি, তার একটা প্রমাণ শুনিয়ে রাখি। কন্যারত্নের বুকে থাকবে জীবন-চিহ্নের প্রতীক। যাও, বিলম্ব করলে ক্রুদ্ধ হতে পারি। প্রতিশ্রুতমত উপহার সামগ্রী মেমফিস শহরে পৌঁছে যাবে।'

সাদা পাঁচিল ঘেরা মেমফিস শহরে ফিরে গুম হয়ে বসে রইল আবি। হাড়ে হাড়ে বুঝল, তাকে সিংহাসনচ্যুত করার চক্রান্ত চালিয়েছে ফারাও। একমাত্র কাকু কিন্তু বিশ্বাস করল ফারাওকে। সে-তো জানে মর্নিং স্টার উদিত হবেই!

(৩) রামিস্, রাজকুমারী এবং কুমীর

যথাসময়ে একটি কন্যারত্ন প্রসব করল রাজরাণী আহমা। ফর্সা। সুন্দর মুখ। ঢেউ খেলানো চুল। চোখ দুটি প্রথম বসন্তাকাশের মতো সুনীল। বুকের ওপর রইল কড়ে আঙুলের নখের সাইজে একটা ছোট্ট ভরুল চিহ্ন—অবিকল জীবন-চিহ্নর আকারে।

আনন্দে উন্মত্ত হ'ল রাজপ্রাসাদের সমস্ত মানুষ। মিশরের সমস্ত মন্দিরের পুরুৎরা। প্রজারা কিন্তু আড়ালে আবডালে বিমর্ষ হল এই কারণে যে শেষ পর্যন্ত জোড়ামুকুট ন্যস্ত হবে একটি নারীর শিরে! কিন্তু প্রকাশ্যে মুখে চাবি দিয়ে রইল সকলে। কেন না, আগুনের মত রটনা হয়ে গিয়েছিল—মেয়েটি নাকি স্বয়ং ঈশ্বর প্রেরিত এবং তার ভূমিষ্ঠ মুহূর্তে আঁতুড় ঘরে দেখা গেছে মানবতা-স্রষ্টা খেমু দেবী এবং নেপথিস্, হাথোর ও আইসিস্ দেবী-দের। স্বর্ণপ্রতিমার মত নাকি প্রভাবিকিরণ করেছিলেন তাঁরা।

হুকুম জারী করলেন ফারাও। মিশরের যেখানে যেখানে রাণী আহমার নাম খোদিত আছে, সেখানে সেখানে নামের তলায় 'আমেনের ইচ্ছায় মর্নিং স্টারের মতো'—এই পংক্তিটা উৎকীর্ণ করতে হবে। আমেনের মন্দিরে একটা নতুন হলঘরও নির্মাণ করতে হবে। সেখানে খোদিত থাকবে প্রিন্স আবির আবির্ভাবের কাহিনী এবং রাণী আহমার স্বপ্নবৃত্তান্ত।

গৌরবময় এই স্থানটি কিন্তু দেখে যেতে পারেন নি রাণী আহমা। মেয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে তাঁর। চতুর্দশ দিবস হ'ল শুদ্ধি দিবস। ঐ দিন ধাত্রীমাতাকে বললেন মেয়েকে কাছে নিয়ে আসতে। পলকহীন চোখে চেয়ে রইলেন শিশুকন্যার পানে। কিছুক্ষণ কথা বললেন মেয়ের 'কা' য়ের সঙ্গে। 'কা' কে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। বললেন, মেয়ের বাহুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। বলে গেলেন, জীবন ও মরণের

সব রকমের বিপদ আপদ থেকে যেন আগলে রাখে মেয়েটিকে—পুনর্জীবনের মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত। তারপর বললেন, আমেন ডাক দিয়েছেন—প্রাণ গ্রহণ করতে চাইছেন—যে প্রাণের বিনিময়ে দিয়েছেন এই কন্যাকে। বলে, ফারাওয়ের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে জ্যোতির্ময় সুখ-সমুজ্জ্বল মুখে দেহত্যাগ করলেন।

বিদায় নিল হর্ষ। এল বিষাদ। মলম মাখানোর দিনগুলিতে শোকে ডুবে রইল সমগ্র মিশর। তারপর জলপোতে চাপিয়ে নীলনদের বুকের ওপর দিয়ে তাঁর নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হল রাণীদের উপত্যকায় অতীব চমকপ্রদ সমাধি মন্দিরে সমাধিস্থ করার জন্যে। দিনরাত এক নাগাড়ে খেটে সমাধি-মন্দির সম্পূর্ণ করল রাজমিস্ত্রী এবং শিল্পীরা। সমাধি-মন্দির নির্মাণের আয়োজন শুরু করেছিলেন আহুরা নিজেই। উনি জানতেন, মৃতের সমাধি-মন্দিরে স্বর্ণ অপচয় কেউ করতে চায় না, মেহনৎ ব্যয়ও করতে চায় না।

তাই মহা আড়ম্বরে কবরস্থ হলেন আহুরা। তাঁর যাবতীয় মণিমাণিক্য রইল তাঁর সঙ্গেই। প্রকৃত শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন ফারাও। সমাধি মন্দিরে অর্পণ করলেন বিস্তর মহার্ঘ সামগ্রী। যে জলপোতে বাহিত হয়েছিল রাণীর নশ্বর দেহ, সেটিকে সমাধি-মন্দিরের প্রবেশ পথে রেখে পাথর দিয়ে ঢেকে তার ওপর এমনভাবে বালি ছড়িয়ে দিলেন যাতে পুনর্জাগরণের দিন না আসা পর্যন্ত জায়গাটার হদিশ আর কেউ না পায়।

ইতিমধ্যে দিনে দিনে বড় হতে লাগল শিশুটি। ছ'মাস বয়েসে তাকে নিয়ে যাওয়া হল আমেনের পুরোহিত ঠাকরুণদের মহাবিদ্যালয়ে লালন পালন এবং শিক্ষাদীক্ষার নিমিত্ত।

রাজকুমারী নেতার-তুয়ার জন্ম যেদিন হল, ঠিক সেইদিনই ধরাধামে আবির্ভাব ঘটল আরও একটি মানব শিশুর—যে হেতু এ কাহিনী তাকে নিয়েও, সুতরাং তার কথায় এবার আসা যাক। আমেনের মন্দিরের রক্ষী প্রধানের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল তাঁরই সৎ-বোন আস্তি-র। আস্তি ছিলেন জাদুকরী। সবাই জানত, বহু পুরুষ আগে মারমিসের পূর্বপুরুষরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হন—নেতার-তুয়া যেমন বর্তমান ফারাওয়ের শেষ বংশধর, ঠিক তেমনি সিংহাসনচ্যুত পূর্বতন ফারাওদের শেষ বংশধর এই মারমিস। অনেক বছর আগে বর্তমান ফারাওয়ের উপদেষ্টারা বলেছিলেন মারমিস আর তাঁর স্ত্রী-কে হত্যা করা হোক—নইলে ধমনীতে প্রবাহিত রাজরক্তের দাবী নিয়ে ফারাওকে গদীচ্যুত করতে পারেন মারমিস আর তাঁর সৎবোন। ফারাও কিন্তু খুনজখম ঘৃণা করতেন। মনটা তাঁর ভারী নরম। মারমিসকে নিধন

তো করলেনই না, উল্টে তাঁকে ডেকে এনে সব কথা খুলে বললেন।

মারমিসের চেহারায় অভিজাত্যের ছাপ ছিল। রাজরক্ত নিয়ে জন্মালে অমন চেহারা তো হবেই। ফারাওয়ের সামনে প্রণিপাত হয়ে বললেন—'হে ফারাও, আমাকে বধ করার কোনো প্রয়োজন আছে কী? ঈশ্বরের বিধানে আমার পূর্বপুরুষরা গৌরব হারিয়েছে—ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সেই গৌরবের অধিকারী হয়েছেন আপনার পূর্বপুরুষরা। আমার উর্ধ্বতন পুরুষরা রাজা ছিল বলে কি কখনো আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি, না, সিংহাসন চ্যুতির চক্রান্তে প্রয়াসী হয়েছি? আপনার সৈন্যবাহিনীর সম্ভ্রান্ত পদ অলঙ্কৃত করতে পেরেই তো আমি সন্তুষ্ট। তাই বলব, আমাকে বাঁচতে দিন, আমার সৎবোনের প্রাণটাও ভিক্ষা দিন। কারণ তাকে বিবাহ করার অভিলাষ আছে আমার। দুজনে মিলে সৎ, বিনীত, বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন। নির্দোষীদের রক্তে নাই বা হাত কলুষিত করলেন। তাতে দেবতারা রুষ্ট হবেন—আমাদের প্রেতশরীরও কবর থেকে উঠে এসে আপনাকে উত্যক্ত করতে পারে। আপনার বংশে অভিশাপ লাগতে পারে।'

বিচলিত হলেন ফারাও। বাড়িয়ে দিলেন স্বীয় তরবারি। চুম্বন করলেন মারমিস। আয়ু এবং নিরাপত্তা—দুই-ই ভিক্ষা পেলেন মারমিস।

ফারাও বলেছিলেন—'মারমিস, তুমি সম্মানীয় পুরুষ। রক্তের কৌলীন্যেও আমার সমতুল্য—যদিও পদমর্যাদা এক নয়। দেবতারা আপন অভিলাষেই কাউকে ওপরে তোলেন কাউকে নিচে নামান। তাই তুমি যেমন আমার কোনো ক্ষতি করবে না—আমিও তেমনি তোমার আর তোমার সৎবোনের কোনো ক্ষতি করব না। ম্যাজিকের অধিরাণী সে—হোক সে তোমার ঘরণী। আর, তুমি হও আমার সুহৃৎ এবং উপদেষ্টা।'

আরও উচ্চপদ দেওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করলেন ফারাও। কিন্তু নিতে চাইলেন না মারমিস পাছে ঈর্ষাকাতর সহযোগীরা পেছনে লাগে ফারাওয়ের—জীবননাশও করতে পারে। কেন না, ঝড় উঠলে বড় গাছই তো আগে পড়ে। শেষকালে মারমিসকে আমেনের রক্ষীপ্রধান পদে বহাল করলেন ফারাও, সেইসঙ্গে দিলেন প্রচুর ভূসম্পত্তি আর বাসগৃহ যাতে রাজার হালে থাকতে পারেন মারমিস—কিন্তু তার বেশী আর কিছু দিলেন না। এ ছাড়াও, তাঁকে নিকট উপদেষ্টা পদে বহাল করলেন, বন্ধুত্বের মর্যাদা দিলেন এবং তাঁর সৎ-পরামর্শ গ্রহণও করলেন বহুক্ষেত্রে।

এরপর আস্তিকে বিয়ে করলেন মারমিস। কিন্তু ফারাওর মতই বহুবছর নিঃসন্তান রইলেন। আস্তি ছাড়া আর কোনো পত্নীও ছিল না মারমিসের।

তারপর যেদিন জন্ম হল নেতার-তুয়ার, ঠিক সেইদিন ভারী সুন্দর একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন আস্তি। পূর্বপুরুষদের মতই বলিষ্ঠ গড়ন এবং গৌর বর্ণ তার। কিন্তু চোখ মিশমিশে কালো। চেহারার মধ্যে রাজকীয় ছাপ সুস্পষ্ট।

ধাত্রীমাতা দেখেই মন্তব্য করেছিল—'মাথার গড়নটা দেখেছেন? মুকুট পরার উপযুক্ত।'

আস্তি বাল্যকাল থেকেই ভবিষ্যদ্‌বক্তা। ধাত্রীমাতার কথা শুনে সেই মুহূর্তে সাবধানতা বিস্মৃত হয়ে জবাব দিলেন—'যা বলেছো। মাথা দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছে। মুকুট ধারণ করবেই।' বলে মুখ চুম্বন করলেন শিশুপুত্রের, নাম রাখলেন রামিস—নৃপতি ঠাকুর্দার নামানুসারে—এ বংশের প্রতিষ্ঠা যিনি করেছিলেন।

এমনই কপাল, একজন গুপ্তচরের কানে গেল এই কথোপকথন। ফলাও করে প্রতিবেদন পেশ করল উপদেষ্টাদের কাছে। মারমিসের ক্ষেত্রে তারা যে-উপদেশ দিয়েছিল, রামিসের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটল না। ফারাওকে বলা হ'ল, শিশুপুত্রকে যেন এখুনি সরিয়ে ফেলা হয়। কেন না, আস্তির মনোভাব মুখে প্রকাশ পেয়েছে—ছেলের নামও রেখেছে অধিরাজ 'রা'য়ের নামানুসারে—যেন সত্যিই সে রাজপুত্র। ফারাও কিন্তু উপদেশ কানে তুললেন না। হেসে বললেন, একই দিনে জন্মেছে তাঁর মেয়ে এবং মারমিসের ছেলে। তাঁর মেয়ের নামকরণ উৎসব কি মারমিসের ছেলের রক্ত দিয়ে করতে হবে?

শেষকালে বললেন—'আমরা সবাই রা-য়ের গৌরবে গৌরবান্বিত। উচ্চ বংশের ছেলেটি বেঁচে থাকলে আমার মেয়ের প্রয়োজনের বন্ধু হতেও তো পারে তার দুর্দিনের সময়ে? ঈশ্বরের ইচ্ছায় এরা এসেছে পৃথিবীতে। খোদার ওপর খোদকারি করা আমাকে মানায় না। আমি তো আর ভগবান নই যে ভগবানের সৃষ্টি নাশ করব স্বার্থসিদ্ধির জন্যে?'

ফলে, প্রাণটা টিকে গেল রামিসের। মারমিস এবং আস্তির কানে গেল ফারাওয়ের এ-হেন মহানুভবতা। প্রাণঢালা আশীর্বাদ করলেন দুজনে। জানালেন আন্তরিক ধন্যবাদ।

রাজকুমারী নেতার-তুয়াকে লালন পালন করা হচ্ছিল আমেনের পুরোহিত ঠাকরুণদের প্রাসাদে। এর কাছেই ছিল মারমিসের ভবন। দুটোই আমেনের সুবিশাল মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে একই প্রাচীর বেষ্টিত। রাণী আহুরার মৃত্যুর পর ফারাও বললেন, রাজকুমারী নেতার-তুয়া যার বুকের

দুধ পান করবে তার ধমনীতে যেন রাজরক্ত থাকে। এ রকম রমণী ছিল একজনই—আস্তি। তাই তাঁকেই ধাত্রীমাতা করা হল নেতার-তুয়ার। রাতের পর রাত রামিস্ এবং নেতার-তুয়া দুজনেই আস্তির বাহুতে মাথা দিয়ে ঘুমোলো পাশাপাশি। একই সঙ্গে হাঁটতে শিখল দুজনে, খেলাধূলাও করল একসঙ্গে। পালিকা-মা আস্তির নয়নের মণি হয়ে রইল নেতার-তুয়া।

যমজ ভাইবোন পরস্পরকে যেভাবে ভালবাসে, প্রথম থেকেই রামিস আর নেতার-তুয়ার মধ্যে ভালবাসা গাঢ় হল সেইভাবে। রামিসের সাহস ছিল, শক্তি ছিল, ছিল বেপরোয়া ডানপিটে স্বভাব। তা সত্ত্বেও কিন্তু নেতার-তুয়ার প্রভুত্ব বজায় রইল তার ওপর। ফারাওয়ের কন্যা বলে নয়—শক্তি উৎসারিত হত তার অন্তরের অন্দর থেকে। সভাসদদের অভিবাদনে সে ভ্রূক্ষেপও করত না, পুরুৎদের বন্দনা কানেও তুলত না, রাশি রাশি খেতাবে কর্ণপাত করত না—প্রভুত্ব চালিয়ে যেত আপন শক্তিতে। কোন্ খেলা খেলতে হবে, নেতার-তুয়া তা ঠিক করে দিত। নেতার-তুয়ার কথা তন্ময় হয়ে রামিস্ শুনত। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের থেকে একেবারেই ভিন্ন ছিল রাজকুমারী—স্বাস্থ্যও ছিল তার অটুট।

মাঝে মাঝে নিজের মধ্যে ডুবে যেত রাজকুমারী। মুখে আর কথা ফুটত না। তখন কাছে ঘেঁসতে দিত না কাউকে—পালিকা মা আস্তিকেও নয়। রামিস্ পর্যন্ত দূরে থাকত। দূর থেকে তাকে নজরে রাখত যে কোনো একজন পুরনারী। আপন মনে মন্দিরের থাম আর দেওয়ালের কারুকাজ দেখে বেড়াতো সে। ফারাও কন্যার গতিবিধি সর্বত্র বলে সুরক্ষিত পবিত্র স্থানেও ছিল তার অবাধ যাতায়াত। গ্র্যানাইট আর অ্যালাবাস্টার স্ফটিক প্রস্তরে নির্মিত বিশাল দেবতাদের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকত। চাঁদের আলোয় মরজগতের জীব এসব স্থানে ভয়ে যেতে পারে না—নেতার-তুয়া কিন্তু নির্বিকারভাবে হাসিমুখে বিচরণ করত জ্যোৎস্নালোকেও এই সব পবিত্র স্থানে।

রামিস্ একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—'হে মর্নিং স্টার, কি ছ্যাখো বলো তো অমন করে? সৃষ্টির শুরু থেকে পাথর দেবতাদের কেউ সঞ্চরমান হয়নি, দেখলেও বুক কাঁপে—বিশেষ করে রা অস্ত যাওয়ার পর—তুমি যাও কি ভাবে? বোবা পাথরদের মধ্যে পাও কী?'

'বোবা পাথর ওরা নয়, রামিস্। আমার সঙ্গে কত কথা বলে। সব কথা আমি বুঝতেও পারি না। কিন্তু ভাল লাগে বলে যাই।'

'কথা বলে! পাথর কি কথা বলতে পারে?'

'তা তো জানি না। বোধ হয় পাথরের আত্মারাই বলে অত কথা। আমার জন্মের আগেকার গল্প বলে। আমার মৃত্যুর পর কি ঘটবে, সে-গল্পও বলে। কিন্তু আর কথা নয় রামিস্—আমি যখন বলছি ওরা কথা বলে, সেইটাই যথেষ্ট।'

'আমার কাছে তারও বেশী,' বলেছিল রামিস্। 'নইলে আমি আমেনের সন্তান হই কি করে? আমার উপাস্য কেবল একটাই দেবতা—মেন্থু—যুদ্ধের দেবতা।'

সাতবছর বয়েসে রামিস্‌কে প্রতিদিন সকালে যেতে হ'ত মন্দির বিদ্যালয়ে। নলখাগড়ার কলম দিয়ে লেখা শেখানো হ'ত কাঠের ফলকের ওপর। শুনতে হ'ত মিশরের বহু দেবতার কাহিনী—শুনতে ইচ্ছা না থাকলেও। এই সময়টা একলা থাকত নেতার-তুয়া। তার বয়সের খেলার সঙ্গী মন্দির-প্রাঙ্গণে কেউ ছিল না, তাছাড়া ফারাওয়ের নির্দেশে অন্য কোনো ছেলেমেয়ের সঙ্গে তার খেলাধূলার অধিকারও ছিল না। কখনো সখনো অবশ্য রাজসভার সম্ভ্রান্ত নারী অথবা সভাসদদের কাছে শিক্ষা নিতে হ'ত নেতার-তুয়াকে এই সময়ে।

বিদ্যালয় থেকে একদিন ফিরে এসে নেতার-তুয়ার কাছে জানতে চেয়েছিল রামিস তাঁর অনুপস্থিতিতে সে নিঃসঙ্গ বোধ করে কিনা। নেতার-তুয়া বলেছিল—'নিঃসঙ্গ বোধ করব কেন? আমার তো আরও একজন সঙ্গী আছে।"

ঈর্ষা হয়েছিল রামিসের—'তাই নাকি? দেখাও দিকি তাকে, এক হাত লড়ে যাই।'

'তাকে দেখতে পেলে তো। সে যে আমার নিজের কা।'

'তোমার কা! কা-য়েদের কথা শুনেছি বটে, দেখিনি কখনো। কি রকম দেখতে বলো তো?'

'ঠিক আমার মতই। শুধু যা ছায়া পড়ে না। যখন একলা থাকি, তখনই শুধু কাছে আসে। আসার শব্দ কখনো-সখনো শুনতে পাই, কথাও শুনতে পাই—কিন্তু দেখার ভাগ্য খুব কম হয়—আলো মিশোনো শরীর তো।'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রামিস বলেছিল—'বিশ্বাস করতে পারলাম না। কা বলে কিছু নেই। সব তোমার মন গড়া।'

এর কিছুদিন পরেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যে কা-য়েদের সম্বন্ধে, অন্ততঃপক্ষে তুয়ার কা সম্বন্ধে মনোভাব পালটাতে হল রামিসকে।

মন্দিরের মধ্যে একটা লুকোনো প্রাঙ্গণ ছিল। সিমেন্টের পাড় দিয়ে বাঁধানো একটা জলাশয় ছিল সেখানে। লোকে বলত, একটা পবিত্র কুমীরের নিবাস সেখানে। বিরাটকায় কুমীর—আছে কয়েকশ' বছর। অনেকদিন ধরেই কুমীরটাকে দেখে আসার ইচ্ছে ছিল তুন্না আর রামিসের। কিন্তু ভেতরে ঢোকা তো সম্ভব নয়। পুরো প্রাঙ্গণটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলে একটিমাত্র তামার দরজা। দরজার চাবি থাকে পুরুৎদের কাছে। আটদিন অন্তর জ্যান্ত বাছুর ছাগল অথবা ভেড়া নিয়ে যায় ভেতরে—কোনোটাই আর ফিরে আসে না।

কুমীর ভোজ সমাপন করে একদিন পুরুৎরা যখন ফিরে আসছে, রামিস দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। একজনের হাতে ছিল তামার দরজার চাবি। তার নাম কপাট-রক্ষক। চাবিটা পিঠের পেছনে বাঁধা থলির মুখে ঢোকাতে গিয়ে ঢুকল না—থলির বাইরে দিয়ে ঠিকরে পড়ল বালির ওপর। টের পেল না কপাট-রক্ষক। দলবল নিয়ে চলে গেল মন্দিরে। চাবি পড়ে রইল বালিতে।

তুলে নিল রামিস। লুকিয়ে রাখল পরিচ্ছদের ভেতর দিকে। তারপর গেল রাজকুমারীর সমীপে।

বললে—'মর্নিং স্টার, আজ কপাট-রক্ষক ভুল করে কুমীরের দরজার চাবি ফেলে গেছিল বালিতে। সাতদিন আগে চাবির খোঁজ আর পড়বে না। সেই ফাঁকে চলো আজ পাঠভবন থেকে ফেরবার পথে তোমাকে নিয়ে কুমীরটাকে দেখে আসি। তারপর চাবি ফিরিয়ে দেব—বলব বালিতে কুড়িয়ে পেয়েছি।'

শুনে উজ্জ্বল হ'ল তুন্নার চোখ। কুমীরটাকে দেখবার লোভ তার অনেকদিনের। বিকেলের দিকে একটা পায়রা নিয়ে ছুটতে ছুটতে এল রামিস—পবিত্র রাক্ষসকে খাওয়াবে বলে জোগাড় করে এনেছে এক সহপাঠীর কাছ থেকে। এসে দেখল কিন্তু অন্য মেজাজে রয়েছে তুন্না।

ভাবিত মুখে কিছুক্ষণ রামিসের পানে তাকিয়ে রইল তুন্না।

তারপর বলল—'পবিত্র কুমীরকে দেখতে যাওয়া আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়।'

'কেন নয়?' অবাক হল রামিস। 'ধারে কাছে কেউ নেই। চাবিতেও চর্বি মাখিয়ে রেখেছি—ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজও হবে না।'

'কা এসেছিল। বলে গেল কাজটা অন্যায়। পরিণামে ঝামেলা আছে।'

রেগে গেল রামিস—'শয়তান সেৎ গিলে খাক তোমার কা-কে। আমো

তাকে আবার সামনে—যা বলবার আমি বলব।'

'আনতে তো পারব না রামিস। কারণ কা যাবে তো আমি। তা ছাড়া, সেৎ যদি গিলে খায় কা-কে, তাহলে তো আমাকেও গিলে খাবে। এ ধরনের মনোবাঞ্ছা তোমাকে মানায় না রামিস।'

কেঁদে ফেলল বালক রামিস। সারা দিন কত আশায় ছিল কুমীর দেখবে বলে। পায়রাটা জোগাড় করতে গিয়ে দান করতে হয়েছে ফারাওয়ের দেওয়া ব্রোঞ্জের ছুরিটা—যে ছুরির দাম অনেক পায়রার দামের সমান। এখন ফারাও তো রেগে যাবেন ছুরি খোয়া গেছে শুনলে। অথচ পায়রাটা এনেছিল লোভ দেখিয়ে কুমীর বাছাধনকে জলের ওপর ভাসিয়ে তুলবে বলে।

বন্ধুর কান্না দেখে নরম গলায় তুয়া বললে—'আমরা আমোদ পাব বলে একটা পায়রার জীবন নাশ করতে হবে?'

'পায়রা তো কোন্ কালে মরে গেছে। পুরুৎঠাকুর পাছে দেখে ফ্যালে, তাই ওপরে চেপে বসেছিলাম। পরে দেখলাম চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে অক্কা পেয়েছে।'

বলে, থলি খুলে পায়রা দেখালো রামিস। আড়ষ্ট, শীতল এবং প্রাণহীন।

'মরেই যখন গেছে তখন আর একে নষ্ট করে লাভটা কি? কুমীরকে খাওয়ানো যাক বরং, সেইসঙ্গে যদি একটু উঁকিঝুঁকি মেরে চেহারাখানা নিতে পারি কা নিশ্চয় রাগ করবে না। উঁকি মারতে তো আর বারণ করেনি কা।'

পা টিপে টিপে দুজনে বাগানের গাছপালার তলা দিয়ে পৌঁছোলো পাঁচিলের ছায়ায় ব্রোঞ্জ দরজার সামনে। অপরাধীর মত ফুটোয় চাবি গলিয়েছিল রামিস। চাবির আংটায় আগে থেকে একটা কাঠ ঢুকিয়ে রেখেছিল চাড় মেরে ঘোরাতে সুবিধে হবে বলে। দুজনে মিলে তাতে চাড় মারতেই সরে গেল ভারী কীলকগুলো।

পাছে বাইরে চাবি ঝোলানো থাকলে কেউ দেখে ফ্যালে, তাই ফুটো থেকে চাবি বার করে নিল রামিস। সামান্য ফাঁক করল কপাট এবং কোনমতে গলে গেল ভেতরে তুয়াকে নিয়ে। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাঁৎ করে উঠল মনটা। প্রাচীর ঘেরা চত্বরে এমন একটা থমথমে ভাব যে প্রাণ শুকিয়ে যায়। সেইসঙ্গে একটা বিকট দুর্গন্ধ—তুয়া ফ্যাকাসে হয়ে গেল সেই গন্ধ শুঁকে। দুজনেরই যুগপৎ মনে হল—না ঢুকলেই বরং ছিল ভাল।

ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট পুকুর। পুকুরের মাঝখানে একটা কৃত্রিম দ্বীপ। চারপাশ ঘিরে পাথর বাঁধানো রাস্তা। উঁচু পাঁচিলের ছায়া পড়ায় কাদাটে মনে হচ্ছে পুকুরের জলরাশি। একপাশে স্যাঁৎসেঁতে গাছ আর ঝোপের মধ্যে দিয়ে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে জলের মধ্যে। একটা নৌকোর আধখানা জলে ডোবানো অবস্থায় টেনে তুলে রাখা হয়েছে সেখানে—দাঁড় বৈঠা রয়েছে নৌকোর ওপরেই।

কুমীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

ফিসফিস করে তুয়া বললে—'চলো পালাই। কুমীর ঠাকুর বোধহয় ঘুমোচ্ছে। বদ্‌গন্ধটা আর সইতে পারছি না।'

'ভয় পেয়েছো মনে হচ্ছে? দুর্গন্ধ তো আমার নাকে আসছে না—পদ্ম ফুলের গন্ধই পাচ্ছি কেবল। ঘুম ভাঙিয়ে দেখে যাই বরং কুমীরঠাকুরকে—নইলে আফসোস থেকে যাবে।'

'ভয় পাবো কেন? ঠিক আছে, ঠিক আছে তাড়াতাড়ি জাগাও।'

একটা কথা কিন্তু চেপে গেল রামিস। ফেরার পথ তো বন্ধ। চাবি নিয়ে ভেতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারী দরজা বন্ধ হয়ে গেছে আপনা থেকেই। দরজার এদিকেও চাবির ফুটো নেই।

পুকুর পাড় বরাবর একপাক ঘুরে এল দুজনে। কিন্তু কুমীরঠাকুর ঘুম ঝেড়ে ফেলে উঠে এল না।

রামিস বললে—'চলো নৌকোয় চেপে খুঁজি। হয়তো দ্বীপের ওপর ঘুমোচ্ছে।'

পাথরের ধাপ বেয়ে তুয়াকে নিয়ে নেমে এল রামিস। সোপানের ওপর পড়ে থাকা কুমীরের আহারের অবশিষ্ট দেখেই গা পাক দিয়ে উঠল তুয়ার। ঝটিতি লাফিয়ে গিয়ে বসল নৌকোয়। ঠেলা মেরে নৌকো জলে নামাল রামিস। গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড় বেয়ে পুকুরময় চক্কিপাক দিয়ে এসেও দেখতে পেল না কুমীর ঠাকুরকে।

হারানো সাহস ফিরে পেয়ে বললে—'হয়তো এখানে নেই।'

পুকুরের জলে দুর্গন্ধ ততটা না থাকায়, তুয়ার সাহসও ফিরে এসেছিল। বলল—'পায়রার লোভ দেখিয়ে ছাখো না।'

বুদ্ধিটা মনে ধরল রামিসের। থলির মধ্যে থেকে পায়রা বার করে ডানা দুটো এমনভাবে ছড়িয়ে দিল যেন মরা নয়—জ্যান্ত পায়রা ধরেছে জলের ওপর। তারপর হাঁক দিল সুর করে—'ওগো কুমীর ঠাকুর, উঠে এসো ওপরে!'

ঠিক তখনি অকস্মাৎ ভয়াবহতা সৃষ্টি করে কোত্থেকে যেন উঠে এল কুমীরটা। জ্যোতিহীন মড়ার মত দুটো চোখের পেছনে বিরাট মাথায় ভয়ংকর আঁশ। ব্যাদিত মুখের সারি সারি ধারালো দাঁত দিয়ে এক কামড়ে পায়রাটা ছিনিয়ে নিয়েই ডুব দিল জলে।

অন্যমনস্কভাবে তোলপাড় জলের দিকে চেয়ে থেকে বললে রাম্সিস—'এই সেই কুমীর ঠাকুর—আটজন কি তারও বেশী ফারাওয়ের রাজত্বকাল যে দেখে গেছে—সেই কুমীর ঠাকুর। যাক, দেখা তো হ'ল।'

'হ্যাঁ, দেখা হ'ল। আর দেখতেও চাই না। চলো, তাড়াতাড়ি ফেরা যাক—নইলে বলে দেবো তোমার বাবাকে।'

ঝপাঝপ দাঁড় বেয়ে নৌকো ঘুরিয়ে নিল রাম্সিস। আর ঠিক সেই সময়ে, পায়রা-ভোজনে তৃপ্ত কুমীর ঠাকুর ভয়ংকর চোয়াল তুলল জলের ওপর এবং তেড়ে এল নৌকোর পেছন পেছন।

আর্ত চীৎকার করে উঠল তুয়া। তারস্বরে ডাকতে লাগল কা-কে।

ক্ষিপ্তের মত দাঁড় বাইতে বাইতে চেঁচাতে লাগল রাম্সিসও—'কা-কে বলো কুমীর ঠাকুরকে যেন ঠেকিয়ে রাখে। কা-য়ের ক্ষতি করার ক্ষমতা কারো নেই।'

কিন্তু কুমীর ঠাকুরকে ঠেকানো গেল না। তেড়ে এসে নৌকোর পেছন দিকটা কামড়ে ধরে এমনভাবে জলের মধ্যে ডুবিয়ে ধরল যে দাঁড় টানতেও আর পারল না রাম্সিস। তারপরেই মড় মড় করে ভেঙে গেল নৌকোর কাঠ।

চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল তুয়া—'খেয়ে ফেলল! খেয়ে ফেলল!'

ঠিক সেই সময়ে নৌকো গিয়ে আছড়ে পড়ল সিঁড়ির ধাপে এবং ঘুরে গিয়েই ধাক্কা মারল কুমীরের মাথায়—নৌকোর ঠিক সেই দিকেই কিন্তু রয়েছে তুয়া। নৌকোর প্রহারে ক্ষিপ্ত কুমীর এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল নৌকোর ওপর।

জলভরা নৌকো যখন ডুবুডুবু, জাগ্রত হল রাম্সিসের বিপুল সাহস—যা তার অণুপরমাণুতে সুপ্ত ছিল এতক্ষণ।

চিৎকার করে বললে তুয়াকে—'পাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

বলেই, হাতের দাঁড় দিয়ে সবেগে মারল কুমীরের মাথায়। মার খেয়ে দাঁড় কামড়ে ধরার জন্যে হাঁ করতেই পুরো দাঁড়টা গায়ের জোরে রাম্সিস ঢুকিয়ে দিল তার মুখগহ্বরে।

হাঁচড় পাঁচড় করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে চিৎকার করে উঠল তুয়া—

'ছেড়ে দিয়ে চলে এসো, রামিস্ ।'

রামিস্ কিন্তু ছেড়ে দিয়ে চলে আসার পাত্র নয়। তার ছোট্ট বুকখানায় দুর্জয় সাহস জড়ো হয়েছে শুধু তুয়াকে কুমীরের খপ্পর থেকে বাঁচানোর জন্যে—ছেড়ে দিলেই যদি তেড়ে গিয়ে তুয়াকে ধরে, এই ভয়ে দাঁড় আঁকড়ে প্রাণপণে ঠেলে আটকে রাখল কুমীর ঠাকুরকে। শেষকালে এক ঝটকায় দাঁড় কেটে দু-টুকরো করে দিল কুমীর। ভাঙা দাঁড় ফেলে দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে আগুয়ান কুমীরের সামনে এবং দমাদম করে ছোট্ট মুঠির আঘাত হেনে চলল চোখের ওপর। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে খপাৎ করে রামিসের হাত কামড়ে ধরে সবশুদ্ধ জলের মধ্যে ডুব দিতে চাইল কুমীর।

কিন্তু টুঁ শব্দটি বেরোলো না রামিসের মুখ থেকে। পেছন ফিরেই তুয়া দেখল সেই ভয়ংকর দৃশ্য। হিড়হিড় করে রামিসকে টেনে তোলপাড় জলের মধ্যে ডুব দিচ্ছে ভয়ংকর কুমীর! যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে রামিসের মুখ!

'আমেন, বাঁচাও!' আর্ত চিৎকার করেই উঠে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে রামিসের বাঁ হাত চেপে ধরল তুয়া—আর একটু হলেই হাতটাও তলিয়ে যেত জলের তলায়। পাথরের খাঁজে পা আটকে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে তুয়া ধরে রইল হাতখানা।

কিন্তু কুমীরের ভয়াবহ শক্তির সঙ্গে পারবে কেন তুয়া? ওকে শুদ্ধ টেনে হিঁচড়ে জলের দিকে নিয়ে চলল অতিকায় সরীসৃপ এবং মুহূর্তের জন্য তুয়ার মনে হল এবার বুঝি মুখ থুবড়ে জলে পড়ে তলিয়ে যাবে চিরতরে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কেন বোঝা গেল না আচমকা হাঁ করে রামিসের হাত ছেড়ে দিলে কুমীর। দুজনেই ছিটকে পড়ল সিঁড়ির ওপর, উঠে এল টলতে টলতে। আসবার সময়ে তুয়া দেখলে বিমূঢ়ের মত নিজের রক্তমাখা ডান হাতের দিকে চেয়ে রয়েছে রামিস—হাতখানার কড়ে আঙুলটা নেই। এরপরেই আর কিছু মনে নেই ওর—শুধু তামার দরজায় একটা দমাদম আওয়াজ ছাড়া।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখল, সে শুয়ে রয়েছে মারমিসের বাড়ীতে। লেডী আস্তি ঝুঁকে রয়েছেন মুখের ওপর। অশ্রু বইছে তাঁর দু-গাল বেয়ে।

'ধাইমা, কাঁদছো কেন? এই তো আমি বেঁচে রয়েছি।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে আস্তি বললেন—'কাঁদছি আমার ছেলের জন্যে।'

'রামিস কি মারা গেছে?'

'এখনো যায় নি—তবে শীগগিরই যাবে। মিশরের ভাবী রাণীর জীবন বিপন্ন করার শাস্তি তাকে পেতেই হবে। ফারাও ছাড়বেন না।'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল তুয়া—'কক্ষনো না। রামিস আমার জীবন বাঁচিয়েছে।'

কথা ফুরোতে না ফুরোতেই খুলে গেল দরজা। স্বয়ং ফারাও প্রবেশ করলেন ঘরে। মেয়ে ডুবে মারা গেছে খবর পেয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছেন তিনি। ভয়ে কাঁপছেন ঠক ঠক করে। কিন্তু একমাত্র সন্তানকে জীবিত দেখে আনন্দে নতজানু হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন, মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন।

বাবার মুখ দেখেই শ্রীমতী তুয়া বুঝেছিল তাঁর ভয়ের কারণটা।

'তুয়া, মা আমার, ভেবেছিলাম তুই আর বেঁচে নেই।'

'কেন বাবা, স্বয়ং আমেন যখন আমাকে আগলে রেখেছেন, কে মারে আমাকে? রামিস না থাকলে—'

রামিসের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলেন ফারাও—'খবরদার! ওর নাম উচ্চারণ করবি না আমার কাছে। বদমাস্ ছেলে কোথাকার! চাবকে বধ করব।'

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে গিয়ে তুয়া বললে—'অমন কথাটি মুখে এনো না বাবা। রামিস মারা গেলে জানবে আমিও বেঁচে থাকবো না। রামিসই আমাকে বাঁচিয়েছে আজকে। ওর কোনো দোষ নেই। মা আমাকে বারণ করেছিলো, কিন্তু ওকে তো কিছু বলে নি। কুমীর যখন আমাকে খেতে এসেছিল—আমাকে সরিয়ে দিয়ে কামড় খেয়েছে সে নিজে। শোনো কি হয়েছিল।'

সব কথা শোনবার পর রামিসকে তলব করলেন ফারাও। সে বেচারা রক্তক্ষরণের ফলে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে হাঁটতেও পারছিল না। ধরাধরি করে নিয়ে এসে তাকে বসানো হল ফারাওয়ের সামনে একটা টুলে।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললে বালক রামিস—'মহান্ ফারাও, পাপ করেছি, শাস্তি দিন। কিন্তু মরব আমি হাসি মুখে—অশুভ প্রাণীটার খপ্পর থেকে বাঁচাতে পেরেছি রাজকুমারীকে—এই আনন্দ নিয়েই মাথা পেতে নেব আপনার মৃত্যুদণ্ড।'

মাথা নেড়ে ফারাও বললেন—খুবই দুষ্টুমি করেছো, রামেস্। কিন্তু তোমার ধমনীতে রাজরক্ত আছে। তাই সব দোষ নিজের কাঁধে নিলে। তা ছাড়া, রাজকুমারীর জীবন বাঁচিয়েছো নিজের জীবন বিপন্ন করে। মারমিসপুত্র, তাই আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। তবে উপদেষ্টাদের কথা শুনলেই বুঝি ভাল করতাম। তারা বলেছিল, তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে।'

বলে, হেঁট হয়ে বালকের শির চুম্বন করলেন ফারাও।

সেই সঙ্গে রাজবৈদ্যদের হুকুম দিলেন যেভাবেই হোক রামিসের রক্ত প্রবাহ থেকে যেন কুমীরের দাঁতের বিষ বার করে দেওয়া হয় এবং উপযুক্ত সেবাশুশ্রূষা করা হয়। চিকিৎসার গুণে অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠল রামিস—হারালো কেবল ডানহাতের কড়ে আঙুলটা। ব্রোঞ্জ ছুরিকার পরিবর্তে ফারাওর কাছ থেকে নতুন উপহার পেল একটা তরবারি। হাতলটা কুমীর দেহের অনুকরণে নির্মিত। সেই সঙ্গে নির্দেশ রইল, জীবন বিপন্ন করেও বালক বয়েসে যার প্রাণ রক্ষার প্রয়াস পেয়েছে রামিস, বড় হয়ে এই তরবারি দিয়ে যেন তাকে আগলে রাখে আমৃত্যু। সেই সঙ্গে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ বালক বয়েসেও কাউন্ট খেতাব লাভ করল রামিস এবং আরও একটা নাম —যার মানে, রাজেন্দ্রাণী-রক্ষক।

ফারাও বিদায় নিলে তরবারির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থেকে ভবিষ্যদ্‌-বক্তা আস্তি বললেন—'রাজরক্ত দেখতে পাচ্ছি তরবারির ওপর।' বলে তরবারি তুলে দিলেন রামিসের হাতে।

এরপর থেকে রামিস এবং তুয়াকে কিন্তু আর একসঙ্গে খেলাধুলো করতে দেওয়া হ'ল না। সশস্ত্র প্রহরী এবং সম্ভ্রান্ত মহিলারা সব সময়ে ঘিরে থাকত রাজকুমারীকে। দু-এক বছরের মধ্যেই রামিসকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল যুদ্ধ-বিদ্যায় শিক্ষাদানের নিমিত্ত একজন সেনাপতির অধীনে। রামিসও চায় সৈনিক হতে—যুদ্ধবিদ্যাই তার একমাত্র মনোমত বিদ্যা। ফলে তার সঙ্গে তুয়ার দেখা সাক্ষাৎ আর ঘটল না। তুয়া কিন্তু ভুলল না রামিসকে। প্রতি রাতে প্রতি ভোরে আমেনের কাছে বাবার আর মায়ের মঙ্গল কামনা করার সঙ্গে সঙ্গে রামিসের শুভ কামনাও করত। বর প্রার্থনা করত যেন রামিসের সঙ্গে আবার তার মিলন হয়—অদর্শনের ফলে দুজনের হৃদয়ের বন্ধন কিন্তু শিথিল হল না একদিনের তরেও। মাসের পর মাস একলা থেকেও তুয়া শুধু একটা প্রার্থনাই জানিয়ে গেল আমেনের পদতলে—আবার যেন দেখা হয় রামিসের সঙ্গে।

(৪) আমেনকে আবাহন

ফুরিয়ে গেল একটির পর একটি বছর। 'আমেনের ভোরের তারা' নাম নিয়ে রাজকুমারী নেতার-তুয়া যুবতী হয়ে উঠল। শুদ্ধিকরণের উৎসব শুরু হল সারা মিশর জুড়ে। তার মত জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী আর সুন্দরী মেয়ে তামাম মিশরে আর দুটি ছিল না। মাথায় লম্বা। সুগঠনা। নীল সমুদ্রের

মত টলটলে গভীর চোখ। ভোরের আকাশের মত গোলাপী গাল। লম্বা কালো চুল সোনার মুকুট পরে না থাকলে লুটিয়ে পড়ত কোমর ছাড়িয়ে। পুরোহিত এবং পুরোহিত ঠাকরুণরা তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে দেওয়ায় অসাধারণ জ্ঞানবতীও বটে। সেই সঙ্গে শিখেছিল নাচ, গান এবং বীণাবাদন। পরম শিক্ষাগুরু ছিল অবশ্য তার নিজের কা। ঘুমের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় সমৃদ্ধ করে যেত গভীরতর জ্ঞানভাণ্ডার দিয়ে।

জ্ঞানবৃদ্ধ পিতা ফারাও শিখিয়েছিলেন রাজবিদ্যা। দেশ শাসন করার কলা কৌশল। শত্রুকে পরাভূত করার বহু মন্ত্রগুপ্তি দিয়েছিলেন প্রাণাধিকা কন্যাকে। সবশেষে দিলেন স্বর্ণ মুকুট শিরে বহন করার অধিকার।

বললেন—'আমার শরীর দুবল। গুরুভার এই মুকুট আর বইতে পারছি না। খানিকটা ওজন তুই নে। রাজ্যশাসনে সাহায্য কর।'

তাই রাণী হতে হ'ল তরুণী নেতার-তুয়াকে। মুকুট অভিষেক অনুষ্ঠিত হ'ল জাঁকজমক করে। পুরুৎরা এলেন জমকালো পোশাক পরে—সর্বাঙ্গে দেবদেবীদের প্রতীক ঝুলিয়ে—অনন্ত জীবন কামনা করে প্রাণ ঢালা আশীর্বাদ করে গেলেন। রাজপুত্র এবং সম্ভ্রান্ত পুরুষরা দিলেন বিস্তর উপহার সামগ্রী। বিদেশী রাজা এবং দল প্রধানদের দূতগণ এসে জানিয়ে গেল অভিবাদন। দুই ভূমির কাউন্ট এবং দেশ নায়করা এসে স্বীকার করে গেল আনুগত্য। সবশেষে সভাসদদের সাক্ষী রেখে জোড়া মুকুট শিরে ন্যস্ত করলেন ফারাও এবং অর্পণ করলেন সিংহাসন-খেতাব—'রা' এবং 'হাথোরের প্রসাদে রূপ ও শক্তির রাণী।'

প্রজাগণের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ক্ষণেক স্থিরভাবে সিংহাসনে আসীন রইল তুয়া। তারপর সঞ্চরমান হল চক্ষু। বিশাল সভাকক্ষের মধ্যে খুঁজতে লাগল একটা চেনা মুখ। অচিরেই পূর্ণ হল অভীষ্ট। ঐ তো দাঁড়িয়ে রয়েছে অনুগতদের ভীড়ে দীর্ঘকায় দৃপ্ত এক পুরুষ—ক্যাপ্টেন রামিস—তুয়ারাণীর পালক-ভ্রাতা। মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল তার মুখের ওপর। পরক্ষণেই অন্যত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করল তুয়া। কিন্তু ঐ একটি মুহূর্তের মধ্যেই হৃষ্ট নয়নের মধ্যে দিয়ে নিক্ষিপ্ত হল যত কথা তত কথা সারা দিনের সুদীর্ঘ বক্তৃতাতেও বলা হয় নি। নীরব কিন্তু বাঙ্ময় সেই চাহনির অর্থ বুঝল কেবল রামিস। তীরের মতই মর্মে প্রবেশ করল অনুক্ত বাণী—'রাণী হতে পারি, কিন্তু বালিকা তুয়া এখনো ভোলেনি বালক রামিসকে। দেবী হতে পারি—কিন্তু নারী তো বটে!'

সুমিষ্ট কিন্তু নির্নিমেষ সেই চাহনির সামনে যেন অশনি-প্রহারে টলে গেল

রামিস। মুহ্যমানের মত বেরিয়ে গেল সভাকক্ষ থেকে।

রাত্রি। সহায়ক, নকলনবিস এবং পার্শ্ব-সহচরীদের বিদায় দিয়ে নিঃসঙ্গ হল তুয়া। অঙ্গে এখন আর রাণীর বেশ নেই—সাদাসিদে শ্বেতবসন। সারাদিনের জমকালো দৃশ্যগুলো ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে—কিন্তু স্থির হয়ে রইল কেবল একটি আনন—ক্যাপ্টেন রামিস। এত বৈভব, এত ঐশ্বর্য, এত আনুগত্য নিয়েও রাণী তুয়া আজ বাল্য সহচরকে আকর্ষণ করতে পারছে না বাহুপাশে। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে। লোকে তাকে দেবী বলে, মাঝে মাঝে তুয়ারও মনে হয় সে যেন অর্ধেক মানবী। কিন্তু এই অর্ধেক মানবী সত্তাই সাধারণ নারীর মতই মুহূর্তে ব্যাকুল হল বাল্য-সহচরের সঙ্গকামনায়।

দেবী হোক কি সম্রাজ্ঞী হোক—মানবী তো বটে। মর্ত্যের দুঃখশোকের ঊর্ধ্বে ওঠবার ক্ষমতা তো তার নেই। তবে হ্যাঁ, তার শক্তি আছে বটে। আত্যন্তিক এই শক্তির অস্তিত্ব সে উপলব্ধি করে—কিন্তু আবাহন জানায় নি কখনো।

কিন্তু একাজ তো একা করা যায় না। কিছুক্ষণ ভাবল তুয়া। তারপর তলব করল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক দাসীকে। খবর পাঠালো আমেনের পুরোহিত ঠাকরুণ আস্তিকে। অচিরেই এল ভবিষ্যদ্বক্তা—চিরকালের মত আজও সদ্যঅভিষিক্ত সম্রাজ্ঞীর ধাত্রীমাতা। বয়স পঞ্চাশ হলেও আজও তার চুলে পাক ধরে নি। সুদর্শনা, সম্ভ্রান্তদর্শনা, কৃষ্ণকেশা।

'আসতে দেরী হল মন্দিরে ছিলাম বলে। মহারাণী যেন ক্ষমা করেন,' মাথা নুইয়ে সবিনয়ে বললেন আস্তি।

সিধে করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চুমু খেয়ে বললে রাজ্ঞী তুয়া—'কান ঝালাপালা হয়ে গেল বড় বড় খেতাব শুনতে শুনতে। মাগো, চিরকাল তুয়া বলে ডেকেছো যখন এখনও ঐ নামে ডাকো। তোমার বুকের দুধ খেয়েই তো বেঁচে গেছি আমি।'

তুয়ার নরম ঢেউ খেলানো চুলে হাত বুলোতে বুলোতে আস্তি বললেন—'কি হয়েছে? ক্লান্ত কেন? জোড়া মুকুটের ভার সহ্য হচ্ছে না?'

'তা ঠিক। অথচ ঘুমোতেও পারছি না। বলো তো মা, ফারাও উপদেষ্টাদের নিয়ে মন্ত্রণা সভা ডেকেছিলেন কেন? মারমিস ছিলেন তাঁদের মধ্যে। অথচ আমি ছিলাম না—রাণী পদবাচ্য হয়েও।'

মৃদু হেসে আস্তি বললেন—'তোমার বিয়ে ঠিক করার জন্যে।'

উদ্বিগ্ন হল তুয়া—'কার সঙ্গে ?'

'অনেক নাম উঠেছে। মিশরের রাণীর বরের অভাব হয় না।'

'নামগুলো তাড়াতাড়ি বলো না।'

নাম বললেন আস্তি। এক-একটা নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করে দিল তুয়া। কেউ নাকি মোটা, কেউ কদাকার, কেউ বিদেশী—স্বদেশের দেবতাদের ঘেন্না করে। কেউ বেজায় বুড়ো। সাতটা নাম শুনিয়ে চুপ করলেন আস্তি। কিন্তু আরও নাম শুনতে চায় তুয়া।

আস্তি বললেন—'আর কারো নাম প্রস্তাব করা হয়নি মর্নিং স্টার। সভা মুলতবি আছে।'

'আর কারো নাম নয় ?'

'না। কেন, কারও নাম তোমার বলার আছে ?'

তুয়া শুধু ঠোঁট নেড়ে নিঃশব্দে একটা নাম আউড়ে গেল—সশব্দে নয়। তাইতেই বুঝে ফেললেন আস্তি। নির্নিমেষে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বললেন ফিসফিস করে—'কিন্তু তা তো হবার নয়। আমি যে কথা দিয়েছি। আমার আর মারমিসের এ-প্রতিজ্ঞা ভাঙবার অধিকার স্বয়ং ফারাওয়েরই নেই। আমাদের বংশধর কোনোদিনই সিংহাসনে বসবে না। এর অন্যথা ঘটতে দিও না, তুয়া—ছেলেটা প্রাণে মারা পড়বে।'

'আস্তি, আমি তো তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চাই না বরং নিয়ে আসতে চাই জীবন আর সম্মানের মধ্যে। কিন্তু খবরদার, এ কথা ফারাওয়ের কানে যদি যায় তো তোমার প্রাণ নিয়ে ছাড়ব আমি।'

স্মিতমুখেই বললেন আস্তি—'বেশ তো, কাউকে বলব না। কিন্তু তুমি এবার বলো তো বিশেষ একজন ক্যাপ্টেন তোমার চাহনির সামনে অজ্ঞানের মত হয়ে গেল কেন ? টলতে টলতে সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল কেন ?'

রক্তিম মুখে তুয়া বললে—'গরমের জন্যে।'

'উহুঁ, গরম সইবার মত ক্ষমতা তার আছে—অত দৈহিক শক্তি রক্ষী-বাহিনীতে আর কারো নেই। তা সত্ত্বেও—'

'আমার রাণীগিরি দেখে ভয় পেয়েছিল, তাই,' ঝটিতি বললে তুয়া—'আজ আমাকে খাঁটি সম্রাজ্ঞীর মতই দেখতে লাগছিল।'

'সে কারণেও হতে পারে, অথবা অন্য কোনো ভাবাবেগের আতিশয্যের দরুনও হতে পারে। কিন্তু তুয়া, মন থেকে এই ভাবনা তাড়াও। ফারাও যখন হবে, তখন খেয়াল রাখবে জনগণের সেবিকা তুমি—আইনের সেবাদাসী। তার নাম মনে রেখো—মুখে কখনো প্রকাশ করো না।'

নরমন্তকে কি ভেবে নিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে তুয়া বললে—'ফারাও যখন হব, তখন কয়েকটা ব্যাপারে আমার আইন সৃষ্টি করব ; তাতে যদি জনগণ চায় অন্য ফারাওকে —আপত্তি করব না।'

বড় বড় চোখে তাকিয়ে শুনলেন আস্তি। উজ্জ্বল হল চক্ষু।

'রাজেন্দ্রাণীর মতই উদার হৃদয় তোমার। কিন্তু যাকে ভালোবাসো, তার মঙ্গলের জন্যে মুখে চাবি এঁটে থেকো। এমনিতেই সর্বক্ষণ ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি কখন জানি বিষ পেয়ালায় কিছু খাইয়ে দেয় তাকে, অথবা উড়ো তীরে গলা দু টুকরো হয়, নয়তো অজানা বর্শায় হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়।'

মুঠো শক্ত করে তুয়া বললে—'যেদিন তা হবে, এমন প্রতিহিংসা নেব যা কেউ কল্পনাতেও আনতে পারবে না।'

'কিন্তু তখন প্রতিহিংসা নিলে তার কী ? তার কবর তো বন্ধ হয়ে যাবে— বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডও আর থাকবে না।'

আবার কিছুক্ষণ ভাবল তুয়া। তারপর বলল—'অসিরিস ছাড়াও অন্যান্য দেবতা তো আছে। আমাকেই তো লোকে আমেনের মর্নিং স্টার বলে ডাকে। আমি তো আমেনের মেয়ে, তাই না, মা ?'

'হাঁ, তুয়া। তোমার মা স্বপ্নে জেনেছিলেন আমেনের মেয়ে তুমি। স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিত অবস্থায় মন্দিরের গুপ্তকক্ষে আছে। আমি দেখেছি।'

'তাহলে মা, পিতৃদেব আমেনকে আবাহন করো তুমি। তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'প্রাণে ভয় ডর নেই দেখছি ?' অদ্ভুত চোখে তাকালেন আস্তি। 'দেবতাদেরও দেবতা তিনি, তাকে যখন তখন ডাকা যে মহাপাপ।'

'মেয়ে হয়ে বাবাকে ডাকা কি মহাপাপ হতে পারে ? ভয় করতেই বা যাবো কেন ?'

'ফারাও আর মহারাণী আমেনের বেদীতে মাথা কুটেও তাঁর দর্শন পান নি—বাণী শোনেন নি। স্বপ্নে শুধু নির্দেশ পেয়েছিলেন মহারাণী। মর্নিং স্টার, তুমিও তাই করো। ঘুমিয়ে পড়ো আর স্বপ্ন ছাখো।'

'দেবাদিদেব যদি আমার পিতৃদেব হন তো আমি তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমার এবং আর একজনের মঙ্গলের জন্যে পথ নির্দেশ শুনতে চাই। আস্তি, তোমার যদি ক্ষমতা থাকে আবাহন করবার, ডাকো তাঁকে। উনি যদি সেজন্যে আমার প্রাণহরণও করতে চান, ডাকো। আমি মরেও যদি—'

'চুপ!' তুয়ার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন আস্তি—'ও নাম উচ্চারণ কোরো না। ঠিক আছে, ক্ষমতা আমার আছে। তোমার—আর একজনের—কল্যাণের জন্যে চেষ্টা আমি করব। আলখাল্লা পরে নাও, সম্রাজ্ঞী. মাথায় ঘোমটা দিয়ে এসো আমার পেছন পেছন।'

সঙ্কীর্ণ গলিপথ বেয়ে নেমে এল দুজনে। পেরিয়ে এল অনেক গুপ্ত সিঁড়ি পথ, পাতাল প্রবিষ্ট হয়ে থামল একটা লম্বা গড়ানে পাথরের প্রান্তে। সামনেই একটা দরজা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ফের তালা দিয়ে দিলেন আস্তি।

ফিসফিস করে বললে তুয়া—'এ কোথায় এলাম?'

'আমেনের প্রধান পুরোহিত ঠাকরুণদের কবরখানা। দেবতার নজর আছে এখানে। গত তিরিশ বছর কেউ এখানে ঢোকেনি। সিঁড়ির ওপরেই ছাখো—ধুলোর স্তরে আর কারো পায়ের ছাপ নেই—শেষ পুরোহিত ঠাকরুণের নশ্বর দেহ যারা এনেছিল—তাদের পদচিহ্ন ঢেকে দিয়েছে পুরু ধুলো।'

আলো তুলে ধরলেন আস্তি। বিরাট একটা গুহা চোখে পড়ল তুয়ার। গুহার দুপাশের দেওয়ালে আঁকা দেবতাদের ছবি। আর রয়েছে সারি সারি কুলুঙ্গি। এক একটা কুলুঙ্গিতে রয়েছে এক একটা শবাধার। শবাধারের পেছনেই অ্যালাবাস্টার স্ফটিকের মূর্তি। মূর্তির সামনে টেবিলে সাজানো উপহার সামগ্রী। গুহার প্রান্তে কালো পাথরের একটা বেদী। এ ছাড়া গুহায় আর কিছু নেই।

বেদীর সামনে গিয়ে তুয়াকে হাঁটু গেড়ে বসালেন আস্তি। প্রদীপটা লুকিয়ে রেখে এলেন পাশের মন্দির কক্ষে। গুহার আলো আর রইল না—নিশ্ছিদ্র তমিস্রা ছাড়া। অচিরেই নিবিড় আঁধারের মধ্যে তাঁর পদশব্দ শুনল তুয়া। পা টিপে টিপে এলেও পায়ের তলায় ধুলোর রাশি যেন ককিয়ে কেঁদে উঠল—মিলেন আর দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল প্রতিধ্বনি। এছাড়াও আস্তির সর্ব অবয়ব ঘিরে একটা জ্যোতির্ময় ছটা দেখা গেল—মৃত্যুর গুহায় জীবনের প্রভা বিকিরিত হচ্ছে আস্তির পুণ্য দেহ ঘিরে। তুয়াকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে বসলেন কালো বেদীর সামনে—মিলিয়ে গেল নড়াচড়ার শব্দ। তুয়ার কিন্তু মনে হল, প্রতিটা শবাধার থেকে যেন কা-য়েরা উঠে আসছে একে একে। যাদের দেহ রয়েছে শবাধারে—তাদের কা শ্বেতমূর্তি পরিগ্রহ করে নির্নিমেষে সাগ্রহে যেন চেয়ে রয়েছে তাদের দিকে।

স্পষ্ট দেখা গেল না। আওয়াজও শোনা গেল না—কিন্তু বত্রিশটা শ্বেত-মূর্তি ঘিরে ধরল ওদের—নিঃশব্দে নীরবে। প্রতিটা মূর্তি ভিন্ন রকমের—কারো সঙ্গে কারোর মিল নেই।

সেই সঙ্গে শুরু হল আস্তির স্তোত্রপাঠ—একবর্ণও বুঝতে পারল না তুয়া। শুনতে শুনতে সেই প্রথম রোমাঞ্চিত এবং ভীত হল তুয়া। মৃত্যুগহ্বরে অপার্থিব এই বন্দনাসঙ্গীত যে ভয়াবহতা সৃষ্টি করল, তুয়া তা সহ্য করতে পারল না। ধুলোর কাছে মাথা নুইয়ে এনে একমনে প্রার্থনা জানালো দেবাদিদেব আমেনকে—ওগো প্রভু রুষ্ট হয়ো না—শ্রবণ করো। মনোবাসনা পূর্ণ করো। বিরামবিহীনভাবে একই প্রার্থনা অনেকক্ষণ করার পর ক্লান্ত হয়ে পড়ল তুয়া—কিন্তু বিরাম রইল না আস্তির আবাহন সঙ্গীতে। তাসত্ত্বেও কেউ জবাব দিল না, কোনো দেবমূর্তির আবির্ভাব ঘটল না, কোনো দৈববাণী কানে ভেসে এল না। অবশেষে উঠে দাঁড়ালেন আস্তি। তুয়ার কাছে এসে বললেন কানে কানে—'চলো যাই, নইলে যাদের জাগিয়েছি—তারা রুষ্ট হতে পারে—প্রেতাত্মারা জেগেছে—সব শুনেছে—শুনলেন না কেবল দেবাদিদেব।'

তুয়ার ভয় তখন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, গভীরতর হয়েছে, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল নতজানু অবস্থা থেকে। সিধে হয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকেই ফের বসে পড়ল নতজানু হয়ে—কেন না প্রবেশ পথের দরজার সামনে আবির্ভূত হয়েছে একটা জ্যোতিঃপুঞ্জ। অন্ধকারের মাঝে জমাট বাঁধছে অদ্ভুত একটা প্রভা—একটা বিচিত্র দীপ্তি। ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হল ফিকে আলোকপ্রভা—রাজরাণীর বেশ পরা এক সম্রাজ্ঞীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল দূরে গুহা প্রান্তে। মুখটা চেনা মনে হল তুয়ার—যেন তার মুখের মতই। হাতে একটা কৃপাণ। আস্তি কিন্তু দেখেই চিনলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন মাটিতে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল জ্যোতির্ময়া—দাঁড়ালো ওদের সামনে। অন্ধকারের মধ্যে আলো দিয়ে বাঁধানো একটা আশ্চর্য মূর্তি।

বললে সুমিষ্ট মৃদু স্বরে—'মিশরের রাণী নেতার-তুয়া। আমেন কন্যা ভোরের তারা। যার গর্ভে তোমার জন্ম তাকে দেখে এত ভয়? তুমি না দেবাদিদেবকে আবাহন করতে চেয়েছিলে?'

ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে তুয়া বললে—'বড় ভয় করছে।'

'আস্তি। জাদুকরী আস্তি। একটু আগেই তুমি না বলছিলে—'স্বর্গলোক থেকে অবতীর্ণ হও হে দেবাদিদেব'—তুমিও কি ভয় পেয়েছো?'

'এখনো তাই বলছি, রাণী আহুয়া।' বিড় বিড় করে বললেন আন্তি।

'মহাপাপে পাপী হলে তোমরা দুজনেই। দেবাদিদেব তোমার আবাহন শুনলে কেউই আর জীবিত থাকতে না—আমাকে দেখেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেছো—তাঁকে দেখলে সহ্য করতে পারতে না। দয়ালু ঠাকুর তাই দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন—নিজে আসেন নি।'

অবরুদ্ধ কণ্ঠে তুয়া বললে—'মাগো, অপরাধ আমার—আন্তিকে আমিই আদেশ দিয়েছি বলে এসেছে এখানে। দেবতার রোষ যেন আমার ওপরেই পড়ে। কিন্তু ভবিষ্যৎ জানবার জন্য বড ব্যাকুল হয়েছি আমি। আমার আর একজনের কপালে কি লেখা আছে, জানবার জন্যেই—'

'সম্রাজ্ঞী নেতার-তুয়া, ভবিষ্যৎ জেনে কি হবে? সুখ দুঃখ হাসি কান্না নিয়েই এই সংসার। দিন আর রাত যেমন পাশাপাশি থাকে—জীবনেও হর্ষ বিষাদ পাশাপাশি থাকে। ভবিষ্যৎ জানলে মরজগতের মানুষ আতংকে উন্মাদ হয়ে যাবে বলেই তো তাদের দিব্যদৃষ্টি দেওয়া হয়নি।'

'মাগো! তাহলে আমার ভবিষ্যতেও একই দুঃখ আছে?'

'অন্যথা তো ঘটবে না। রাণী নেতার-তুয়া, সুখ থাকলে দুঃখও থাকবে। তুমিও তো মানুষ।'

'দেবীও তো বটে, মা আহুয়া। গল্প যদি সত্যি হয়, তাহলে দেবী-সত্তা তো আমার মধ্যেও আছে।'

'তাহলে ঈশ্বরের আরাধনাই করে যাও একমনে—চোখের জলের মধ্যে দিয়ে তাঁকে ডাকো—আর কিছু করার নেই। যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর ঊর্ধ্বে তোলেন মানুষকে—আগুন ছাড়া সোনা নিখাদ হয় না।'

কাতর কণ্ঠে তুয়া বললে—'মা, তুমি কিছুই বলছ না। আমি তো আমার জন্যে কিছু জানতে চাইছি না। যার জন্যে জানতে চাইছি, অনেক বিপদ ঘিরে রয়েছে তাকে। তাকে আমি ভালবাসি—মিশরের ঐশ্বর্যময়ী সম্রাজ্ঞী হয়েও তাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি। সে বেঁচে থাকুক এই শুধু আমি চাই—বেঁচে থেকে যেন আমাকে পায় স্ত্রী রূপে—এটাও চাই। আমেনের মেয়ে আমি—কেন তিনি মেয়েকে এই বিপদের মধ্যে দেখবেন না? মাগো, সাহায্য করো আমাকে।'

'সাহায্য করবে তোমার নিজের ঈশ্বর-বিশ্বাস। আমেনের দৈববাণী তো লিখে রাখা হয়েছে। পড়ে নাও। ভালবাসা একটা অব্যর্থ শর—লক্ষ্যভ্রষ্ট কখনো হয় না। আগুন পোড়াতে পারে না প্রেমকে, জল বা বাতাসে মিলিয়ে যায় না প্রকৃত প্রেম। তাই ভালোবাসো—হৃদয় দিয়ে

ভালবেসে যাও। বৃথা যাবে না তোমার ভালবাসা। রাণী, আমার কন্যা, বিদায়।'

'না, না, অমর মা আমার, এখনো যে কথা বাকি। বিপদ যখন ঘনিয়ে আসবে, সম্মান যখন ভূলুণ্ঠিত হবে, সঙ্গী যখন কেউ থাকবে না আমার —তখন কে হবে আমার ত্রাতা—কাকে ডাকবো?'

'তোমার মধ্যে যে আছে, যাকে জন্মমুহূর্ত থেকে দেওয়া হয়েছে তোমার সঙ্গে—ডাকবে শুধু তাকে। তাকে আহ্বান করার মন্ত্রগুপ্তি জানে আস্তি। জাদুকরী আস্তি, আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। কাছে এসো।'

এগিয়ে গেলেন আস্তি। জ্যোতির্ময়ীর প্রভায় আলোকিত হল তাঁর মুখ। দেখা গেল হেঁট হয়ে আস্তির কানের কাছে মুখ নিয়ে গেলেন আলোকময়ী—কি যেন বললেন মনে হল। তারপরে আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় হাত বাড়িয়ে দিলেন তুয়ার দিকে—পরক্ষণেই আর তাঁকে দেখা গেল না।

তুয়ার কক্ষ। নিরক্ত ফ্যাকাশে মুখে কাঁপতে কাঁপতে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল তুয়া আর আস্তি।

তারপর বললেন আস্তি—'রাণী, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। তিনি নিজে না এলেও প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন।'

'কিন্তু যা বললেন অশরীরিণী, তার কোনো মানেই তো বুঝলাম না।'

'ঠিক উল্টো বললে। অনেক কথাই বলে গেলেন তোমার গর্ভধারিণী। ভালবাসার পুরস্কার থাকে—এইটাই তো আসল কথা—আর চাই কি তোমার?'

সোল্লাসে বললে তুয়া—'তাহলে আমি খুশী।'

'খুব খুশী হয়ো না রাণী। আজ দেবাদিদেবকে আবাহন করে যে মহাপাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত হবে নিকটজনের রক্তপাতে। কে সে, তা কিন্তু জানি না।'

'তখন তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না?'

'আমার বুকের দুধ খাইয়ে যখন তোমাকে এত বড় করেছি, তখন থাকব শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আমেনকে ডাকতে আর বোলো না।'

(৫) কেশ যুবরাজের সঙ্গে রামিসের লড়াই

পুরো একটা চান্দ্রকাল ধরে উৎসব চলল থিব্‌স্ শহরে। সব উৎসবেই অংশ নিতে হল সম্রাজ্ঞী নেভার-তুয়াকে।

একটার পর একটা ভোজ সভার আয়োজন হল রাণীর এক একজন

পাণিপ্রার্থীর সম্মানে।

ভোজসভা শেষ হলেই উপদেষ্টাদের নিয়ে তুয়ার মতামত জিজ্ঞেস করতে আসতেন ফারাও। সুচতুরা তুয়া সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে খুঁত বার করে যেত প্রত্যেকের।

শেষকালে তুয়া দেখতে চাইল মাতা আহুয়ার লিখিত স্বপ্ন বৃত্তান্ত। নিয়ে আসা হল সেই গুরুত্বপূর্ণ দলিল। পড়া সাঙ্গ হলে তুয়া বললে, আমেন তো স্পষ্ট বলেছেন রাজরক্ত ধমনীতে আছে এমন একজন প্রেমাস্পদ হবে তার। কিন্তু পাণিপ্রার্থীদের অনেকেই সে দলে যখন পড়ছে না—তখন এদের বিবাহ করা যায় না স্বয়ং আমেনের নির্দেশে।

কিন্তু এমন অনেক আছে যারা রাজা; তবে তারা তো নিজেরা আসে-নি—দূত পাঠিয়েছে। না দেখে কি বিয়ে করা যায়? রাজসভায় আগে আসুক তারা। তারপর মত প্রকাশ করা যাবে'খন।

শেষকালে বাকী রইল কেবল একজন পাণিপ্রার্থী। তুয়া তাকে ভাল-ভাবেই চেনে। কাজেই ফারাও এবং উপদেষ্টারা চেপে ধরলেন তাকে—একেই তাহলে বিয়ে করা যাক। নাম তার অ্যামাথেল—কেশ-য়ের যুবরাজ। কেশ-য়ের পিতার বয়স হয়েছে। নাপাতা নামে একদম দক্ষিণের একটা শহরের রাজা তিনি। শহরটা যে ভূমিখণ্ডে অবস্থিত, তার দুপাশ দিয়ে দু-বাহুর মত নীলনদ প্রবাহিত হওয়ায় দেশটাকে দ্বীপ বলা হয়। মিশরের পরেই সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ সেটি। খনিতে হীরে জহরৎ ঠাসা রয়েছে, ক্ষেতে শস্য উপচে পড়ছে এবং সোনা সেখানে এত অঢেল যে তার দাম তামা আর লোহার চেয়ে কম।

এ ছাড়াও, সুদূর অতীতের নাপাতার রাজবংশই ফারাও হয়েছিল মিশরের সিংহাসনে। কিন্তু যেহেতু তারা বিদেশী এবং নুবিয়ান রীতিনীতি চালু করতে গিয়েছিল মিশরে, তাই জনগণ পুরোহিতদের নেতৃত্বে সিংহাসনচ্যুত করে সেই রাজবংশকে; অলিখিত কানুন অনুযায়ী এ বংশের কাউকে জোড়া মুকুটের ধারে কাছেও আসতে দেওয়া হয় না। এই ফারাও বংশেরই অন্যতম শেষ আইন সম্মত বংশধর হল রামিস—তুয়ার বাল্যসঙ্গী।

মিশরের মানুষের কিন্তু আক্ষেপের অন্ত ছিল না এমন ধনরত্নপূর্ণ একটা দেশ হাতছাড়া হওয়ায়। সিংহাসন হারানোর পর কেশ রাজবংশ অন্য রাজবংশের সূচনা করেন এবং স্বদেশকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। যুবরাজ অ্যামাথেল এই রাজবংশের শেষ বংশধর।

তাই তুয়ার সঙ্গে অ্যামাথেলের বিয়ে দিয়ে ধনরত্ন ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন

দেখল উপদেষ্টারা। ফারাও নিজেও তাই চাইছিলেন। ছেলে থাকলে দেশের প্রথামত মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতেন। অ্যামাথেলের সঙ্গে তাঁর কথা হয়ে গিয়েছিল, বিয়ের পর থিব্‌স্‌-য়ে এসে থাকতে হবে।

তুয়া তাই জানত, অ্যামাথেলই শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বন্ধনে বন্দিনী করবে তাকে। আন্তির কাছে এই সম্ভাবনা শোনার পর সে ক্ষিপ্তের মত আবাহন জানিয়েছিল আমেনকে স্বর্গসিংহাসন থেকে—তার মন যে চায় রামিস্‌কে—আর কাউকে নয়। কিন্তু ফারাও তাকে অ্যামাথেল সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নি। আমাথেল অবশ্য ছদ্মবেশে হাজির ছিল মুকুট-অভিষেক উৎসবে। মনের মত না হলে মিশরের কেন, মিশরের চাইতে দশগুণ বড় দেশের রাণীকে সে বিয়ে করবে না—এই ছিল অহংকারী যুবরাজের প্রতিজ্ঞা। তাই স্বচক্ষে দেখবার মানসে ছদ্মবেশে হাজির হয়েছিল অভিষেক উৎসবে।

দেখেই মুণ্ড ঘুরে গেছিল আমাথেলের। দক্ষিণী রক্ত গরম হয়ে গিয়েছিল। জানিয়ে দিয়েছিল ফারাওকে—পাত্রী পছন্দ হয়েছে।

এরপর একরাতে বিরাট ভোজসভায় ভাবী বধূর সঙ্গে আলাপ করতে এল যুবরাজ। তুয়া যেন কিছুই জানে না, এমনি ভান করে হলঘরে ঢুকে দেখলে বিশাল হলঘরে সারি সারি জ্বলছে মশাল—অসংখ্য টেবিল পাতা হয়েছে অভ্যাগতদের জন্যে। এ যে দেবতাকে সম্বর্ধনা করার আয়োজন। অবাক হওয়ার ভান করে বাবার কাছে জানতে চেয়েছিল তুয়া—কে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি যার জন্যে এমন এলাহি আয়োজন?

ঘাবড়ে গেলেন ফারাও। বললেন আমতা আমতা করে—'কেশ-য়ের যুবরাজ। মিশরে যেমন আমাদের দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়, কেশ রাজবংশ ঠিক তেমনি পূজা পায় স্বদেশে।'

'কেশ! ও-দেশ তো আমাদের ছিল না?'

'এককালে ছিল। ওদেশের রাজা মিশরের ফারাও পর্যন্ত হয়েছিল। তারপর আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ সিংহাসন দখল করেন। ওবংশের আর তিনজন জীবিত আছে আজ—মারমিস, আন্তি আর রামিস—যে তোমাকে ছেলেবেলায় বাঁচিয়েছিল কুমীরের মুখ থেকে।'

'তাহলে মারমিস কেশ-য়ের রাজা হয়নি কেন?'

'কেশ-য়ের প্রজাবৃন্দ অন্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে—যে বংশের শেষ বংশধর এই অ্যামাথেল।'

'অন্যায়ভাবে দখলকারী রাজবংশের বংশধর হয়ে গেল না?'

'অমন কথা বলে না,' ধমকে উঠলেন ফারাও। 'তাহলে তো আমাদের

জায়গায় মারমিসকে ফারাও হতে হয়।'

তুয়া আর কোনো কথা না বলে গিয়ে বসল সোনার চেয়ারে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—'হে ফারাও, কেশ-য়ের যুবরাজ কি আমার পাণি-প্রার্থী?'

'তা তো বটেই। জানতিস না বুঝি? রাজযোটক মিল হবে, মা। ভালভাবে কথা বলিস। আমরা ঠিক করে ফেলেছি, অ্যামাখেলই তোর স্বামী হবে। চুপ, আসছে যুবরাজ!'

উদ্দামছন্দে ধ্বনিত হল যন্ত্রসঙ্গীত হলঘরের প্রান্তে। জমকালো পোশাক পরা বাদকরা আবির্ভূত হল বিশাল কক্ষের প্রবেশ পথে। হাতীর দাঁতের শিঙে ফুঁকে, ব্রোঞ্জের করতাল বাজিয়ে এবং স্বর্ণ-ঢোলক পিটতে পিটতে তারা এগিয়ে এল ভোজ কক্ষের মাঝখান দিয়ে। কিছুদূর এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড শব্দে বন্য বাজনা নিয়ে ব্যস্ত রইল বাদকবৃন্দ। তারপরেই কুচকাওয়াজ করে ঢুকল কুড়িজন চ্যাপ্টা ফলকওলা বর্শাধারী নুবিয়ান সৈনিক। জলহস্তীর চামড়া দিয়ে তৈরী অদ্ভুত ঢাল তাদের হাতে—চামড়ার ওপর বিচিত্র কারুকাজ। পরনে চিতাবাঘের ছালের পোশাক—মাথার টুপিও চিতাবাঘের ছাল দিয়ে তৈরী।

এরপরেই এল স্বয়ং কেশ যুবরাজ। খর্বকায়, বৃষস্কন্ধ, গাঁট্টাগোঁটা, ভারীমুখ এবং গুরুদেহী এক যুবক—চোখ দুটো বিরাট ভাঁটার মত। অস্থির, চঞ্চল, ঘূর্ণমান। পরনে ভোজসভার পরিচ্ছদ। স্বর্ণশৃঙ্খলে গাঁথা বিবিধ রত্নরাজি ঝুলছে গা থেকে। মাথায় উটপাখীর পালকের শিরস্ত্রাণ। মেঝের ওপর লুটোনো পোশাক প্রান্ত বয়ে নিয়ে আসছে দুটো মর্কটাকার বামন—আকারে বালক সমান হলেও বয়েসে প্রাপ্ত বয়স্ক।

দূর থেকেই যুবরাজের আপাদমস্তকে দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল তুয়া এবং ঘৃণায় ভরে উঠল অন্তর—এত ঘৃণা আর কোনো পুরুষকে সে করেনি। উঁচু মঞ্চ থেকে এবার দেখা গেল ইথিওপিয়ার যুবরাজের ঠিক পেছনেই বাছাই করা মিশরীয় সৈন্যদের নিয়ে ঢুকল দীর্ঘদেহী কাউন্ট রামিস। পরনে সাদামিদে আঁশওলা ব্রোঞ্জবর্ম, উরুর ওপর ফারাওয়ের দেওয়া সোনার হাতলওয়ালা তরবারি। দেখেই মুখ লাল হয়ে উঠল তুয়ার। ফারাও কিন্তু ভাবলেন খর্বকায় গরিলাসদৃশ যুবরাজকে এই প্রথম দেখেই বুঝি লজ্জায় অরুণ হল কন্যা। হাজার হোক ভাবী বর তো!

তুয়ার মনে তখন অন্য চিন্তা। যুবরাজ অ্যামাখেলের সেবায় কাউন্ট রামিসকে মোতায়েন করা হয়েছে কেন? জবাবটা এল মনের মধ্যে থেকে।

নিশ্চয় কোনো উপদেষ্টা ঘুস খেয়ে এই কাণ্ডটি করেছে। ফারাও কিছুই জানেন না। বংশ মর্যাদায় রামিস অ্যামাথেলের উর্ধ্বে। তাই তাকে প্রকাশ্যে যুবরাজের সেবক মোতায়েন করে একাধারে রামিসকে অপমান এবং যুবরাজের সম্মান বৃদ্ধির এই আয়োজন। দাম্ভিক অ্যামাথেল ফারাও বংশোদ্ভূত রামিসকে সেবক রেখে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেয়েছে এই নীচ পন্থায়। তাই মুখ লাল হয়ে গেল তুয়ার।

তরুণ কাউন্ট একদা তরুণী সম্রাজ্ঞীর খেলার সঙ্গিনী ছিল। তুয়া এখনো তাকে পছন্দ করে। সুতরাং সর্বসমক্ষে ভাবী রাজজামাতার সেবক হিসেবে তাকে মোতায়েন করে তার সম্মানহানি করার এই চক্রান্তটা নিশ্চয় এমন কোনো উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত যে বা যারা চায় তুয়ার চোখে অ্যামাথেলই একমাত্র পবিত্র মহান ব্যক্তি হয়ে ধরা দিক—তাই এই তুলনামূলক অবমাননার আয়োজন।

মুহূর্তের মধ্যে ষড়যন্ত্রটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল তুয়ার মনে। প্রতিজ্ঞা করলে ষড়যন্ত্রকারীদের এমন শাস্তি সে দেবে যা মিশরের কেউ কোনোদিন বিস্মৃত হবে না। রামিসকে লাঞ্ছনা করার প্রতিফল পেতেই হবে। উত্তরজীবনে এ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়নি তুয়া।

মঞ্চে উঠে এল যুবরাজ। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো ফারাও এবং তুয়াকে। উঠে দাঁড়িয়ে পাল্টা অভিবাদন জানালেন ফারাও। তুয়াকেও দাঁড়াতে হল। বাছাই করা কয়েকটি কথায় ফারাও বললেন, কেশ এবং মিশরের মধ্যে সম্পর্ক অতি প্রাচীন এবং এ সম্পর্ক যেন আবার ফিরে আসে। প্রতিটি শব্দই কিন্তু বিশেষ অর্থবহ। যুবরাজের গালভরা কয়েকটা খেতাবও বলতে হল বক্তৃতায়।

তারপর তাকালেন তুয়ার পানে। এবার তুয়ার পালা। তাকে যা বলতে হবে অ্যামোথেল-য়ের সম্মানে, তা প্যাপিরাস রোল-য়ে লিখে পাশে রাখা আছে। প্রতিটি শব্দ তুয়ার মুখস্থ। কিন্তু সেদিকে হাত না বাড়িয়ে, এমন কি কোনো কথা উচ্চারণ না করে একজন সেবিকার কাছ থেকে একটা হাতপাখা চেয়ে নিয়ে নিজেকে বাতাস করতে লাগল আপন মনে।

বেশ খানিকটা সময় গেল এইভাবে। অগত্যা অ্যামাথেল শুরু করল তার ভাষণ। অনুষ্ঠান সূচী অনুসারে তার ভাষণ দেওয়ার কথা তুয়ার ভাষণের জবাবে—লিখিত ভাষণ বহুবার পড়ে মুখস্থ করতে হয়েছিল বেচারীকে। তুয়া কোনো ভাষণ না দেওয়ায় মুখস্থ করা ভাষণটাই তোতাপাখীর মত গড়গড় করে বলে গেল মাথামুণ্ডু না বুঝে। ফলে যখন বলল—'মহিময়ী

রাণীর সুমিষ্ট বচনে যেন যেন বৃষ্টি ঝরে পড়েছে তার হৃদয় মরুভূমিতে,—হো-হো করে হেসে উঠেই কয়েকজন সভাসদ মুখ নিচু করল হাসি গোপন করার জন্যে। পাখার ওপর দিয়ে তুয়া দেখল, মুখ টিপে হাসছে রামিসও।

রেগেমেগে উপহার সামগ্রী আনতে আদেশ দিল যুবরাজ। এল সোনা দিয়ে তৈরী পেয়ালা, হাতী এবং বিবিধ জানোয়ার। এরকম জিনিস নাকি দেদার পাওয়া যায় তার দেশে—ভারী বলে আনা যায়নি।

বিনয় বচনে ধন্যবাদ জানিয়ে ফারাও অবশ্য বললেন, মিশরও দরিদ্র দেশ নয়। যুবরাজ নিজেও আশা করি অদূর-ভবিষ্যতে তা আবিষ্কার করবেন।

এবার উপহার সামগ্রী হাজির করা হল তুয়ার সামনে। বিবিধ রত্নরাজির মধ্যে ছিল হীরে মাণিক খোদাই করা অপূর্ব সুন্দর রত্নালঙ্কার এবং কণ্ঠহার। যে হেতু মিশরের সেরা গায়িকা বলতে একজনকেই. বোঝায়—তাই তার পদতলে রাখা হল হাতীর দাঁতের ভারী সুন্দর একটা বীণা—তারগুলো সোনা দিয়ে তৈরী, সেইসঙ্গে উপহার দেওয়া হল দু'জন কৃষ্ণাঙ্গিনী গায়িকাকে।

তুয়া কিন্তু কোনো বস্তুই স্পর্শ করল না। ফারাও কানে কানে বললেন, একটা কণ্ঠহার পরে নিতে। তুয়া আস্তিকে ডেকে বললে জিনিস-গুলো দূরে সরিয়ে রাখতে, কেন না যে সুগন্ধি উপহার সামগ্রীতে ঢালা হয়েছে তা পীড়া দিচ্ছে তাকে। তাছাড়া কণ্ঠহার বেমানান হবে সাদা পোশাক আর নীল পদ্মের পাশে। শেষ মুহূর্তে কি ভেবে হাতীর দাঁতের বীণাটা রেখে দিল কাছে।

এইভাবেই ম্রিয়মান পরিবেশে শুরু হল ভোজসভা। আকণ্ঠ মদ খেল আমাথেল। রামিস পেছনে দাঁড়িয়েছিল বলে, অথবা ইচ্ছে করেই তাকে অপমান করার জন্যে যুবরাজ তাকে দিয়েই বারবার সাইপ্রাস আর আসি সুরা ঢালিয়ে নিল নিজের পানপাত্রে। তুয়া লক্ষ্য করে গেল সেই দৃশ্য। রামিস যেন কাউন্ট নয়—সামান্য একজন সুরাবাহক—ঠিক সেই ভাবে তাকে হুকুম দিয়ে যাচ্ছে যুবরাজ। মিশরের কোনো অফিসার বা কাউন্টের পক্ষে এ কাজ শোভন নয় জেনেও নিরুপায় রামিস হুকুম তামিল করছে নীরবে।

মাংসভর্তি রেকাব নিয়ে বিদায় হ'ল স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা পরিবেশিকারা। শুরু হল জাদুবিদ্যা। অনেক চমকপ্রদ খেলা দেখালো তারা। সবচেয়ে বিস্ময়কর খেলাটা অবশ্য রাণী নেতার-তুয়াকে অবলম্বন করে। ঝবহু তারই

মত সুবেশা এক সুন্দরী বেরিয়ে এল ফুলদানীর ভেতর থেকে। কপালে জলজল করছে ভোরের তারা।

আগে থেকেই ব্যবস্থা ছিল, একই ভাবে এবার ফুলদানীর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে যুবরাজ অ্যামাথেল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে নিজের জাদু-শক্তি প্রয়োগ করল জাদু সম্রাজ্ঞী আস্তি।

উচ্চরবে অ্যামাথেলকে আহ্বান করেছিল জাদুকররা। কিন্তু একী কাণ্ড! ফুলদানীর মধ্যে থেকে অবিকল একই রকম উটপাখীর শিরোভূষণ এবং সারা গায়ে রত্নখচিত স্বর্ণশৃঙ্খল জড়ানো অবস্থায় বেরিয়ে এল একটা বানর। লাফ দিয়ে মাটিতে নেমেই গলে মিলিয়ে গেল মর্কট মহাশয়!

হো-হো করে হেসে উঠেছিল কিছু দর্শক—নীরব রইল বাদবাকী। ফারাও হতচকিত হয়ে বিমূঢ়ের মত তাকালেন যুবরাজের পানে। যুবরাজ তখন সুরাপানে বেহুঁশ অবস্থায় একদৃষ্টে নেতার-তুয়ার সৌন্দর্য সুধা পানে ব্যস্ত থাকায় মজাদার এই জাদুপ্রদর্শনী দেখতে পায়নি। জাদুকররা বেগতিক দেখে সেই ফাঁকে চোঁ-চাঁ দৌড় দিলে ভোজকক্ষ ছেড়ে—কিছুতেই বুঝে উঠল না কোন্ অশুভ শক্তি প্রভাবে পূর্বব্যবস্থা বানচাল হয়ে যেতে পারে এ-ভাবে।

নেতার-তুয়া পাখার হাওয়া খেতে খেতে চেয়ে রইল ওপর পানে। কিন্তু অ্যামাথেলের প্যাটপেটে চাহনির সামনে স্থির হয়ে বসে থাকা যায় না! জাদুকররা পলায়ন করতেই সে জায়গায় গায়ক এবং নাচুনেরা এসে নৃত্যগীত শুরু করেছে। অ্যামাথেলের নির্নিমেষ চাহনি নিবদ্ধ কিন্তু তার ওপরেই। শেষকালে উপঢৌকন হিসাবে পাওয়া গায়িকা বাঁদীদুটোকে গান গেয়ে শোনাতে হুকুম দিল তুয়া। সত্যিই ভাল গলা মেয়ে দুটির। সুর চমৎকার। কথার মানে বোঝা না গেলেও মোহিত হ'ল সকলে। তুয়া তাদের পুরস্কার দিলে তৎক্ষণাৎ—'আজ থেকে তোমরা মুক্ত। এই সভায় গান গাইতে আসবে ভাড়াটে গায়িকা হিসেবে—বাঁদী হিসেবে নয়।'

উল্লসিত হ'ল দুই বাঁদী। এর মানে অতি সুস্পষ্ট। আজ থেকে গান গেয়ে তারা যা রোজগার করতে পারবে—তা সারা জীবনে বাঁদী হয়ে থেকে রোজগার করা কল্পনারও অতীত। ধরে আনা মেয়ে তারা—এত সৌভাগ্য তাদের কপালে ছিল?

অভ্যাগতরা ইঙ্গিত বুঝে সোনার আংটি এবং বিবিধ অলংকার নিক্ষেপ করল মেয়ে দুটির দিকে। তারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হল তুয়ার সামনে।

রেগে আগুনশর্মা হল কিন্তু যুবরাজ। বলল--'বিশ্বের সেরা গায়িকাদের দখলে রাখতে পারলেই কিন্তু ভাল হত।'

সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথম যুবরাজের সঙ্গে সরাসরি কথা বলল তুয়া। চোখে চোখে চেয়ে বললে—'তাই নাকি? বিশ্বের সেরা গায়িকা তাহলে কাকে বলে স্বকর্ণে শুনে যান।'

বলেই তুলে নিল হাতীর দাঁতে বাঁধানো বীণা। দ্রুত অঙ্গুলি সঞ্চালন করল সোনার তারে। সুর বেঁধে নিলে এটা-ওটা নেড়ে। চোখ রইল কিন্তু যুবরাজের ক্ষুধিত ভাঁটাচক্ষুর ওপর।

ফারাও কিন্তু বাধা দিলেন—'সেকী কথা! তুমি মিশরের রাণী। সর্ব সমক্ষে গান গাওয়া তোমাকে মানায় না।'

'কেন মানায় না? সম্মানীয় অতিথি এসেছেন আজ। তাঁর সম্মানেই এত আয়োজন—এমন কি যাঁর পূর্বপুরুষ একদা ফারাও ছিলেন এই সিংহাসনে, তিনিও স্বহস্তে সুরা ঢেলে দিচ্ছেন অতিথির শূন্য পেয়ালায়—তাহলে সম্মানীয় সেই অতিথির মনোরঞ্জনার্থে মিশরের রাণী গান গাইবে না কেন? গান ছাড়া এত উপহারের বিনিময়ে আমার তো আর কিছু দেবার নাই।'

ঘর নিস্তব্ধ। কাটা কাটা কথার অর্থ তীরের মত গিয়ে বিঁধল প্রতিটি অভ্যাগতের অন্তরে। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মণিং স্টার। বীণা তুলে নিল বুকের ওপর। মাথার মুকুটে জল জল করতে লাগল রাজসর্প 'ইউরোইউস'—ছোবল দিতে উদ্যত।

শুরু হল গান। গান তো নয়, যেন জাদুসঙ্গীত। মুহূর্তে মোহিত হল অভ্যাগতরা; এমন কি ফারাও পর্যন্ত ঝুঁকে বসলেন সিংহাসনে। আস্তে আস্তে চড়তে লাগল গলা। ভোজ কক্ষ থর থর করে কাঁপতে লাগল স্বর্গীয় সুরের ইন্দ্রজালে। আকাশের তারারাও বুঝি কেঁপে উঠল চড়া গলার আশ্চর্য সুরলহরীতে।

মর্মস্পর্শী এই বিষাদ সঙ্গীতের প্রতিটি কথা সবাই জানে। কিন্তু জানা কথাই নতুন করে জাদু করল তুয়ার প্রাণঢালা সুরের মোহে। দেবী হাথোরের একজন প্রধান পুরোহিত ঠাকরুণ ভালবেসেছিল নগণ্য এক নকলনবিসকে! কিন্তু বিয়ে করা তো সম্ভব নয়। প্রেম-পাগল নকলনবিস নিশীথরাত্রে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছিল প্রণয়িনীর সঙ্গ কামনায়। ক্রুদ্ধ দেবী তাকে বধ করেন চক্ষের নিমেষে। ঠিক সেই সময় প্রেমাস্পদকে যাতে পাওয়া যায়, এই প্রার্থনা জানাতে পুরোহিত ঠাকরুণ আসছিল দেবীর সামনে। নকলনবিসের মৃতদেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় সে। মৃত-দেহ চিনতে পারে। মারা যায় শোকে বিহ্বল হয়ে। প্রেমের দেবী হাথোরের মন গলে যায় সেই দৃশ্য দেখে। দুটি মৃতদেহের নাসিকারন্ধ্রে

ফুঁ দিয়ে তাদের সঞ্জীবিত করেন তৎক্ষণাৎ। কিন্তু পুনর্জীবিত প্রেমিক-যুগলের আর তো মর্ত্যে থাকা যায় না—পাতালে সেই থেকে আছে তারা—প্রেমপাশে বদ্ধ থাকবে অনন্তকাল।

এ গান নতুন নয়। তবুও সম্মোহিত হল প্রত্যেকে। চোখের সামনে যেন দেখতে পেল দেবী হাথোর ফুঁ দিয়ে প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছে প্রেমিক-যুগলকে। আবেগ থর-থর কণ্ঠস্বরে প্রত্যেকের মনের পটে উজ্জ্বল এই ছবিই ফুটিয়ে তুলল সুরের জাদুকরী নেতার-তুয়া। আকাশ থেকে যেন পুষ্পবৃষ্টি হ'ল। সারা ঘর যেন স্বর্গীয় পুষ্পের সৌরভে ভরে গেল। ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে মিলিয়ে গেল গানের সুর। স্তব্ধ হল জাদুকরী সঙ্গীত।

বসে পড়ল তুয়া। বীণার তার তখনো কাঁপছে থির থির করে। নীল চোখ জ্বলতে লাগল নীল তারার মত। জাদুকণ্ঠে সম্মোহিত, আবিষ্ট অভ্যাগতদের মনে পড়ে গেল—মর্নিং স্টার আমেনের মেয়ে। দেবী। দেবী-কণ্ঠের গান শোনার সৌভাগ্য হ'ল তাদের।

ফ্যাকাশে মুখে সমুজ্জ্বল নীলকান্ত চোখে তুয়া কিন্তু স্থিরভাবে চেয়ে রইল যেদিকে, সেই দিকেই বোবা বিস্ময়ে হাঁ করে তার দিকে চেয়ে বসেছিল যুবরাজ অ্যামাথেল। রাণী তার দিকে চেয়ে আছে ভেবে চোখ পাকিয়ে ভাল ভাবে তাকাতে গিয়ে মদের ঘোরেও বুঝতে পারল, রাণী তাকিয়ে আছে তার পেছন দিকে—তার দিকে নয়।

পেছন দিকে কি আছে, দেখবার জন্যে ঘাড় ফিরোতেই যুবরাজ দেখল, কাউন্ট রামিস সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে রাণীর নীলকান্ত দুই চোখের দিকে—নীল চোখের অদৃশ্য চুম্বক যেন তাকে টানছে···টানছে···টানছে! নেশার ঝোঁকেও রামিসের মুখভাব দেখে যুবরাজ বুঝে নিল ঐ আবিষ্ট চাহনির মানে কি!

এক ঝটকায় চেয়ার সরিয়ে উঠতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। হাতীর দাঁত দিয়ে বাঁধানো চেয়ারের উঁচু পৃষ্ঠদেশ ধাক্কা মারল রামিসের হাতে ধরা মদ্য-পাত্রের তলদেশে। সঙ্গে সঙ্গে পাত্র উপুড় হয়ে পড়ল যুবরাজের মাথায়—লাল সুরা লাল রক্তের মত গল্ গল্ করে ঝরে পড়ল মাথায়, উটের পালকে, জমকালো পরিচ্ছদে।

বিকট হুংকার ছেড়ে যুবরাজ হাতের পেয়ালা নিক্ষেপ করল রামিসের মুখে—'কুত্তার বাচ্চা কোথাকার! শুওর! এই তোর রাজসেবা?'

বলার সঙ্গে সঙ্গে তরবারি কোষমুক্ত করে কোপ মারল রামিসকে লক্ষ্য করে।

অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েও নিমেষ মধ্যে ফারাওয়ের দেওয়া কুমীর খোদাই হাতলওলা তরবারি কোষ মুক্ত করে একলাফে মঞ্চ থেকে নিচের নাচিয়েদের জন্যে সুরক্ষিত ফাঁকা জায়গায় নেমে পড়েছিল রামিস—নইলে দু-টুকরো হয়ে যেতে হত যুবরাজের তরবারিতে। 'কাপুরুষ কোথাকার!' বলেই পেছন পেছন তেড়ে এল যুবরাজ। পরক্ষণেই বিশাল কক্ষ মুখরিত হল তুয়ার সুরেলা সঙ্গীতে নয়—দুই অসির ঝনঝনানিতে। হতবাক অভ্যাগতরা চেয়ে রইল চিত্রার্পিতের মত। ঘটনার আকস্মিকতায় জ্ঞান হারিয়ে সিংহাসনে এলিয়ে পড়লেন ফারাও—মুদিত হ'ল তাঁর দুই চক্ষু। তুয়া কিন্তু একটি কথাও বলল না—ঈষৎ দ্বিধা বিভক্ত অধরোষ্ঠে উত্তাল বুকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল তরবারি যুদ্ধের শেষ দেখবার প্রত্যাশায়।

রামিস কিন্তু বিশ্বসংসার বিস্মৃত হল সেই মুহূর্তে। মনে রইল শুধু সৈনিকপুরুষ এবং রাজবংশীয় হয়েও মদের পেয়ালা ছুঁড়ে মারা হয়েছে তাকে, কালা নুবিয়ান যুবরাজ তাকে কুৎসিত গালাগালি দিয়েছে সর্বসমক্ষে। রক্ত ফুটে উঠল শিরাউপশিরায়, রক্তাভ আচ্ছন্ন চোখে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখল নীল তারার মত তুয়ার দুটি চোখ নিষ্পলকে তাকে যেন যুদ্ধে জয়লাভ করতে মদৎ দিচ্ছে। দেখেই মরু সিংহের মত ধেয়ে গেল অ্যামাথেলের টুঁটি লক্ষ্য করে। তরবারির কোপ কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল, শিরোভূষণের কয়েকটা পালক কেটে উড়ে গেল শূন্যে—কারণ অ্যামাথেলও বীরপুরুষ—রাগে উন্মাদ হওয়ায় আরো ভয়ংকর। তাছাড়া, তার তরবারি রামিসের তরবারির চেয়ে বেশী লম্বা হওয়ায় সুবিধেও অনেক। তাই পাল্টা কোপ এসে পড়ল আঁশওলা বর্মে, দ্বিতীয় কোপ কাঁধের বর্মে, তৃতীয় কোপ উরুর বর্মে। বর্মের আঘাতে উরু কেটে রক্ত বেরিয়ে আসতেই চেঁচিয়ে ক্যাপ্টেনকে উৎসাহ জোগালো মিশরীয় সৈন্যরা—পাল্টা চিৎকারে ইথিওপিয়ান যুবরাজকে মদৎ দিল নুবিয়ান সৈনিকরা।

সম্মিলিত রণ হুংকারে যেন জাগ্রত হল রামিস। কেটে গেল আচ্ছন্ন অবস্থা। পর-পর তিনটে বজ্রসম আঘাতের আকস্মিকতায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ছিল সে। ঐ অবস্থা থেকেই ভয়ানক আঘাত হানল যুবরাজের ষণ্ডামার্কা বপু লক্ষ্য করে—রাজবেশের তলায় পরিহিত লৌহবর্ম ভেদ করে অস্ত্র প্রবিষ্ট হ'ল ভেতরে। আবার দ্বিতীয় আঘাত হানল রামিস পলকের মধ্যে—ফিনকি দিয়ে এবার বেরিয়ে এল যুবরাজের রক্ত। পাল্টা মার থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যেই যেন হেঁট হয়ে দেহের সমস্ত শক্তি আর রণকুশলতা প্রয়োগ করে তরবারির ফলা ভীমবেগে ঢুকিয়ে দিলে যুবরাজের বক্ষ দেশে। লৌহবর্ম ভেদ

করে বৃষস্কন্ধ এফোঁড়-ওফোঁড় করে তরবারির অগ্রভাগ বেরিয়ে গেল পিঠ দিয়ে। ক্ষণেকের জন্যে টলমল করে উঠেই ধড়াস করে পেছনে পড়ে গেল অ্যামাখেল—আর নড়ল না।

ক্রুদ্ধ হুংকার ছেড়ে নুবিয়ান সৈন্যরা ধেয়ে গেল রামিসের রক্ষীবাহিনীর দিকে—পরমুহূর্তেই শুরু হয়ে গেল অসির আর বল্লমের ঝনঝনানি দুই দলের মধ্যে। সুপ্রাচীন আমল থেকে এরা ঘৃণা করে পরস্পরকে। ক্যাপ্টেন নিহত হতেই ক্রোধে উন্মাদ হয়ে নুবিয়ান দৈত্যরা যাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের ক্যাপ্টেন কিন্তু যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে—থিবসের বাছাই করা যোদ্ধাও বটে তারা। ফলে প্রলয়ংকর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল অচিরেই। তিনজন ছাড়া নিহত হ'ল সমস্ত নুবিয়ান যোদ্ধা—জীবিত তিনজন নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইতে বন্দী করা হ'ল তাদের।

এতক্ষণে চৈতন্য ফিরল রামিসের। অতিথি নিধন করার শাস্তি একটাই—মৃত্যু। রক্তাক্ত অসি হাতে—যে অসি দেখে বহুবছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তার মা—'রাজরক্ত দেখছি এই তরবারিতে'—রাজরক্ত মাখা সেই তরবারি হাতে মঞ্চে লাফিয়ে উঠে ফারাওয়ের সিংহাসনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললে—'হে ফারাও, শাস্তি দিন আমাকে—আমি অন্যায় করেছি।'

কিন্তু ফারাও তো তখন মুদিতচক্ষু এবং জ্ঞানহীন। তাই জবাব দিলেন না। তুয়ার পানে ফিরে রামিস বললে—'হে রাণী, ফারাও ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু কৃপাণ রয়েছে আপনার হাতে—দ্বিখণ্ডিত করুন আমাকে।'

এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মত নিস্পন্দ দেহে বসেছিল তুয়া। এবার যেন প্রাণ সঞ্চার ঘটল প্রস্তর প্রতিমায়। রামিস তার মহা উপকার করেছে। কৃষ্ণকায় বৃষস্কন্ধ ঐ নরাকারে দানবের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আর তো তার সঙ্গে বিয়ের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কূটনীতিতে শিক্ষিতা তুয়ার মাথায় চিন্তা ছুটে চলল বিদ্যুৎবেগে অন্য কারণে। রামিস তাকে ভয়ংকর বিবাহের সম্ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে ভয়ংকরতম দুর্যোগের সূচনা করে ফেলেছে। যাকে বধ করেছে, তার দেশ এত পরাক্রমশালী যে বহুবছর সে দেশকে ঘাঁটাতে চায়নি মিশর। অনেক মরুভূমি, অনেক দুর্গমপথ পেরিয়ে মিশরের প্রত্যন্ত প্রদেশের স্বাধীন, ধনরত্নপূর্ণ এবং বলবান এই দেশের রাজার শক্তিও কম নয়। তাদেরই যুবরাজকে মিশরের ভোজকক্ষে সসৈন্যে নিধন করার পরিণাম হবে অতি ভয়ংকর। এই দুর্গতির সূচনা যে করেছে, তার শাস্তি একটাই—মৃত্যু। রামিস নিজেও তা বুঝে মৃত্যুদণ্ডই যাচ্ঞা করেছে তুয়ার কাছে।

তুয়া এখন কি করবে? হেঁট হয়ে তাকিয়ে দেখল পায়ের কাছে রক্ত মস্তকে বসে আছে তার প্রিয় বান্ধব। বুকটা টন-টন করে উঠল তুয়ার। রামিসকে এই মহাবিপদ থেকে বাঁচাতেই হবে। ক্ষণেকের জন্যে বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন হয়ে গেলেও অমানিশাভরা অন্তরের অন্দরে সহসা ঝলকিত হল সর্পিল পরিকল্পনার বিদ্যুৎরেখা। বিলম্ব না করে অভ্যাসমত তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হল তুয়া। মাথা তুলে হুকুম দিল, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হোক এখুনি—কেউ যেন আর ঢুকতে বা বেরোতে না পারে। তলব করল রাজবৈদ্যদের। সুচিকিৎসা হোক আহত এবং ফারাওয়ের। অমাত্য এবং উপদেষ্টাদের জড়ো করল সামনে এবং ধীর স্থির শান্ত শীতল কণ্ঠে বললে:

'সুধীবৃন্দ! প্রজাবৃন্দ! ঈশ্বরের ইচ্ছায় এইমাত্র একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হল সমগ্র মিশর। মিশরের ফারাওয়ের সামনে নিহত হলেন মিশরের অতিথি এবং তাঁর সৈনিকবৃন্দ। এই হত্যাকাণ্ড যে বিশ্বাসঘাতকতার দরুন, অচিরেই তা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়বে দেশে দেশে। কিন্তু আমি জানি, আপনারাও জানেন—এর পেছনে বিশ্বাসঘাতকতা নেই—আছে নিছক একটা দুর্ঘটনা। যুবরাজ তাঁর স্বদেশের রীতি অনুযায়ী মদ্যপানে উন্মত্ত হয়ে কুৎসিত গালাগাল দিয়েছিলেন ফারাওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী কাউন্ট রামিসকে—তাঁকে বধ করতেও গিয়েছিলেন, তাঁকে দিয়ে মদের পেয়ালায় মদও ঢালিয়েছেন। আপনারা সবাই তা দেখেছেন—ঠিক কিনা?'

একবাক্যে সায় দিল উপদেষ্টা এবং শ্রোতারা।

'তাতেও ক্ষান্ত হন নি যুবরাজ। বধ করতে গিয়েছিলেন লাঞ্ছিত কাউন্ট রামিসকে। কিন্তু আত্মরক্ষার অধিকারে রুখে দাঁড়ান এই অফিসারটি এবং যুদ্ধবিদ্যায় অধিকতর কুশলতার দরুন তাঁকে বধ করেন। তাঁর সৈন্যরা মিশরের সৈন্যদের আক্রমণ করেও নিহত হয়েছে একই কারণে—মাত্র তিনজন ছাড়া, আমি কি সত্যি বলছি?'

একজন মুখপাত্র বললেন—'ঠিকই বলেছেন। কোনো দোষ নেই রামিস এবং রাজরক্ষীদের।' সায় দিল বাকী সবাই।

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল তুয়ার আত্মবিশ্বাস—'সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে স্বয়ং ফারাও অচৈতন্য হয়ে পড়ায়। এ অবস্থায় সঠিক নির্দেশ দিতে তিনি অক্ষম। কিন্তু আমি সম্রাজ্ঞী রূপে স্বাভিষিক্ত হতে পারি এই ধরনের গুরুতর এবং জরুরী পরিস্থিতিতে। দেরী করা আর সমীচীন হবে না। বলুন আপনারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি এখন আমি সমস্ত দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি কিনা।'

প্রধান মন্ত্রী বললে—'নিশ্চয় পারেন। আইনের সম্মতি আছে এ ব্যবস্থায়।'

তুয়া বললে—তাহলে এখন সমস্যার সমাধান নিয়ে চিন্তা করা যাক। আপনাদের সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে চাই, কাউন্ট রামিস এবং তাঁর রক্ষীরা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন এবং এঁদের এখুনি বধ করা উচিত। যদিও কাউন্ট রামিস যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হয়েছেন—কিন্তু ফারাওয়ের সম্মানীয় অতিথিকে বধ করার শাস্তি স্বরূপ তাঁর প্রাণ যাবে।'

বিরতি দিয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল তুয়া। কারো মুখে কথা নেই। একজন শুধু বিড়বিড় করে বললে—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত।' কিন্তু মনে মনে সবাই রামিসের কাজ সমর্থন করছে। নুবিয়ানদের অন্তর থেকে ঘৃণা করে এসেছে মিশরীয়রা বাপঠাকুর্দার আমল থেকে। মোক্ষম জবাব দিয়েছে রামিস তাদেরই যুবরাজকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নিহত করে। এর মধ্যে দোষটা কোথায়? সুতরাং বচসা আরম্ভ হয়ে গেল অভ্যাগতদের মধ্যে এই নিয়ে।

ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে ফারাওয়ের অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলল তুয়া। হাজার হোক বাবা তো। চিকিৎসকরা মাথায় জলপটি দিচ্ছে, ভিজে কাপড়ে মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে—কিন্তু ঘুম আর ভাঙছে না তাঁর।

ভিজে চোখে ফিরে এসে তুয়া বললে—'শুনুন সবাই। ফারাও গুরুতর অসুস্থ। শয়তান সেৎ তাঁকে গ্রাস করতে চলেছে। আপনারা সবাই মানবেন নিশ্চয়, তাঁর এই অবস্থার জন্যে দায়ী আমন্ত্রিত যুবরাজ আমাথেল। যা কোনো রাজন্যের পক্ষে শোভা পায় না, ওঁর সেই অসদাচরণের ফলেই এত গোলমালের সূত্রপাত।'

একমত হল শ্রোতারা। কটমট করে চাইল জীবিত তিন নুবিয়ান রক্ষীর দিকে।

তুয়া বললে—'শোকে বিহ্বল হলে চলবে না এখন, কর্তব্য করে যেতে হবে। আগেই বলেছি, এখনো বলছি, কাউন্ট রামিস এবং তাঁর রক্ষীদের মরতেই হবে এবং সে মরণ হবে রাজঅতিথি নিধনের শাস্তি স্বরূপ যে মরণ মানায়—সেই মরণ।'

সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা নেমে এল বিশাল কক্ষে। এমন কি সেবা স্থগিত রেখে রাজবৈদ্যরা পর্যন্ত মুখ তুলে চাইল মিশরের প্রধান বিচারপতির মুখে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা শুনতে।

তুয়া বললে—'মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার আগে আপনাদের সামনে একটা কথা ব • রাখি। আপনাদের পরামর্শ চাই এ ব্যাপারে। দেবতার পথ-

নির্দেশ এসেছে আমার মনের মধ্যে। তিনি বলছেন, কাউন্ট রামিসকে রক্ষীবৃন্দসমেত নিধন করার পর কিন্তু এমন ঘটনাও হতে পারে যে নৃপতি সুকৌশলে রাজ অতিথিদের বধ করার পর অপরাধ চাপা দেওয়ার জন্যে বধ করেছেন ঘাতকদেরও। যুবরাজ আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন কি আশা নিয়ে, মেয়ে হয়ে আমার মুখে আর নাই বা প্রকাশ করলাম। কিন্তু বিচার করে দেখুন, পাইকারী হত্যার শাস্তিস্বরূপ আর এক প্রস্থ পাইকারী হত্যার আয়োজন করে স্বদেশ প্রেমিক মহাবীর এই যোদ্ধাদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে মিশরের ইতিহাসে চিরকাল চিহ্নিত করে রাখা উচিত হবে কি না।'

সত্যিই তো। এ সম্ভাবনা কারো মাথায় আসেনি। গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকজন মহিলা বীরপুরুষদের এহেন পরিণতি কল্পনা করে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

মিনতি মাখানো সুরে তুয়া এবার বললে—'আমরা অন্য পথও নিতে পারি। উপযুক্ত রক্ষীবাহিনী সঙ্গে নিয়ে কাউন্ট রামিস নাপাতা গিয়ে মহারাজের সমীপে যুবরাজের আকস্মিক খবর নিবেদন করলে কেমন হয়? সাক্ষীসাবুদ নিয়ে যাবেন তিনি—মৃত্যুটা যে নিছক দুর্ঘটনাপ্রসূত, তা প্রমাণ করে দেবেন? সেইসঙ্গে আমরা চিঠি দেব কেশ-য়ের মহারাজাকে—'যাদের হাতে যুবরাজ নিহত হয়েছেন রক্ষীবৃন্দসহ, আপনার কাছেই তাদের পাঠালাম বিচারের জন্য। বিচারে যে দণ্ডাজ্ঞা দিতে চান—দিন। দণ্ড দেব আমরা —মিশরে।' যার পুত্র নিহত হয়েছেন, তিনি নিজে যদি ঘাতককে বিচার করার সুযোগ পান, তাহলে তাঁর রোষবহ্নি থেকে মিশর রেহাই পেয়ে যাবে না? সুধীবৃন্দ! প্রজাবৃন্দ! আপনারা ভেবে দেখুন এই পরিকল্পনার সারবত্তা আদৌ আছে কিনা।'

একবাক্যে সোল্লাসে সবাই বললে এর চাইতে ভালো মতলব আর হয় না। বিদেহী সহায় তাঁর ওপর ভর না করলে এমন সুচতুর মতলব কি মাথা থেকে বেরোয়? উল্লসিত হল জীবিত নুবিয়ান রক্ষীরাও। নীরব রইল কেবল রামিস—সিংহাসনের সামনে জানু পেতে নতমস্তকে বসে রইল আগের মতই।

ভুরু কুঁচকে গেল কিন্তু তুয়ার। কৃপাণ শূন্যে তুলে বললে কঠোর কণ্ঠে—'তাহলে আপনাদের সবার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আসুক একজন লিপিকার এখুনি। লিখে ফেলা হোক আমার আদেশ। আমি, মিশরের সম্রাজ্ঞী নেত্তার-তুয়া, জনগণের নির্দেশে এই আদেশ দিচ্ছি, অবিলম্বে দু-হাজার বাছাই করা সৈন্য নীলনদে জাহাজ ভাসিয়ে রওনা হোক নাপাতা অভিমুখে—

গুপ্তচরকারীদের যাবতীয় রটনা বন্ধ করার জন্যে সরে যাক কুকর্মের হোতা কাউন্ট রামিস তাঁর কুকর্মের সমস্ত সঙ্গী নিয়ে।'

এ তো শাস্তি নয়—পদোন্নতি। এমন কি রামিসও হতভম্ব হয়ে মুখ তুলে চাইল তুয়ার পানে।

ঝটিতি বললে তুয়া—'আমি আদেশ দিচ্ছি কেশ-য়ের মহারাজার সামনে পৌঁছে নতজানু হয়ে যেন সুবিচার প্রার্থনা করেন কাউন্ট রামিস এবং দণ্ডাজ্ঞা মাথা পেতে নিয়ে ফিরে আসেন এই সভায় দণ্ড কার্যকর করার জন্যে। আমি আদেশ দিচ্ছি, আজ রাতেই যেন জাহাজ তৈরী থাকে—যাতে কাল ভোরেই রওনা হওয়া যায়। ইতিমধ্যে আমাদের রোষের নিদর্শন স্বরূপ রক্ষীবৃন্দ সহ কাউন্ট রামিস নির্বাসিত হোক এই সভাকক্ষ থেকে—রওনা হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা প্রহরাধীন থাকবেন।'

নকলনবিস তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলল আদেশ। অনুলিপি তৈরী হল অনেকগুলো। তলায় সই দিল রাণী তুয়া। মিশরের সমস্ত গভর্নরের কাছে অনুলিপি পাঠানোর ব্যবস্থা হল তক্ষুনি। কেশ-য়ের অনুলিপি নিয়ে যাবে রাজদূত, সঙ্গে যাবে শোকবার্তা এবং যুবরাজের মৃতদেহ।

সব কাজ শেষ হলে খুলে দেওয়া হল দ্বার। রামিস আর রক্ষীদের নিয়ে যাওয়া হল প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায়। ফারাও তখনো অচেতন, নিঃশ্বাস পড়ছে মৃদু মৃদু। তাঁকে পাঠানো হল শয়নকক্ষে। তুয়া এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে নিজে থেকে হেঁটে সভাত্যাগ করতে পারল না—ধাত্রী মাতা আস্তির কাঁধে ভর দিয়ে ফিরে এল আপনকক্ষে।

(৬) রামিশ আর তুয়ার শপথগ্রহণ

রাণীবেশ পরেই কোচে শুয়ে পড়ল তুয়া—শয্যাগ্রহণের চেষ্টা করল না। পাশেই গম্ভীরমুখে কর্ত্রীঠাকরুণের মত দাঁড়িয়ে রইলেন আস্তি।

বললেন প্রশান্ত কণ্ঠে—'আজ বড় অদ্ভুত কাণ্ড করে এলে মহারাণী।'

আস্তির চোখে চোখে চেয়ে তুয়া জবাব দিল—'হ্যাঁ ধাইমা, খুবই অদ্ভুত। ফারাও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়তেই ভাগ্যের সুতো এসে পড়ল আমার হাতে। বরাবর ইচ্ছে ছিল, সুতো টেনে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার। সে সুযোগ আজ হাতে পেয়েই টান মেরেছি সুতোয়।'

'বড় জোরে টানা হয়ে গেল যে।'

'নইলে বধ্যভূমি থেকে তোমার পুত্রকে বাঁচানো যেত না—সম্মানের মঞ্চে তুলে দেওয়া যেত না। করলাম আমিই—কিন্তু সবাই ভাবল তাদের

ইচ্ছাতেই হল। আমিই করিয়ে নিলাম।'

'মহারাণী অতিশয় চতুরা। বাড়াবাড়ি না করে ফেললে অনেক উর্ধ্বে উঠবে।'

'তোমার চাইতে বেশী চতুরা নয়। ফুলদানীর মধ্যে থেকে যে ভাবে বাঁদরটাকে বার করলে। থাক থাক, মুখখানা নিরীহ করার দরকার নেই। কাণ্ডটা যে তোমার, তা আমি তখনি বুঝেছি। জাদুশক্তি যেন আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। কি করে করলে আন্তি?'

'আগে বলো ঘর ভর্তি লোককে কি করে রাজী করালে দু-হাজার সৈন্য-সমেত কেশ রাজ্যে রামিসকে পাঠাতে? রামিসকে আমি চিনি। এর মানেই কিন্তু কেশ-য়ের সঙ্গে মিশরের লড়াই। যদি বলো কৌশলটা, তাহলে আমিও বলব বাঁদর বার করার মন্ত্রগুপ্তি।'

'তাহলে আর শেখা হল না আমার। কেন না, বুদ্ধিটা হঠাৎ মাথায় এসে গেল—ঠিক যে ভাবে সঙ্গীত আসে কণ্ঠে। রামিস তো ইচ্ছে করে মাথায় মদ ঢেলে দেয় নি—'

'না, ইচ্ছে করে দেয়নি। তা সত্ত্বেও ওর ওপর তোমার দুর্বলতা না থাকলে বিনা অপরাধেই অবশ্য শিরশ্ছেদ—'

ঝটিতি কথা ঘুরিয়ে দিল তুয়া—'এক পেয়ালা সুরা এনে দেবে? কালো অ্যামাথেল এমন সুরাপান আরম্ভ করে দিল যে আমার আর খেতে ইচ্ছে হয়নি। বড্ড ক্লান্ত। দাও না এক কাপ।'

আঙুর পাতা জড়ানো সুরাপাত্রকে থেকে পেয়ালায় সুরা ঢেলে নিয়ে এলেন আন্তি

পেয়ালা হাতে নিয়ে উঁচু করে তুলে ধরল তুয়া। বলল উদাত্ত স্বরে—'অসিরিসের দরবারে এখন যিনি মদ্যপানে মত্ত—সেই কালো যুবরাজের স্মৃতির উদ্দেশে এবং যে বীরপুরুষ তাকে সেই দরবারে পাঠিয়েছে—তার শুভকামনায়—'

বলেই এক চুমুকে পেয়ালা নিঃশেষ করে মেঝের ওপর নিক্ষেপ করল তুয়া। খান খান্ হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে গেল মহার্ঘ পানপাত্র।

প্রশান্ত স্বরে বললেন আন্তি - মহারাণীর আজ হয়েছে কী?'

শক্তি জাগ্রত হয়েছে। চলো, ফারাওকে দেখে আসি।'

ফারাও তখন চোখ মেলেছেন, কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। কাউকে চিনতেও পারছেন না। তুয়া জিজ্ঞেস করল চিকিৎসকদের, প্রাণে বাঁচবেন কিনা ফারাও। হ্যাঁ, বাঁচবেন, বললে চিকিৎসকরা। তবে দীর্ঘকাল শুয়ে

থাকতে হবে। উত্তেজনার কারণ ঘটলেই পূর্বাবস্থা ফিরে আসবে—পরিণামে আসবে মৃত্যু।

বাবাকে চুম্বন করে নিজের ঘরে ফিরে এল তুয়া।

'মহারাণী কি শুতে যাবে না?' শুধোলেন আন্তি।

'না। ফারাওয়ের দায়িত্ব যার কাঁধে পড়েছে, তার অনেক কাজ এখনো বাকী। মারমিসকে ডেকে আনো।'

মারমিস এসে দাঁড়ালেন তুয়ার সামনে। উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ, ম্রিয়মান। রামিসের মুখের আদল মুখে সুস্পষ্ট। মাথার চুল সাদা হয়ে এসেছে বয়সের ভারে।

স্নিগ্ধকণ্ঠে তুয়া বললে—'মনে সাহস রাখুন। ফারাও এখনো বাঁচবেন।'

'মারা গেলে তাঁর রক্তের দাগ পড়ত আমার বংশে।'

'না। দাগ পড়ত দেবতার হাতে। তাঁর ইচ্ছাতেই এ ঘটনা ঘটেছে। রামিস নিমিত্তমাত্র। মোটকা যুবরাজের পদলেহন করে প্রাণভিক্ষা চাইলে কি আপনি খুশী হতেন?'

'তা ঠিক। ধরো, যদি তাই হতো, কি করতে?'

'তাহলে মিশর মহাবিপদে পড়ত না। কিন্তু নারী হিসাবে, তাঁর বাল্য-বন্ধু হিসাবে জীবনে আর তার মুখদর্শন করতাম না। প্রাণের চাইতে সম্মান বড়।'

কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে মুখভাব গোপন করে মারমিস বললেন—'হ্যাঁ, প্রাণের চাইতে সম্মান বড়। রামিস এখন সেই পথেরই পথিক। কিন্তু, কিছু মনে করো না মহারাণী, ফারাও সুস্থ হয়ে ওঠার পর—'

'ততদিনে রামিস অনেকদূরে। যান, এখুনি তাকে ডেকে আনুন। প্রধানমন্ত্রী আর নকলনবিসকেও আসতে বলুন। আমার এই আংটি নিয়ে যান—সব দরজা খুলে যাবে।'

'এত রাতে?'

ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল তুয়ার—'আমার আদেশ কি শুনতে পান নি? মিশর যখন বিপদগ্রস্ত, আমি তখন ঘুমোই না।'

মাথা নুইয়ে বিদায় নিলেন মারমিস। আন্তিকে দিয়ে মাথার চুল পরিপাটি করে নিল তুয়া। রাণীবেশ ত্যাগ করে পরল অন্য পরিচ্ছেদ। বেছে বেছে এমন সব অলংকার ধারণ করল যা পরলে তাকে আরো ভালো দেখায়—কারণটা কিন্তু ব্যক্ত করল না। তারপরে গিয়ে বসল দর্শক-কক্ষে।

অচিরেই হাই তুলতে তুলতে এল বিস্মিত চক্ষু প্রধানমন্ত্রী এবং নকল-

নবিস। পেছনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকল রামিস। তার চোখেও অপরি-সীম বিস্ময়।

রাণী সম্ভাষণ শোনার অপেক্ষা না করে প্রথমেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুয়া জানতে চাইল তার আদেশ মত কাজকর্ম ঠিক এগোচ্ছে কিনা। প্রধানমন্ত্রী জানালে, হাঁ, আয়োজন সেইভাবেই হচ্ছে। তুয়া তখন বিস্তারিতভাবে আদেশ দিলে জাহাজে কি ধরনের সৈন্য এবং রসদ যাবে। পথিমধ্যে যে সব ক্যাপ্টেন আর ব্যারনরা ঘাঁটি আগলে রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের নামে পৃথক আদেশনামা লেখবার হুকুম দিল এরপর—কাউন্ট রামিস যাচ্ছেন—তাঁরা যেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রস্তুত থাকেন। সবশেষে দু হাজার সৈন্যের সর্বময় কর্তা করে দেওয়া হল কাউন্ট রামিসকে।

সবকটা আদেশনামা লেখা হয়ে যাওয়ার পর নকলনবিসকে সারারাত জেগে অনুলিপি প্রণয়নের হুকুম দিয়ে বিদেয় করল তুয়া—ভোরবেলাই যেন তার সামনে আনা হয় দস্তখৎ করার জন্যে। তারপর রামিসকে উদ্দেশ করে বললে, মিশরের সীমান্তে তাকেনসিৎ দুর্গে গিয়ে যেন অপেক্ষা করে অন্যান্য সৈন্যসামন্ত, কেশ নৃপতির জন্য তুয়ার উপঢৌকন এবং মৃত যুবরাজের মমী-দেহ না পৌঁছানো পর্যন্ত।

নীরব হল তুয়া। বসে রইল মাথা হেঁট করে। যেন চিন্তিত এবং দ্বিধা গ্রস্ত। কাজ শেষ হয়েছে বুঝে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে পায়ে পায়ে পেছন হেঁটে সবাই যখন দরজার দিকে এগোচ্ছে হঠাৎ যেন মনস্থির হয়ে গেল তুয়ার।

বললে—'কাউন্ট রামিস, কথা আছে, তুমি একা থাকো—আর সবাই একটু বাইরে অপেক্ষা করুন। মারমিস, আস্তি—কেউ যেন আমাদের কথা আড়ি পেতে না শোনে। একটু পরেই ফের ডেকে পাঠাবো।'

দ্বিধায় পড়লেন আদিষ্ট ব্যক্তিরা। এ যে বড় অদ্ভুত ব্যাপার! কিন্তু তুয়ার চাহনি দেখে দ্বিরুক্তি না করে পেছন হেঁটে নিষ্ক্রান্ত হল কক্ষ থেকে।

ঘরে আর কেউ নেই—রামিস আর তুয়া ছাড়া। অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল তুয়া। তারপর মাথা তুলে বললে—'ছেলেবেলায় অনেক খেলা করেছি দুজনে। তারপর আর দেখা হয়নি।'

'হবে কি করে? তুমি মহারাণী, আমি একজন সামান্য সৈনিক। রাণীর সঙ্গে মেলামেশা আমার পক্ষে কি শোভন?'

'আশা করতে বাধা তো নেই।'

'মহারাণী, কেন এই রঙ্গ আমাকে নিয়ে?'

'আমেনের নাম করে বলছি, তোমাকে নিয়ে রঙ্গ করছি না। আমার মন কিন্তু চাইছে ছেলেবেলার মতই আবার দুজনে পাশাপাশি থাকি।'

'মহারাণী, কূটনীতি তুমি ভালই শিখেছো—'

'তুমিও শিখেছো যুদ্ধবিদ্যা—আজকের তরবারি-যুদ্ধই তার প্রমাণ।'

'আমার জীবন তুমি বাঁচিয়েছো—'

'আমারও জীবন তুমি বাঁচিয়েছো। কুমীরের চাইতেও ভয়ানক রাক্ষস আজ মরেছে তোমার হাতে।'

'ঐ সম্ভাবনাটা আঁচ করেই তো পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। নইলে ওকে শুধু আছাড় মেরেই আজ ছেড়ে দিতাম। আর কোনো মেয়েকে খেতে আসবে নররূপী ঐ কুমীর।'

'তা আর আসবে না,' চিবুক চুলকে বললে তুয়া। 'সেৎ এখন খাক কুমীরটাকে। কিন্তু ফারাও জ্ঞান ফিরে পেয়ে রাগবেন।'

'তাহলে কি দু-হাজার সৈন্যের সেনাপতি বানিয়েছো পথেই আমাকে নিধন করার জন্যে?'

'সে কাজ যে করবে, তার পরিণাম হবে ভয়ংকর।' হেঁট হল তুয়া। ফিসফিস করে বললে—'শোনো রামিস, কেশ রাজ্যে মিশরের চর আছে। তাদের প্রতিবেদন আমি পড়েছি। রাজবংশীয় প্রতিটি মানুষ দাম্ভিক, অত্যাচারী আর মদ্যাসক্ত—যুবরাজ আমাথেলের মত—জনগণ তাদের ঘৃণা করে। এই পরিস্থিতিতে তুমি গিয়ে যা ভাল মনে করবে—তাই করবে। মনে রেখো, আমাথেলের বংশ আজ না থাকলে, তুমিই কেশ-এর সিংহাসনে বসতে, এবং আমি এই সিংহাসনে না বসলে, ফারাও তুমিই হতে।'

কিছুক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা তুলে রামিস বললে—'কি করতে হবে বলো।'

'তোমার জায়গায় আমি থাকলে যা করতাম, তাই করবে,' কড়িকাঠ নিরীক্ষণ করতে করতে বললে তুয়া—'একটা জিনিস কখনোই করতাম না। দণ্ডাজ্ঞা মাথায় নিয়ে মিশরে ফিরে আসতাম না। দণ্ডাজ্ঞা কি হবে, তা এখানে বসেই অনুমান করা যাচ্ছে। এমন ভাবে ফিরে আসতাম যাতে উপযুক্ত অভ্যর্থনা পাই। শুধু যে নাপাতায় থেকে যেতাম তা নয়—সেখানকার শাসনভার হাতে নিতাম, সে দেশের ধনরত্ন আবার মিশরে ফিরিয়ে আনতাম। ফলে, মিশর আমাকে ক্ষমা করত।'

'বুঝলাম। যাই ঘটুক না কেন, দোষের ভাগী হব কেবল আমি।'

'আমাদের এই কথার সাক্ষী কিন্তু কেউ রইল না। কূটনীতি নিয়ে

তুমিও তো অবসর সময়ে পড়াশুনা করেছো ?

চোখে চোখে চেয়ে রইল দুজনে। মৃদু হাসি ফুটল রামিসের ঠোঁটে। বলল—'তুমি ক্লান্ত। আমি চলি।'

'আমার চাইতেও বেশী ক্লান্ত তুমি। তোমার ক্ষতে এখনো ওষুধ পড়েনি।'

'তা হবে। আজ যা ঘটল, এর পরিণামে কিন্তু আমার মৃত্যু হওয়া উচিত। মহারাণী, তোমার কা কি বলে ?'

'ছেলেবেলার পর থেকে কা আর দেখা দেয়নি আমাকে। তোমার মা-ও তোমার সম্বন্ধে কোনো কথা বলে না আমাকে, খালি সাবধান করে—যেন পক্ষপাত না দেখাই—গুমখুন হয়ে যেতে পারো। কিন্তু এত মরবার সাধ কেন তোমার ? আমার খপ্পর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ?'

দুহাতে কণ্ঠনালী টিপে ধরল রামিস আত্যন্তিক আবেগে। বললে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে—'তুয়া, ক্ষণেকের জন্যেও নিজেকে মহারাণী রূপে না ভেবে সামান্যা মানবী ভাবতে পারো না ? তাহলে একটা গুপ্ত কথা বলতাম।'

'ছেলেবেলায় অনেক গুপ্ত কথাই বলাবলি করেছি দুজনে। যা বলবার সংক্ষেপে বলো। মনে রেখো আর আমাদের দেখা হবে না।'

'রাণী নেভার-তুয়া, তোমাকে ভালবাসবার দুঃসাহস আমার হয়েছে।'

'লক্ষ প্রজা ভালবাসে আমাকে।'

'পুরুষ আর নারীর ভালবাসার কথা বলছি—রাণীকে প্রজাদের ভালবাসার কথা বলছি না।'

ভাঙা গলায় নতুন স্বরে বললে তুয়া—'তাই বলো, একজন নারীকে যদি একজন পুরুষ ভালবাসে তো রাগ করতে যাবো কেন ? চাষীর ঘরেও নারী থাকে, রাণীরূপেও নারী থাকে। ধন্যবাদ রামিস, তোমার ভালবাসার জন্যে।'

'কিন্তু ভালবাসার বিনিময়ে যদি ভালবাসা না পাওয়া যায়, সে ভালবাসার কোনো মানে আছে কী ? মিশরের মহারাণী, আমার পরিণাম কি হবে বলতে পারো ?'

সমস্যাটা যেন খুবই জটিল, এমনি ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রইল তুয়া।

তারপর বললে গলা নামিয়ে—'বলা মুস্কিল। প্রাণ যেতে পারে, অথবা মিশরের ফারাও হয়ে যেতেও পারে। সবটাই নির্ভর করছে বিশেষ সেই পুরুষটির ওপর মহারাণীর মনোভাব কি রকম—তার ওপর।'

সন্ধ্যাসমীরণে বৃক্ষপত্রের মত শিহরিত হল রামিস। নির্নিমেষে চেয়ে

রইল তুয়ার উজ্জ্বল নীল দুই চক্ষুর দিকে।

বললে গাঢ় স্বরে—'তুয়া, তুমি কি গ্রহণ করছো আমার ভালবাসা, না প্রত্যাখ্যান করে নিক্ষেপ করছো লাঞ্ছনা আর মৃত্যুর গহ্বরে?'

জবাব দিল না তুয়া। ধীরে সুস্থে কৃপাণ নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে দিল রামিসের পানে।

বললে কানে কানে—'মৃত্যু যদি আসে, লাঞ্ছনা যদি কপালে লেখা থাকে থাকুক—দুজনে তা ভাগ করে নেবো। রামিস আমি গ্রহণ করছি তোমার ভালবাসা। পারবে এই মরণ খেলা খেলতে?'

'জিজ্ঞেস করছো কেন? চেনো না আমাকে?'

রামিসের অধর চুম্বন করল তুয়া, মন প্রান যৌবন মিশে গেল সেই চুম্বনে। তারপর আলতো করে তফাতে সরিয়ে দিল রামিসকে।

বললে—'শোনো রামিস, একই মায়ের বুকের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছি। হতে পারি আমি মহারাণী তবুও আমি নারী। নারী হয়ে যখন ভালবেসেছি তোমায়—মহারাণী হয়েও বাসব। এতে কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু মহারাণীর প্রেমাস্পদকে শেষ পর্যন্ত যে-সিংহাসনে বসতে হয়—সেটা কিন্তু ফারাওয়ের সিংহাসন।'

'আমি চাই নারীর ভালবাসা—ফারাওয়ের সিংহাসনে প্রয়োজন নেই।'

'নারী যখন মহারাণী, তখন তার ভালবাসা পেলে ফারাওয়ের সিংহাসনও এসে যায়। কিন্তু যদি আমার কপালে অনেক দুর্গতি লেখা থাকে, যদি সিংহাসন হারাই, পথে পথে ঘুরে বেড়াই, তখন সিংহাসনে বসেও কি আমাকে ভালবাসবে?'

রেগে গেল রামিস—'কি ছেলেমানুষের মত কথা বলছো? এ সব কথা আসছে কি করে? তাছাড়া, আমিই বা কোন্ সিংহাসনে বসতে যাবো?'

পালটে গেল তুয়ার মুখচ্ছবি—'মৃত্যুমুখ থেকে তোমাকে ফিরিয়ে এনেও এত বিপদের মুখে তোমাকে কেন ঠেলে দিচ্ছি বুঝতে পারছো না? এখানে তোমার শত্রু অনেক। অতিথি নিধনের শাস্তি স্বরূপ তোমার প্রাণদণ্ড হয়ে যেত এতক্ষণে—ফারাও জ্ঞান ফিরে পেয়ে নিশ্চয় সেই আদেশই দেবেন।'

জানি।'

'তাহলে জাগো, রামিস। দু-হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো কেশ নৃপতির ওপর। আরো সৈন্য পাবে যাওয়ার পথে। দখল করো দুর্বল রাজার সিংহাসন। তোমার কিন্তু দাবী আছে ঐ সিংহাসনে। মুকুট কেড়ে নিয়ে ধারণ করো শিরে। তারপর কেশ-য়ের রাজা হয়ে পাণিপ্রার্থী হও

মিশরের মহারাণীর। কেউ আর তখন না বলবে না—মিশরের প্রতিটি মানুষ চায় ফিরে আসুক দক্ষিণ ভূমির ধনরত্ন।'

যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল তুয়ার চোখে মুখে, চোখ ধাঁধিয়ে গেল যেন রামিসের। মাথা হেঁট করল ক্ষণেকের জন্য। পরক্ষণেই সিধে হয়ে বললে সেই দৃপ্ত স্বরে যে স্বরে একজন রাজা কথা বলে আর একজন রাজার সঙ্গে।

'মহারাণী, তোমার গায়ে রাজরক্ত আছে, আমার গায়েও রাজরক্ত আছে। হয়তো আমার রাজরক্ত তোমার চাইতেও একটু বেশী প্রাচীন। কিন্তু রাজরক্তের দাবীতেই দখল করব কেশ-য়ের সিংহাসন—করব শুধু তোমাকে পাওয়ার জন্যে, আর কোনো প্রত্যাশা নিয়ে নয়। তবে একটা কথা দিতে হবে তোমাকে। আর হয়ত আমাদের দেখা হবে না। অনেক ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে হয়ত আমাদের দুজনকেই যেতে হবে। কিন্তু কথা দাও, আমি ছাড়া আর কাউকে কোনো অবস্থাতেই পতিত্বে বরণ করবে না।'

'কথা দিলাম। যদি শোনো আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি, থুথু ছিটিও আমার নামে। কিন্তু আর নয়। চুক্তিবদ্ধ হলাম দুজনে গ্রহ-নক্ষত্র সাক্ষী রেখে—এসো, স্বাক্ষর, দাও তাতে।'

উঠে দাঁড়িয়ে কৃপাণ এগিয়ে দিল তুয়া। অনুগত প্রজার মত কৃপাণ চুম্বন করল রামিস। পরমুহূর্তে তুয়া ঝটিতি মাথা থেকে উদ্যতফণা সর্প-মূর্তি খোদিত মুকুট খুলে নিয়ে পরিয়ে দিল রামিসের মাথায়। তুয়ার রাজা হয়ে গেল রামিস। মিশরের মহারাণী নতজানু হয়ে বসল আপন রাজার পদতলে। তারপর কৃপাণ আর মুকুট দুটোই নিক্ষেপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল রামিসের বুকে—যেভাবে সব নারী আশ্রয় নেয় পরম প্রিয় পুরুষের বুকে। ঠিক সেই সময়ে ভোরের সূর্যকিরণ পূবের জানালা দিয়ে এসে পড়ল যুগল মূর্তির ওপর। যেন অগ্নিময় বিবাহ পরিচ্ছদে আবৃত হল দুটি মূর্তি।

অন্তে পৌঁছালো মিলন মুহূর্ত। আলোকিত আসনে স্থির হয়ে বসে তুয়া দেখলে বাইরের ছায়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে রামিস। হয়ত আর তাদের দেখা হবে না ইহজীবনে। আনন্দ টলমলে হৃদয় তাই সহসা শংকিত হল অজানা ভবিষ্যতের কল্পনায়।

(৭) মেমফিসে গেল তুয়া

সৈন্যসামন্ত এবং জাহাজ ইত্যাদি দ্রুত সংগ্রহ করে নিয়ে সেইদিনই রওনা হল রামিস। সীমান্তে গিয়ে অপেক্ষা করল দ্রুত মামীকৃত যুবরাজের দেহ এবং অন্যান্য সৈন্য না পৌঁছোনো পর্যন্ত। তারপর রওনা হল দক্ষিণ দেশ

অভিমুখে। পাছে থিব্‌স্ শহরে ফিরে আসার হুকুম এসে পৌঁছোয়, এইভয়ে একদণ্ডও তর সইছিল না তার। এ ছাড়াও ভয় ছিল, তার আগেই যুবরাজের মৃত্যু কেশনৃপতির কাছে পৌঁছে যাওয়ার।

তুয়ার সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি। তবে, প্রাসাদের প্রাকার বরাবর জাহাজ যাওয়ার সময়ে রাজকক্ষের একটা বাতায়নে শ্বেতবসনা একটি স্থির মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই সে বুঝেছিল তুয়া দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তরবারি নামিয়ে অভিবাদন করেছিল তৎক্ষণাৎ, দাঁড়িদের বলেছিল দাঁড় তুলে একইভাবে অভিবাদন জানাতে। প্রত্যভিবাদন জানিয়েছিল মহারাণী বাতায়নে। সেই তাদের শেষ দেখা।

রওনা হওয়ার আগে মারমিস আর আন্তি তাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

মারমিস বলেছিলেন—'পুত্র, মহারাণীর কৃপাদৃষ্টি তোমার ওপর বর্ষিত হয়েছে। প্রাণদণ্ডের বদলে পদোন্নতি ঘটেছে। যাচ্ছো ধূমকেতুর মত—জানি না তোমার ভাগ্যে কি আছে। কিন্তু ফিরে এসে হয়তো আমাকে আর দেখতে পাবে না।'

'ও কথা বলো না, পিতা। আমার ভাগ্যে কি আছে, আমি নিজেও তা জানি না। মা, তুমি তো ভবিষ্যৎ দেখতে পাও। বলতে পারো?'

আন্তি বললেন—'চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু খুব বেশী জানতে পারিনি। শুধু জেনেছি, অনেক সৌভাগ্যের অধিকারী হবে তুমি ভবিষ্যতে। তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখাও হবে। তবে শেষ বিদায় জানিয়ে যাও তোমার বাবাকে।'

শুনে অশ্রু গোপন করার জন্যে মুখ ফেরালো রামিস। মারমিস কিন্তু দুঃখে ভেঙে পড়লেন না—মুখে প্রকাশও করলেন না।

বললেন—'জীবন একদিন ফুরোয়। ভাগ্যরহস্য চিরতিমিরাবৃত—কেউ জানে না। আকাশের মেঘ একদিন আকাশেই মিলোয়। নদীর বুদবুদ নদীতেই বিলীন হয়। ভাগ্য তোমাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাবে, হয়তো জয়ী হয়ে ফিরবে—কিন্তু তোমাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অবস্থায় দেখতে আমি পাব না। কিন্তু হাতে ক্ষমতা পেয়ে অন্যায়ভাবে শক্তি প্রয়োগ কোরো না। অকারণে কারো প্রাণ নিও না। অসহায়া নারীর ক্ষতি কোরো না। মনে রেখো, ভিক্ষুকের ভাগ্য তোমার চাইতে বড় হতে পারে। একই বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে তোমার মতই গ্রহণ করছে পোকামাকড় এবং গৃহপালিত পশুরা। যৌবনকে উপভোগ করো। তারপর জীবন পথের শেষে অসিরিসের

পাদদেশে তোমাকে বরণ করার জন্যে উপস্থিত থাকবো আমি। আশীর্বাদ রইল আমার। বিদায়।'

নিষ্ক্রান্ত হলেন মারমিস। আর দেখা হয়নি দুজনে।

আন্তি কিন্তু বললেন—'দুঃখ কোরো না। লক্ষ লক্ষ বছর মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটেছে—ঘটবে লক্ষ লক্ষ বছর। জীবনকে উপভোগ করো, দুর্ভাগ্য এলে হাসি মুখে সহ্য কোরো, পাপ ছাড়া কাউকে ভয় পাবে না, কোনো কিছুর প্রত্যাশা করবে না—জানবে, যা কিছু ঘটছে, তা ঘটবেই—অন্যথা হবে না।'

বিনীতভাবে রামিস বলবে—'তাই হবে, মা।'

'তোমাকে একটা উপহার দেওয়ার আছে—যার জিনিস তার নাম বলা নিষেধ।'

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল রামিস—'দাও। তাহলে স্বপ্ন দেখিনি কাল রাতে।'

'বটে!' ছেলের মুখভাব নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন আন্তি—'গতরাতে মহারাণীর ঘরে তাহলে তোমার স্বপ্ন দর্শন ঘটেছিল?'

'দাও উপহার!'

রামিসের প্রসারিত হাতে একটা সোনার আংটি দিলেন আন্তি। ভারী আংটি। জল জল করছে একটা সূর্য আংটির গায়ে। দুপাশে মুকুট মাথায় একজন পুরুষ আর একজন নারী বসে রয়েছে নতজানু হয়ে। ডান হাত বাড়িয়ে ধরেছে সূর্যের দিকে—জীবনচিহ্নের ফাঁসযুক্ত প্রতীক রয়েছে দুজনের প্রসারিত হাতে।

আন্তি বললেন—'কার আংটি জানো?'

'তুয়ার কড়ে আঙুলে কিছুদিন ধরে দেখেছি।'

'এ আংটি তোমার প্রপিতামহের—যিনি একাধারে মিশরের ফারাও এবং কেশ-য়ের নৃপতি ছিলেন। কিছুদিন আগে তাঁর মমীদেহে নতুন পরিচ্ছদ পরানোর সময়ে মারমিস, আমি আর তুয়া হাজির ছিলাম সেখানে। তুয়া আংটিটা আঙুল থেকে খুলে নিয়ে দেয় মারমিসকে। মারমিস দেয় তুয়াকে। সেই আংটিই এখন উপহার পেলে তুমি তোমার পথ সুগম করার জন্যে। কেশ-য়ের সবাই চেনে এই আংটি। কিন্তু মিশরের সীমান্ত না পেরোনো পর্যন্ত লুকিয়ে রেখো—নইলে জবাবদিহি করতে হবে।'

'তাই করব মা, ধন্যবাদ দিও মহারাণীকে।'

'রামিস,' চকিতে প্রশ্ন করলেন আন্তি—'রাণীকে তুমি ভালবাসো?'

'হ্যাঁ, রামিস। দোষটা তোমার। কেন এক সঙ্গে মানুষ করেছিলে দুজনকে ?'

'আসল দোষ ভগবানের—তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়েছে। কিন্তু সে তোমাকে ভালবাসে ?'

'মাগো, তুমি তার কাছে কাছে থাকো. নিজে জিজ্ঞেস করো। মা, আমি চললাম বিপদের মাঝে—তাকে ফেলে যাচ্ছি বিপদের মাঝে। তুমি জাদুবিদ্যা জানো—সর্বশক্তি দিয়ে তাকে আগলে রেখো। অনেক বিপদ আসতে পারে—তোমার ওপর ভরসা রইল। তাকে বিয়ে করতে দিও না—স্বামীরাই স্ত্রীদের বাধা করে অনেক অপ্রিয় কাজ করতে—যদি ঈশ্বরের কৃপাবঞ্চিত হয় তুয়া—তুমি তাকে জাদুশক্তি দিয়ে লুকিয়ে রেখো।'

'চেষ্টা করবো, রামিস। কিন্তু আমার শক্তি আর কতটুকুই বা। আংটিটা লুকিয়ে রাখো। মহারাণী তোমাকে যা বলেছে—অক্ষরে অক্ষরে তা তামিল করো—তার ভেতরে দেবশক্তি আছে—এইটুকু শুধু মনে রেখো।'

রামিসের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন আস্তি।

রওনা হল রামিস। তাকে নিয়ে জল্পনা কল্পনারও অবসান ঘটল এক সময়ে। মহারাণী অতিশয় সুচতুরা, পালক ভ্রাতার রক্তে হস্ত কলুষিত না করে তিনি যে তাকে কৌশলে মিশরের বাইরে নিয়ে গিয়ে হত্যার আয়োজন করেছেন, এ বিষয়ে কারো মনে আর সন্দেহ রইল না। সবাই ধরে নিলে, সীমান্ত পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে আদিষ্ট সৈন্যরা বধ করবে তাকে এবং মৃতদেহ পৌঁছে দেবে কেশনৃপতির পদতলে। কেশ রাজ্য এত দূরে যে যাতায়াত করতেই লাগে দু-বছর। রামিসের কথা সবাই ভুলে যাবে—মহারাণীও নিষ্কণ্টক হবেন। কেন না ফারাও-রক্ত রয়েছে যার ধমনীতে, একদিন না একদিন অভ্যুত্থান ঘটত তার—বিঘ্নিত হত মহারাণীর সিংহাসন।

কিন্তু হাজার বছরের মধ্যে কোনো নারী বসেনি মিশরের সিংহাসনে—কুমারী তো নয়ই—সুতরাং মহারাণীর তো এখন বিয়ে হওয়া দরকার। কিন্তু বিয়ে দেবে কে ? ফারাও কি আর বাঁচবেন ?

ফারাও কিন্তু বেঁচে গেলেন। তিনমাস শিশুর মত আচরণ করে গেলেন শয্যাশায়ী হয়ে। বল আর পুতুল নিয়ে খেললেন। শৈশবের সঙ্গীদের নাম ধরে ডাকলেন—তারা এলে বল আর পুতুল খেলতে বসলেন।

তার পরেই একদিন শয্যায় উঠে বসে জানতে চাইলেন—ব্যাপারটা কী ? মহাভোজের পর থেকে আর তাঁর কিছু মনে পড়ছে না কেন ?

রাজবৈদ্যরা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদেয় হতেই মারমিসকে ডেকে ফারাও জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? ভোজসভায় ফারাও বংশোদ্ভূত কাউন্ট রামিস দিয়ে মদ ঢালার আয়োজন করেছিল কোন মূর্খ, তা তিনি জানেন না। দেখে চমকে গিয়েছিলেন। হাজার হোক বংশমর্যাদায় যুবরাজের অনেক ঊর্ধ্বে সে। তারপরেই লাগল তরবারি যুদ্ধ—শেষকালে কি হল?

বিনীতভাবে সমস্ত নিবেদন করলেন মারমিস। দু-হাজার সৈন্য নিয়ে রামিস দৌত্যকার্যে গিয়েছে শুনে লাফিয়ে উঠে ফারাও বললেন—'সেকী! এ তো দৌত্য নিয়ে যাওয়া নয়—বাহিনী নিয়ে যাওয়া। তাছাড়া সামান্য একজন অফিসার এত বড় পদে উন্নীত হয় কি করে? তার তো শিরশ্ছেদ হওয়া উচিত রাজ অতিথিকে বধ করার অপরাধে! কার হুকুম হয়েছে এসব?'

'মহারাণীর হুকুমে,' সবিনয়ে বললেন মারমিস।

'ডাকো তাকে।'

তুয়া এসে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল বাবাকে। মিষ্টি কথায় অনেক কুশল জিজ্ঞাসা করল। তারপর বুঝিয়ে বললে রামিসকে কেন দু-হাজার সৈন্য দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রজাদের সমর্থন পেয়েছিল সে—তাই তাকে বহুদূরের পথে সরিয়ে দিয়ে ঝামেলা এড়ানো হয়েছে। কেন সিংহাসন যদি দখল করে বসে রামিস, ক্ষতি কী? মিশর তো তখন ডুকরে কেঁদে উঠবে না?

শুনে হাঁ হয়ে গেলেন ফারাও। মিষ্টি হাসল তুয়া।

ফারাও বললেন—'তুই নারী বটে! কিন্তু তোর মধ্যে এত ধারালো রাজবুদ্ধি! অনেক ঊর্ধ্বে উঠবি তুই—কিন্তু বেশী তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে নিজের ধারেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে না যাস। তোর রাশ টেনে ধরার জন্য দরকার একজন স্বামীর।'

'বেশ তো, খোঁজ করো।'

কিন্তু কোনো পাত্রকেই শেষ পর্যন্ত মনে ধরল না তুয়ার।

মাস কয়েক যেতেই এই খেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ফারাও। উপদেষ্টাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি করা যায়। তারা বললে, মহারাণীর একজন প্রেমিক দরকার। এ মেয়ে প্রেমে না পড়লে বরমাল্য কাউকে দেবে না। দেশ ভ্রমণে বেরোলে রাজপ্রেমিক জুটে যেতে পারে।

তুয়াকে ফারাও তার মতামত জিজ্ঞেস করতেই সে লাফিয়ে উঠল দুটো কারণে। প্রথম কারণটা তার নিজস্ব। দেশ ভ্রমণের অছিলায় দাক্ষিণ দেশে

গিয়ে রাখিসের খোঁজখবর নেওয়া যাবে; দ্বিতীয় কারণটা অবশ্য দেশের স্বার্থে। বড় বড় শহরগুলো না দেখলে মহারাণীর কর্তব্য করবে কি করে? সেই সঙ্গে ফারাও তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে পাবে—তুয়া নিজেও হাঁপিয়ে উঠেছে থিব্‌সে।

অতএব ঠিক হল সকন্যা মিশর ভ্রমণে বেরোবেন ফারাও। কিন্তু দক্ষিণ দেশে যাওয়া সমীচীন হবে না। সেখানকার মরু অঞ্চলে এমন সব দুর্ধর্ষ উপজাতিরা আছে যারা বাগে পেয়ে ফারাওকে নাকাল করতে পারে।

কাজেই নীলনদ ধরে দক্ষিণে না গিয়ে উত্তরে রওনা হল তুয়া বাবাকে নিয়ে। বড় বড় শহর দেখতে দেখতে পৌঁছালো সুবিশাল আব্‌তু শহরে। হাজার হাজার মহান্ মিশরীয় কবরস্থ হয়েছে যেখানে, পবিত্র সেই অসিরিস বেদীমূলে নতুন করে মুকুট অভিষেক হল তুয়া রাণীর। সেখান থেকে গেল অন্ শহরে—পিরামিডের দেশে—সূর্যনগরীতে। সুপ্রাচীন মিশরীয় নৃপতিরা বিস্তর পিরামিড নির্মাণ করে দেশ শাসন করেছিলেন সেখানে একদা।

পিরামিডে রুগ্ন শরীর নিয়ে ঢুকতে পারলেন না ফারাও। আস্তিকে নিয়ে তুয়া কিন্তু গেল। হাজার হাজার বছর ধরে যাঁরা মিশর শাসন করেছেন, তাঁদের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে অশরীরীদের আহ্বান জানাল—কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। অনুরোধ সত্ত্বেও আস্তি এ-সবের মধ্যে গেলেন না—উল্টে বারণ করলেন তুয়াকে।

রহস্যজনক সাংকেতিক লিপি খোদাই পিরামিডগুলোর ছায়ায় দাঁড়িয়ে বললেন—'যাঁরা ঘুমোচ্ছেন, তাঁদের ঘুমোতে দাও। জাগিও না। যা জানবার নয়, তা জানতে চাইলে ক্রুদ্ধ হতে পারেন—যেমন হয়েছিলেন আমেন। ওঁদের বিরাট কীর্তিগুলো শুধু দেখে যাও দুচোখ ভরে।'

রেগে গিয়ে তুয়া বলেছিল—'বিরাট কীর্তি কি শুধু পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে নিজেদের দম্ভ চরিতার্থ করলেই হয়? আমি এমন স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করব যার গায়ে উৎকীর্ণ থাকবে ইতিহাস আর কাহিনী—ফাঁকা দম্ভর নিদর্শন হবে না এই সব প্রস্তর পিরামিডের মত।'

পরের দিনই মেমফিস শহরে প্রবেশ করলেন ফারাও মেয়েকে নিয়ে। রাজকীয় অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিল প্রিন্স আবি—সেই প্রিন্স আবি যে বহুবছর আগে রাজসিংহাসন দাবী করেছিস থিবসে গিয়ে, তারপর থেকে আর দেখাও করেনি ফারাওয়ের সঙ্গে, এমন কি তুয়ার মুকুট অভিষেক উৎসবেও শেষ মুহূর্তে শরীর খারাপ বলে এসে পৌঁছোয়নি। নিজের চার

ছেলের একজনের সঙ্গেও তুয়ার বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়নি। কিন্তু কঠোর ভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেশ শাসন করেছে, নিয়মিত খাজনা পাঠিয়েছে বিনীত পত্রসহ এবং বছর বছর খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে গেছে। তাই শেষ পর্যন্ত ফারাও তার আকাশচুম্বী স্পর্ধা-কাহিনী বিস্মৃত হয়েছিলেন, ভেবেছিলেন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে প্রিন্স সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তুয়ার জন্মের পর।

কিন্তু রাজপথ দিয়ে মাত্র পাঁচশ রক্ষী নিয়ে যাওয়ার সময়ে যখন দেখলেন দুপাশে জনতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা হর্ষধ্বনি দিচ্ছে, যখন দেখলেন মেমফিস শহর কেল্লা, বুরুজ, প্রাচীর আর পরিখায় সুরক্ষিত, তখন শংকিত হলেন মনে মনে—মুখে কিন্তু কিছু বললেন না।

তিনি না বললেও তুয়া বলল খাটো গলায়—'বাবা, মেমফিসের এই যুবরাজ দেখছি গোটা শহরটাকে সৈন্য দিয়ে আগলে রেখেছে।'

'তাতো রাখবেই। এখানকার গর্ভনর যে সে।'

'কিন্তু হালচাল দেখে তো মনে হয়, তার চাইতেও বেশী। মেমফিসের রাজা সে। আমি যদি ফারাও হতাম। বেশী সৈন্য সঙ্গে আনতাম।'

'যখন খুশী বেরিয়ে পড়লেই হল,' আমতা আমতা করে বললেন ফারাও।

'ব্রোঞ্জের বিরাট দরজার পাল্লা কিন্তু আমরা শহরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল দেখলাম। মেমফিসের প্রিন্সের ইচ্ছে না হলে ও দরজা আর খুলবে বলে তো মনে হয় না।'

ঠিক এই সময়ে ওঁদের রথ এসে দাঁড়াল বিশাল সোপান শ্রেণীর সামনে। সুবিশাল এই হলঘরেই ফারাও এবং তার কন্যাকে অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে প্রিন্স। সে নিজে দাঁড়িয়েছিল সিঁড়ির ওপর। ষাট বছরের বিরাট, স্থূল এবং ভয়ঙ্কর এক মূর্তি। ধুরন্ধর এবং বলবান। দেখেই ঘৃণায় ভরে গেল তুয়ার অন্তর—এত ঘৃণা অ্যামাথেলকেও সে করেনি। সেই সঙ্গে ভয় হল—যে ভয় অ্যামাথেলকে দেখেও হয়নি।

আবির ক্ষুধিত চক্ষু যেন তুয়ার আপাদমস্তক লেহন করে নিল প্রথম দর্শনেই। তারপর শুরু করল ফারাও প্রশস্তি। সবিনয়ে আহ্বান জানালো 'দীনের কুটিরে'।

ফারাও নিশ্চুপ। কিন্তু সহসা বললে তুয়া—'স্তুতিবাদের জন্যে ধন্যবাদ খুড়ামশায়। কিন্তু জানতে পারি কি মেমফিসের সিংহদ্বারের বাইরে আপনি নিজে হাজির থেকে শহরের চাবি ফারাওয়ের অফিসারদের হাতে

তুলে দেন নি কেন ? মেমফিসের গভর্নরের কাছে এইটাই কিন্তু প্রত্যাশা করেছিলাম।'

থতমত খেয়ে বিস্ফারিত চোখে দীর্ঘকায়া, পরমাসুন্দরী ভাইঝির পানে চেয়ে রইল আবি। মুখে তার ফারাওয়ের আদল বেশ স্পষ্ট। রাণী বেশ-পরা একটা নরম মেয়েকে কল্পনা করেছিল সে মনে মনে—এরকম ধারালো কথা আশা করেনি। কথা তো নয়—যেন চাবুক।

তাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই রইল—জবাব দিতে পারল না।

পাশ কাটিয়ে উঠে গেল তুয়া। জানতে চাইল থাকার জায়গা কোথায় হয়েছে।

ঝাউ গাছ দিয়ে ঘেরা শহরের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট প্রাসাদ দেখানো হল তাকে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে তুয়ার অপছন্দ হল জায়গাটা। শেষকালে খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল নীলনদের ধারে শেখেৎ দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে একটা ছোট প্রাসাদ। শেখেৎ হলেন প্রতিহিংসার দেবী—মুণ্ডটা বাঘের। দুটো সুউচ্চ মিনার আছে নদীর ঠিক পাড়েই। চুনা পাথরের পুরু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা পুরো চত্বরটা। ফটক সুদৃঢ়। মেম-ফিসের চারধারে যে দেওয়াল, সে দেওয়াল নদীর পাড় দিয়ে মিনারের তলা দিয়ে ঘিরে রেখেছে এই অঞ্চলটিকেও। ভেতরে মন্দির আর পুরুৎদের বাসস্থান। প্রাসাদটা কিন্তু বহু দিন পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। বাসযোগ্য ঘর নেই। তাতে কী ? নদীর হাওয়ায় ফারাওর স্বাস্থ্য ফিরবে, জানলায় দাঁড়িয়ে বিশাল পিরামিড দেখা যাবে মিনার-অট্টালিকার সুউচ্চ বাতায়ন থেকে।

অতএব সেখানেই দুটো ছোট ঘর তাড়াতাড়ি সাফসুতরো করে নিয়ে আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো হল আন্তি আর তুয়ার জন্যে। বাবাকে রাজী করিয়ে মারমিসকে দিয়ে চুনাপাথরের দেওয়াল বরাবর রক্ষী মোতায়েন করল তুয়া—ফটক পাহারার ভারও রইল নিজেদের রক্ষীর ওপর। বাগানেও ছড়িয়ে রইল সশস্ত্র রক্ষীরা।

(৮) জাদু মূর্তি

সভাসদদের সঙ্গে এনেছিলেন ফারাও। পরের দিন সকালে সবাইকে নিয়ে সভা সাজিয়ে বসলেন বিশাল ভোজকক্ষে। এ রকম ভোজের আয়োজন অ্যামাথেলের সম্মানেও করেননি ফারাও। সোনার সিংহাসনে বসলেন ফারাও এবং তুয়া। তুয়ার ডানদিকে বসল আবি।

তুয়া জিজ্ঞেস করেছিল—'আপনার উচিত কিন্তু ফারাওয়ের পাশে বসা। এখানে বসলেন কেন?'

'ফারাওয়ের পাশে বসবেন তো মৃত্যুর দেবতা।'

'বটে। মৃত্যুর দেবতা বসবে আমার বাবার পাশে?'

'বয়স হয়েছে তাঁর। শীগগিরই 'অমর' হয়ে যাবেন। আমি তাই বসলাম সবচেয়ে সুন্দরীর পাশে।'

'তার মানে আপনি বলতে চান, বাবা মারা যাবে শীগগিরই। আপনার কথাগুলো কিন্তু অমঙ্গলসূচক,' শাণিত কণ্ঠে বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল তুয়া। তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল ভোজকক্ষের সব কিছু।

হঠাৎ চোখে পড়ল আবির ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে দীর্ঘদেহী এক পুরুষ। একমাথা পাকা চুল। মাথায় জ্যোতিষীর টুপি। একদৃষ্টে দেখছে সে তুয়াকে। সে যা কিছু বলছে মোমের ফলকে সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিচ্ছে। পরে এই সব বচন বিচার করে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবে নিশ্চয়।

আস্তি দাঁড়িয়েছিল পেছনে। কানে কানে জিজ্ঞেস করল তুয়া—'লোকটা কে?'

'জ্যোতিষী কাকু। দেখে রাখো। পরে বলব এর সম্বন্ধে।'

তাই তাকে চোখে চোখে রাখল তুয়া। দেখল লোকটা ফারাও কি বলছেন—সব লিখে নিচ্ছে মোমের ফলকে। সমানে প্যাট প্যাট করে কালো চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।

আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করল তুয়া।

মেরিত্রা নামে একটি মেয়ে হাওয়া করছিল ফারাওকে। মধ্যবয়েসী। কিন্তু এখনো সুন্দরী। সুচতুরা এবং প্রিয়ংবদা বলে ফারাও তাকে পছন্দ করতেন, যদিও তুয়া তাকে দুচক্ষে দেখতে পারত না। বহু বছর আগে এই মেরিত্রা আবির চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়েছিল ফারাওয়ের কাছে। ফারাও তাকে নিজের কাছে রাজপ্রাসাদে রেখেছিলেন অবসর মুহূর্তে রঙ্গপরিহাসের জন্যে।

এই মেরিত্রাই আড়চোখে চেয়েছিল কাকুর দিকে। চোখোচোখি হতেই মুখ টিপে হাসল দুজনে—যেন পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালাই করে নিল চোখে চোখে চেয়ে।

কিছুক্ষণ পরেই ব্যজন করার জন্যে অন্য মেয়ে এসে দাঁড়াতেই পাখা হাতে কাকুর পাশে সরে গেল মেরিত্রা। পাখা আড়াল দিয়ে দ্রুত স্বরে কি যেন বলল কাকুকে। ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালো কাকু। যেন গোপনে

দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়ে গেল। পরক্ষণেই পৃথক হয়ে গেল দুজন।

ভোজ অব্যাহত রইল দীর্ঘক্ষণ। তারপর খুলে গেল দরজা। একটা প্রাচীন মমীদেহ বহন করে নিয়ে এল বান্দারা। রাখল হলঘরের মাঝখানে।

চিৎকার করে বললে মূল পরিবেশক—'সবাইকেই একদিন এই অবস্থায় আসতে হবে—কাজেই এর উদ্দেশে পাত্র তুলে আকণ্ঠ পান করুন—উপভোগ করে নিন জীবনটাকে।'

তুয়া জানত না, ভোজকক্ষে মমী নিয়ে আসা একটা অতি প্রাচীন রীতি। কিন্তু এখন তা অপ্রচলিত। ওর কিন্তু ভাল লাগল না ব্যাপারটা।

বললে খুড়ামশায়কে—'কবর থেকে মড়া তুলে আনা হল কেন জানতে পারি? এতো দেখছি রাজার মৃতদেহ।'

'না, মহারাণী। সামান্য একজন প্রজার হাড় রাজবেশ পরিয়ে আনা হয়েছে মহামান্য ফারাওয়ের সম্মানার্থে—দেখছেন না কৃপাণ আর উদ্যত সর্প ইউরেইউস রয়েছে রাজবেশে?'

ভুরু কুঁচকে গেল তুয়ার। ফারাও এতক্ষণ বাদে এই প্রথম কথা বললেন। ম্লান হেসে বললে—'মৃত্যুর পথে যে এগিয়ে চলেছে, তাকে এইভাবে অভিনন্দন জানানোর ব্যবস্থা না করলেও চলতো, প্রিন্স।'

ক্ষমাপ্রার্থনা করে, মমী সরিয়ে নেওয়ার হুকুম দিল আবি। সেইসঙ্গে বললে এর আগেও তিরিশজন ফারাওয়ের সামনে এই একই মমীকে আনা হয়েছে এইভাবে। শাসনকেন্দ্র যখন থিবসে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়—তখনও ভোজসভায় হাজির হয়েছিল মমীটা।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে তুয়া বললে—'তাই যদি হয়, তাহলে এবার এ প্রথার অবসান ঘটুক। হাড় যদি হয়—কবরস্থ করুন। কাঠ যদি হয়, পুড়িয়ে ফেলুন। ফারাও ক্লান্ত, এখন যেতে পারি?

জবাব না দিয়ে এমনভাবে উঠে দাঁড়াল আবি যেন এবার বিদায় সম্ভাষণ জানাবে। কিন্তু সোনার মদ্যপাত্র তুলে ধরে বললে গমগমে গলায়—

'হে অতিথিবৃন্দ, ভোজসভা ত্যাগ করার আগে আসুন আপনাদের সম্মানার্থে সুরাপান করে যাই। এইমাত্র ফারাও বললেন, তিনি মৃত্যুপথযাত্রী। আশা করি, থিবস্ শহরে ফিরে গিয়ে আরও অনেকদিন বাঁচবেন তিনি। কিন্তু দুর্বল দেহ একদিন চিরনিদ্রিত হবেই—তখন সিংহাসনে আসীন হবেন তাঁর কন্যা, মহারাণী নেভার-তুয়া। নারী চিরকালই অসহায়া, দুর্বলা—রমণীর হাতে মিশর নিরাপদ নাও থাকতে পারে। তাই তাঁর উচিত শাসনদক্ষ, যুদ্ধকুশলী, বীর্যবান স্বামী নির্বাচন করা। আমি প্রস্তাব করছি, মেমফিস শহর

থেকেই এমন একজনকে তিনি পতিত্বে বরণ করুন মিশরে ফেরার আগে, যাঁর ধমনীতে বইছে ফারাওয়ের রক্ত। তাহলে তাঁর অনভিজ্ঞতার দরুন মিশর আর বিপদগ্রস্ত হবে না।'

শ্রোতারা বুঝল, কি বলতে চাইছে আবি, আগে থেকেই নিশ্চয় শেখানো ছিল এর জবাবে কি বলতে হবে। পানপাত্র তুলে সোল্লাসে বললে তারা সমস্বরে—'মহারাণী. আমরা জানি কে সেই ব্যক্তি, পতিত্বে বরণ করুন তাঁকে!'

হতচকিত হয়ে গেলেন ফারাও। ক্লান্ত কণ্ঠে তুয়াকে বললেন—'এরা কি বলছে বুঝতে পারছি না। জবাব দাও আমার হয়ে—আমি আর পারছি না।'

উদ্বিগ্ন চোখে বাবার মুখচ্ছবি দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল তুয়া। বিদ্যুৎ ঝলকিত চোখে ভোজকক্ষের সবাইকে দেখে নিয়ে বললে তীক্ষ্ণ দৃপ্ত কণ্ঠে—বিরাট হলঘরের শেষপ্রান্ত পৌঁছে গেল তার কণ্ঠস্বর।

'ধন্যবাদ আপনাদের অভিনন্দনের জন্য। কিন্তু যুবরাজের ভাষণের অর্থ সুস্পষ্ট হল না। ফারাও অশক্ত আপাততঃ, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য তো চিরকাল থাকবে না। দীর্ঘজীবি হবেন তিনি—দীর্ঘকাল মিশর শাসন করবেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর আমাকেই যদি মিশর শাসন ভার নিতে হয়—রাণীর দুর্বলতা বা অনভিজ্ঞতা নিয়ে আপনাদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। স্বামীর প্রয়োজন নেই আপনাদের মহারাণীর—মেমফিসের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেও তাঁর স্বামী নির্বাচনের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনাদের অনুমতি নিয়ে এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবার হাত ধরে নেমে এল তুয়া। পেছন পেছন এলেন আন্তি। মেমফিসের মান্যগণ্যরা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল তেজস্বিনী মেয়েটির দিকে।

মিনার-অট্টালিকায় পৌঁছে আন্তিকে জিজ্ঞেস করল তুয়া—'আবি কি বলতে চেয়েছে বুঝিয়ে দেবে?'

'তুমি যদি না বুঝে থাকো, বলব তোমার চেয়ে বোকা মেয়ে দুনিয়ায় আর নেই,' কাটা কাটা কথায় বললেন আন্তি—'আবি বলল, মেমফিসে তোমাদের ফাঁদে ফেলা হয়েছে এবং তার স্ত্রী না হওয়া পর্যন্ত বেরোতে পারবে না।'

রেগে টং হল তুয়া।

'স্পর্ধা তো কম নয় খুড়ামশায়ের। আমি হব ঐ বদমাস শূওরটার স্ত্রী!

যে আমার ঠাকুরদার বয়েসী, আমার বাবার ভাই, বড়াই করে বেড়ায় শ-খানেক ছেলে আর মেয়ের বাবা ? আমেনের ইচ্ছায় যার জন্ম—মিশরের সেই সম্রাজ্ঞী হবে—'বলতে বলতে রাগে গলা আটকে গেল তুয়ারাণীর।

আন্তি বললেন—'প্রশ্ন তো সেইটাই রাণী, এত স্পর্ধা হল কি করে আবির। কিন্তু এইটাই ওর পরিকল্পনা। আমি কিন্তু গোড়াতেই আঁচ করেছিলাম এখানে আসতে বারণও করেছিলাম। কিন্তু ফারাও শোনেন নি। বলেছিলেন, মিশরের সবচেয়ে প্রাচীন শহরে তিনি যাবেনই।'

'কিন্তু আমাকে বলা উচিত ছিল। চুপ করেছিলে কেন? আমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আবি অথবা তার কোনো ছেলের তরফ থেকেই কিন্তু প্রস্তাব আসেনি। তাই কোনো সন্দেহও করিনি।'

'হৃদয়দান করার পর মেয়েরা ভুলে যায় তাদের আরও কিছু দেবার থাকে। তোমার ক্ষেত্রে রয়েছে তোমার রাজত্ব। সাপ গর্জায় না সিংহের মত, কিন্তু বেশী ভয় সাপকেই।'

'এখান থেকে একবার বেরোই, তারপর সাপের শিরদাঁড়া ভেঙে ছাড়বো আমি। শকুনি দিয়ে খাওয়াবো। ধাইমা, মেমফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে এখুনি।'

'কাজটা অত সোজা হবে না, সম্রাজ্ঞী। আগামী আটদিনের প্রতিদিন একটা না একটা উৎসবের আয়োজন করে রেখেছে আবি। উৎসবে হাজির না থাকলে উত্তরের প্রজা বিক্ষুব্ধ হবে—মুকুট ধারণের পর এই প্রথম কিন্তু এদিকে এসেছেন ফারাও।'

'হোক বিক্ষুব্ধ। ফারাও যা খুশী তা করতে পারেন।'

'কিন্তু খেয়ালখুশী মত চলতে গিয়ে গৃহযুদ্ধ ডেকে এনে নিজের সিংহাসন বিপন্ন করতে পারেন না। আবির সৈন্যবল বড় কম নয়। এ ছাড়াও মরুভূমির বেদুইনরা তার কথায় ওঠবোস করে। তার অঙ্গুলি হেলনে এরা উপোসী শকুনির মত ঝাঁপিয়ে পড়বে মিশরের ওপর। এখন শান্তির সময়। মেমফিসে ফারাওয়ের সৈন্যসংখ্যা এই মুহূর্তে মোটে পাঁচশ। কিন্তু আবির পুরো সৈন্যবাহিনী হাজির এখানে। ওর যুদ্ধজাহাজ আটক করেছে নীলনদের জলপথ। দক্ষিণের পথও বন্ধ। দূত পাঠিয়ে সৈন্য তলব করাও সম্ভব নয়—তা করতে গেলেও লাগবে কমসেকম পঞ্চাশটা দিন।'

বিপদের গুরুত্ব বুঝে শান্ত হয়ে এল তুয়ারাণী।

বললে—'আন্তি, তুমি অন্যায় করেছো। এতই যদি আঁচ করেছিলে তো

ফারাও আর তাঁর উপদেষ্টাদের আগে ভাগে হুঁশিয়ার করে দেওয়া উচিত ছিল।'

'করেছিলাম। শুধু আমি না, মারবিসও পই-পই করে বারণ করেছিল। কিন্তু ফারাও বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, এ সবই আমার ভবিষ্যৎদর্শনের অলস এবং অলীক স্বপ্ন। উনি নাকি খোঁজখবর নিয়ে জেনেছেন আবিকে অথবা আবির অধীনস্থ সেনাপতিদের ভয় করার কোনো কারণ নেই। তোমাকে একথা বলতে বারণ করেছিলেন পাছে ভয় পাও—দেশভ্রমণের আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়।'

'কার কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন?'

'অদ্ভুত একটা মেয়ের কাছে। তার নাম মেরিত্রা। ফারাওয়ের দেখাশুনা করে। আজকেই পাখা হাতে যে বাতাস করছিল তাঁকে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি আমি মেরিত্রাকে। জ্যোতিষীটার সংগে ফিসফাস করছিল বটে। কিন্তু দেখাশুনা করে যে, এমনি একটা মেয়ের কথা শুনে চলেন ফারাও, তাও কি সম্ভব?'

'মেরিত্রাকে ফারাওয়ের খুব পছন্দ। ওর সব কথা হয়তো তুমি জানো না। তোমার জন্মের আগে সিংহাসনের দাবী নিয়ে থিবস্ শহরে গিয়েছিল আবি। ফারাওকে হত্যা করে সিংহাসন দখলের চক্রান্ত করেছিল। মেরিত্রা তা আড়ি পেতে শোনে। তার ঠিক আগেই অযথা আবি চড় মেরেছিল মেরিত্রাকে। শোধ নেয় মেরিত্রা ফারাওয়ের কাছে চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়ে। সেই থেকে সুচতুরা আর সুন্দরী মেরিত্রাকে নিজের সেবা শুশ্রূষার কাজে নিয়োগ করেন ফারাও—কাছে কাছে রাখেন। মেমফিসে মেরিত্রার জন্ম বলে মেমফিসের খবর জানার দরকার হলেই তাকে ডেকে পাঠান। মেমফিসের অত্যন্ত গোপনীয় অনেক খবর সে রাখে—অনেক খবর সত্যও হয়েছে।'

'আশ্চর্য নয়। আবির জ্যোতিষী পাঠিয়েছে গুপ্ত সংবাদ।'

'বিনিময়ে নিশ্চয় ফারাওয়ের গোপন খবর মেরিত্রা পাচার করছে কাকুকে। ফারাওকে আমি হুঁশিয়ার করার পর উনি এই মেরিত্রাকেই ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন সত্যিই আবি তোমাকে এবং ফারাওকে ফাঁদে ফেলবে কিনা। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল মেরিত্রা। আবি নাকি মেমফিসে সৈন্য জড়ো করেছে শুধু ফারাওয়ের সম্মানে। আবি তাঁর একান্ত অনুগত প্রজা, তাঁকে ভালবাসেন প্রাণ দিয়ে, সে যা পেয়েছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট। তাছাড়া মেরিত্রা তাকে একদিন ধরিয়ে দিয়েছিল। সে নিজে আবির কাছে

যেতে চাইছে কেন ? ফাঁদ পাতার সম্ভাবনা থাকলে নিশ্চয় যেতো না। ফারাও বিশ্বাস করেন তার কথা। পাছে আমার কাছ থেকে তোমাকে সরিয়ে দেন এই ভয়ে তোমাকেও কিছু বলতে পারিনি। ভুল করেছি এখন বুঝতে পারছি।'

'স্নেহ করো বলেই ভুল করেছো,' আন্তিকে চুমু খেয়ে মিষ্টি করে বললে তন্নারাণী। 'হে ফারাও, রমণীর পরামর্শে মরণ ফাঁদে পা দিলে শেষ পর্যন্ত! এখন যাও। আমি ঘুমোবো। দেখি স্বপ্নের মধ্যে আমেনের পথনির্দেশ পাই কিনা।'

সেইরাত্রেই ভোজ সভা শেষ হওয়ার পর ফারাওয়ের অনুচরবর্গের জন্য নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে ফিরে এল না মেরিত্রা। হল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে প্রধান পরিচারকের কানে কানে কি যেন বলে গেল। ফারাওয়ের প্রিয় সেবিকা সে। সর্বত্র অবাধ গতি তার। সুতরাং বাধা পেল না।

কালো আলখাল্লায় সর্বাঙ্গ ঢেকে বিশেষ একটা মূর্তির আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল মেরিত্রা। অচিরে কালো আলখাল্লায় আবৃত একটা কৃষ্ণ মূর্তি এসে দাঁড়াল পাশে। দুজনে অনেক গালঘুঁজি পেরিয়ে এসে দাঁড়াল একটা সিঁড়ির তলায়। সুদীর্ঘ সিঁড়ি। উঠতে উঠতে পা ব্যথা হয়ে গেল মেরিত্রার। সিঁড়ির শেষে পৌঁছোলো একটা বিরাট দরজার সামনে। তালা খুলে কৃষ্ণমূর্তি প্রবেশ করল ভেতরে। দরজা বন্ধ করে দিল মেরিত্রা ঢোকবার পর।

ঘরটা পেতলের বিচিত্র যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। রাশি রাশি অদ্ভুত সাংকেতিক চিহ্ন লেখা গোটানো কাগজ গড়াগড়ি যাচ্ছে ঘরের সর্বত্র। পেল্লায় এবং এবং ভারী সুন্দর একটা ক্রিষ্টাল গোলক ঝুলছে টেবিলের ওপর। এ ঘর যেন নক্ষত্র পর্যবেক্ষকের ঘর—জাদুবিদ্যার চর্চা করা হয় নিভৃতে।

চেয়ারে বসে আলখাল্লা খুলে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে মেরিত্রা বললে—'বন্ধু কাকু, তুমি যে দেখছি দেবতাদের কাছাকাছি থাকো।'

শুষ্ক হেসে কাকু বললে—'তা ঠিক। স্বর্গের আধখানা দেখি এখানকার খোলা জানালা দিয়ে। আকাশ দেখে যা জানতে পারি, তা নিচের মানুষদের কাছে দরকার মত চড়া দামে বেচি।'

'চড়া দামে?'

'নইলে দর পাবো কেন? যে ডাক্তার কম দক্ষিণা নেয়, তার তো কদর হয় না। যাক, বহু বছর পরে তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগছে। ঠিক আগের

মতই রূপযৌবন ধরে রেখেছো দেখছি। অনন্ত যৌবনের মন্ত্রগুপ্তিটা বলবে ?'

দাম্ভিকা মেরিত্রা বললে—'পরিচ্ছন্ন বিবেক আর হজমশক্তি—এই দুটোই আমার মন্ত্রগুপ্ত। কিন্তু তুমি এত বুড়িয়ে গেছো কেন? মমীর মত হয়েছে যে চেহারাখানা?

'বদহজম আর বাতের ফলে। খেটে খেটে হজম শক্তি নষ্ট করেছি। ঠাণ্ডায় এত উঁচুতে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বাতে পঙ্গু হয়েছি। যাক, মদ খাও, এ মদ থিবসে পাবে না।'

পাত্র থেকে সুরা গড়িয়ে দিল কাকু। নিজে নিল একপাত্র। পান করে মেরিত্রা বললে—'চমৎকার মদ্য না খেলে আমাকেই বাতে ধরতো মনে হচ্ছে। এবার বলো তো বন্ধু, এখানে এসে আমি বিপদে পড়বো কিনা। আরে না, না, ফারাওকে নিয়ে ভয় নেই। তাঁর কাছে যত্রতত্র যাওয়ার অধিকার আমার আছে। আমি বলছি তাঁর রাজভ্রাতার কথা। চেহারাখানা যা দেখলাম, মেজাজ ঠাণ্ডা হয়েছে বলে তো মনে হল না। চড় মারার শোধটা কি রকম দিয়েছিলাম, নিশ্চয় মনে আছে এতদিনেও?'

'জানলে তো মনে থাকবে। আবি জানে চড় খেয়ে তুমি পালিয়েছো—চক্রান্ত ফাঁস করেছো—আজও জানে না।'

'মহামূর্খ তো।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে অমন চালাকি করাটা ঠিক হয়নি। আবির কাছে চেয়ে নিলাম তোমাকে তোমার রূপসুধা পান করব বলে, আর তুমি কিনা আমাকে ফেলে ফারাওয়ের অন্দরে গিয়ে ঢুকলে।'

'তোমার মত মহাজ্ঞানীর উপযুক্ত হবো না মনে করেই ফারাও নামক ঐ জীবটার সন্ন্যাসিনী-মঠে গিয়ে ঢুকেছিলাম। তোমার কাছে এলে তোমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটত। কিন্তু আবিকে বলে দেবে না তো?'

'না, বলব না। এবার কাজের কথায় আসা যাক—দেরী হলে রাত কাটাতে হবে এখানে—ফারাও চটবেন।'

'সেৎয়ের আলয়ে যাক ফারাও। বলো, কাজের কথা বলো।'

ধূর্ততা ঝিলিক দিয়ে উঠল জ্যোতিষীর কৃষ্ণ চোখে। চোয়াল শক্ত হল। উঠে গিয়ে দেখল দরজাটা ভালভাবে বন্ধ হয়েছে কিনা। পর্দা টেনে দিয়ে একটা টুল নিয়ে এমন ভাবে বসল মেরিত্রার সামনে যাতে আলো পড়ে মেরিত্রার মুখে—নিজে থাকে অন্ধকারে।

'কাজটা খুব বিরাট। কিন্তু তোমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না। একবার তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছো। এতবছর

ধরে ধোঁকা দিয়ে এসেছো ফারাওকে—তোমাকে বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছে।'

'তাহলে সময় নষ্ট করে কি লাভ? আমি উঠি।'

'না, বোসো। তুমি সুন্দরী, তুমি ধড়িবাজ।' বলে সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়ে মেরিত্রার কব্জি খামচে ধরে চাপা গলায় বললে কাকু—'বিশ্বাসঘাতকতা যদি করো, তাহলে যদি বিষ বা ছুরিও তোমাকে শেষ করতে না পারে—জেনো আমার খপ্পর থেকে তুমি বাঁচবে না। আমি প্রবঞ্চক নই—জাদুবিদ্যায় রীতিমত পারদর্শী। এমন কাণ্ড করব যে রাত্রে কোনোদিন ঘুমোতে পারবে না, চেহারা কদাকার হয়ে যাবে, শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাবে। শপথ করো যা শুনবে, তা কাউকে বলবে না।'

কাকুর চোখ মুখ দেখে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল গুপ্তচরীর। জাদুকর কাকুর অশুভ শক্তির কথা মিশরের কাকপক্ষীও জানে। এই কারণেই তাকে ভয় পায় মেরিত্রা।

বললে—'খুব বিপজ্জনক ব্যাপার মনে হচ্ছে। তোমার মতলব কিন্তু আঁচ করতে পারছি। সাহায্য যদি করি, বিনিময়ে কি পাবো?'

'আমাকে।'

'তোষামোদ কোরো না। আর কি পাবো?'

'ফারাও-য়ের পরেই সবশক্তিমান প্রধান মন্ত্রীর স্ত্রী হবে তুমি।'

'স্ত্রী? কিন্তু তোমার তো আরও স্ত্রী আছে?'

'একজনও নেই।'

কাকুর কঠিন শক্তিময় মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মেরিত্রা।

তারপর বললে—'বেশ শপথ নেবো। কিন্তু তোমাকেও নিতে হবে। মনে রেখো, মেয়েদের নিজস্ব ক্ষতি করার ক্ষমতা থাকে।'

'জানি। শুনেছি, আত্মিক শক্তি হৃদ্‌পিণ্ড, মস্তিষ্ক বা যকৃতে থাকে না—থাকে মেয়েদের জিভে। উঠে দাঁড়াও।'

উঠে দাঁড়ালো মেরিত্রা। দেওয়ালের গোপন খুপরি থেকে একটা পুঁথি অথবা প্যাপিরাসের ভুর্জপত্র নিয়ে এল কাকু। টাইফন দেবতার ধাতু লোহা দিয়ে বাঁধানো পুঁথি।

বললে—'এ পুঁথি আর কোথাও তুমি পাবে না। দেবরাজরা যখন মিশরে রাজত্ব করেছেন, সেই 'মেনা'র আমলের আগে এই পুঁথি রচনা করেছিলেন সেকালের সবসেরা জাদুপণ্ডিত। বইটা ছিল তাঁর অস্থির মধ্যে। আমি উদ্ধার করি সেখান থেকে। কবরের মধ্যে তাঁর কা উঠে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়েছিল, ভয় দেখিয়েছিল। এ বই তিনি পড়তে জানতেন বলেই অত

শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন—যেমন হয়েছি এখন আমি। মেরিত্রা, এই বই বুকে চেপে ধরে শপথ করতে হবে তোমাকে—আমিও করছি।'

বড় ভয়ংকর শপথবাক্য উচ্চারণ করল কাকু। সূর্যের দেশের ওপারে যে অন্ধকারের রাজত্ব, যে তমিস্রাজগতে পশুমুখো বেঁটে দানবদের বাস—তাদের আহ্বান করে সাক্ষী থাকতে বলল। শপথ যদি ভঙ্গ হয়—তাহলে সাজা দেবে তারা—বিশ্বের চরমতম লাঞ্ছনা, ব্যাধি এবং দুর্ভাগ্য ঘিরে ধরবে শপথভঙ্গকারীকে—অকল্পনীয় নিপীড়নে তিলতিল করে প্রাণবায়ু মিলিয়ে দেবে শূন্যে।

চুপ করে শুনল মেরিত্রা। তারপর বললে—'একটা কথা কিন্তু বাদ পড়ে গেল।'

'কী?'

'ফারাওয়ের প্রধান মন্ত্রীর একমাত্র স্ত্রী হব আমি এবং তার যা ক্ষমতা থাকবে—সমান ক্ষমতা থাকবে আমারও।'

'ভুলে গেছিলাম,' বলে শপথবাক্যের মধ্যে কথাগুলো জুড়ে দিল কাকু।

তারপর শপথ নিল দুজনে। মাথায় পুঁথি ছুঁইয়ে চোখ তুলতেই মেরিত্রা দেখলে বিশাল কৃস্ট্যাল গোলকটি ধীরে ধীরে রক্তাভ দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। যেন রক্তনদীর ধারা বইছে গোলকের মধ্যে। অদ্ভুত অগ্নিশিখাসম আলোক বর্তিকা জ্বলছে, দুলছে, ঘুরছে কৃস্ট্যাল ফানুসের অভ্যন্তরে। তারপরেই রক্তস্রোতের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে এল, ম্যাড়মেড়ে লোহিতাভার মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করল একটা চক্ষু। বিশাল চক্ষু। স্তিমিত নয়নে অনিমেষে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর অদৃশ্য হল চক্ষু প্রত্যঙ্গ, মিলিয়ে গেল রক্তনদীর অবিরাম ধারা—সে জায়গায় ফুটে উঠল তুয়ারাণীর ছবি। মহাগৌরবে আসীন সিংহাসনে। প্রজাবৃন্দ উপাসনা করছে। পাশেই রাজবেশ পরে বসে একটি পুরুষ মূর্তি—মুখটি কিন্তু মেঘে ঢাকা।

'কি দেখছো?' শুধোলো কাকু।

যা দেখছে, তা বিবৃত করল মেরিত্রা। ক্ষণেক চিন্তাচ্ছন্ন থেকে বললে কাকু সংশয় নিবিড় স্বরে—'লক্ষণ শুভ বলেই মনে হচ্ছে। রাজসঙ্গী বসে রয়েছে পাশে। কিন্তু মুখটা মেঘে ঢাকা কেন?'

'জানি না,' জবাব দিল মেরিত্রা। 'তোমার এই লাল মদে আরক মিশোনো ছিল নিশ্চয়—মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। এবার বলো, কি ষড়যন্ত্র করতে চাও। কৃস্ট্যালটার কাপড় চাপা দাও তার আগে, ছবি আর দেখতে চাই না।'

'তোমার দূরদর্শনের ক্ষমতা দেখে অনুকম্পা হচ্ছে,' বলে ঝাপী ঢাকা দেওয়ার যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে জাদুশক্তি প্রয়োগ করা হয় সেটি দিয়ে কৃস্ট্যাল গোলক চাপা দিল কাকু।

তারপর বললে—'ছোট্ট করে বলছি। আমার মোটকা প্রভু আবি মিশরের ফারাও হবার ফন্দী করেছে ভাইঝিকে কব্জায় এনে।'

'বিয়ে করে তো?'

'হ্যাঁ।'

'নেতার-তুয়ার সব খবর জানো তুমি?'

'কি বলতে চাও?'

'তার অনিচ্ছায় যে তাকে বিয়ে করবে, তার দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে। মেয়েটা একটা জীবন্ত অগ্নিশিখা। ওর ভেতরে দেবত্ব আছে—আমেনের মেয়ে সে। আমি তা বিশ্বাসও করি। ওর ভেতরে যে শক্তি আছে, তা মিশরের সব জাদুকরের সম্মিলিত শক্তির চাইতেও বেশী—তুমিও তাদের মধ্যে পড়ো। ও মেয়ের ঘৃণা কুড়িয়ে যে তাকে জোর করে বিয়ে করবে তার কপালে জানবে অশেষ দুর্গতি লেখা আছে।'

'মরলে আবি মরবে। আমাদের কর্তব্য আবিকে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া। তুয়ারাণী যে রাজী হবে না, তা বলাই বাহুল্য।'

'তা তো হবেই না। গুজব, তুয়ারাণী ভালবাসে রামিসকে। কেশ যুবরাজকে তুয়ারাণীর চোখের সামনেই বধ করে সে এখন সসৈন্যে গেছে যুবরাজের বাবার কাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে।'

'পালক-ভ্রাতাকে ভাল তো বাসবেই। রামিস নিজেও সুপুরুষ। রাজ-রক্তও আছে ধমনীতে। কিন্তু প্রেম করা রাণীদের মানায় না। ওটা তোমার আমার মত সাধারণের পক্ষে শোভা পায়। আবিকে সন্দেহ করে কি তুয়ারাণী?'

'তা বলতে পারব না। তবে ওর ধাইমা আস্তি সন্দেহ করেছে। ফারাওকে নিষেধও করেছিল মেমফিসে আসতে। যদিও আস্তি তোমার চাইতেও বড় জাদুকরী, কিন্তু আমি তোমার চিঠি পেয়ে ফারাওকে উল্টো বুঝিয়ে নিয়ে এসেছি। আজও কিন্তু ফারাওয়ের অগাধ বিশ্বাস আমার ওপর—ফলে আসতে পেরেছি তোমার কাছে।'

'তুয়ারাণী তাহলে জেনে যাবে আস্তির কাছ থেকে। ফারাওয়ের চেয়ে বেশী শক্তি ধরে মেয়েটা। আবি তার সমস্ত সৈন্য আর জাহাজ দিয়েও আটকে রাখতে পারবে না তুয়ারাণীকে। একবার যদি পগাড়পার হয়,

তারপর যুদ্ধ ঘোষণা করবে আমির বিরুদ্ধে। কাজেই যে করেই হোক ফারাওকে আটকে রাখতে হবে মেমফিসে। ফারাও থাকলেই মেয়েও থাকবে।'

কুয়াশাচ্ছন্ন ক্রিস্টাল গোলকের দিকে তাকিয়ে মেরিত্রা বললে—'কিন্তু কি ভাবে?'

'রক্তপাত ঘটিয়ে নয়, কারাগারে বন্দী করেও নয়—দুটোই সমান বিপজ্জনক। অন্য পথ আছে।'

'বিষ দিয়ে?'

'বিষ দেওয়াটাও বিপজ্জনক। কিন্তু অসুস্থ করে দিতে পারলেই আটক পড়বেন ফারাও। এসো, একটা জিনিস দেখাই তোমাকে।'

সিন্দুক খুলে একটা কাঠের বাক্স বার করল কাকু। চির-হরিৎ সীডার কাঠের বাক্স। মমী শবাধারের অনুকরণে নির্মিত। ভেতর থেকে বার করল হাতখানেক লম্বা একটা মোমের মূর্তি। অবিকল ফারাওয়ের মত দেখতে। মাথায় মিশরের জোড়া মুকুট।

শিউরে উঠে এল মেরিত্রা—'কি এটা?'

'ফারাওয়ের কা। প্রাচীন পুঁথির মন্ত্র দিয়ে সঞ্জীবিত। আরও কিছু ক্রিয়াকর্ম করে স্বয়ং ফারাওকে শবাধারে পাঠানো যাবে এর সাহায্যে—পাঠাবে তুমি।'

'আমি!' চমকে উঠল মেরিত্রা—'কিভাবে?'

'ফারাওয়ের পছন্দসই রমণীদের অন্যতমা তুমি। ওঁর শয়নকক্ষের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার তোমার ওপর। এ ঘরে এমন সময়ে তুমি ঢুকবে যখন কেউ থাকবে না। মোমের তৈরী এই মূর্তিটা রাখবে ওঁর বিছানার তলায় এমন-ভাবে যাতে ওঁর নিঃশ্বাস মূর্তির ভেতরে প্রবেশ করে। তারপর মূর্তিটা বার করে নিয়ে বলবে—'মূর্তি! মূর্তি! আমার আদেশে, তোমার ভেতরকার শক্তির জোরে আর ব্যাধি দেবতার নামের জোরে যেন তোমার হাত-পা শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যার অনুকরণে তুমি নির্মিত তার হাত-পাও শুকিয়ে যায়।' বলে, আগুনের শিখার ওপর মূর্তির পা দুটো রেখে অর্ধেক গালিয়ে নিয়ে নিজের শোবার ঘরে কোথাও লুকিয়ে রাখবে। সেই রাতেই ফারাওয়ের পায়ের পেশী আর স্নায়ু শুকিয়ে যাবে, তিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হবেন। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না। তারপর বলবো কি করতে হবে।'

মেরিত্রা ভয়াতুরা নয়—কিন্তু এই কথায় বুক কেঁপে উঠল।

বললে—'আমি পারব না। পৈশাচিক এই জাদুবিদ্যা আমার হাত

দিয়ে :করানো হচ্ছে এমন একজনের ওপর যিনি স্বয়ং দেবতা। নরকে নিক্ষিপ্ত হব আমি। না, একাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। অন্য লোক ভাখো তুমি, অথবা নিজে গিয়ে বিছানার তলায় মূর্তি রেখে এসো।'

নির্মম এবং ভয়ংকর হয়ে উঠল ঐন্দ্রজালিকের মুখচ্ছবি। খোলা জানলার সামনে মেরিত্রার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে—'কি দেখছো?'

বহু নিচে পুতুল বাড়ীর মত বিশাল সৌধ শ্রেণী আর মাথার খুব কাছে আকাশের তারা দেখে মাথা ঘুরে গেল মেরিত্রার।

কাফু বললে—'নিচে মেমফিস, দূরে নীলনদ, তার ওপারে ধূ-ধূ মিশর। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত পিরামিড শ্রেণী। শাসক হতে চাও না এই সব কিছুর? আমার কথা মত চলো—পূর্ণ হবে তোমার মনোবাঞ্ছা।'

'আর যদি তোমার কথা মত না চলি?'

'তাহলে আমার মন্ত্রবলে তুমি ঠিকরে গিয়ে আছড়ে পড়বে নিচের ঐ সাদা ফিতের মত রাস্তায়—রাস্তার কুকুর মাংস ছিঁড়ে খেয়ে হাড়গুলো কেবল ফেলে যাবে—কেউ আর তোমাকে খুঁজেও পাবে না। আমার কথা না শুনলে প্রাণ নিয়ে এখান থেকে ফেরা তোমার চলবে না। যদি ভাবো, এখন 'হ্যাঁ, কথামত চলব' বলে পরে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তাহলেও পার পাবে না। যে মূর্তিটাকে নিয়ে যাবো, সে কিন্তু আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। তোমার সব খবর পাঠাবে আমাকে আর ব্যাধিদেবতাকে। ভেবে ভাখো কি করবে।'

'কথা মত চলব,' ক্ষীণ স্বরে বলল মেরিত্রা। ঠিক সেই সময়ে মনে হল, কে যেন চাপা গলায় হেসে উঠল জানলার বাইরে।

'চমৎকার। এবার মূর্তিটা আলখাল্লার তলায় লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। রাস্তায় ফেলে দিও না। মূর্তি চেঁচিয়ে উঠবে পেছন থেকে—লোক জড়ো করবে। জাদুকরী বলে সবাই তোমাকে পুড়িয়ে মারবে। আমার নতুন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত মূর্তি লুকিয়ে রাখবে ফারাওয়ের বিছানার তলায়। কাল রাত্রে চাঁদ উঠলেই নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে আগুনের ওপর ধরবে। তারপর লুকিয়ে রাখবে, পরে আমার কাছে নিয়ে আসবে আবার যদি দরকার না হয়। নতুন মন্ত্র পড়বো মূর্তির গায়ে। চলো। আমি এগিয়ে দিয়ে আসছি তোমাকে ফারাওয়ের অস্থায়ী আবাসের দরজা পর্যন্ত।'

(৯) ফারাওয়ের শেষদিন

পরের দিন সকালে তুয়ারাণীর শয়নকক্ষে পোশাক পরাতে এসে আস্তি জানতে চাইলেন স্বপ্নে আদেশ এসেছে কিনা।

'না। খারাপ স্বপ্ন দেখেছি অনেক। সব স্বপ্নেই ঐ পাজী মেরিত্রা মেয়েটা রয়েছে বাবার সঙ্গে। দেখে তো মনে হল, শীগগিরই বাবার সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে সর্বনাশী।'

'সে কাজ এর মধ্যেই শুরু করেছে বলেই আমার বিশ্বাস। কাল রাতে চাঁদের আলোয় জানলা থেকে দেখলাম রাত দুপুরে ফিরে এল মন্দির চত্বরে। আলখাল্লার তলায় কি যেন লুকিয়ে রেখেছিল, তাও দেখেছি।'

'কোত্থেকে এল?'

'শহর থেকে। ফারাওয়ের ছাড়পত্র নিয়ে যেখানে খুশী যাওয়ার অধিকার ওর আছে। মার্বিসকে দিয়ে প্রহরীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মেরিত্রার সঙ্গে এসেছিল কালো আলখাল্লা জড়ানো লম্বা মত একটা লোক। চেহারার বিবরণ শুনে মনে হল জ্যোতিষী কাকু—যার সঙ্গে ভোজসভায় কথা বলছিল মেরিত্রা।'

'খুবই খারাপ খবর। আর কিছু বলবে?'

'আগের চাইতে কড়াকড়ি বেড়েছে ফটক-প্রহরায়। আজ সকালে আমার নিজের একটা ব্যাপারে একজনকে পাঠাচ্ছিলাম থিব্‌স্‌ য়ে—কি ব্যাপার জানতে চেও না—তাকে বেরোতে দেওয়া হয়নি।'

'বলো কী। সিংহাসনে বসেই এক বছরের মধ্যে মেমফিসের সমস্ত ফটক গালিয়ে রান্নার কড়া বানিয়ে ছাড়ব, ক্যাপ্টেনদের পাঠাবো মরু খনিতে কুলির কাজে। না, না, এখন চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই—সময় এলেই ক্ষমতা দেখাবো। ফারাওয়ের সঙ্গে কথা বলা যাবে?'

'না। সভাসদদের নিয়ে উনি এখন ব্যস্ত। একটু পরেই বেরিয়ে যাবেন নতুন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। এসো রাণী মুকুটটা পরিয়ে দিই মাথায়। মেমফিসের কুত্তারা দেখুক কে তাদের অধিরাণী।'

একটার পর একটা অনুষ্ঠানে হাজিরা দিতেই দিন গড়িয়ে গেল। দিনের শেষে আবি বললে—'হে ফারাও, আপনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।'

বিশেষ কথা বলার দরবারে হাজির রইল আবির দুই বড় ছেলে, কাকু ফারাও এবং আবির উপদেষ্টারা, আস্তি, মেরিত্রা এবং সম্ভ্রান্ত মহিলারা।

পাশাপাশি বসলেন ফারাও এবং নেতার-তুয়া। আবিকে উদ্দেশ করে ফারাও বললেন—'বলো কি বলবে।'

বিনীতভাবে আবি বললে—'আপনার অনুগত প্রজা হিসেবে, আপনার ভ্রাতা, হিসেবে আমি সম্রাজ্ঞী নেতার-তুয়ার পাণিপ্রার্থনা করছি।'

তুয়া তৈরী ছিল। সহজভাবে মুখ ফিরিয়ে আবির ইতিহাস-বিশেষজ্ঞকে বললে—'ভাইঝির সঙ্গে বিয়ের কোনো নজীর মিশরের ইতিহাসে আছে?'

'আজ্ঞে, নেই।'

ঐতিহাসিককেই সম্বোধন করে আবার বললে তুয়া—'তাহলে নতুন ইতিহাস রচনা করার আর দরকার নেই।'

আস্তে বললেও ফারাও তুয়ার কথার ধরন দেখেই বুঝলেন. সে রাজী নয়। আবিকে বললেন—'যা বলবার, আমার মেয়েকে বলো।'

বুকে হাত ভাঁজ করে উদাত্ত কণ্ঠে শুরু করল আবি—'হে সম্রাজ্ঞী, আপনার প্রতি আমার সুগভীর ভালবাসার দাবীতে—'

'বলুন, আপনার সিংহাসনের প্রতি আমার সুগভীর ভালবাসার দাবীতে—'

ভুরু কুঁচকে গেল আবির। হেসে উঠল সবাই, বাদ গেলেন না ফারাও এবং কাকুও। ফলে সব গোলমাল হয়ে গেল আবির।

এলোমেলোভাবে আবার কথা শুরু করতেই ফের বাধা দিয়ে তুয়া বললে —'আমি কালা নই, খুড়ামশায়। আপনার ইতিহাস-উপদেষ্টার সঙ্গে এইমাত্র আলোচনা করেছি এই ব্যাপারে। উনি বলছেন, এ বিয়ে হতে পারে না।'

জ্বলন্ত চোখে ঐতিহাসিকের দিকে তাকাতেই বৃদ্ধ ভয়ার্ত স্বরে চিলের মত চেঁচিয়ে বললে—'আমি শুধু বলেছি ইতিহাসে এ বিয়ের নজীর নেই। ভাইপোকে দত্তক নিয়েছিলেন এক রাণী—পরে সে অবশ্য ফারাও হয়েছিল।'

'একই কথা। খুড়ামশায় যদি আমাকে দত্তক নিতে চান, ভেবে দেখা যাবে'খন।'

আবি এতক্ষণে বুঝল, তাকে নিয়ে মস্করা করা হচ্ছে। রেগে গিয়ে বললে—'আমি সোজা জিজ্ঞেস করেছি, সোজা জবাব চাই। তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে। আমার বয়স যদিও একটু বেশী—'

বৃদ্ধ ঐতিহাসিকের দিকে ফিরে মধুর স্বরে তুয়া বললে— 'খুড়ামশায়ের জন্ম তারিখটা আপনার জন্মতারিখের সঙ্গে মিলে যায়, তাই না?'

সিংহাসনের পেছন দিয়ে চম্পট দিল ঐতিহাসিক।

ভ্রূক্ষেপ করে বলে চলল আবি—'কিন্তু আমার বাহুবল আছে, সৈন্যবল

আছে, শাসনদক্ষতা আছে। উত্তরের প্রজারা ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহী। বেদুইনরাও উঁচিয়ে রয়েছে মিশর লুঠ করার জন্যে। আবি ফারাও হলে উত্তর-দক্ষিণে আর কোনো বিদ্রোহ থাকবে না। আর যদি এ বিয়ে না হয়—'

ঠিক এই সময়ে নিজের মুখ থেকে মাছি তাড়াতে গিয়ে আবির বস্ত্র খামচে ধরল কাকু। ইসারা বুঝে তক্ষুনি চুপ মেরে গেল আবি।

সুমধুর স্বরে তুয়া বললে—'বলুন, এ-বিয়ে যদি না হয়?'

'তা হলে ঝামেলা হবে। তুমি চুপ করো জ্যোতিষী, কথা বলতে দাও। ফারাও, অনেক বছর রাজত্ব করেছেন—এত বছরে একটি মাত্র সন্তান জন্মেছে আপনার—তাও আমি থিবসে গিয়ে সিংহাসনের উত্তরাধিকার দাবী করার পর। আপনার এই সন্তান কিন্তু আপনার মতো দেখতে নয়। মিশরে এই নিয়ে যথেষ্ট কানাকানি চলছে। আমি তাকে বিয়ে করলে গুজব বন্ধ হবে। বিয়ে না করলে বিদ্রোহ শুরু হবে—জোড়া মুকুট মাথা থেকে ঠিকরে যাবে।'

শুনেই তো দমবন্ধ হয়ে এল উপস্থিত প্রত্যেকের। গলাবাজি করে এ কি বলে বসল প্রিন্স! মুখ লাল হয়ে গেল তুয়ারাণীর। জবাব দিতে যাচ্ছে, এমন সময়ে প্রশান্তি পরিত্যাগ করে ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে গেলেন ফারাও। কর্তৃত্বব্যঞ্জক রুদ্ররোষের সামনে আবি পর্যন্ত যেন গুটিয়ে এতটুকু গেল।

রাগে দুঃখে রাজপোশাক ছিঁড়ে ফেলে বজ্রকণ্ঠে বললেন ফারাও—'এই জন্যেই কি এতদিন ভাই হিসেবে আগলে রেখেছি তোমাকে? এই জন্যেই কি বহুবছর আগে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তোমাকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম থিব্‌স্‌ শহরে? এই জন্যেই কি এত মান সম্মানের মধ্যে তোমাকে তুলে রাজার মত থাকতে দিয়েছি আমার এই মেমফিস শহরে? আমার বাবার বাঁদীর ছেলে তুমি, মিশরের সম্রাজ্ঞীর শুভ্র সুন্দর পাণিপীড়ন করতে চাও বিবাহের লালসা নিয়ে? বয়েসে না তুমি ওর পিতামহ সমান—সম্পর্কে পিতৃব্য? এত বড় সাহস তোমার নোংরা কদর্য মুখে ওর মায়ের চরিত্র নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করছো? দেবাদিদেব আমেনকে টিটকিরি দিচ্ছ? দেব-দরবারে তোমাকে নিয়ে গিয়ে উচিত সাজা তিনি দেবেন—কিন্তু মর্ত্যের দরবারে তোমার দণ্ড বিধান করব আমি আমেনের পুত্র এবং ভৃত্য হিসাবে। মারমিস, ডাকো প্রহরী, বন্দী করো এই পাপিষ্ঠকে। কালকেই থিব্‌স্‌ রওনা হব—আইন মাফিক এর বিচার হবে সেখানে।'

গলায় ঝুলোনো রুপোর বাঁশি তুলে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তীব্র সংকেত করেই

এক লাফে এগিয়ে এসে আবির বাহু খামচে ধরলেন মারমিস। এক ঝটকায় তরবারি কোষমুক্ত করেছিল আবি, কিন্তু বংশীধ্বনি শুনে বর্শা বাগিয়ে ধেয়ে এসে রক্ষীরা তাকে নিরস্ত্র করে নিক্ষেপ করল ভূমিতে।

'বাঁধো, কষে বাঁধো, নিক্ষেপ করো কারাগারে—কাল নিয়ে যাব বিশ্বাস-ঘাতককে থিবসে।' গর্জে উঠলেন ফারাও।

'আর সবাইকে?' রক্ষী প্রধানের প্রশ্ন।

'ছেড়ে দাও। ওরা তো পাপ করেনি। দেখে শিখুক বিশ্বাসঘাতকতার কি পরিণাম,' ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন ফারাও।

হুটোপাটির সময়ে কাকুর পাশে গিয়ে পড়েছিল মেরিত্রা। ফিসফিস করে বললে কাকু—'যা বলেছি ঠিক সেইভাবে কাজ করে যাও আজ রাতে। সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি না করো, প্রাণে মারা যাবে। কথা কানে ঢুকেছে?'

'ঢুকেছে। তাই হবে,' ফিস ফিস করে বলেই তফাতে সরে গেল মেরিত্রা। ঠিক তখনি রক্ষীরা এসে কাকুর বাহু ধরে হিড়হিড় করে টেনে বার করে দিল মন্দিরের বাইরে। সেই সঙ্গে আবির পুত্রদের।

একঘণ্টা পরে ফারাওয়ের সামনে গিয়ে বিনীতস্বরে মারমিস আর আস্তি বললেন, আর দেরী করা সমীচীন হবে না—এখুনি মেমফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়া দরকার। সম্রাজ্ঞী এবং উপদেষ্টারা একমত ব্যাপারে।

ফারাও কিন্তু রাজী হলেন না। সারাদিন কম ধকল যায়নি দুর্বল শরীরের ওপর দিয়ে—তারপর এই মানসিক উত্তেজনা। তিনি কাপুরুষ নন। নিজের শহর ছেড়ে চোরের মত পলায়ন করবেন কিসের জন্যে? রাতটা ঘুমিয়ে ভোরবেলা রওনা হবেন—তার আগে নয়।

মারমিস বলেন—'কারণ আছে বলেই এখুনি পালাতে বলছি। আমরা টের পেয়েছি এখানে আমাদের আটকে রাখার চক্রান্ত হয়েছে। আজ বিকেলে চেষ্টা করলেও শহর ছেড়ে বেরোতে পারতেন না। কিন্তু এখন পারবেন আবি বন্দী হওয়ায় ওর অনুচররা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় রয়েছে বলে—নেতা না থাকায় প্রহরীরা পথ আটকাবে না। কিন্তু কাল নেতা এসে যেতে পারে—পথ বন্ধ হয়ে যাবে।'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন ফারাও—'কী! মিশর আমি শাসন করি—সেই মিশরের একখানা শহরে আমি বন্দী! যা ভাবছো, তা হবে না। আমার হুকুমে খুলে যাবে দ্বার। যদি তা না হয় মেমফিসের প্রত্যেক পাথর খুলে নিয়ে শহরবাসীদের শেয়ালের গুহায় পাঠাবো। সৌজন্যতার খাতিরে নরম কথা বলি বলে ওরা কি ভাবে দরকার হলে তরবারি ধারণ করতে

পারি না? ওরা কি ভুলে গেছে যৌবনে বিদ্রোহীদের কি ভাবে কচুকাটা করে তাদের শহরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম। কালকের আগে কেউ রওনা হবে না এখান থেকে। যাও, আর কথা বাড়িও না।'

এরপর আর কথা বলার বিধান নেই দেশের আইনে। তা সত্ত্বেও দুঃসাহস দেখালেন আন্তি।

বললেন—'ফারাও, অপরাধ নেবেন না। আপনি তো জানেন আমার কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে। বিদেহীরা অনেক সময়ে কানে কানে সুপরামর্শ দিয়ে যায়। একটু আগেই রাণীর কাছ থেকে আসার সময়ে অন্ধকারে মধ্যে চল আমার পরলোকগতা বান্ধবী এবং সম্রাজ্ঞী আহুরা কানে কানে বলে গেলেন, ফারাওকে বলো সামনে ঘোর বিপদ। তুয়ারাণীর চরম লাঞ্ছনা আসন্ন। ফারাও যদি মরতে না চান, এখুনি যেন মেমফিস ছেড়ে চলে যান। যে তাঁর সিংহাসনের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে, তার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে দুষ্ট জাদুকরের।'

রাগত চোখে তাকালেন ফারাও— জানতে পারি তাদের নাম?'

'রাণী আহুরা তা বলেন নি। কিন্তু আমার শক্তিবলে তাদের নাম জেনেছি। একজন মেরিত্রা, অপরজন জ্যোতিষী কারু।'

অট্টহেসে ফারাও বললেন—'আন্তি, তুমি ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছো। মেরিত্রা আমার স্নেহের পাত্রী, তাই তুমি তাকে ঈর্ষা করো। অনেক দিন পরেই আমি তা লক্ষ্য করেছি। তোমার কানে কানে তোমার এই ঈর্ষাই ফুসমন্তর দিয়ে গেছে—আহুরা নয়। মেরিত্রা অনেক বছর আগে ঘৃণিত আবির কুচক্রান্ত ফাঁস করে দিয়েছিল আমার কাছে—সে করবে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র? করবে ঐ লম্বা পা ওয়ালা জ্যোতিষীটার সঙ্গে? যে কিনা আবি বন্দী হতেই পাঁই পাঁই করে পালালো সামনে থেকে? যাও, আন্তি, মিথ্যে আতংক নিয়ে নিজের ঘরে যাও। আমাকে যেতে দাও আমার ঘরে ষড়যন্ত্রকারিণী মেরিত্রা সেখানে বসে রয়েছে আমার জামা কাপড় পাল্টে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে আর রঙ্গ পরিহাসে শ্রান্তি অপনোদনের জন্যে।'

'ফারাওয়ের আদেশ শিরোধার্য,' প্রশান্ত স্বরে বললেন আন্তি - 'সুনিদ্রা হোক ফারাওয়ের— সুপ্তিভঙ্গ হোক সুখের মধ্যে।'

কিন্তু দুঃস্বপ্নময় হয়ে রইল তুয়ারাণীর নিদ্রা। বারে বারে স্বপ্নের মধ্যে ফিরে ফিরে এল যুবরাজ আবির হিংস্রমূর্তি। আর দেখল থিবস্ শহরের সেই জাদুক্রীড়া। ফুলদানির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে বাঁদর—তার স্বপ্নের

মধ্যে বাঁদর হয়ে গেল আমি—রক্তবর্ণ চোখে তরবারি মুঠোয় ধরে তুয়ার সর্বাঙ্গ ক্ষুধিত চোখে লেহন করতে করতে এগিয়ে এল পা-পা।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল তুয়া। অন্ধকার। নিঃসীম অন্ধকার। গায়ে রোমাঞ্চ।

বেরিয়ে এল বাইরে। সামনেই আস্তির ঘর। আস্তির কথা শোনা যাচ্ছে ভেতরে। একা কথা কইছে। প্রার্থনা করছে যেন।

ঢুকল ভেতরে। দুহাত সামনে বাড়িয়ে অদৃশ্য সহায়দের আহ্বান করছেন আস্তি। তুয়াকে দেখে প্রথমে অদৃশ্য সহায়ের আবির্ভাব মনে করেছিলেন। ভুল ভেঙে দিয়ে তুয়া বললে—'বড় ভয় করছে—তাই উঠে এসেছি।' আস্তি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'ভয় কিসের? কাল ভোরেই রওনা হওয়ার আয়োজন চলছে তো।'

ঠিক এই সময়ে হট্টগোল শোনা গেল নিচে—অনেকদূরে। ছিটকে দরজার কাছে গিয়ে আস্তি জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার? এত চেঁচামেচি কেন?

ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাইরে—'ফারাও মারা যাচ্ছেন। সম্রাজ্ঞীর যাওয়া দরকার এক্ষুনি।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে দুজনে দৌড়ে গেলেন ফারাওয়ের শয়নকক্ষে। সভা-চিকিৎসক পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল বিভ্রান্তের মত। ফারাওর পা থেকে কাপড় সরিয়ে দেখাল দুটো পা-ই যেন ঝলসে গেছে। পা নাড়াতে পারছেন না ফারাও—কথাও বলতে পারছেন না। চেয়ে আছেন উদ্‌ভ্রান্তের মত।

ঝটিতি বললে তুয়া—'কেন এমন হল?'

'বুঝতে পারছি না,' বললে বিমূঢ় সভা-চিকিৎসক—'আমাদের শাস্ত্রে এ রকম ব্যাধির কথা লেখা নেই। দুটো পা অসাড় হয়ে গেছে পেশী আর স্নায়ু শুকিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

আস্তি কিন্তু বুঝতে পারলেন।

বললেন—'ইন্দ্রজালের জন্যে এ রকম হয়েছে। ফারাওকে কেউ তুক করেছে।'

নিমেষে ধাতস্থ হল তুয়া—'ফারাওয়ের পাশে সর্বশেষ কাকে দেখা গেছে?'

'মেরিত্রাকে।'

'ফারাও অসুস্থ। শাসনভার হাতে নিলাম আমি। বর্শা দিয়ে ঘিরে নিয়ে এসো মেরিত্রাকে আমার সামনে—কারাগার থেকে নিয়ে এসো প্রিন্সকে।'

বলে, চিকিৎসকের সেবায় ফারাওকে রেখে সভাসদদের নিয়ে পাশের ঘরে বসল তুয়া। রক্ষী প্রধান সেখানে এল অনতিবিলম্বে। বললে কাঁচুমাচু মুখে—'হে সম্রাজ্ঞী, ক্রুদ্ধ হবেন না। যুবরাজ আবি কারাগারে নেই—মেরিত্রাকেও কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কোথায় তারা? খোঁজ নেওয়া হয়েছে?'

'আজ্ঞে, সে খোঁজ নিয়েই আসছি। একটু আগেই ফারাওয়ের খাস মোহর দেখিয়ে সরকারী কাজে ফটকের বাইরে গেছে মেরিত্রা। পেছন পেছন গেছে একজন মোটা উট-চালক। নিশ্চয় ছদ্মবেশী যুবরাজ। গুপ্তসুড়ঙ্গ আছে কারাগারে—পুরুৎদের সুড়ঙ্গ। জানেন শুধু যুবরাজ।'

সারমিসকে ডেকে হুকুম দিল তুয়া ফটকে যেন কড়া প্রহরা বসানো হয় এখুনি। পরের দিন রওনা হওয়ার প্রস্তুতিপর্ব যেন ত্বরান্বিত করা হয়। আর মেরিত্রার ঘর খুঁজে দেখা হোক কিছু পাওয়া যায় কিনা।

সত্যিই পাওয়া গেল একটা জিনিস। একটা আধপোড়া মোমের মূর্তি। ছিল ওর শয্যার তলায়। জিভে কাঁটা বিঁধোনো—পা দুটো ঝলসানো। হাতীর দাঁতের তৈরী হাড় আর সরু সরু তার দিয়ে তৈরী শিরা উপশিরা আগুনে পুড়ে গেছে।

নাক সিঁটকে তুয়া বললে—'পুতুল নাকি?'

কঠোর কণ্ঠে আস্তি বললেন—'না, ফারাওয়ের জাদুমূর্তি। জিভে কাঁটা বিঁধোনো হয়েছে বলেই কথা পর্যন্ত বলতে পারছেন না ফারাও।'

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তুয়া।

অসিরিসের প্রধান পুরোহিতকে ডেকে আস্তি হুকুম দিলেন—এখুনি যেন বিনষ্ট করে ফেলা হয় অশুভ মূর্তিটা। মূর্তি নিয়ে বিদায় হল পুরুৎ। রাণী ফিরে এল ফারাওয়ের পাশে। চেয়ে রইল নির্নিমেষে।

আচমকা একটা ভয়াবহ পরিবর্তন এল ফারাওয়ের চোখে মুখে। অকথ্য যন্ত্রণায় বিকৃত হল সর্বাঙ্গ। পরক্ষণেই মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ হাহাকারে মত বেরিয়ে এল এই ক'টি কথা :

'জ্বলে গেলাম! জ্বলে গেলাম! তুয়া, আমাকে ওরা জাদু করেছে! পুড়িয়ে মারছে! শোধ নিস তুই! উঃ! জ্বলে গেলাম! জ্বলে গেলাম!'

মাথা ঢলে পড়ল বালিশে। প্রাণবায়ু বিলীন হল শূন্যে। নিস্পন্দ হলেন ফারাও।

নিমেষহীন নয়নে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে প্রার্থনা করল তুয়া। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'ফারাও দেবলোকে গেলেন। সবাইকে জানিয়ে

দিন খবরটা। সকলনবিসকে ডাকুন—সভাসদদের ডাকুন। সবাইকে দেখান কি ভাবে জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে ফারাওকে হত্যা করেছে প্রিন্স আবি, জ্যোতিষী কাকু আর ফারাওয়ের সেবিকা মেরিত্রা।'

এল সবাই। স্তম্ভিত হয়ে দেখল ফারাওয়ের ঝলসানো দেহ। লিখে নেওয়া হল মৃত্যু বিবরণ। স্বাক্ষর দিল সবাই।

তলব করা হল প্রধান পুরোহিতকে। শেষ কাজ তাকেই করতে হবে।

পুরুৎ আসতেই আন্তি তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'মূর্তিটা নষ্ট করলেন কি ভাবে ?'

'পুড়িয়ে।'

'মূর্খ! মাটিতে পুঁতে দেওয়া উচিত ছিল। মূর্তি পুড়িয়ে আপনি স্বয়ং ফারাওকেই পুড়িয়ে মারলেন!'

অজ্ঞান হয়ে আছড়ে পড়ল প্রধান পুরোহিত। আরেকজনের ডাক পড়ল শেষকাজ করার জন্যে।

(১০) কা-য়ের আবির্ভাব

সকাল হল। ফারাওয়ের মৃতদেহে তেল মাখিয়ে মমী করার ঝামেলা নিয়ে মহাব্যস্ত হল চিকিৎসকরা। অফিসারদের নিয়ে পরামর্শ সভায় বসল তুয়ারাণী। বিপদের খাঁড়া মাথার ওপর ঝুলছে বলে উৎকণ্ঠিত প্রত্যেকেই। সভা চলল তাই অনেকক্ষণ। আবি পলায়ন করেছে। তার হাতে সৈন্য প্রচুর। ফারাও নিধন এবং জাদুবিদ্যা প্রয়োগের কুকর্ম সে ঢাকবার প্রয়াস পাবে তুয়ারাণীকে বিয়ে করে—যেন তেন প্রকারেন।

একজন প্রস্তাব করল পাঁচিল ভেঙে নীলনদে অপেক্ষমান জাহাজে গিয়ে ওঠা যাক। মতলব মনে ধরল প্রত্যেকের। কিন্তু পাঁচিলের ধারে গিয়ে দেখা গেল, এর মধ্যেই জাহাজ দখল করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তফাতে। দুটো পথ তখন খোলা রইল। মন্দির চত্বরে অবস্থান করা—বার্তাবহ পাঠিয়ে সৈন্য তলব করা অথবা রক্তগঙ্গা বইয়ে ফটক ভেঙে শহরের বাইরে যাওয়া—সেখানে মিত্রভাবাপন্ন শহরের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে—অথবা খোলা জায়গায় আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু কোন পথ নেওয়া উচিত, এই নিয়ে মতান্তর উপস্থিত হল উপদেষ্টাদের মধ্যে। শেষকালে সিদ্ধান্তের ভার দেওয়া হল সম্রাজ্ঞীকে।

দৃপ্তকণ্ঠে বললে নেতার-তুয়া—'এখানে আর নয়। লড়ে পথ করে নেব আমরা। যদি মরি, তো সূর্যের পরপারে ঠাঁই পাব অমরধামে।'

এবার শোকপ্রকাশ আর ঘোষণার পালা। রাজরমণীরা কেঁদে উঠল শব্দ করে। উঁচুতে দাঁড়িয়ে নকীবরা হেঁকে ঘোষণা করল, ফারাও স্বর্গে গেছেন—তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে সম্রাজ্ঞী নেতার-তুয়া। শুনে নিচের রাস্তায় হর্ষধ্বনি করল কিছু প্রজা—বেশীর ভাগ নীরব রইল আবির ভয়ে।

রাত শেষ। খোলা হল মন্দির চত্বরের ফটক। শোভাযাত্রা করে রাজ-রমণীরা বেরোলো শবাধারে ফারাওয়ের মামী দেহ নিয়ে। পুরোহিতরা সুপ্রাচীন স্তোত্রপাঠ করতে করতে চলল পেছনে। সবার পেছনে রইল রক্ষীবাহিনী—তাদের মাঝে পুরুষ বেশী ধর্মপরিহিতা নেতার-তুয়া আন্তিকে নিয়ে বসে রইল রথে।

মন্দির চত্বরের বাইরের চৌকানা প্রাঙ্গণ শূন্য। কেউ বাধা দিল না। মামীদেহের শোভাযাত্রা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ঢুকল সরু পথে—আর এক মাইল গেলেই শহরের মূল তোরণ।

এবার সার দিয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল রক্ষীবাহিনী। অকস্মাৎ আশ পাশের গলিঘুঁজি থেকে কাতারে বেরিয়ে এল আবির সৈন্যবাহিনী—পুরোধা চার পুত্র।

তৎক্ষণাৎ সম্রাজ্ঞীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল ফারাওয়ের রক্ষীবৃন্দ।

হেঁকে বললে আবির এক পুত্র—'রাণীকে আমাদের হাতে সঁপে দাও। সসম্মানে রাখব তাঁকে। বাকী সবাই যেতে পারো—কারো ক্ষতি করব না।'

মারমিস এসে নেতার-তুয়ার কাছে জানতে চাইলেন, কি করা উচিত এখন?

নেতার-তুয়ার তখন রণরঙ্গিনী মূর্তি। বললে তীক্ষ্ণ স্বরে—'বলুন, মিশরের সম্রাজ্ঞী বিদ্রোহীদের হাতে আত্মসমর্পণ করবে না। ঝাঁপিয়ে পড়ুন—বধ করুন বিদ্রোহীদের।'

ফিরে গেলেন মারমিস। জানিয়ে দিলেন রাণীর অভিপ্রায়। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক তীর গিয়ে পড়ল আবির চার পুত্রের ওপর।

লড়াই শুরু হয়ে গেল এর পরেই। বড় ভয়ংকর লড়াই। মিশরের ইতিহাসে এমন অসম লড়াই কখনো হয়নি। ফারাওয়ের সৈন্য সংখ্যা মোটে পাঁচশ হতে পারে, কিন্তু সৈন্যবাহিনীর সেরা যোদ্ধা তারা। রাগে এবং বেপরোয়া হয়ে তারা লড়াই করল উন্মাদের মত। কিন্তু আবির অগণিত সৈন্যর সঙ্গে পারবে কেন? দেখতে দেখতে কমে এল সংখ্যায়—বাকী রইল মোটে পঞ্চাশজন।

নেতার-তুয়া নিজেই লড়ল বীরবিক্রমে। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে

পড়ল তার ওপর। কিন্তু যেন একটা অদৃশ্য শক্তি মুখ ঘুরিয়ে দিল প্রতিটি তীরের। ব্যর্থ করে দিল প্রতিটি তরবারির কোপ।

পিছু হটতে হটতে মন্দিরের বাইরের চত্বরে এল তুয়া—সেখান থেকে ভেতরের চত্বরে। তখন অবশিষ্ট রয়েছে মোটে বারোজন সৈন্য। উন্মত্ত বেগে ফটক দিয়ে ধেয়ে আসছে আবির সৈন্যরা—মরছে এবং মারছে। তুয়া পিছু হটে এসে দাঁড়াল মিনার অট্টালিকার সিঁড়িতে। তখন অবশিষ্ট মোটে পাঁচজন সৈন্য—তাদের মধ্যে রয়েছেন ক্ষতবিক্ষত মারমিস।

সিঁড়ি দিয়ে ওদের ঠেলে ওপরের চত্বরে নিয়ে গেল আবির সৈন্যরা। এরপর আপ্তি আর তুয়ার শয়নকক্ষ। সৈন্যরা সব মারা পড়েছে, একক মারমিস হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ালেন তুয়ার সামনে।

বললেন—'পুরুষ মানুষের পক্ষে যা সম্ভব, আমি তা করেছি। হে সম্রাজ্ঞী, এবার বিদায় নিচ্ছি। চললাম ফারাওয়ের কাছে। আমেন রক্ষা করুন তোমাকে। প্রিয়তমা পত্নী, বিদায়।'

বলে, দু হাতে দুটো তরবারি নিয়ে, পূর্বপুরুষ ফারাওদের রণহুংকার ছেড়ে সিঁড়ির ওপর থেকে আবির সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন মারমিস। মারলেন অনেককে—শেষকালে মারা পড়লেন নিজে।

চোখ ঢেকে দেওয়াল পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আপ্তি।

তুয়া তাঁর হাত ধরল—'এসো, রাজপুরুষের বউ, এসো।'

অবরুদ্ধ কণ্ঠে আপ্তি বললেন—'বিধবা বলো, রাজপুরুষ তো তোমার সামনেই মারা গেল।'

আপ্তিকে নিয়ে শয়নকক্ষের সামনে খোলা চাতালে গিয়ে দাঁড়ালো তুয়া। তখন সূর্য উঠছে পূব আকাশে। সোনালী রোদ এসে পড়ল ঝকমকে বর্মে। দূর থেকে দেখে মনে হল যেন আগুনে মোড়া অপরূপা স্থির দেহে দাঁড়িয়ে মিনার অট্টালিকার উচ্চ চাতালে।

হর্ষধ্বনি উঠল নিচ থেকে—'দেবী নেত্তার-তুয়া—আমেন কন্যা নেত্তার-তুয়া!'

থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল আবির সৈন্য বাহিনী। এক পা এগোনোর সাহসও আর নেই।

দল নায়ক নেমে গিয়ে আবিকে জিজ্ঞেস করল, কি করা উচিত এখন। আবি বেচারী ভারী দেহ নিয়ে এত উঁচুতে উঠতে পারেনি। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে—'ধরে আনো—আবার কি করবে?'

কিন্তু অগ্নিময় মূর্তির মত আমেন কন্যার অত্যাশ্চর্য সেই রূপ দেখে আতংকিত সৈন্যরা পিছু হটে এল—ওপরে উঠবে কা!

বললে ভয়ার্ত কণ্ঠে—'ফারাওয়ের প্রেতমূর্তি আগলাচ্ছে সবাকীকে। আমরা পারব না ওঁকে ধরে আনতে।'

নেতার-তুয়া মুখ খুলল ঠিক সেই মুহূর্তে:

'বিশ্বাসঘাতক আবি, মেমফিসের একদা আইনসঙ্গত আবি, ফারাওয়ের রক্তে কলুষিত-হস্ত হত্যাকারী আবি—শুনুন আপনি—শুনুন আপনারা সবাই—যারা এই নগরের বাসিন্দা, যারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আবির এই মহাপাপের দোসর হয়েছেন—আপনারা সবাই শুনুন। মৃত্যুদণ্ড দিলাম আমি আবিকে। আমি, নেতার-তুয়া, মিশরের সম্রাজ্ঞী, দেবাদিদেব আমেনের কন্যা, ভোরের তারা, দেবতার নির্দেশমত অভিশাপ দিচ্ছি—আজ থেকে আপনারা কেউ শান্তি পাবেন না। কালসর্প কুড়ে কুড়ে খাবে আপনাদের হৃৎপিণ্ড। আজ থেকে একটা মুহূর্তের জন্যেই নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন না—সুখনিদ্রা কি জিনিস তা ভুলে যাবেন। মহাপাপিষ্ঠ আবি, সিংহাসনে যদিও বা জোর করে বসেন—শান্তি পাবেন না। অষ্টপ্রহর বিপদের ঘনঘটায় আবৃত থাকবে সিংহাসন, মৃত্যু আসবে লোভের শেষ পরিণতি রূপে। মৃত্যুর পরেও নরকের দুষ্ট প্রেতদের রোষবহ্নিতে তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মরবেন আপনি। নির্বংশ হবেন—বংশে বাতি দেবার মতো কেউ আর থাকবে না আমি আমেনের কন্যা আমেনের কাছেই ফিরে যাবো এখান থেকে নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়ে। কিন্তু যাবার আগে আবার অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, জীবনে মরণে আজ থেকে নরক-যন্ত্রণারও অধিক যন্ত্রণায় ভুগবেন আপনারা সকলে।'

ভয়াবহ এই অভিশাপ শুনে ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল যোদ্ধাদের। একে একে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। একা দাঁড়িয়ে রইল আবি।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তুয়ারাণীর স্বর্ণপ্রভ জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে। তিনবার কথা বলতে গেল, তিনবারই কণ্ঠস্বর বিশ্বাসঘাতকতা করল। চতুর্থবার কর্কশ নিনাদে বেরিয়ে এল এই কটি কথা:

'হে শক্তিময়ী সম্রাজ্ঞী, ফিরিয়ে নাও তোমার অভিশাপ। বিনিময়ে আমি পথ ছেড়ে দিচ্ছি, ফিরে যাও থিবসে। আজ আমি সত্যই নির্বংশ হয়েছি। আমার চারপুত্র আজ নিহত হয়েছে। কিন্তু এই দেশ শাসনের ভার থাকুক আমার ওপর। মিশরের সিংহাসন আর চাই না—ওগো সুন্দরী, হে সম্রাজ্ঞী, ফিরিয়ে নাও তোমার অভিশাপ।'

'না। ফিরিয়ে নেওয়া আর সম্ভব নয়। এ কথা আমার নয়—বিদেহী সহায়দের কথা। সেৎ-পুত্র, যা খুশী করতে পারেন—আমার অভিশাপ রইল আপনার ওপর।'

এবার কিন্তু বিষম ক্রোধে থর থরিয়ে কেঁপে উঠলো আবি।

'আমেনের তারা, আর কোনো ভয় যখন রইল না—তখন তোমাকেও আমি ছাড়ছি না। আমার মহাশত্রু ফারাও এখন পরলোকে—কিন্তু তুমি তো আছো ইহলোকে। তুমিই হবে আমার ভার্যা। নিজের ইচ্ছায় হবে, কেউ তোমাকে স্পর্শও করবে না। যদি না হতে চাও—না খেয়ে শুকিয়ে মরো এখানে। আর যদি হতে চাও, আমার পাশে বসে মিশর শাসন করার সুযোগ পাবে। আমেন দুহিতা, ভোরের তারা—আমারও দিন আসছে।'

'সেৎ-নন্দন, সেদিন যখন আসবে, তারপর থেকেই শুরু হবে অনন্ত আতংকের রাত্রি—সে মহানিশার অন্তে—ভোরের আলো আর কোনোদিন দেখবেন না।'

আর কথা খুঁজে না পেয়ে গটগট করে নেমে গেল আবি।

আন্তিকে নিয়ে চাতাল থেকে নেমে শয়ন কক্ষে ফিরে এল তুয়া। বহু নিচে চৌকোনা প্রাঙ্গণে হাজার হাজার ভয়ার্ত প্রজা শিহরিত অন্তরে নীরবে চেয়ে রইল তাঁর অত্যুজ্জ্বল উষামণ্ডিত দেহবল্লরীর পানে।

ছদিন পর।

এই ছটা দিন মিনার অট্টালিকার চূড়ায় জল আর মধু খেয়ে দিন কেটেছে তুয়ারাণী আর তার ধাত্রীমাতার। ছাদের কোণে মৌমাছির চাক ভেঙে মধু জোগাড় করে এনেছিলেন আন্তি। জল ছিল পাত্রে। কিন্তু সামান্য আহারে শরীর নিস্তেজ হয়ে এসেছে একটু একটু করে।

ষষ্ঠদিন সূর্যাস্তের সময়ে আন্তিকে ধরে ধরে চাতালে গিয়ে দাঁড়াল তুয়া। রোজ এখানেই দাঁড়িয়ে রা দর্শন করেছে সে। পরনে তার এখনো ঝকঝকে বর্ম। রক্তলাল পড়ন্ত রোদে অগ্নিময়ী দেবীর মতই মনে হয়েছে তাকে। বহু নিচে প্রাঙ্গণে সমবেত হাজার হাজার প্রজা নির্বাক বিস্ময়ে প্রতিদিন ঠিক এই সময়টিতে চেয়ে থেকেছে তার পানে। অন্তর তাদের সমবেদনায় ভরপুর—কিন্তু আবির ভয়ে মূক। সেদিনও চাতালে এসে বীণা-কণ্ঠে রা-বন্দনা শুরু করল তুয়া। সমুদ্র উচ্ছ্বাসের মত চাপা গুঞ্জন ভেসে এল নিচ থেকে। ভয়ে বিস্ময়ে ভক্তিতে নিবিড় শ্রদ্ধায় পরক্ষণেই বোবা হয়ে চেয়ে রইল প্রজাবৃন্দ তার পানে। বন্দনা সাঙ্গ হতেই আন্তিকে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এল তুয়া। দুজনেরই শরীরে আর শক্তি নেই।

ক্ষীণকণ্ঠে তুয়া বললে—'মাগো, এবার এসো শেষ শয়ন করি। আসুক মৃত্যু।'

'না। এবার আহ্বান করা যাক পরম সহায়কে। মনে আছে জ্যোতির্ময়ী অশরীরিনী আহ্‌রার নির্দেশ ?'

'মনে আছে, আন্তি।'

'কানে কানে মন্ত্র একবারই উচ্চারণ করা যাবে। এবার সময় হয়েছে। নইলে তোমাকে আর বাঁচানো যাবে না।'

'তাহলে তাই করো। আমি ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত। ডাকো আহ্‌রা মা-কে, ডাকো ফারাওয়ের প্রেতদেহকে, ডাকো বিদেহী গুরুদের।'

'না, ডাকবো তোমার ভেতরে যে আছে—তাকে। ঘুমিয়ে পড়ো তুয়া। অন্ধকারের মধ্যে সে জাগবে। তুমি জানবে তোমার ঘুম ভাঙবার পর।'

'ঘুম ভাঙার পর ? আন্তি, তুমি কি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে প্রাণহরণ করতে চাও ? তবে তাই করো। পরপারে আছেন ফারাও—আছেন আহ্‌রা মা। তিনজন মিলে অপেক্ষা করব খামিসের। দাও মা, ঘুম পাড়িয়ে দাও; ঘুম পাড়িয়ে দাও আমাকে।'

শুয়ে পড়ল তুয়া। সুমিষ্ট কণ্ঠে ঘুমপাড়ানি গান শুরু করলেন আন্তি। অচিরেই নিদ্রিত হল তুয়া।

দুহাত সামনে বাড়িয়ে নিঃসীম অন্ধকারে প্রার্থনা শুরু করলেন আন্তি। বিরামবিহীন প্রার্থনার পর অন্তর যখন শুদ্ধ হল, তখন উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন সেই মহামন্ত্র, যা বিদেহিনী আহ্‌রা কানে কানে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

মন্ত্র শেষ হতেই সহসা নিশুতি রাত্রি যেন শিহরিত হল, অদ্ভুত কণ্ঠস্বর সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত ছড়িয়ে গেল দিক হতে দিকে। সুউচ্চ মানমন্দিরে কাকু আর মোরত্রার মাঝখানে ঝোলানো বিশাল ক্রিস্ট্যাল গোলক আচমকা চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ল মেঝেতে। অজানা আতংকে কোচ ছেড়ে ছিটকে গেল আখ।

তমালকালো নিদ্রা ঘিরে ধরল আন্তিকে। বোধহয় তা জ্ঞানহীনতার নামান্তর। নির্জনকক্ষ আবার নির্জন হয়ে এল। কবরের মত নিথর নৈঃশব্দ্য নেমে এল নিরন্ধ্র অন্ধকারে।

ঘুম ভাঙল নেতার-তুয়ার। ভোরের প্রথম প্রভা তখন মিনার বাতায়ন দিয়ে প্রবেশ করছে ঘরে। ছায়া মায়ার মধ্যে দিয়ে দেখল চেয়ারে বসে দুহাতে মাথা ন্যস্ত করে ঘুমোচ্ছেন আন্তি। তারপরেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হল একটা

উজ্জ্বল মূর্তির দিকে। শয্যার পায়ের কাছে জোড়া মুকুট মাথায় দিয়ে রাণী বেশে দাঁড়িয়ে আছে অপার্থিব আলোর আলোকিত একটা মূর্তি—এ আলো যেন চন্দ্র আর নক্ষত্র জগৎ থেকে ধার নেওয়া। পৃথিবীর কোনো আলো নয়। দেখেই চিনল তুয়া।

সে নিজে দাঁড়িয়ে নিজের পায়ের কাছে!

ক্ষীণ প্রভায় সমুজ্জ্বল সেই বিচিত্র মূর্তি দেখে তুয়া ভাবল বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে। উপলব্ধি করল, তার শেষ ক্ষণ সমাগত। ঘুমের মধ্যেই আস্তির জাদুশক্তি তার প্রাণপাখীকে টেনে এনেছে বাইরে! সে মরতে চলেছে।

ক্ষুধায় অবসন্ন নেতার-তুয়ার দু-চোখ সহসা জলে উঠল বিশ্বাসঘাতক আবিকে কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করতে পারার সুযোগ না পাওয়ায়। কিন্তু একী! পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা আলোকময়ীর দু-চোখও যে দপ্ করে জলে উঠল ভয়ংকর ক্রোধে—উত্তাল হল বক্ষদেশ—বক্ষালঙ্কার দুলে উঠল উদ্বেল বক্ষদেশে!

সহসা ঘোর কেটে গেল। অবিশ্বাস্য সেই জ্যোতির্ময়ী হেঁট হয়ে ঈষৎ দ্বিধাবিভক্ত অধরোষ্ঠে বললে ফিস ফিস করে—'জাগো, সম্রাজ্ঞী, জাগো! পূর্ণ হবে তোমার মনস্কামনা। মর্নিং স্টার, আমি তোমার আজ্ঞাবহ সেবিকা—তোমার আদেশ প্রতিপালন করতেই যে এসেছি।'

কণ্ঠস্বর তার নিজের!

অলৌকিক স্বপ্নদর্শন নিঃসন্দেহে। শয্যায় উঠে বসে হেসে উঠল তুয়া।

বললে—'আমার মনস্কামনা! ওগো স্বপ্ন সুন্দরী, উপোসী ভিক্ষুকের মনস্কামনা কি হয়, তা কি তুমি জানো না? শুধু এক টুকরো রুটি, আর এক পাত্র জল।'

ক্রিস্টাল কৃপাণ দুলিয়ে কোচের পাশে টেবিল দেখিয়ে বললে আলোকময়ী—'ঐ তো রয়েছে জল আর রুটি!'

অলসনয়নে চোখ ফেরালো তুয়া। প্রদীপ্ত হল চক্ষু! টেবিলের ওপর রয়েছে রুপোর পেয়ালায় জল, আর সোনার রেকাবীতে রুটি। এ পেয়ালা সেই পেয়ালা যা তাকে শৈশবে উপহার দিয়েছিলেন পিতৃদেব ফারাও। হাত বাড়িয়ে পেয়ালা তুলল ঠোঁটের কাছে—সুপেয় সুমিষ্ট জলধারায় স্নিগ্ধ হল তৃষিত কণ্ঠ। পরক্ষণেই তুলে নিল রুটির টুকরো। বুভুক্ষুর মত আহার করল শেষ টুকরোটাও। স্বপ্ন এত মধুর হয়!

কিন্তু শেষকণা খাদ্যও তো উদরস্থ করে বসে আছে তুয়া! একী স্বার্থপরতা! মরণোন্মুখ আস্তির জন্যে তো কিছুই রইল না!

তারই মত বীণাঝঙ্কৃত কণ্ঠে অমনি বললে মনোরমা আলোকময়ী—'ভাবনা কী? চেয়ে ছাখো, খাবার আবার তৈরী!'

সত্যিই তো! সোনার রেকাবীতে আবার হাজির হয়েছে রুটি,রুপোর পেয়ালা আবার ভরে উঠেছে জলে!

'মর্নিং স্টার!' সুমিষ্ট স্বরে বললে রহস্যময়ী—'শুধু উদরপূর্তিই তোমার কাম্য নয়। যাচ্ঞা কি ব্যক্ত করো। আমি এসেছি তোমার হুকুম তামিল করতে।'

সীমাহীন প্রতিহিংসা স্পৃহা জাগ্রত হল তুষারাণীর রুধির প্রবাহে। বললে দৃপ্ত কণ্ঠে—'চাই প্রতিহিংসা। চাই বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি! চাই পিতার হত্যাকারীর চরম লাঞ্ছনা।'

'পূর্ণ হবে তোমার মনস্কামনা,' কৃস্ট্যাল কৃপাণ শূন্যে আন্দোলিত করে বললে ছায়াময়ী—'বিষের ফোঁটা যে-ভাবে ঝরে ঝরে পড়ে ধমনীর রক্ত প্রবাহে—সেইভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে তোমার—এমন প্রতিহিংসা নেবে যা তুমি কল্পনাও করতে পারছো না। প্রেম প্রত্যাখ্যানের উৎপীড়ন, ক্ষমতা পেয়ে হারানোর উৎপীড়ন, ভয়ংকর আতংকের উৎপীড়ন, মৃত্যুসম লাঞ্ছনার উৎপীড়ন—সবার ওপরে কুড়ে কুড়ে বিবেক দংশনের উৎপীড়ন পাগল করে দেবে তোমার পিতৃঘাতক আমিকে। মর্নিং স্টার, এ ছাড়া আর কোনো যাচ্ঞা তোমার নেই?'

'আছে। কিন্তু স্বপ্নের ঘোরেও তা মুখে প্রকাশ করতে পারছি না।'

'সে যাচ্ঞাও পূর্ণ হবে। বহুদূরের দেশে পাবে তোমার প্রাণের পুরুষকে। যুগলে ফিরবে স্বদেশে, যুগলে শাসন করবে সারা মিশরদেশ। তোমাদের গৌরব গাথা গীত হবে ঘরে ঘরে—মৃত্যুর পরেও।'

এবার যেন স্বপ্নভঙ্গ ঘটল তুষারাণীর। দুহাতে চোখ কচলে দেখল, ঐ তো আমি ঘুমোচ্ছেন চেয়ারে। কোচের পায়ের কাছে ভোরের আলোয় সমুজ্জ্বল রাণীবেশ পরিহিতা রহস্যময়ী মৃদু মৃদু হাসছে তার দিকে চেয়ে।

'কে তুমি? অধিদেবী, না, প্রেতিনী? উন্মাদ স্বপ্নে বিভোর হয়েছি বলে কি বিদ্রূপ করছো?'

'কোনোটাই না। হে মর্নিং স্টার, আমি তো তুমিই। তোমার কা। আমাদের বাবা আমেন আমাকে দান করেছিলেন তোমার জন্ম মুহূর্তে তোমার সঙ্গে থেকে তোমাকে আগলে রাখার জন্যে। ছেলেবেলায় একসাথে কত খেলা করেছি মনে পড়ে না?'

'পড়ে। তুমিই তো নিষেধ করেছিলে ভয়ানক কুমীরের সামনে যেতে।

তারপর থেকে আর তো তোমায় দেখিনি। রক্তমাংসের চেহারা নিয়ে আমার সামনে আবির্ভূত হওয়ার এত শক্তি তুমি পেলে কোত্থেকে?'

'আস্তির ইন্দ্রজালেই শক্তি পেয়েছি, মর্নিং স্টার। পরলোকের এক শুভ শক্তি মহামন্ত্র দান করে গিয়েছিল আস্তির কানে কানে চরম বিপদের মুহূর্তে আমাকে দৃশ্যমান করার জন্যে। আমাকে তুমি এতদিন দেখতে পাওনি ঠিকই, কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে তোমার সঙ্গে থেকেছি, তোমাকে আগলে রেখেছি। আমি যে তোমার অনন্তকালের সঙ্গী। আমি আছি তোমার জীবনে, থাকব মরণেও। আগলে রাখব তোমাকে শবাধার শয়নে—পুনর্জীবিত না হওয়া পর্যন্ত। আমার যে শক্তি, তা তোমার মধ্যেও আছে—কিন্তু তুমি তা টের পাও না। অতীত আমার সামনে সুস্পষ্ট—ঠিক যেমনি সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎ। সীমাহীন, অন্তহীন সেই ভবিষ্যৎ তোমার চোখে অদৃশ্য—কিন্তু আমার চোখে নয়—বৃক্ষের একটি পত্রের মত, বালুকা মরুভূমির এক কণিকা বালির মত সেই ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাই। জীবন-পুঁথি আমার হাতে—ভাগ্য কেতাবের প্রতিটি পৃষ্ঠা আমার চোখের সামনে। দেবতারা আমার কানে কানে কথা বলে যান—আমি তাদের মুখাবয়ব চোখের সামনে দেখতে পাই। অনন্তের ক্রোড়ে আমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই, যাত্রা সাঙ্গ হলে, কর্তব্য সমাপ্ত হলে—ফিরে যাই সেই অনন্তের ক্রোড়ে—তোমাকে নিয়ে। হে মর্নিং স্টার, আস্তির মন্ত্রোচ্চারণে তোমারই রক্ত মাংসে আজ আমি মূর্তি পরিগ্রহ করেছি তোমার হুকুম তামিল করার জন্যে।'

আর সইতে পারল না তুয়া। তীব্র কণ্ঠে ডেকে তুলল আস্তিকে। আস্তি উঠে দেখলেন দ্বিতীয় তুয়ারাণীকে। কিন্তু একটি কথাও বললেন না।

বললে কা—'খেয়ে নাও, আস্তি। সময় খুব সংক্ষিপ্ত।'

পানাহার সমাপন করলেন আস্তি। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল স্বর্ণরেকাবী এবং রৌপ্য পেয়ালা।

ভ্রূক্ষেপ না করে ধীর স্থির কণ্ঠে বললেন আস্তি—'হে রাজনক্ষত্রের ছায়া-দেবী, অনাহারে মরতে বসেছিলাম আমরা। বাইরের ফটকে ওৎ পেতে রয়েছে আমি। রাণী প্রাণে বেঁচে গেলে টেনে গিয়ে ভার্যা করবে, মরে গেলে তার সিংহাসন দখল করবে। আমাদের বুদ্ধির দৌড় ফুরিয়েছে। বলো এখন কি করব। রাণীকে বাঁচাতে হবে। মর্যাদার সঙ্গে শেষদিন পর্যন্ত যাতে সিংহাসনে থাকতে পারে, সে ব্যবস্থাও করতে হবে।'

'এই কি সব চাওয়া?' বললে কা

ঝটিতি জবাব দিলে তুয়া—'না, একা সিংহাসনে বসতে চাই না আমি।

চাই আর এক নক্ষত্রকে আমার পাশে।'

'যদি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারো, তবেই পূর্ণ হবে মনস্কামনা—নইলে নয়।'

চোখে চোখে চাইল দুই রমণী—মাথা হেলিয়ে সায় দিল তুয়া।

আন্তি বললেন—'আস্থা আছে বই কি। যা বলবে, তাই করব।'

'তাহলে শোনো। আবি এখুনি আসবে। রাণী এখানেই অনাহারে শুকিয়ে মরতে চায়, না, তার সঙ্গে গিয়ে স্ত্রী হতে চায়—জিজ্ঞেস করবে। রাণীর বদলে আমি গিয়ে হব তার স্ত্রী। এমন স্ত্রী হব যা কখনো কোনো পুরুষ কল্পনাও করতে পারে নি।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর হয়ে উঠল ছায়াময়ীর চোখের চাহনি—'অভিশাপকে পরিণয় করলে পুরুষের যা পরিণাম হয়, আবির হবে তাই।'

মৃদু হাসল তুয়া। হাসলেন আন্তি। দুজনেই বুঝেছেন পরিণয়ের পরিণামটা কী।

তুয়া বললে—'আমার বদলে তুমি বসবে সিংহাসনে—পাশে ফারাও হয়ে বসবে আবি। কিন্তু মিশর আর আমার প্রজার কি হাল হবে?'

'যদ্দিন না তুমি ফিরে আসছো সিংহাসনের দাবী দিয়ে, তদ্দিন কোথাও কোনো অশান্তি দেখা দেবে না।'

'আমার আর আন্তির কি হবে?'

ক্রিস্ট্যাল কৃপাণ তুলে জানলার দিকে দেখালো তুয়ার সূক্ষ্মদেহ। জানলার কয়েকশ ফুট নিচে বইছে নীলনদের দুধের মত সাদা জল।

'জনক নীলের ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত থাকবে।'

বিস্ফারিত দৃষ্টি বিনিময় করলেন আন্তি আর তুয়া।

তুয়া বললে—'এত উঁচু থেকে নিচে লাফিয়ে পড়া মানেই অসিরিসের পায়ে ঠাঁই নেওয়া। এই কি আমাদের পরিণাম?'

'আমার ওপর আস্থার এই বুঝি নমুনা? আর কিছু বলার প্রয়োজন দেখছি না। যা ভাল বোঝো, করো। আবি এসে গেল বলে, ঠিক করে নাও কি করবে। আমার ওপর ভরসা রাখবে?' দূরে শোনা গেল ঝন্ ঝনাৎ শব্দে খুলে গেল মন্দিরের ব্রোঞ্জ কপাট।

শিউরে উঠল তুয়া। সটান দাঁড়িয়ে উঠল কোচ ছেড়ে। বললে দৃপ্ত কণ্ঠে—'মনস্থির হয়ে গেছে। ফারাওয়ের মেয়ে কাপুরুষ নয়। আবির বাহু অথবা কারাগারে বিলম্বিত মৃত্যুর চেয়ে অনেক শ্রেয় অসিরিসের পদতল। হে সূক্ষ্মদেহী, ভরসা রইল তোমার শক্তিতে।'

আন্তির পানে চাইল কা। মাথা হেলিয়ে আন্তি বললেন—'মারমিশ যেখানে গেছে, আমার রাণীও যদিও সেখানে যেতে চায়, আমি বাদ যাবো কেন?'

ইঙ্গিতে জানলার সামনে পাশাপাশি দুজনকে কোমর জড়িয়ে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল কা। কৃপাণ তুলে উচ্চারণ করল কয়েকটা অস্ফুট শব্দ।

আগুনের ঝলক দেখা দিল দুজনের চোখের সামনে। হু-হু বাতাস আছড়ে পড়লো ললাটে। তারপর আর কিছু মনে রইল না।

(১১) আবির স্বপ্ন দর্শন

নেতার-তুয়ার কা যে রাত্রে আবির্ভূত হল কায়ামূর্তি ধারণ করে, সেই রাত্রেই কাকুর মানমন্দিরে বিরসবদনে বসেছিল মেরিত্রা।

তোষামোদ করে কাকু বলেছিল—'সুন্দরী, মন খারাপ কেন?'

ঘাড় ফিরিয়ে বার বার পেছন দিকে কি যেন দেখতে দেখতে মেরিত্রা বললে—'বরাতে আমার অনেক দুর্ভোগ আছে মনে হচ্ছে।'

'কেন, সুন্দরী কেন? স্বয়ং সেৎ যে জাদুমূর্তি বানিয়েছে, তার কাজও হয়েছে চমৎকার। তবে ভয় কি?'

রেগে গেল মেরিত্রা—'দুষ্ট জ্যোতিষী, আমার সঙ্গে চালাকি খেলেছো তুমি। কথা ছিল ফারাওকে কেবল খোঁড়া করে দেব। আমার ভাল ছাড়া মন্দ কখনো করেন নি তিনি—কিন্তু তাঁকে খুন করেছি আমি।'

'চুপ! চুপ! দেওয়ালেরও কান আছে! খুন তো তুমি করোনি। মহামূর্খ এক পুরোহিত বেদীর ওপর জাদুমূর্তি পুড়িয়ে ফেলেছে বলেই ফারাও মারা গেছেন।'

দোষ হল আমারই। সারা মিশর জেনে যাবে আমি জাদুকরী। পুড়িয়ে মারবে আমাকে। বদমাস জ্যোতিষী, সেৎ-য়ের কদাকার পুত্র, তোমার জন্যে নরকে পচতে হবে আমাকে।'

চিবুক চুলকোতে চুলকোতে দাঁত বার করে হাসল কাকু।

আরো খেপে গেল মেরিত্রা—'পাহাড়ী বাঁদরের মত আর হেসো না। এর শেষ কি, বলো।'

'শেষ জেনে কি করবে, মেরিত্রা? এ সংসারে শেষ বলে কি কিছু আছে? শেষ যেখানে, শুরু আবার সেইখান থেকেই—সেরা দার্শনিকরা তাই বলেন। সর্প-প্রতীকের কথা ভেবে দেখো, সারা বিশ্বচরাচরকে যে বেড় দিয়ে রয়েছে মুখের মধ্যে ল্যাজ পুরে—শেষ যেখানে হচ্ছে—শুরু

হচ্ছে—সেখান থেকেই। মিশরের সমস্ত সমাধি মন্দিরে দেখবে এই প্রতীক চিহ্ন—।'

'সাপ আর সমাধিমন্দিরের কথা বন্ধ করো বলে দিচ্ছি—,'চিৎকার করে উঠল মেরিত্রা।

'তা যা বলেছো। মিশরবাসীরা সমাধি নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে—যার পরের জগৎ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ যখন রয়েছে, তখন তা নিয়ে এত উন্মত্ততার কোনো মানে হয়? ভালই বলেছো, সমাধি আর সর্পের কথা এখন থাকুক। জীবন আর প্রাসাদ নিয়ে কথা বলা যাক। ফারাও মরেছেন, আখির চার পুত্র মরেছে, ফারাওয়ের পাঁচশ রক্ষীও মরেছে। আজ আমি লিখিত নিয়োগপত্র পেয়েছি আখির কাছ থেকে—আজ থেকে আমি তার প্রধানমন্ত্রী—শীগগিরই ফারাও হয়ে যাওয়ার পর আমিই হব মিশরের দ্বিতীয় সর্বশক্তিমান পুরুষ—তুমিও আজ থেকে আমার স্ত্রী পদবাচ্য হয়েছো। উৎসবের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে সে স্বীকৃতি পেয়েছো।'

'তার চাইতে অনেক ভালো ছিল ফারাওয়ের সেবিকা হয়ে থাকা। কাকু, আমার বড় ভয় করছে। ক্ষমতা যদি থাকে, দেখাও আমার ভবিষ্যতে কি আছে।'

'ক্ষমতা যদি থাকে মানে? জাদুমূর্তির অ্যাডভেঞ্চার দেখবার পরেও আমাকে জোচ্চোর মনে করো?'

'ওটা একটা দুর্ঘটনা হলেও হতে পারে। ফারাও বৃদ্ধ এবং দুর্বল ছিলেন। এর আগেও একটা ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছেন। ক্রিস্টাল গোলকে দেখতে চাই আমার ভবিষ্যৎ।'

'কিন্তু তার জন্যে মনটা ঠাণ্ডা রাখা দরকার—যা তোমার এখন নেই। তবুও চেষ্টা করা যাক। স্থির হয়ে বোসো—মন্ত্রোচ্চারণ করতে দাও।'

দুজনের মাঝখানে ঝুলছিল বিশাল ক্রিস্টাল গোলক। মন্ত্রপাঠ এবং আবাহন সঙ্গীত সাঙ্গ করল কাকু। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ একটা গাঢ় ছায়া গোলকের মধ্যে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। তারপরেই দেখা গেল ফারাওয়ের মমীদেহ। আচমকা পটিবাঁধা একটা হাত তুলে মমীদেহ আঘাত হানল যেন ক্রিস্টাল গোলকে। বিকট চেঁচিয়ে উঠল মেরিত্রা। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটল ক্রিস্টাল গোলকে। টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল বড় বড় কাঁচ। একটা টুকরো সবেগে আছড়ে পড়ল মেরিত্রার মুখে—এত জোরে যে সামনের দুটো দাঁত উপড়ে এল এক আঘাতেই এবং দু-টুকরো হয়ে গেল ঠোঁট।

বুক ভাঙা চিৎকার করে উলটে পড়ল মেরিত্রা। ভীষণ চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে পলায়ন করতে গিয়েও কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেল কাকু।

মুখের রক্ত মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়িয়ে বিহ্বল কণ্ঠে বললে মেরিত্রা—'কি হল বলো তো?'

কম্পিত কণ্ঠে কাকু বললে—'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। অধিদেবতারা বোধ হয় ভবিষ্যৎ দেখাতে চান না। বেশ তো, তাহলে বর্তমান নিয়েই সুখী থাকা যাক।'

রেগে টং হয়ে চিলের মত চেঁচিয়ে মেরিত্রা বললে—'বর্তমান মানে তো কাটা ঠোঁট আর ফোকলা মুখ! ছিলাম সুন্দরী, হলাম শূকরী—হলাম তোমার জন্যে! বদমাস কোথাকার! স্পষ্ট দেখলাম, মামী হাত বাড়িয়ে গোলক চুরমার করে দিল মৃত ফারাও, সেৎপুত্র শূকর কোথাকার! এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।'

বলেই ছিটকে গিয়ে কাকুর টুপি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দু-হাতে পড় পড় করে পরচুলা ছিঁড়ে আনল মেরিত্রা।

ঠিক সেই সময়ে নীরক্ত পাংশুমুখে ভয়ার্ত চোখে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকল আবি।

'একী! এই কি তোমার রাত জেগে পড়াশুনার নমুনা!'

'নিশ্চয় না, মহামতি যুবরাজ,' আড়চোখে মেরিত্রার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল কাকু। ছিন্ন পরচুলা হাতে পাশেই মারমুখো ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে ছিল সে। 'সদ্য বিয়ে করা এই স্ত্রী-টা নারকীয় মেজাজের একটুখানি নমুনা দেখাচ্ছিল আমাকে।'

'ফের যদি মুখ দিয়ে ঐ ধরনের কথা বেরোয় তো জানলা দিয়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেবো! কুকুরে ছিঁড়ে খাবে জাদুকরের মাংস। দেখুন মহামান্য, দেখুন আমার কি হাল করেছে বদমাস জ্যোতিষী। ক্রিস্ট্যাল গোলকে ভবিষ্যৎ দেখাচ্ছিল। মৃত ফারাওয়ের মামী ঘুসি মেরে ভেঙে দিল গোলকটা। কাচের টুকরোয় এই দেখুন আমার দুটো দাঁত ভেঙে গেছে—ঠোঁট কেটে ফাঁক হয়ে গেছে।'

'চোপরাও মাগী,' হুংকার ছাড়ল আবি। 'আর একটা কথা বললে এমন বেত চালাবো পায়ের পাতায় যে ঠোঁটের জ্বালাও তখন মিষ্টি মনে হবে। কাকু, ফারাওয়ের মামী কি করেছে? এই ব্যাপারে তো আমিও কথা বলতে এসেছি।'

'হে উত্তরের প্রশাসক, রাজরক্তধারী, মহামান্য কাউন্ট —'

'উপাধি বাদ দাও মূর্খ। আমি এসেছি পরামর্শ নিতে—স্তুতি শুনতে নয়। এই মাত্র স্বপ্নে দেখলাম সারা গায়ে পটি জড়িয়ে ফারাওয়ের মামী— ।'

'বলের মধ্যে আমিও তো সেই দৃশ্য দেখলাম,' বলে উঠল মেরিত্রা—'কিছু ছুঁড়ে মারল নাকি ?'

'তার চাইতেও জঘন্য কাণ্ড করল। কথা বলল। বললে, ভাই আমার, যদিও আমাকে হত্যা করেছো, আমার মেয়ে আর তার ধাই-মা'কে অনাহারে মারছো, তবুও ক্ষমা করেছি তোমাকে। অসিরিসের বিচারালয়ে সে বিচার হবে'খন। আপাততঃ দেবতারা এসে তোমার জন্যে একটা বার্তা রেখে গেলেন। আবি, মন্দিরে যাও ভোরের মুহূর্তে। রাণীরূপিনী প্রতীক্ষায় রয়েছে তোমার। সাদরে নিয়ে এসে বিবাহ করো তাকে। রাজত্ব করো সিংহাসনে বসে। তারপর একদিন বিশেষ বার্তা নিয়ে আসবে রামিস আর আর এক ভিক্ষুক। থিবসে গিয়ে সমাহিত করো আমার নশ্বর দেহ আমারই তত্ত্বাবধানে তৈরী সমাধি মন্দিরে—ঠিক পাশেই খুঁড়ে রাখো তোমার কবর। কেননা তোমার মরণ হলে আমার এই কা, যে তোমাকে এখন দেখা দিচ্ছে, আসবে তোমার কাছে।

'আর একটিও কথা না বলে শীতল চাহনি মেলে চেয়ে রইল মামীটা। তারপর আমার চার মৃতপুত্র এসে বহন করে নিয়ে গেল তাকে। হাওয়ায় কম্পমান নলখাগড়ার মত কাঁপতে কাঁপতে ঘুম থেকে উঠেই ছুটে এসে দেখি নিম্নশ্রেণীর এই মাগীটা তোমার নকল চুল ছিঁড়ছে।'

মেরিত্রা এ সব গালাগাল সহ্য করার পাত্রী নয়। কিন্তু পুরুষ দুজনের কটমটে চাহনির সামনে নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করল।

আবি বললে—'কাকু, চটপট বলো স্বপ্নের মানে কি। না পারলে বেত মেরে তোমার পায়ের ছাল তুলে দেব—প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নামিয়ে দেব। মনে রেখো, তুমিই এই পথে আমাকে নামিয়েছো।'

বিপদ আসন্ন দেখে ধীরস্থির হয়ে গেল কাকু—ধূর্ততা ঝিলিক দিয়ে উঠল দুই কৃষ্ণ চক্ষুতে।

'সত্যিই আমি আপনাকে নামিয়েছি এই পথে। অনেক উঁচুতে ওঠার গৌরবময় পথে গোড়া থেকেই আপনাকে নিরাপদেও রেখেছি। আমার পরামর্শ না নিলে আজ্জিনে লোকে আপনাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই মনে রাখত। থিবসের সেই রাতের কথা মনে করে দেখুন। আমি আপনাকে না বোঝালে, গোঁয়ারের মত ফারাওয়ের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছারখার হয়ে যেতেন। ভেবে দেখুন, এমনি আরো কত বিপদ থেকে

আপনাকে আমি রক্ষে করেছি। এটাও পরম সত্য যে অতীতের মত ভবিষ্যতেও আমার পরামর্শ ছাড়া আপনি ধুলোয় মিলিয়ে যাবেন। ভেবে দেখুন কি করবেন। আমাকে ছাড়া যদি চলতে পারেন, বেছে নিন আর কাউকে প্রধানমন্ত্রী স্বরূপ—যত পারেন বেত ভাঙুন আমার পিঠে আর পায়ে —আপনার ভবিষ্যৎ তাতে ভালো হবে না।'

দমে গেল আমি—'ঠিক আছে, একই জালে জড়িয়ে গেছি যখন, তখন তোমার কথাই শোনা যাক। ভয় নেই, প্রতিশ্রুতি মত পুরস্কার তুমি পাবে।'

'এইমাত্র অবশ্য বেত মারার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,' মুখভঙ্গী করে পরচুলার ছিন্নাংশ শিরে ন্যস্ত করতে করতে বললে কাকু—'যাক গে সে কথা, আপনার স্বপ্নবৃত্তান্ত নিয়ে কথা বলা যাক। ফারাও আপনার কাছে কিন্তু জীবন্ত শরীর নিয়ে আসে নি—এসেছিল মড়ারূপে। মড়াকে এত ভয় করার কি আছে?'

জল দিয়ে কাটা ঠোঁট ধুতে ধুতে ঝাঁঝিয়ে উঠল মেরিত্রা—'ভয় আমি পাচ্ছি। মড়াই তো আমার দাঁত উপড়ে ঠোঁট কেটে দিয়েছে।'

'জিভটা এবার কেটে দেবো আমি,' গর্জে উঠল আমি—'কাকু, কর্ণপাত কোরো না—বলে যাও।'

'কি বলল ফারাও? না, তার মেয়েকে বিয়ে করে ফারাও হওয়া যাক এবার। ঠিক এইটাই তো আপনার মনের সাধ।'

'কিন্তু কে একটা রামিস আসবে, তারপর আমি আমার কবর খুঁড়ে রাখব —এ কথা বলা হল কেন?'

'রামিস? মেরিত্রা জানে তার ব্যাপার। কেশ-যুবরাজকে খুন করে সে এখন প্রায়শ্চিত্ত করতে গেছে কেশ-রাজার কাছে। ভিখিরিকে নিয়ে ফিরে এলে কিভাবে তার শাস্তি বিধান করতে হয়, আপনি তা জানেন।'

'কিন্তু রাণী তাকে কিভাবে নেবে? অনেক গুজব শুনছি—'

'মিথ্যে গুজব। রামিস ফারাও বংশোদ্ভূত। পথের কাঁটা কে না সরাতে চায়? তার মা আবার রাণার ধাই-মা। তাই একঢিলে দু-পাখী মেরেছে রাণী। যদিও বা জীবিত ফিরে আসে, আপনি জানেন ভিক্ষুকসহ রামিসের প্রাণ কি করে নিতে হয়।'

প্রফুল্ল কণ্ঠে আমি বললে—'তা না হয় করা যাবে। কিন্তু ফারাও সমাধি সম্পর্কে ঐ সব কথা বলে গেল কেন?'

'মড়া তো সমাধি সম্পর্কেই কথা বলবে। আমরাও যখন মরব, সমাধি নিয়ে কথা বলব। আপাততঃ এই জীবনের সুখসম্পদ রূপরস বর্ণগন্ধ নিয়ে কথা বলা যাক। বিয়ে করে ফেলুন সুন্দরী তুয়ারাণীকে। দরকার তাকে—

ফারাওয়ের ভূতকে নয়।'

'তা ঠিক। দরকার তুয়াকে—কিন্তু আর একটা প্রশ্ন। ফারাওয়ের স্বামী 'তুয়া' নামটা একবারও না বলে রাণীরূপিনী বলল কেন? এমনভাবে বলল যেন সম্রাজ্ঞীর রূপে আর কেউ—তুয়া নয়? মানবীও নয়!'

দ্বিধায় পড়ল কাকু। জবাব খুঁজে পেল না। পরক্ষণেই দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বললে—'সে যে মাম্বীর অধিক—আমেনের কন্যা। স্বয়ং দেবী। রাণীরূপিনী উপাধি তো তাকেই মানায়। এবার বলুন তো আপনার চার ছেলে মমীদেহ বয়ে নিয়ে গেল কেন?'

'মারা গেছে বলে,' গুম হয়ে গেল আখি।

'মরেছে তো বীরের মত। তা নয়, প্রিন্স, তারা বেঁচে থাকলে আপনার ঔরসজাত তুয়ারাণীর সন্তানসন্ততিদের সঙ্গে আপনার চারছেলের বিবাদ বাঁধতো সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে।'

'তা হবে,' বিষয়টা কষ্টদায়ক বলে হস্ত সঞ্চালনে উড়িয়ে দিল আখি—'কিন্তু সম্রাজ্ঞীকে টেনে আনি কি করে বলো তো? শুকিয়ে মরছে, রোজ সূর্য ডোববার সময়ে রা-কে আর প্রজাদের শুনিয়ে গান গাইছে। প্রজাদের সহানুভূতি এখন তার ওপর। আজ বিকেলেই শোভাযাত্রা করে তারা প্রাসাদের সামনে দিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে গেলো—'খেতে দিন, সম্রাজ্ঞীকে খেতে দিনে! যেতে দিন—যেখানে চান, সম্রাজ্ঞীকে যেতে দিন।' এতদিন থিব্‌স্ শহরেও খবর গিয়ে পৌঁছেছে নিশ্চয়—সৈন্যসামন্ত নিয়ে ওরা এল বলে।'

'স্বপ্নে যে আদেশ পেয়েছেন, ঠিক তাই করুন। ভোরের মুহূর্তে চলে যান। মহাসমারোহে এনে প্রজাদের সামনে বিয়ে করে ফেলুন।'

'কিন্তু আস্তিকে নিয়ে কি করবো?'

থুৎনি চুলকে নিল কাকু। মাথায় দুষ্টবুদ্ধি এলেই থুৎনি চুলকোনো তার অভ্যেস।

বললে—'বয়স হয়েছে আস্তির। পতির শোকে ভেঙেও পড়েছে। ক্ষিদেয় মরতে বসেছে। এর পরেও যদি বেঁচে থাকে তো মেরিত্রা তার দেখাশুনা করবে'খন। মেরিত্রা, পুরোনো বান্ধবী আমার—পারবে না?'

সজোরে বলল মেরিত্রা—'নিশ্চয় পারবো। বেড়াল যে ভাবে বিহঙ্গকে দেখাশুনা করে, সেইভাবে দেখাশুনা করব। কিন্তু তুমি সাবধান, তোমার চাইতে অনেক বেশী জাদু জানে আস্তি। তার জাদুক্ষমতার উৎস স্বর্গ—তোমার জাদুশক্তির উৎস কিন্তু নরক। দেবতারা সাহায্য করে তাকে—তোমাকে করে শয়তানরা।'

ঊষার প্রথম প্রভায় চতুর্দোলায় চেপে মন্দির তোরণের সামনে উপস্থিত হল আবি। ভারী দেহ নিয়ে এতটা পথ হেঁটে আসতে কষ্ট হচ্ছিল বলেই এল লোকের ঘাড়ে চেপে—উপদেষ্টারা এবং কাকু এল কিন্তু পায়ে হেঁটে। ব্যাঘ্রমুখী শেখেৎ দেবীর প্রাচীন দেবালয়ের সামনে চতুর্দোলা থেকে নেমে তোরণ পেরিয়ে এল আবি—কেউ বাধা দিল না—বাধা দেওয়ার যারা ছিল, তারা সবাই নিহত। ঢুকল ভেতরের প্রাঙ্গণে।

কাকুকে শুধোলো—'কোথায় তাকে পাওয়া যাবে বলো তো?'

'মিনার অট্টালিকার ওপরকার ঘরে—যেখানে সে রয়েছে না খেয়ে,' বললে কাকু।

'মিনার অট্টালিকার ওপরে উঠতে হবে?' গুঙিয়ে উঠল আবি—'তোমার মানমন্দিরে উঠেই জিভ বেরিয়ে গেছে একটু আগে—আবার? ঠিক আছে, যাওয়াই যাক।'

সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে বেড়ালের মত টপাটপ লাফ দিয়ে উঠে গেল কাকু—আবিকে পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে গেল উপদেষ্টারা।

তৃতীয় চাতালে পৌঁছে সবাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আবি। বললে ফিসফিস করে—'ধড়ফড় কোরো না। হঠাৎ গিয়ে পড়লে চমকে উঠে চাতাল থেকে নীলনদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সম্রাজ্ঞী। একটু দাঁড়াও দম নিয়ে আমি ডাকবো'খন।'

দম নেওয়া হলে পর ইনিয়ে বিনিয়ে স্তবস্তুতি করে ভাবীবধূকে আহ্বান জানাল নরপিশাচ আবি। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। পরপর তিনবার ডেকেও যখন কারোর সাড়া পাওয়া গেল না, তখন ভয় পেয়ে গেল আবি। সম্রাজ্ঞী অনাহারে মরে গেল না তো? তাহলে তো পেত্নী হয়ে নির্ঘাৎ ঘাড় মটকাবে তার। গোটা মিশর খেপে যাবে সম্রাজ্ঞীর এহেন শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ শুনলে।

হেঁকে বললে—'কাকু, তুমি জাদুকর। ভয় কাকে বলে তুমি জানো না। যাও, গিয়ে দেখে এসো কি ব্যাপার।'

কিন্তু ভয় কাকে বলে, কাকু তা জানে বইকি। তাই নড়ল না। শেষকালে সীডার কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে আবি খোঁচা মারল পিঠে, তখন কম্পিত কণ্ঠে স্তবগান গাইতে গাইতে উঠতে লাগল একটা-একটা ধাপ। অনেকক্ষণ পর সম্রাজ্ঞীর শয়ন কক্ষের দরজার সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ে দেখলে ঘর শূন্য। সেখান থেকে গেল আস্তির ঘরে। সে ঘরও শূন্য। ভয়ের চোটে মরিয়া হওয়ায় এবার বুকে বল ফিরে এল। উঠে গেল নীলনদের ধারের

সেই চাতালের ওপর—যেখান থেকে প্রতি সূর্যাস্তে রা বন্দনা করেছে তুয়া-রাণী। কিন্তু সে স্থানও শূন্য।

তখন পড়ি কি মরি করে দৌড়ে এসে বললে আবিকে—'হে মহামাহিম, ওরা পালিয়েছে।'

ধাঁ করে রেগে গেল আবি—'তা-রের নাম নিয়ে বলছি, তোমার কু-পরামর্শের জন্যেই এই কাণ্ড হল। থিবসে যদি পালায়—সৈন্যবাহিনী এসে কচুকাটা করবে আমাকে। নীলনদের তলায় যদি আশ্রয় নেয়—অধিদেবতারা নরকের পাঁকে ডুবিয়ে মারবে আমাকে—সেটা আরো ভয়ানক। ভণ্ড কোথাকার, এই হল গিয়ে তোমার স্বপ্ন ব্যাখ্যা।'

আহত কণ্ঠে কাকু বললে—'মন্দিরটা আগে খুঁজে দেখুন, তারপর গালা-গাল দেবেন।'

শুরু হল মন্দির খোঁজা। সব কটা সভাগৃহ আর কক্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজে নেমে এল ভেতরকার সেই পবিত্র মন্দির কক্ষে যেখানে মেমফিসের দরবার করে গেছেন ফারাও। ঘরটা ছায়াচ্ছন্ন। ছাদের ফাঁক দিয়ে, ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে সামান্য আলো আসছে। দেখা যাচ্ছে পদ্মাকৃতি স্তম্ভের ওপর সুবিশাল ছাদ। শেষরাতের এই উষালগ্নে ঘর যেন আরও অন্ধকার। থমথমে তমিস্রার মধ্যে একটার পর একটা থামের আশপাশ দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল সবাই। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

আচমকা পূর্বদিকের দেওয়ালে অসিরিস-নেত্রর আকারে একটা ঘুলঘুলি দিয়ে ভোরের প্রথম সূর্যকিরণ এসে পড়ল দেবীর বেদীমূলে। হাজার হাজার বছর এইভাবেই ভোরের শুদ্ধ কিরণ উদ্ভাসিত করেছে বেদীমূলকে। এই বেদীর সামনেই সিংহাসন পেতে দরবার করে গেছেন ফারাও।

সিংহাসনে বসে থাকতে দেখা গেল নেতার তুয়াকে।

সম্রাজ্ঞীর মত গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠেছে তার দেহবল্লরী সোনালী রোদে। অন্ধকারের মাঝে সে এক অপূর্ব দৃশ্য! সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে পরনের রাণীবেশ। যেন সহস্র নক্ষত্র চিকমিক করছে হাতের কৃপাণে, রামধনু রোশ-নাই ঠিকরে যাচ্ছে রত্নাভরণ এবং জোড়া মুকুটের সর্প থেকে, সবচেয়ে বেশী জলজল করছে ভয়ংকর অথচ অসাধারণ সুন্দর দুটি চক্ষু। নয়ন যুগলের সেই ভয়াবহ চাহনি দেখেই হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে এল প্রত্যেকের—পিছু হটে গেল কয়েক পা। মানবী তো নয়—এ যে সাক্ষাৎ দেবী! গর্বিত রূপ, অসীম প্রশান্তি এবং নিটোল নীরবতা দেখে কে বলবে এই মেয়ে সাতদিন অনাহারে আছে। এ যেন অমর, চিরঞ্জয়ী—মৃত্যুকে যে পায়ের তলায়

রেখেছে।

হুটোপুটি করে তাই সবাই গিয়ে জড়ো হল দরজার কাছে। শুরু হল ফিসফাস কথাবার্তা। কিন্তু সিংহাসনে আসীন অপরূপা ভ্রূক্ষেপ করল না—দেখেও দেখল না—মাথার ওপর দিয়ে চেয়ে রইল অনন্তের পানে—রহস্য আর চিন্তায় আচ্ছন্ন সেই মূর্তির বর্ণনা ভাষায় দেওয়া সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ পরে সাহস সঞ্চয় করে বললে কাকু—'হে প্রিন্স, ঐ তো আপনার কনে—পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কনে কেউ দেখেছে? যান, ধরে নিয়ে আসুন।'

প্রতিধ্বনি উঠল অন্যদের কণ্ঠেও—'যান, ধরে নিয়ে আসুন।'

এরপর না এগোলে মান সম্মান আর থাকে না। পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে বারংবার পেছন ফিরে দরজাটা দেখতে লাগল আবি। সিংহাসনের গোড়ায় পৌঁছে মাথা নিচু করে অভিবাদন করে দাঁড়িয়েই রইল—মুখে কোনো ভাষণ ফুটল না। কি বলবে, তা সে নিজেই জানে না।

আচমকা যেন রুপো বাঁধানো সুস্পষ্ট শাণিত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল মাথার ওপর।

'মেমফিস অধিপতি, এখানে কেন? ফারাও যেখানে বন্দী করে রেখেছিল, সেই কারাগারে আপনার থাকার কথা না? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে! গুপ্তচর মেরিত্রা আপনাকে বার করে দিয়েছে, তাই না? কাকুর সঙ্গেই তো তার থাকার কথা, গেল কোথায় সে? এই তো সেই জাদুকর কাকু যে জাদুমূর্তি বানিয়ে ফুসমন্তর লাগিয়ে হত্যা করেছে ফারাওকে! ডাক্তারের কাছে গেছে বুঝি মেরিত্রা? কাল রাত্রে আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনানোর ঠিক আগে ক্রিস্টাল গোলকের কাঁচে কাটা ঠোঁটে ওষুধ লাগাতে বুঝি?'

'তুমি জানলে কোত্থেকে? আমার প্রাসাদেও তোমার গুপ্তচর আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, খুড়োমশায়। আমার গুপ্তচর শুধু আপনার প্রাসাদেই নেই, আছে সর্বত্র। অ মেন যা দেখে, জানতে পারে তার মেয়ে। আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন তো? আমি তৈরী। যা প্রাণ চায়, সাহস থাকে তো করুন।'

'সাহস থাকে মানে? সাহস থাকবে না কেন শুনি?' সংশয়ভরা কণ্ঠে শুধোয় আবি।

'জবাবটা তো আপনারই দেওয়া উচিত, নয় কি? দেওয়া উচিত আপনার অনুচরদের। তাহলেও বলুন তো কাল রাতে কাকুর ঘরে ক্রিস্টাল গোলক বিস্ফোরিত হল কেন, কেন বেত না খাওয়া পর্যন্ত আপনার স্বপ্নের

পুরো মানে আপনাকে বলবে না ঠিক করেছে জ্যোতিষী কাকু ?'

'জানা থাকলে তো বলব। তবে কাকু যা জানে, তা তোমার প্রস্তাবিত পন্থায় ওর পেট থেকে যথা সময়ে বার করে নেব 'খন,' বলে রোষকষায়িত লোচনে জাদুকরকে ভস্মীভূত করার প্রয়াস পেল আমি।

কাকু ততক্ষণে অন্ধকারে ঘাপটি মারার চেষ্টায় ব্যস্ত। সেইদিকে কৃপাণ সংকেত করে বললে মোহিনী মূর্তি—'আপনি যেমন জানেন না, কাকুও তেমনি জানে না—বেত খেলে অবশ্য কিছু জানলেও জানতে পারে। সাপের শিরদাঁড়া বেত দিয়েই ভাঙা উচিত। জানি কেবল আমি। আমেন আমাকে ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা দিয়েছেন বলেই জানি। কিন্তু আমি যা জানি, তা গোপন থাকে আমার ভেতরে। তা নাহলে আমার ভবিষ্যৎবাণী শুনে আপনার মাথার চুল সব সাদা হয়ে যেত; সাপের জাত ঐ মেরিত্রা আর কাকুর মনে হত এর চাইতে উৎপীড়ন-কক্ষও বুঝি অনেক আরামদায়ক। বিয়ের শুভলগ্নে সে সব কথা বলা কি উচিত ?'

শুনে তো দাঁতের বাদ্যি আরম্ভ হয়ে গেল জাদুকর কাকুর। দুবার দরজা আর বাইরের আলোর দিকে দৃকপাত করল আমি—প্রতিবারেই মনে হল বাইরের প্রাণময় পৃথিবী থেকে সে প্রবেশ করছে অন্ধকারাচ্ছন্ন মৃত্যুর পৃথিবীতে। আর সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল সোনালী রোদে ঘেরা রহস্যময়ীর প্রোজ্জ্বল মূর্তির পানে।

আমতা আমতা করে শেষকালে বললে আমি—'হে মহারাণী, তোমার কথাগুলো দু-মুখ ধারালো ছুরিকার মত—বিষের কৌটা ঝরছে যেন আমার ক্ষতস্থানে। একটা কথা বলবে ? তুমি মানবীই যদি হও তো সাত-সাতটা দিন উপবাসে থেকেও সৌন্দর্য অম্লান রাখলে কি ভাবে ? পুষ্টি ছাড়া তো রক্তমাংসের মানবী এমন রূপবতী থাকতে পারে না ? অমন ঝলমলে রাণী বেশই বা পেলে কোত্থেকে ? শূন্য মন্দিরে কে এনে দিল এই বেশ ? তোমার ধাই-মা আস্তিই বা কোথায় ?'

'আমাকে আহার জুগিয়েছেন অগ্নিদেবীরা, রাণীবেশও এনে দিয়েছেন তাঁরা—নইলে তো আপনার যোগ্য হতে পারতাম না। আর আস্তি ? তাকে পাঠিয়েছি সাইপ্রাসে আমার জন্যে সুগন্ধি আনতে—সাইপ্রাস ছাড়া এ সুগন্ধি আর কোথাও তৈরী হয় না। না, না, সুগন্ধি এনে দিয়েছে গতকাল—মাথায় মেখেছি সেই আতর। আজ তাকে পাঠিয়েছি থিবসে—আমার বিশেষ একটা কাজে। গোপনীয় কিছু নয়। ফারাওয়ের মূল কক্ষে হত্যা আর বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস উৎকীর্ণ করার ভার নিয়েই সে গেছে থিবসে।'

শুনেই ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল উপস্থিত প্রত্যেকের। পায়ে পায়ে পিছু হটে পৌঁছোলো দরজার সামনে—আবি নিজেও রইল তাদের মধ্যে।

বিষন্ন অথচ বিদ্রূপশাণিত স্বরে বললে রাণী—'একী! আমাকে একা ফেলে যাবেন নাকি? আমার শক্তি আর জ্ঞান দেখে ভয় পেলেন? হায়রে! আমি নিরুপায়। কিন্তু রাজপ্রাসাদ আলো করার জন্যেই যে আমি এসেছি—আপনার মত স্বামী পাওয়ার ভাগ্য নিয়েও—অন্ধকারে পড়ে থাকবার জন্যে তো নয়। বেশ তো, প্রিন্স আবি, অনেক সুন্দরীর নৃত্যগীত আপনার মনোরঞ্জন করেছে—এবার করব আমি—যে নাচ নেচেছিলাম, যে গান গেয়েছিলাম কেশ যুবরাজের সামনে রামিসের হাতে সে নিহত হওয়ার আগে—শুনুন, দেখুন সেই গান আর নাচ।'

ধীরপদে সিংহাসন থেকে নেমে এল মহারাণী—এত ধীরে এবং মসৃণ গতিভঙ্গিমায় যে উপস্থিত প্রত্যেকের মনে হল যেন বাতাসের ওপর দিয়ে পিছলে নেমে এল মহারাণী। তারপর মৃদুছন্দে দেহবল্লরী আর চরণযুগল দুলিয়ে সুমধুর কণ্ঠে শুরু করল আশ্চর্য সংগীত।

সংগীতের কথা কারো মনে রইল না, কিন্তু গানের ধারা নির্ঝরিণীর মতই অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে খুলে দিল যৌবনের সিংহদ্বার। এ সেই গান যে গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনের চোখে যেন ভেসে ওঠে প্রিয়তমা নাচের হিল্লোলে করস্পর্শে আদর জানিয়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গে। এমন কি বয়োবৃদ্ধ আবিও যেন মাতাল হয়ে গেল জাদুসংগীতের মোহমায়ায়।

স্তব্ধ হল সংগীতলহরী, স্তব্ধ হল নৃত্যছন্দ। প্রতিধ্বনির রেশ কিন্তু তখনো লেগে রইল দেওয়ালে দেওয়ালে—ব্যাঘ্রমুখী শেখেৎ যেন প্রতিহিংসা-ভরা দুচোখ মেলে নিষ্ঠুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রইল আবিষ্ট পুরুষ ক'জনের ওপর।

নিরুত্তাপ, নির্বিকার মহারাণী বললে সুমিষ্ট হেসে—'যান, ঘরে ফিরে যান আপনারা সবাই—একলা থাকতে দিন আমাকে আমার একক-আলয়ে—শীগগিরই মিলিত হবো ফারাওয়ের সঙ্গে।'

কিন্তু যাবার লক্ষণ দেখালো না কেউ। আবির শিরা উপশিরায় তখন রক্ত ফুটছে টগবগিয়ে। ধেয়ে এসে আছড়ে পড়ল রাণীর পদতলে। পাগলের মত বলে গেল অজস্র প্রেমের কথা। বাদবাকী সবাই অপলক চোখে চেয়ে রইল তার দিকে। অবশেষে শ্রান্ত, নিঃশেষিত হয়ে সে স্তব্ধ হতেই বাঁকা গলায় বললে মহারাণী—'একী! একটু আগেই ভয়ে পালাচ্ছিলেন, এখন গান শুনেই পায়ে লুটোচ্ছেন? ভালবাসার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছেন? সুখে

ভরে উঠুক আপনার ভবিষ্যৎ—যদিও কি আছে ভবিষ্যতে তা বলা নিষেধ বলেই বলতে পারছি না। আবি, মেমফিসে এমন রাজকীয় বিবাহের আয়োজন করুন যে বিবাহের সমতুল্য বিবাহ মিশরে কখনো হয়নি। আপনার সীমিত জীবনটুকু আমার পাশে সিংহাসনে বসে অতিবাহিত হোক। কারাও তো এই নির্দেশই দিয়েছেন আপনাকে ঘুমের মধ্যে? আসুন, নতুন দিনের সূর্য উঠছে। চলুন, হেঁটে বেরিয়ে পড়ি—বিদায় জানিয়ে যাই ছায়াবৃন্দকে।'

(১২) রাজকীয় বিবাহ

অদ্ভুত গুজব ছড়িয়ে পড়ল মেমফিসে। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নাকি মহারাণী রাজী হয়েছেন নিজের পিতৃব্যকে বিয়ে করতে? অবিশ্বাস্য! নিছক গুজব ছাড়া কিছু নয়। পুরুষরা যে চেয়েছিল ইতিহাস রচনা করুন মহারাণী অনাহারে প্রাণত্যাগ করে পিতৃব্যর সঙ্গে বিবাহ অস্বীকার করে।

মেয়েরা কিন্তু টিটকিরি দিল পুরুষদের। তারা নারী বলেই জানে, কবর-খানার চাইতে সিংহাসন অনেক বরণীয় তুয়ারাণীর কাছে—হোক না দ্বিতীয় স্থান—কড়া স্বামী তাকে তো আর প্রথম স্থানে উঠতে দেবে না। কাজেই সব সত্যি—গুজব মিথ্যে নয়। তাছাড়া, মহারাণী তো স্বেচ্ছায় এসেছেন শ্বেত প্রাসাদে। সেটাও কি মিথ্যে?

গুজবের অবসান ঘটল অচিরেই। ঘোষক ঢেঁড়া পিটে চেঁচিয়ে বলে গেল শহরময়, সূর্যাস্তের ক্ষণে শ্বেত-প্রাসাদে তুয়ারাণীর সঙ্গে আবের শুভবিবাহ হবে মহাসমারোহে। শুনে, চুপ মেরে গেল পুরুষরা—অট্টহেসে আরো বিদ্রূপবাণ ছাড়ল নারীরা।

নির্দিষ্ট সময়ে কাতারে কাতারে প্রজাবৃন্দ জড়ো হল শ্বেত-প্রাসাদে। সোপান কালো হয়ে গেল তাদের কালো মাথায়। পাঁচিলে, এমন কি বাতায়নেও ঝুলতে লাগল কৌতূহলী জনতা। হলঘরের প্রান্তে পাশাপাশি দেখা গেল দুটো সিংহাসন। একটা আর একটার নিচে। কুচক্রী কাকুর মতলবে গোড়া থেকেই আবি বুঝিয়ে দিতে চায়, প্রজাদের মুখ্য প্রশাসক সে নিজে—তুয়ারাণী নয়। তাই ওপরের অধিকতর জমকালো সিংহাসন সংরক্ষিত তার জন্যে, নিচের ম্যাড়মেড়ে সিংহাসন তুয়ারাণীর জন্যে।

শুভলগ্নে মন্দিরে মন্দিরে ধ্বনিত হল তূর্যধ্বনি। পরপর তিনবার প্রতি-ধ্বনি মিলিয়ে গেল তপ্ত নিথর বাতাসে। প্রজাদের জানিয়ে দেওয়া হল,

হাথোরের দেবালয়ে পুরোহিতদের উপস্থিতিতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হল আবি এবং নেভার-তুয়া।

আর একটা গুজব ছড়িয়ে গেল মুখে মুখে—জলের মধ্যে ঢিল পড়লে বৃত্তাকারে যেভাবে তরঙ্গ ধেয়ে যায় চারিদিকে, সেইভাবে।

অদ্ভুত গুজব। প্রধান পুরোহিত পদ্মের কুঁড়ি তুলে দিয়েছিল বিয়ের কনের হাতে। দেবপুষ্প পদ্মকোরক সহসা অঙ্কুরিত হয়েছে এবং ডাঁটার জায়গায় দেখা গেছে সোনার কৃপাণ, ফোটা ফুলের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে বিশুদ্ধ নীলকান্ত মণি—মরুখনিতেও যা পাওয়া যায় না।

আরও একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে। হাথোরের বেদীতে একটা শ্বেতকবুতর অর্ঘ দিয়েছিল বরমশায়। জীবন্ত কবুতর। সহসা দরজার ছায়াময় কোণ থেকে উড়ে এসেছিল একটা শ্যেনপক্ষী। ছোঁ মেরে দু-টুকরো করেছিল কবুতরটিকে। রক্তধারায় স্নাত মৃত কবুতর ফেলে গিয়েছিল দেবতার জানুর ওপর।

কোথেকে আবির্ভূত হয়েছিল শিকারী বাজ, তা আন্দাজ করতে পেরেছিল প্রজারা। আমেন-রা'য়ের পুত্র হোরাসের মুণ্ড। তো শিকারী বাজের! সুতরাং......!

জীবনে সেই প্রথম মাথায় রাজমুকুট পরে গায়ে জমকালো রাজবেশ চাপিয়ে হলঘরে প্রবেশ করল আবি। কিন্তু বর এতো অস্বস্তিতে ভুগছে কেন? এমন কি প্রজাবৃন্দের হর্ষধ্বনির প্রত্যুত্তরে হস্তসঞ্চালনের সময়ও দেখা গেল হাত কাঁপছে, ভাষণ দিতে গিয়ে দেখা গেল ঠোঁট সাদা হয়ে গেছে! অদ্ভুত ব্যাপার তো! তা সত্ত্বেও কাষ্ঠ হেসে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানাতে হল প্রজাদের।

মন থেকে এবার মুছে গেল আবি—আসছে তার কনেবউ। ঘোষকদের ঘোষণা শোনা গেল না বটে, তা সত্ত্বেও উপস্থিত প্রত্যেকেই অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করল, সে আসছে। হ্যাঁ, সে এসে গেছে। অথচ তাকে কেউ আসতে দেখেনি। আচমকা দেখা গেল স্মিত হাসিতে মুখ ভরিয়ে শীতল চাহনি মেলে হলঘরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেতবসনা এক সুন্দরী। পরনে সেই চোখ ধাঁধানো রাণীবেশ এখন নেই—আছে সাদাসিধে একটি পোশাক। গলার কাছে উন্মুক্ত। পীবর বক্ষের ঈষৎ ওপরে আগুনের মত জ্বলছে তার জন্ম চিহ্ন—জীবনের প্রতীক। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ঘরের কোণে কোণে আঁধার আশ্রয় নিচ্ছে। তা সত্ত্বেও অলৌকিক প্রভা বিকিরণ করছে যেন বুকের অত্যাশ্চর্য জড়ুল। আর জ্বলছে বুকের রত্নাভরণে যুগ্মসর্পের

লোহিত চক্ষু। হাতে ঝলমল করছে সোনার কৃপাণ আর নীলকান্ত মণি—পদ্মকোরক থেকে রূপান্তরিত জাদু কৃপাণ—যা নিয়ে গুজবের আর শেষ নেই।

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইল প্রজারা। দীর্ঘ, তেজোদৃপ্ত, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, মহিমময়ী এই অপরূপাকে তো তারা আশা করেনি। ভেবেছিল অনাহারে কৃশ, ক্ষীণপ্রভ, ভগ্নস্বাস্থ্য, ম্লানমুখী, সজলচক্ষু, বিষণ্ণবদনা এক মানবীর ধ্বংসাবশেষ তারা দেখবে—যার গর্ব, অহংকার, তেজ, শক্তি চূর্ণ করেছে আবি শুধু না খাইয়ে রেখে। কিন্তু এ যে দেবী মূর্তি! সুগভীর নীল চোখ বুলিয়ে যেন প্রত্যেকের অন্তর পর্যন্ত পাঠ করে নিল অপরূপা সেই দেবী মূর্তি। শক্তি, ক্ষমতা, আত্মমর্যাদা যেন লক্ষ বিকিরণে ঠিকরে পড়ছে সর্ব অঙ্গ থেকে।

কারো মুখে অস্ফুট শব্দও ফুটল না। বিমূঢ় চোখে কেবল চেয়ে রইল চিত্রার্পিতের মত। মৃদু হাসল নীলনয়না শ্বেতসুন্দরী। বিশাল হলঘরের পুতুলবৎ মানুষগুলোর ওপর প্রশান্ত গরিমাবিকিরিত চাহনি বুলিয়ে নিয়ে খস্ খস্ শব্দে রেশমবস্ত্রের শব্দ জাগ্রত করে অগ্রসর হল সিংহাসন অভিমুখে।

সম্বিৎ ফিরে পেল দুজন প্রকোষ্ঠ-পরিচারক। যষ্টি হাতে এগিয়ে গিয়ে নির্দেশ করল তার জন্য সংরক্ষিত সিংহাসন।

হস্ত সঞ্চালনে তাদের সরিয়ে দিলে সুন্দরী। বললে সুস্পষ্ট রজতমসৃণ কণ্ঠে—'আমাকে পথ দেখানোর মত কেউ এখানে নেই। মিশরের সম্রাজ্ঞীর যোগ্য আসন সে নিজেই খুঁজে নেবে।'

ঘর নিস্তব্ধ। ধীর চরণে এগিয়ে গিয়ে আবির জন্য উচ্চস্থানে রক্ষিত সিংহাসনে আসীন হল রাণীরূপিণী।

এবার কিন্তু দূরাগত সমুদ্র-উচ্ছ্বাসের মত কলগুঞ্জন শোনা গেল ঘরময়। আবির কানে কানে ফুসলোন দিলে কাকু। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে রইল প্রজারা।

সবেগে ভূমিতে পদাঘাত করল বটে আবি, কিন্তু রোষবহ্নি সীমিত রইল ঐ পর্যন্তই। অনেকক্ষণ পরে এগিয়ে এসে বললে ভগ্ন কর্কশ স্বরে—'মহিষী, তোমার নিশ্চয় জানা নেই ঐ আসনটি আমার। তোমার আসন আমার বাঁয়ে। ঐখানে বসো।'

প্রশান্ত স্বরে বলল রাণীরূপিণী—'কেন?'

'কারণ স্বামীর স্থান স্ত্রীর উচ্চে—পরাজিত থাকে বিজিতের নিচে।'

'তাই নাকি?' যেন গানের ছন্দে বললে রাণীরূপিণী—'হত্যাকারীর

উচ্চে, এই তো বলতে চান? প্রিন্স আবি, ভুল করলেন। মিশরের সম্রাজ্ঞীর স্থান হত্যাকারীরও উর্ধ্বে। আসুন, বন্দনা করুন আমাকে—চরণ বন্দনা জানিয়ে যাক তারাও যারা অস্ত্রধারণ করেছিল আমার বিরুদ্ধে।'

ভয়ানক হট্টগোলে যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল প্রশস্ত কক্ষ। ক্রোধে, হতাশায়, যেন ফেটে পড়ল আবির সশস্ত্র অনুচররা—নেতার-তুয়া যে তাদেরকে পদ-লেহন করে যেতে বলছে। এতবড় স্পর্ধা!

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে ফের বললে নেতার-তুয়া—'দেবগণের আদেশে আমি এসেছি হত্যাকারীর স্ত্রী হয়ে—দেবগণের আদেশেই যার যা প্রাপ্য আমি দিয়ে যাব। কিন্তু সে সময় এখনো আসেনি। ইতিমধ্যে আসুন, পদচুম্বন করে যান।'

ঘর যেন চৌচির হয়ে গেল সম্মিলিত অট্টরোলে। উচ্চকণ্ঠের মুহুর্মুহু অনুরোধ এসে পৌঁছোলো আবির কাছে—দেরী কেন? এখুনি টেনে নামানো হোক স্ত্রীলোকটাকে—কেটে কুচি কুচি করা যাক তরবারির কোপে। সমুদ্র-তরঙ্গের মত দলে দলে তারা ধেয়ে এল উন্মুক্ত অসি হাতে। ফারাওয়ের অনুগত প্রজারা গোলমাল দেখে সরে পড়ল বাইরে। বাইরে থেকে রক্ত-লোলুপ অনুচররা পূর্ণ করল তাদের শূন্য স্থান। নেতার-তুয়া যে এইমাত্র তাদের মৃত্যুদণ্ড দিল সুললিত ভাষায়—তা তারা হৃদয়ঙ্গম করেছে। তাই আতংকে এবং ক্রোধে উন্মত্ত হয়েছে। এদের মধ্যে আছে বন্য বেদুইনরা—মিশরকে শকুনির মত ছিঁড়ে খাবার জন্যে যারা যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা করেছে। আছে দুর্ধর্ষ হিস্‌কোস্‌-রা—যাদের রক্ত রয়েছে আবির ধমনীতে। রয়েছে লেবাননের বক্রনাসিকা সেমাইট-রা, পুন্ত-য়ের কৃষ্ণকায় বর্বররা। এদের সবার একমাত্র আশা ভরসা আবি। আবির উত্থানের মধ্যে দিয়ে উত্থিত হতে চায় নিজেরা। পথের কাঁটা ঐ নেতার-তুয়া। মারো তাকে!

'মারুন! মেরে ফেলুন ফারাওয়ের জারজ মেয়েটাকে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করুন ডাইনীটাকে—যদি ভয় পান—পথ ছেড়ে দিন—আমরা যাচ্ছি!'

অনেকক্ষণ গলাবাজি করে গলা ভেঙে গেল দুর্দান্ত খুনেদের। তারও অনেকক্ষণ পর স্তিমিত হয়ে এল অট্টরোল—তারপর নিস্তব্ধ হয়ে গেল ঘর। তবুও দ্বিধা গেল না আবির। ঘন ঘন কান পেতে শুনে গেল কাফুর নিম্ন-কণ্ঠের মন্ত্রণা।

অবশেষে বললে মুখ তুলে—'তুয়া, আমার রাণী, দেখতেই পাচ্ছো ক্ষুব্ধ হয়েছে আমার অনুচররা। বড় দুর্দান্ত ওরা। বেশীক্ষণ ধরে রাখতে কিন্তু

পারব না।'

এতক্ষণ উদাসীনভাবে বসেছিল নেতার-তুয়া। এত চেঁচামেচি যেন কানেও ঢোকেনি।

এবার বললে—'খুবই খারাপ দৃষ্টান্ত, প্রিন্স। অসিরিস কিন্তু জাগ্রত হলেন।'

'কি চাও তুমি? তোমার পদচুম্বন করবো?'

'কেন নয়? ফারাও যা বলে, তা একবারই বলে—তার অন্যথা কখনো হয় না। মেয়ে হলেও আমি ফারাও।'

এবার কিন্তু রাগে ফেটে পড়ল আবি। এক ঝটকায় পেছন ফিরে ইশারা করল রক্ষীদের রাণীকে টেনে নামাতে সিংহাসন থেকে।

নির্নিমেষে সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিল নেতার-তুয়া। সহসা স্বর্ণ-কৃপাণ শূন্যে তুলে বললে বীণাঝঙ্কৃত তীক্ষ্ণ চড়া গলায়—ঘরের শেষ প্রান্তে, এমন কি সোপানের ওপর জমায়েত প্রজাদের কর্ণেও পৌঁছোলো তীব্র শব্দগুলো:

'হে প্রজাবৃন্দ, মস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফারাওয়ের রক্তে যে হাত রাঙিয়েছে, বিশ্বাসঘাতক সেই মহাপাপিষ্ঠকে ফারাও বলে মানবেন—না, আমেন যাকে ফারাও হতে ধরায় পাঠিয়েছেন—তাকে ফারাও বলে মানবেন। বিশ্বাসঘাতক হত্যাকারীর সৈন্যবল আছে, কিন্তু অসহায়া নারী আমি—আমার কেউ নেই—সৈন্যরা বহুশত মাইল দূরে রয়েছে। আপনাদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা তো আমার নেই।'

'নেই-ই তো!' চিৎকার করে বললে একজন বিস্ফারিত-চক্ষু মুখপাত্র—'সুড় সুড় করে নেমে আয় ভেড়ার বাচ্চা—চুমু খেয়ে যা সিংহের পায়ে। দুর্ধর্ষ হিসকোস্ যোদ্ধা আমরা—আমাদের পূর্বপুরুষ কম করেও বারোবার এ-দেশ শাসন করেছে—সোপানশ্রেণীর দুপাশে চতুষ্কোণ ঐ দুটি স্তম্ভ: তারাই বানিয়েছে-ঐ স্তম্ভ চিরন্তন, থাকবে চিরকাল, মহান হিসকোস্ ফারাওদের বংশধররাও তোকে ফারাও বলে মানবে না কোনোদিন—মানবে আবিকে যার মা ছিল হিস্কোস্। ফারাওয়ের জারজ মেয়ে, নেমে এসে ঢুকে পড় তোর প্রভুর পত্নীশালায়।'

'আচ্ছা! চতুষ্কোণ স্তম্ভদুটো যদ্দিন খাড়া থাকবে, হিসকোস্‌রা আমাকে ফারাও বলে মানবে না? কিন্তু কি করি এখন? সামান্য নারী আমি, আমার পিতাকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করা হয়েছে—ভেবে পাচ্ছি না কি করা উচিত।'

'ভেবে আর কাজ নেই জারজ কন্যা, সুবোধ মেয়ের মত নেমে এসে স্বামীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়!'

টিটকিরি দিল একটি কণ্ঠস্বর। হো-হো করে হেসে উঠল হিংস্র অনুচররা। নেতার-তুয়ার সুনীল চক্ষু নীল বিদ্যুতের মত নিমেষে নিবদ্ধ হল তার ওপর। ফারাও-রক্ষী নিধনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল এই ব্যক্তি।

বড় অদ্ভুত সেই চাহনি। লোকটার পাশে যারা ছিল, তারা দেখলে দেখতে দেখতে সাদা হয়ে গেল তার দুই ঠোঁট। মনে হল যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। ভীড়ের চাপে না থাকলে পড়েই যেত। একটু পরেই মনে হল যেন অতি কষ্টে সামলে নিল নিজেকে। পুরোহিতদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চাইল ক্ষীণকণ্ঠে—একজন ইসারায় তাকে ডেকে নিল দলের মধ্যে। তুয়া কিন্তু তা-ও লক্ষ্য করল নীল বিদ্যুৎসম অপার্থিব চাহনি দিয়ে।

বললে—'দেবাদেশে যে সম্রাজ্ঞী হয়েছে মিশরের, তাকে এই কদর্য গালিগালাজ করার সুযোগ আপনারা পেয়েছেন সম্রাজ্ঞী আজ নিঃসহায় নির্বান্ধব বলে। কিন্তু জন্মমুহূর্তে আমেন জানিয়ে গেছিলেন, চরম বিপদের মুহূর্তে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। একটু ফাঁকা জায়গা দেবেন? তাঁকে আবাহন করার জন্যে একটু জায়গা ছেড়ে দিন। ঐ দেখুন সূর্য ডুবছে। না ডোবা পর্যন্ত প্রার্থনা করার সুযোগ দিন আমাকে। তারপর যা বললেন, তাই করব। বিশ্বাসঘাতক আবি, গুপ্তচরী মেরিত্রা আর দুষ্টু জাদুকরের পদচুম্বন করব।'

আবি হেঁকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—'জায়গা করে দাও, জায়গা করে দাও!' অবস্থা যে ক্রমশঃ ঘোরালো হয়ে উঠছে, আবি তা বুঝে শংকিত হয়েছিল বিলক্ষণ। যে কোনো মুহূর্তে বন্য হিস্‌কোস্‌রা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে তার সদ্য বিবাহিতা সুন্দরী তরুণী পত্নীকে।

উঠে দাঁড়াল তুয়া। দুহাত আর চোখ আকাশের পানে তুলে ধরে বললে উদাত্ত কণ্ঠে—'হে আমেন। এই লাঞ্ছনার জন্যেই কি তুমি আমায় ধরা পাঠিয়েছিলে? এই কি তোমার বিচার? আমি তোমার কন্যা, কিন্তু মহাপাপিষ্ঠা আবির অনুচররা আমাকে ফারাও বলে মানতে চাইছে না। ফারাও-য়ের রক্তে হস্তরঞ্জিত করে এখন তারা তোমার অভিপ্রায়কেও পদদলিত করতে চাইছে। প্রমাণ দাও, হে আমেন, প্রমাণ দাও আমি তোমারই কন্যা—মিশরের একমাত্র দেবতানির্দিষ্ট ফারাও আমি—আমার বিপদে তুমিই আমার রক্ষাকর্তা।'

প্রার্থনা শেষ করে দুই হাতে চিবুক রেখে নির্নিমেষে পশ্চিম আকাশের অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে রইল তুয়া।

চেয়ে রইল সমবেত প্রজাবৃন্দও। বড় অদ্ভুত সূর্যাস্ত ঘটছে পশ্চিম

আকাশে। তপ্ত দিবসের শেষে গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। বাতাসের কানাকানি শোনা যাচ্ছে না। শহরে কোনো শিশুও কাঁদছে না। নিথর নিস্তব্ধ, মেমফিস শহর থেকে দেখা যাচ্ছে লাল গোলকটা ধীরে ধীরে হেলে পড়ছে পশ্চিমদিগন্তে।

বিচিত্র সূর্যাস্তক্ষণে সহসা একটা কালো মেঘ আবির্ভূত হল রক্তরাগে রঞ্জিত আকাশে। অথচ কোথায় কোন বাতাস নেই। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ কোত্থেকে যেন কোন্ এক অলক্ষ্য শক্তির তাড়নায় জড়ো হল আকাশে—পশ্চিমদিক থেকে উঠে এসে ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলল পূবের আকাশ পর্যন্ত। মুহুর্মুহু আশ্চর্য আকার নিতে লাগল মেঘের দল। কখনো পিরামিড, কখনো দেবরাজ আমেন, কখনো সিংহাসন। অবশেষে একটা বিশাল আকাশ ছাওয়া রমণীরূপে তমালকালো মেঘরাশি ছেয়ে রইল পশ্চিম থেকে পূবে—যে রমণীর পা রয়েছে সূর্যে, হাত রয়েছে পূবের চন্দ্রে—যার চুল সোনা দিয়ে তৈরী।

'আইসিস! আইসিস!' ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল বাইরে। 'চন্দ্র-ধারণ করে রয়েছেন দেবী আইসিস!'

'না, না। ধরিত্রী মাতা নাউত নজর রেখেছেন পৃথিবীর ওপর।'

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ভয়ার্ত সোরগোল। আবার সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা। সহসা রক্তসূর্য থেকে বিচ্ছুরিত রক্তরশ্মি এসে পড়ল সোপানের দুপাশে খাড়া 'চিরন্তন' দুটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের ওপর। লম্বা দুটি ছায়া এসে পড়ল তুয়ার কণ্ঠে—ছায়াশীর্ষের দুটি সূচ্যগ্র বিন্দু একসাথে মিলে গেল তুয়ার পদতলে—যেন চুম্বন করল তার চরণ।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে সেই দৃশ্য দেখল ঘরশুদ্ধ লোক।

কিন্তু আবির ধৈর্য রইল না।

বললে গুরুগম্ভীর গলায়—'রা ডুবেছে। এসো রাণী, পদচুম্বন করো এবার।'

'না, রা এখনো ডোবেনি। ঐ দেখুন।'

আধডোবা সূর্যের মাথায় বলয়কারে বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন অগ্নিচ্ছটা। অগ্নি-কিরীটের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থেকে তুয়া বললে—'ঐ দেখুন!'

দূরে নদীর পাড়ে সারি সারি ঝাউগাছগুলো সহসা নুয়ে পড়ল পূবদিকে—তুয়ার পানে। বাতাস নেই, অথচ পর-পর তিনবার সারবন্দী ঝাউ নুয়ে পড়ে তুয়াকে যেন প্রণাম জানিয়ে আবার দাঁড়াল সিধে হয়ে।

আতংকমিশ্রিত হট্টগোল শোনা গেল বাইরে। আবির কানে কানে কি

বলে পশ্চিম আকাশে আঙুল তুলে দেখাল কাকু।

দেখল তুয়াও। ক্রুর হাসি ফুটে উঠল অধরোষ্ঠে।

সূর্যের পরিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে সবুজাভ আঁধারের মধ্যে সহসা আবির্ভূত হয়েছে দুটি তারা। যুগ্ম নক্ষত্র। ঠিক সেই সময়ে ডুব দিল সূর্য।

আঁধার ঘনিয়ে এল বিশাল কক্ষে। অন্ধকারের মধ্যে কেবল শোনা গেল উদাত্ত কণ্ঠে আমেনকে আবাহন করছে তুয়া।

ধ্বনিত হল একটা কণ্ঠস্বর—'রা মৃত! জারজ কন্যা, রা খতম—এবার তোর পালা!'

কঠিন শীতল বিজয়োল্লাসে বললে তুয়া—'কিন্তু বেঁচে আছে আমেন! বিশ্বাসঘাতকের দল—ঐ ছাখো।'

বলেই স্বর্ণকৃপাণ দিয়ে যেন সংকেত করল দূর আকাশকে। আচম্বিতে গগন যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল উপর্যুপরি দুটো বিজলী কশাঘাতে। চোখ-ধাঁধানো দীপ্তিতে জনগণ দেখল, নিজে থেকেই ঝাউয়ের দল নুয়ে পড়ল আবার—এবার মাটি পর্যন্ত শুয়ে যেন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল তুয়াকে। একবার…দুবার…তিনবার! একই সঙ্গে দুলে উঠল ভূতল—যেন ফুলে ফুলে উঠল বিষম ক্রোধে—একবার…দুবার…তিনবার। তৃতীয় বারের সঙ্গে সঙ্গে তমিস্রার মধ্যে শোনা গেল আতীব্র আর্তনাদ আর আতংককর হাহাকার। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড নিনাদে ভগ্ন প্রস্তর আছড়ে পড়ার রক্ত জল করা শব্দ।

সারা আকাশে যেন আগুন ধরে গেল। ভয়ংকর অগ্নিপ্রভায় দেখা গেল, উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে, স্বর্ণ কৃপাণ শূন্যে তুলে—অট্টহাসি হাসছে নেতার-তুয়া। বিষম উল্লাসে যেন চৌচির হয়ে পড়তে চাইছে হৃদ্‌পিণ্ডখানা। অট্ট-হাসির মাঝখানেই সহসা চিরন্তন সেই চতুষ্কোণ হিসকোস্ স্তম্ভ দুটো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল দরজার ওপর—দরজা গুঁড়িয়ে গেল—শ-য়ে শয়ে মানুষ চূর্ণ হল প্রস্তরের তলায়। পুরোহিত চক্রের মধ্যে বিশেষ একজন কিন্তু এমন দলা পাকিয়ে গেল শিলা সংঘাতে যে চেনবার আর উপায় রইল না। এ সেই দুর্বিনীত অশিষ্ট অনুচর—তুয়ার ক্ষণেক দৃকপাতে যার ঠোঁট পর্যন্ত সাদা হয়ে গিয়েছিল। ঠাঁই নিয়েছিল পুরোহিতদের ভীড়ে—কিন্তু রক্ষে পেল না সেখানেও—স্তম্ভের শীর্ষদেশ ভেঙে এসে পড়েছে তার মেরুদণ্ডে।

পশ্চিম ফটক দিয়ে উন্মত্তের মত পালাতে লাগল ভয়ার্ত প্রজারা। সিংহাসনের সামনে এসে সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করতে লাগল পুরোহিতরা। আবির মাথা থেকে রাজমুকুট ঠিকরে গিয়েছিল

মাটি দুলে ওঠায়—এখন নতজানু হয়ে বসে পড়ে দু-হাতে নেতার-তুয়ার পা জড়িয়ে ধরে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগল কাতর কণ্ঠে। তুয়ার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। অগ্নিময় আকাশ, ধ্বংসস্তূপ, মৃত আর অর্ধমৃতদের দিকে সুবর্ণ কৃপাণ তুলে ধরে অট্ট অট্ট হেসে চলেছে তো চলেইছে।

দেখতে দেখতে উধাও হল আতংকিত জনগণ। রইল কেবল বন্দনারত পুরোহিত, মুমূর্ষু, মৃত এবং সপারিষদ আবি।

পাক খেতে খেতে সরে গেল মেঘরাশি। দেখা দিল চাঁদ আর তারার আলো, অন্ধকার কক্ষ আলোকিত হল স্নিগ্ধ আভায়।

পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা বিধ্বস্ত আবির পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল তুয়া।

বললে 'স্বামী, এবার বলুন তো মিশরের দেবতা কে?'

'আমেন—তোমার জনক।'

'মিশরের ফারাও কে?'

'তুমি, আর কেউ নয়।'

'বেশ, বেশ, এই নিয়েই তো এত বিবাদ, তাই না? আমারও যে পরম সহায় আছে, তার প্রমাণ দরকার হয়েছিল সেই জন্যেই। দেখেছেন তাঁর পদাঘাতের জোর?' অঙ্গুলি সংকেতে টুকরো টুকরো চতুষ্কোণ স্তম্ভ-দুটিকে দেখালো নেতার-তুয়া।

বারেক সেদিকে চেয়ে নিয়ে শিউরে উঠে আবি বললে—'তুমি ছাড়া আর কেউ ফারাও নয়, মহারাণী। এবার তোমার এই সেবককে আয়ু দাও—সে যেন তোমার ছায়ায় থেকে তোমাকে সেবা করে যেতে পারে।'

'প্রথম আবেদন মঞ্জুর করার অধিকার আমার নেই। নির্দিষ্ট আয়ু অন্তে শেষ বিচারালয়ে আপনার বিচার হবেই। আপনার দ্বিতীয় আবেদন মঞ্জুর করলাম। উঠে দাঁড়ান পুরুৎমশায়রা, সিধে হয়ে দাঁড়ান উপদেষ্টারা—দেখুন আপনাদের প্রভু তারও প্রভুর পদ চুম্বন করে কিভাবে।'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে পুরুৎ আর উপদেষ্টারা দেখল সেই অভাবনীয় দৃশ্য। দেখল, সুবর্ণ কৃপাণ সংকেতে স্বীয় চরণ নির্দেশ করতেই আছড়ে পড়ে চটি চুম্বন করল মহামান্য আবি। তারপর পর-পর পদলেহন করে গেল পুরোহিতরা, সৈনিক-প্রধানরা, খাস-ভৃত্যারা—সবশেষে এল জ্যোতিষী কাকু।

কিন্তু পা সরিয়ে নিল তুয়া—স্পর্শ করতে দিল না পাদুকা।

বললে—'তোমার চাইতে অনেক কম জঘন্য কুকর্ম করেও এখানে এত

জলে মারা গেল। কিন্তু তুমি, যে কিনা জাদুমূর্তি গড়ে গুপ্তবিদ্যা প্রয়োগ করে ফারাওকে পৈশাচিকভাবে বধ করেছো—এখনো প্রাণে বেঁচে আছো কি করে?'

শুনেই তো প্রাণ উড়ে গেল কাকুর। দমাদম মাথা ঠুকতে লাগল পাথরে। অস্বীকার করতে লাগল যাবতীয় অপরাধ, অথচ ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগল অস্বীকৃত সেই সব অপরাধের জন্যেই।

কঠোর কণ্ঠে দাবড়ানি দিল নেতার-তুয়া—'থামো! তোমার আর মেরিত্রার জীবন টিঁকিয়ে রাখলাম আরো কিছুদিনের জন্যে। প্রধানমন্ত্রীর পদও রয়ে গেল আপাততঃ।'

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে উদ্যত হতেই আবার দাবড়ানি দিয়ে কাকুকে থামিয়ে দিল তুয়া।

বললে—'ধন্যবাদ দিও না। ভবিষ্যৎ জানো না বলেই ধন্যবাদ দিতে চাইছো। জানলে পাগল হয়ে যেতে তুমি আর মেরিত্রা দুজনেই। চেয়ে ভাখো জাদুকর, চেয়ে ভাখো আমার দিকে। বলো তো আমি কে?'

বলে, হেঁট হল কাকুর মাথার ওপর।

চোখ তুলে চাইল কাকু। চাইল নীল বিদ্যুৎসম দু-চোখের পানে। দৃষ্টি ফেরাতে আর পারল না।

'কাকু,' বললে নেতার-তুয়া—'আমারও কিছু-কিছু ভোজবিদ্যা জানা আছে—নমুনা পেলে একটু আগে। নইলে মেদিনী প্রকম্পিত হত না, 'চিরন্তন' স্তম্ভ ভেঙে পড়ত না। দুজনেই যখন ভোজবিদ্যায় পারদর্শী, তোমার আমার মধ্যে কোনো গুপ্তরহস্য থাকা উচিত নয়। অবশ্য হয়তো তুমি তা আগেই আঁচ করেছো। তোমাকে বলব সেই গুপ্ত-কথা—কিন্তু মেরিত্রাকে নিশ্চয় তা বলতে যাবে না। তোমার প্রভুকেও না। যদি বলো, সেই মুহূর্তে তোমার মৃত্যুক্ষণ নির্ধারিত হয়ে যাবে—শুরু হবে শাস্তি-পর্ব—যে শাস্তি মুলতবী রেখেছি বিশেষ উদ্দেশ্যে। হে জাদুমূর্তির কারিগর, পাপাচারের নায়ক, নরককুণ্ডের পথপ্রদর্শক জ্যোতিষী, শোনো সেই কথা!' বলে, হেঁট হয়ে কাকুর কানে কানে কি যেন বলল তুয়া।

চকিতে নিঃসীম আতংক বিমূর্ত হল ঐন্দ্রজালিকের মুখের পরতে পরতে। দেখা গেল, সুরামত্তের মত সোপানশ্রেণী থেকে ছিটকে গড়িয়ে গেল জ্যোতিষীর দীর্ঘ শীর্ণ দেহ। আবি ধরে না ফেললে নির্ঘাৎ আছড়ে পড়তো মঞ্চ থেকে নিচে।

কানে কানে শুধোলো আবি—'কি বলল রাণী?'

রাণীর নজর কিন্তু আর সেদিকেই নেই। যেন বিস্মৃত হয়েছে ক্ষণপূর্বের নাটক। দূরবিস্তৃত চোখে চেয়ে আছে সুদূরের পানে।

জবাব দিল না কাকু। সবেগে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বায়ুবেগে পলায়ন করল কক্ষের বাইরে।

(১৩) আবি জানল গুপ্তরহস্য

এক মাস, মানে, এক চন্দ্র অতিবাহিত হল। প্রধান রাজকর্মচারীদের হিসাব কক্ষে বসে শহরের জমা খরচের হিসেব নিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী কাকু। এ-কাজ এখন তার। দুবার হিসেব ফেরৎ এসেছে ফারাও সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে। অনেক টাকার গোলমাল দেখা যাচ্ছে। টাকা আদায় হয়েছে, কিন্তু ফারাওয়ের কোষাগারে যায়নি। দুজন খাজনা আদায়-কারীকে বেত মেরে পায়ের ছাল চামড়া তুলে দিয়েছে কাকু রাগের চোটে—নিখোঁজ টাকা যেখান থেকেই হোক জোগাড় করে আনতে হবে। আসলে এ-টাকার বেশীর ভাগটাই গেছে কাকুর নিজের পকেটে।

মেজাজ যখন সপ্তমে চড়ে রয়েছে, এমন সময়ে প্রায়ান্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল আবিকে। এই একমাসে যেন বুড়িয়ে গেছে। রোগা হয়ে গেছে। চেনা আর যায় না।

কাকু তাই চিনতে পারেনি। কুৎসিৎ গালাগাল দিয়ে বিদেয় হতে বলেছিল আগন্তুককে।

আর যায় কোথা। ধেয়ে এসে খপাৎ করে জ্যোতিষীর দাড়ি খামচে ধরল আবি। এতবড় স্পর্ধা। প্রভুর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এইভাবে কথা বলে।

কাকুতি মিনতি করে কাকু জানালে, চিনতে পারেনি বলেই গালাগাল দিয়েছে। প্রভুর চেহারা যে একমাসেই এমন পাল্টে যাবে কে জানত?

জলে উঠল আবি। চেহারা পালটাবে না? বদমাস জ্যোতিষীর পরামর্শ শুনেই তার এই হাল হয়েছে। কি কুক্ষণেই সম্রাজ্ঞীকে বউ বানিয়ে ফারাও হওয়ার চক্রান্ত করেছিল। কত সুখে ছিল তার আগে। এক গাদা বউ ছিল, ছেলেরা ছিল, রাজত্ব ছিল, সৈন্যবাহিনী ছিল, মনে সুখ ছিল।

আর এখন? বউদের দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ছেলেরা মারা গেছে, রাজত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে, মন থেকে সুখ পালিয়েছে।

কাকু বললে—'তাতে কী? পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরীর স্বামী তো আপনি। সাক্ষাৎ ফারাও।'

গুঙিয়ে উঠল আবি—'শহরের দীনতম কবরের সামান্য মামীটাও জানে

আমার মত ফারাওয়ের চাইতে অনেক বড় সামান্য এক রাজা। দুষ্ট তারার পাল্লার পড়ে প্রাণটা বেরিয়ে যেতে বসেছে আমার।'

'তাতো বটেই। ভোরের তারা সে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভোরের তারা। সুন্দরীরূপে মূর্তিমতী ভয়ংকর আতংক। জানো একমাস আগে সুন্দরীকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে কি দেখেছি? আয়নার সামনে বসে চুল এলিয়ে দিয়ে মাথার খোশবাই মাখছিল। আমাকে দেখে এমন হাসি হাসল যে পাগল হয়ে গেলাম। জড়িয়ে ধরতেই দেখি দাঁত বার করে ফারাওয়ের হলদে মামী চেয়ে আছে আমার দিকে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছেড়ে দিয়ে সরে আসতেই দেখি কোথায় মামী—এ যে তুয়া। হাসছে সেই মোহিনী হাসি। আবার জড়িয়ে ধরলাম, আবার সেই মামীর হাসি। এরকম কয়েকবার হতেই আমার মুখ নিশ্চয় সাদা হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রূপ করে তুয়া বললে, 'স্ত্রীদের আদর করতে এসে স্বামীদের চেহারা এরকম হয় নাকি?' এই একমাস ধরে চলছে এই কাণ্ড।'

'আর কিছু?'

'আমার বিশ্বস্ত অনুচরদের প্রেমপাগল করে আমার সর্বনাশ করছে তুয়া। এমন মোহিনী হাসি হেসে তাদের ডাকছে, যে প্রেমে উন্মাদ হয়ে হাত জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে। তারপর তাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে হেসেই। ফলে, দুজন এর মধ্যে আত্মহত্যা করেছে। একজন পাগল হয়ে গেছে। বাকী সবাই আমাকে পথের কাঁটা মনে করে বসে আছে—খুন করতে পারলে বাঁচে।'

'আর কিছু?'

'আরও আছে, আরও আছে। ছিলাম সর্বশক্তিমান। এখন হয়েছি বান্দা। যে সব কাজ মনে প্রাণে ঘেন্না করি, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত করতে হচ্ছে সেই সব কাজ। মেষপালনের কাজ করতে হচ্ছে, গরুঘোষের তদারকি করতে হচ্ছে, সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে, খাজনা আদায় করে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে। যে বেদুইনরা ছিল আমার ডান হাত, তাদের পেছনে আমাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মিতার রাজার সঙ্গে গোপনচুক্তি করেছিলাম—তার মেয়েকে বিয়েও করেছিলাম। এখন সেই মেয়েকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে তার বাবাকে লড়াই করে হারাতে হয়েছে। সে লড়াই শেষ হতে না হতেই ফারাও আমাকে থিবসে যেতে হুকুম দিয়েছে। আমার সমাধি মন্দিরটা নাকি তৈরী করে ফেলতে হবে—নকশা পর্যন্ত এঁকে দিয়েছে। অদ্ভুত ভয়ংকর সব সাংকেতিক লিপি লিখে দিয়েছে নকশায়। তোমার জন্যেও একটা ছোট কবর বানাতে

হবে আমার কবরের পাশে। আজ সকালেই লোক পাঠিয়ে মরুভূমি থেকে তিনটে পাথর আনিয়েছে তোমার, আমার আর মেরিত্রার শবাধারের জন্যে। আমাদের সম্মান জানানোর জন্যেই নাকি বিশেষ উপহার এই পাথর।'

শুনেই তো সংযম উড়ে গেল কাকুর। দাড়ি টানতে টানতে পায়চারী করতে লাগল ঘরময়।

শেষকালে বললে—'সহ্য করছেন কেন? খুন করে ফেলুন না?'

'সাহস নেই কাকু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মনের সব খবর ও ঠিক জানতে পারে। সভাগৃহে ওকে যে টিটকিরি দিয়েছিল তার অবস্থাটাও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চতুষ্কোণ স্তম্ভ পিঠে ভেঙে পড়ে পিণ্ডি পাকিয়ে দিয়েছিল চক্ষের নিমেষে।'

'তাহলে সহ্য করে যান।'

'না, কাকু, আর সহ্য করতে পারছি না। তাই এসেছি তোমার কাছে।'

'আমি কি করব?'

'আর একটা ভেল্কী দেখাবে। যেভাবে ফারাওকে খতম করেছো, ঠিক সেই ভাবে—পুরস্কার পাবে, কাকু, যোগ্য পুরস্কার পাবে।'

'পুরস্কার আমার মৃত্যু। তাকে মারা যায় না—গুপ্তরহস্যটা আপনি জানেন না বলেই এই সব কল্পনা করছেন।'

'মূর্খ! রক্তমাংসের মানুষকে নিশ্চয় মারা যায়।'

কুটিল হাসি খেলে গেল কাকুর পাতলা ঠোঁটের ওপর দিয়ে।

'তা ঠিক। রক্তমাংসের মানুষকেই মারা যায়।'

'পাহাড়ী বাঁদরের মত দাঁত খিঁচিয়ে ফের যদি ঐ হাসি দেখি তো কেটে দু-টুকরো করে ছাড়বো বলে দিচ্ছি,' সাঁই করে তরবারি কোষমুক্ত করে ধেয়ে গেল আবি—'বলো এখন কি সেই গুপ্তরহস্য।'

নতজানু হয়ে বসে পড়ে দুহাত জোড় করে কাতর কণ্ঠে কাকু বললে—'হে মহামান্য, জানতে চাইবেন না, এ-গুপ্তরহস্য সজ্ঞানে জানবার অধিকার কেবল দেবতাদের।'

'তাহলে সেই দেবতাদের কাছেই তুই যা!'

বলেই তরবারি তুলল আবি। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল কাকু।

ঠিক সেই সময়ে একটা হাসির শব্দ শোনা গেল বাইরের বাগানে। তুয়ার হাসি।

তরবারি নামিয়ে তৎক্ষণাৎ জানলার সামনে ধেয়ে গিয়ে স্তম্ভিত দেহে দাঁড়িয়ে গেল আবি।

অদ্ভুক নাটক চলছে নিচের বাগানে। তার অত্যন্ত বিশ্বাসী এক অনুচর, যার শৌর্যবীর্যের পুরস্কারস্বরূপ সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদে বসিয়ে নিজের জামাই করে নিয়েছে আবি, সেই লোকটা এখন নতজানু হয়ে বসে প্রেম নিবেদন করছে তুয়াকে। তুয়া কিন্তু হেসেই চলেছে। পাগলের মত তার পোশাক খামচে ধরে গদগদ স্বরে কত প্রেম বচনই না আউড়ে যাচ্ছে কুলাঙ্গার জামাই। শেষকালে সাহস পেয়ে যেই শাশুড়ির হাত ধরতে যাবে, অমনি তুয়া তাকে হাতের সংকেতে দূরে ঠেকিয়ে রেখে পাশের ঝোপ থেকে একটা ফুল তুলে ছুঁড়ে দিলে কোলে। ফুলটা লুফে নিল বিশ্বাসঘাতক। তুয়া বললে—'তুমিই না মারমিসকে বধ করেছিলে? তার পুরস্কার এই ফুল। যাও, নিজের বউকে এই ফুল দেখিয়ে বলে এসো কে দিয়েছে—কেন দিয়েছে—কি জন্যে তার কাছে তুমি এসেছিলে।' পাপিষ্ঠ জামাই বিহ্বলভাবে পাঁচিল টপকে উধাও হল চক্ষের নিমেষে।

কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলল আবি। অসি আন্দোলন করে বললে ক্ষিপ্তের মত—'মাগীকে আজকেই টুকরো টুকরো করব আমি।'

ভাঙা ভাঙা গলায় পেছন থেকে বললে কাকু—'তাহলে এখানেই দাঁড়ান।'

'কেন শুনি?'

'সম্রাজ্ঞী এখানেই আসছেন।'

খস্‌খস্‌ আওয়াজ শোনা গেল বাইরে। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকল তুয়ারাণী। প্রথমেই নজর পড়ল আবির খোলা তরবারির দিকে।

'ব্যাপার কী? কাকে মারবেন স্বামী?' বিদ্রূপতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর তুয়ার।

'তোকে! এতবড় স্পর্ধা আমার জামাইকে ফুল দিস্‌ তুই!'

ফুলটা যে কি ফুল। তা কাকু লক্ষ্য করেছিল—কিন্তু বলেনি। শবাধারে মামী শোয়ানোর সময়ে যে ফুলের মালা পরানো হয়—সেই ফুল। কিন্তু এখন কিন্তু সে কথা মুখ দিয়ে বেরোলো না—ভয়ের চোটে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঘরের কোণে।

মিষ্টি হেসে তুয়া বললে—'আমি জানতাম আপনি দেখছেন জানলা থেকে, তাই মড়ার পর যে ফুল দেওয়ার রেওয়াজ, সেই ফুল দিয়েছি তাকে। মরার আগে আরও অনেক দুর্গতি লেখা আছে ওর কপালে আপনার মেয়ের হাতে। কিন্তু হে স্বামী, সে দৃশ্য দেখবার আগে আমাকেই তো মারবার চক্রান্ত করছিলেন কাকুর সঙ্গে—তার আগেই অবশ্য কাকু নিজেও মন্ত্রণা দিয়েছিল আপনাকে আমাকে খুন করার জন্যে। তাই আমি এসেছি।

মারুন।'

তরবারি বাগিয়ে ধরে কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল আমি। শুধু তুবড়ির মত গালাগাল ছোটালো মুখ দিয়ে।

টিটকিরি দিল মোহিনী তুয়া—'অত কথায় কাজ কী? হাতে অস্ত্র যখন রয়েছে, মারুন।'

ক্ষেপে গেল আমি। ধেয়ে গেল তরবারি নিয়ে। কিন্তু কি-এক অদৃশ্য বাধায় ঠিকরে গেল একদিকে। আবার গেল—আবার ছিটকে পড়ল অদৃশ্য বাধায়।

'এই আপনার মুরোদ? আপনি না পারলেও কাকু পারবে। মানুষ মারতে তার জুড়ি নেই।'

ককিয়ে উঠল কাকু—'হে মহিমময়ী। আর প্রাণে দাগা দেবেন না। আপনাকে যে মারতে যাবে, তার মৃত্যু অবধারিত।'

'তা জেনেও তো একটু আগে আমাকে মারবার পরামর্শ দিয়েছিলে আমিকে।'

তরবারি খসে পড়ল আমির হাত থেকে।

'কে তুমি?'

'জানতে চাও? তবে দ্যাখো—দুজনেই ছাখো।'

দেখল দুজনেই—চোখ নেমে এল পায়ের দিকে, গোঙানি জাগল আমির কণ্ঠে—'মূর্তিময়ী শেখেৎ দেবী নাকি তুমি? না, মরণের দেবী? নাকি প্রেতিনী?'

'কোনোটাই নয়, চেয়ে ছাখো।'

চোখ তুলল দুই পুরুষ। আগের মতই তুয়া দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

'আমি, আমি ওদেরই সবই, অথবা কোনোটাই নয়। আমি এসেছি প্রতিহিংসা নিতে—পাঠানো হয়েছে আমাকে। জিজ্ঞেস করো জাদুকরকে—সে জানে। আমি অনুমতি দিচ্ছি—বলো, কাকু, বলো আমি কে?'

ককিয়ে উঠল—'কা! তুয়ারাণীর কা! আমেনের মেয়ের কা! যারা তার প্রতি ঘোর অবিচার করেছে, তাদের জাহান্নমে পাঠাতে এসেছে তুয়ারাণীর কা! এসেছে দেবতাদের শক্তি নিয়ে—ফারাওকে যারা মেরেছে, তাঁর সৈন্যদের যারা খুন করেছে—তাদের প্রত্যেকের নিষ্ঠুর মৃত্যু রচনা করতে এসেছে তুয়ারাণীর কা!'

'তুয়ারাণী তাহলে এখন কোথায়? মরলোকে?' নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে খাবি খেতে খেতে বললে আমি।

জবাব দিল তুয়া রাণীরূপিনী—'না, ইহলোকেই, গেছে তার প্রেমাস্পদের সন্ধানে। শীগগিরই ফিরে আসবে তাকে নিয়ে—সঙ্গে আনবে বিশেষ একজন ভিক্ষুককে। আমিও বিদায় নেব তখন। তারা আসবে তোমাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে—এমন মৃত্যুদণ্ড যা কল্পনা করতেও শিউরে উঠবে। তদ্দিন আমার হুকুম তামিল করো—উঠে দাঁড়াও!'

(১৪) রা-য়ের তরণী

চোখ খুলে ভোরের তারা নেতার-তুয়া আবার চোখ বন্ধ করেই শুয়ে রইল। কানে ভেসে এল ছপাৎ ছপাৎ শব্দে দাঁড় টানার শব্দ। জাহাজের গায়ে জল আছড়ে পড়ার শব্দ! তাই ভাবল, স্বপ্ন দেখছে। নিশ্চয় থিবসের রাজপ্রাসাদে শুয়ে আছে নিজের ঘরে। একটু পরেই পরিচারিকারা এসে ডেকে তুলবে।

থিবসের রাজপ্রাসাদে মানে? মনে পড়ে গেল রাজধানী ছেড়ে বেরিয়েছে বেশ কয়েক মাস আগে। মনে পড়ে গেল তার পরের ঘটনাগুলো। ললাটে আগুনের ঝলক অনুভব করার পর আর হু-হু করে পতনের অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার পর বিস্মৃতি ঢেকে দিয়েছিল তার চেতনা।

তার মানে সে মারা গেছে। পেঁৗছেছে পাতালে। কিন্তু ছলাৎ ছলাৎ আর ছপাস্-ছপাস্ শব্দগুলো তাহলে কিসের?

ফের চোখ খুলল ধীরে ধীরে। আকাশে চাঁদ দেখল প্রথমে। চাঁদের আলো রেশমের চন্দ্রাতপ ফুঁড়ে তার গায়ে পড়ছে। চাঁদোয়ার চারদিকে রেশমের পর্দা সারি সারি খুঁটিতে বাঁধা। পাশেই শুয়ে আন্তি।

ফিস ফিস করে ডাকল—'আন্তি, শুনছো?'

মাথা ফিরিয়ে চোখ খুললেন আন্তি—'কোথায় আমরা?'

'পাতালে। আত্মা-জগতের দিকে চলেছি মনে হচ্ছে।'

'তাই যদি হবে তো এখনও দেহটা রক্ত মাংসের কেন? চোখ দিয়ে দেখছি কি করে? কথা বলছি কিভাবে?'

উঠে বসল দুজনে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল যেন সোনা আর রুপো দিয়ে মোড়া ভারী সুন্দর একটা জাহাজে বসে রয়েছে দুজনে। সুগন্ধ ভেসে আসছে জাহাজের খোল থেকে। ঠিক মাঝখানে ওদের চন্দ্রাতপ। দুপাশে সাদা পোশাক পরে বসে সারি সারি দাঁড়ী। গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ-দেহী এক শ্বেতবসন পুরুষ। মুখটা কাপড় ঢাকা।

নদীর জল চক্ চক্ করছে অদূরে। দূরে দূরে চাঁদের আলোয় নদীর

তীরে দেখা যাচ্ছে তাল গাছ আর মন্দির।

বিড় বিড় করে তুয়া বললে—'রা-য়ের তরণীতে যাচ্ছি আমরা সূর্যের পেছনে তাঁর রাজত্বে মৃত্যুনদীর ওপর দিয়ে।'

বলেই, ফের অজ্ঞান অথবা নিদ্রিত হল শয্যায়।

চোখ খুলে দেখলে সূর্য উঠেছে। পাশে বসে তার দিকে চেয়ে আছে আন্তি। সামনের টেবিলে থরে থরে সাজানো খাবার দাবার।

'ধাই-মা,' ক্ষীণ কণ্ঠে বললে তুয়া—'কোন জগতে আছি বলতে পারো?'

'ইহজগতেই আছি। কিন্তু এই তরণী আর তরণী-চালকরা ইহজগতের নয়। এসো, আহার করা দরকার এখন।'

খেয়ে দেয়ে তৃপ্ত হল দুজনে। ঘুরে ফিরে দেখতে গিয়ে দেখলে সম্ভব নয়। চন্দ্রাতপ খাটানো হয়েছে জাহাজের সবচেয়ে উঁচু ডেকে। পুরো ডেকটা সূক্ষ্ম জাল দিয়ে ঘেরা। দাঁড়ীরাও দাঁড় তুলে রেখে বোধ হয় বিশ্রাম নিতে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে কেবল দুজন। দীর্ঘদেহী সেই ক্যাপ্টেন আর কর্ণধার। দুজনেরই মুখ মুখোশে ঢাকা। জাহাজ এখন নদী ছেড়ে ঢুকেছে একটা খালে। দুপাশে তাল গাছ আর মন্দিরের বদলে দেখা যাচ্ছে ধু-ধু মরুভূমি।

আন্তি বললেন—'এ জায়গা আমি চিনি। ছেলেবেলায় একবার এসে-ছিলাম। প্রাচীন ফারাওরা খনন করেছিলেন এই খাল। হিস্‌কোস্ ফারাওদের পতনের পর মেরামতও করা হয়েছিল। এ-খাল গেছে বুবাস্‌তিস্ থেকে উপসাগর পর্যন্ত—সেখান থেকে পর্যটকরা সূর্যোদয়ের দেশে রওনা হয় জাহাজে চেপে।'

তুয়া বললে—'যাক, তাহলে ইহজগতেই আছি। জাদু জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ডেকে জিজ্ঞেস করা যাক যাচ্ছি কোথায়।'

ডাক দিলেন আন্তি। ক্যাপ্টেন কিন্তু শুনতে অথবা দেখতে পেয়েছে বলে মনে হল না। কর্ণধারকে ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না। প্রেত হোক কি মানব হোক—দুজনেই বোধ হয় কালা আর বোবা। দুপাশের দৃশ্য অনেকক্ষণ দুচোখ ভরে দেখবার পর রোদের তাতে ক্লান্ত হয়ে চাঁদোয়ার তলায় ফিরে এসে দেখলে অদৃশ্য হস্ত বিছানা পরিপাটি করে উচ্ছিষ্ট সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য খাবার রেখে গেছে।

'জাদু জানে দেখছি এরা!' চামড়া মোড়া হাতীর দাঁতের চেয়ারে বসতে বসতে বললে তুয়া।

'আশ্চর্য কী ?' প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন আন্তি। 'জাদুর মধ্যেই তোমার জন্ম, জাদুর মধ্যেই তোমার বাবার মৃত্যু, জাদুর মধ্যে আমরা বেঁচে গিয়ে কোথায় যে চলেছি দেবতারা জানেন, বিশ্বচরাচর যে শক্তিবলে চলছে—তাও তো জাদুশক্তি বলেই মনে হয়।'

তুয়া বললে—'আমি শূওরটার চাইতে এ-জাহাজ অনেক ভাল। মিশরের সিংহাসনে আমার সূক্ষ্মদেহ কা বসে এখন কি কাণ্ড করে চলেছে, জানতে বড় কৌতূহল হচ্ছে। এ জাহাজে আমরা এলামই বা কি করে ? যাচ্ছিই বা কোথায় ?'

'যথাসময়ে জানা যাবে। আমিকে মনে প্রাণে ঘেন্না করলেও ওর জন্যে অনুকম্পা বোধ করছি,' শুষ্ক কণ্ঠে বললেন আন্তি।

রাত হল। সারাদিন দুপাশের মরুভূমি দেখে কেটে গেল। খাবারের টেবিল আবার ভরে উঠল টাটকা খাবারে যেন জাদুমন্ত্র বলে। পেট ভরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল দুজনে।

ঘুম ভাঙল দিনের আলোয়। আকাশ কিন্তু ঢাকা। মরুভূমি অদৃশ্য হয়েছে। ধু-ধু সমুদ্রে দোল খাচ্ছে জাহাজ। এই প্রথম সমুদ্র দর্শন করল দুজনে। গা-পাক দিয়ে ওঠায় এবং মাথা ঝিম ঝিম করায় পরের তিনটে দিন আর তিনটে রাত ঘুমোলো অঘোরে। চন্দ্রাতপের তলায় যে তারা শুয়ে নেই, কাঠের কেবিনে হাজির হয়েছে জাদুবলে—তা দেখেও বিস্ময়বোধ করল না। শুধু ঘুমোলো।

ঘুম ভাঙার পর টের পেল জাহাজ আর উথালিপাথালি হচ্ছে না। যে ঝড়ের পাল্লায় পড়ে নক্ষত্রবেগে ছুটছিল জাহাজ, সে ঝড়ও থেমে গেছে। সীতার গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে দেখল বাতাস না থাকায় দাঁড়ীরা ফের দাঁড় টানতে বসেছে। জাহাজ পৌঁছেছে বিরাট একটা নদীর মোহানায়। দুপাশে বড় বড় গাছ। শেকড় নেমে এসেছে জলে। শেকড়ের ওপর গা এলিয়ে রয়েছে বড় বড় কুমীর আর অন্যান্য সরীসৃপ। অচিরেই দেখা গেল একটা বালুকা সৈকত। জাহাজ নোঙর ফেলল এখানে।

খিদে পেয়েছিল খুবই। খেয়েদেয়ে নিতেই হঠাৎ ডুবে গেল সূর্য। মুখোশপরা দুটি পুরুষমূর্তি এসে দাঁড়ালো সামনে। দুটো বেতের বাক্স নামিয়ে রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হয়ে হাতের ইসারায় দেখালো তীরভূমি—যেন নামতে ইশারা করছে। পাথরের ফাঁকে সেখানে জলছে একটা আগুন—কে জেলেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। মুখোশধারীদের প্রশ্ন করেও কোনো জবাব পাওয়া গেল না। ক্যাপ্টেন আর কর্ণধারের মত এরাও বোধহয় কালা

আর বোবা।

আস্তি বললেন—'জাহাজ থেকে নামতে বলছে যখন, তখন চলো নেমে যাই। ভাগ্য-তারা এখনো তো ঊর্ধ্বে, দেখাই যাক না কপালে কি আছে।'

'ঠিক বলেছো,' বললে তুয়া—'এতদূর আনা হয়েছে নিশ্চয় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে।'

লোকদুটির পেছন পেছন জাহাজের কিনারায় গেল দুজনে। ঘেরা জাল এখন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তীরভূমি পর্যন্ত পাতা পাটাতনের ওপর দিয়ে নেমে আসতেই মুখোশধারী দুজন ঝুড়ি দুটো ধরিয়ে দিল দুজনের হাতে। উঠিয়ে নেওয়া হল পাটাতন। ঝপাঝপ দাঁড় টেনে কাদা জল ঘুলিয়ে মাঝ-নদীতে পৌঁছোলো সুদৃশ্য জাহাজ। গোধূলীর রক্তরাগে আগুন ঝলমলে মূর্তির মত স্থির হয়ে ওদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্যাপ্টেন আর কর্ণধার জাহাজের দুদিকে। সহসা এক ঝটকায় একই সঙ্গে দুজনে খসিয়ে আনল মুখের মুখোশ। পলকের মধ্যে দেখা গেল দুজনের মুখ। ক্যাপ্টেন আর কেউ নন—স্বয়ং ফারাও! কর্ণধারের বেশে দাঁড়িয়ে মারমিস। পরক্ষণেই কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল মুমূর্ষু সূর্য। মেঘ সরে যেতেই অপরূপ জাহাজকে আর দেখা গেল না।

এই প্রথম ভয় পেল আস্তি আর তুয়া। সভয়ে চাইল পরস্পরের পানে।

'ভুতুড়ে জাহাজ,' বললে তুয়া।

'হ্যাঁ,' বললেন আস্তি। 'প্রথম থেকেই আঁচ করেছিলাম। কিন্তু আমাদের বদলের জন্যেই এ জাহাজে চাপিয়ে এতদূরে এনে ছেড়ে দিয়ে গেল যারা, তারা কিন্তু এখনও ভালবাসে আমাদের। চলো, দূরের ঐ আগুনের কাছে যাওয়া যাক, কি ভাগ্যে আছে দেখা যাক।'

তখন অন্ধকার হয়েছে। আগুনের পাশে শুকনো কাঠ রয়েছে বিস্তর, আর রয়েছে উটের লোমের পোশাক—শীতনিবারণের জন্যে। পোশাক গায়ে চাপিয়ে ঝুড়ি খুলে দেখল ভেতরে কি আছে। আস্তির ঝুড়িতে শুকনো খাবার দাবার। তুয়ার ঝুড়িতে সবার ওপরে হাতীর দাঁতের সেই বীণা—যে বীণার সোনার তারে ঝংকার তুলে কেশ যুবরাজকে পাগল করে দিয়েছিল তুয়া রামিসের হাতে নিহত হওয়ার ঠিক আগে। কিন্তু এ-বীণা থিব্‌স্ থেকে থেকে এখানে এসে পৌঁছোলো কি করে?

জবাব দিলেন আস্তি। ঠিক যে ভাবে তাঁরা এসেছেন এখানে, সেইভাবে।

বীণার তলায় হাজার হাজার সেরা মুক্তো। এক-এক সাইজের মুক্তে দিয়ে রেশমের সুতোয় মালা গাঁথা। নখের সাইজের সবচেয়ে বড় মুক্তোগুলো

বস্ত্রখণ্ডে জড়িয়ে রাখা হয়েছে একদম তলায়।

বিস্মিত তুয়া বললে—'পৃথিবীর কোনো সম্রাজ্ঞীর এত মুক্তো নেই। কিন্তু জঙ্গলে মুক্তো আর বীণা নিয়ে করব কি?'

'ভবিষ্যতে সেটা জানা যাবে,' বললেন আন্তি। 'আপাততঃ এসো খেয়ে নেওয়া যাক।'

খাওয়া শেষ হল। হাতে আর কোনো কাজ নেই। আগুনের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল দুজনে।

কিন্তু চোখে ঘুম নামতে না নামতেই জেগে উঠল অরণ্য। হিংস্র শ্বাপদের গর্জন ভেসে এল দূর থেকে। থিবসের রাজপ্রাসাদে সিংহগর্জন শুনেছে বলেই সিংহের ডাক চিনতে পারল তুয়া। তারপরেই শোনা গেল শেয়াল আর নেকড়ের গজরানি। পরক্ষণেই গণ্ডার আর জলহস্তীর ঘোঁৎঘোঁতানি।

সম্মিলিত শব্দ এগিয়ে এল কাছে। অচিরেই জঙ্গলের অন্ধকারে তারার চুমকির মত জ্বলে উঠল নিশাচরদের চোখ। জলের ধারে দ্রুত সঞ্চরমান হল অনেকগুলো জীব। পাথরের ধারে কাছে আবির্ভূত হল ঝকঝকে দাঁতালো বরাহ এবং একটা ভীষণাকার প্রাণী—যার নাকে একটি মাত্র খড়্গ।

তুয়া বললে ক্ষীণ কণ্ঠে—'শেষ পর্যন্ত জানোয়ারের পেটেই যেতে হবে দেখছি।'

আন্তি কোনো কথা না বলে শুকনো কাঠ চাপিয়ে গেলেন আগুনে। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতেই বিকটাকার শ্বাপদগুলো দূর থেকেই ছাড়তে লাগল রক্ত-জল-করা গর্জন। ল্যাজ আছড়াতে লাগল সিংহ। দংষ্ট্রা দেখাতে লাগল হায়না।

'এইবার লাফ দেবে,' ভয়ার্ত কণ্ঠে বললে তুয়া।

'এতদূর আমাদের এই পরিণতির জন্যে নিশ্চয় আনা হয়নি,' আন্তি বললেন নির্বিকার স্বরে। 'বীণা তুলে নাও রাণী। বাজাও প্রাণ ঢেলে।'

সোনা তারে ঝংকার তুলল তুয়ারাণী। সেই সঙ্গে বীণা কণ্ঠের গান। প্রথম দিকে গলা কেঁপে গেছিল ভয়ে। ধীরে ধীরে গান ছাড়া আর সব কিছুই ভুলে গেল। নিস্তব্ধ অরণ্য মুখর হল তার দিকদিগন্তব্যাপী সঙ্গীত নির্ঝরে। গান উদারা মুদারা ছাড়িয়ে তারায় পৌঁছোতেই শান্ত হয়ে এল পশুবৃন্দ। মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইল স্থির দেহে। এমন কি প্রস্তর-কন্দর ছেড়ে একটি সর্প বেরিয়ে এসে কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথা দোলাতে লাগল গানের তালে তালে।

অনেকক্ষণ পর নীরব হল তুয়া। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। একে একে পশুরা উঠে মিলিয়ে গেল বনানীর অন্ধকারে, নদীর জলে। এক মাত্র বিষধর ভুজঙ্গটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল অকাতরে। ঘুমিয়ে পড়ল আন্তি আর তুয়াও।

ঘুম ভাঙল ভোরের আলোয়। নদীর ধারে গিয়ে দেখল নিশাচরদের পায়ের ছাপ আর পুরীষাদি। চেয়ে রইল নদীবক্ষে—বিচিত্র তরণীর ফিরে আসার প্রতীক্ষায়।

কিন্তু জাহাজ আর এল না। জলহস্তী আর কুমীরদের কেবল দেখা গেল নদীর ঘোলা জলে। ফিরে এসে ঝুড়ির খাবার খেয়ে দৃষ্টি বিনিময় করল দুজনে।

তুয়া বললে—'নদীর পাড় বেয়ে যাওয়া সম্ভব নয়—কাদা আর ঝোপে আটকে যাব। চলো যাই জঙ্গল ঠেলে।'

মিশরের চাষী রমণীদের কায়দায় মাথায় ঝুড়ি নিয়ে হাঁটতে শুরু করল দুজনে। হাতীর দাঁত আর সোনার তারে নির্মিত বীণা ঝুলতে লাগল তুয়ার গলায়।

হেঁটে চলল ঘন্টার পর ঘন্টা। মাথার ওপর কিচিরমিচির করে গেল বড় বড় বাঁদর। বৃহদাকার পশুরা পাশ কাটিয়ে আত্মগোপন করলে নিবিড় অরণ্যে। দুপুর নাগাদ জমি উঠতে লাগল ওপর দিকে। বিরল হয়ে এল গাছপালা। অচিরে পৌছোলো একটা বালুকাময় মরুপ্রান্তে। আরও কিছুদূর গিয়ে পৌছোলো একটা মরুদ্যানে। সবুজ ঘাসে ঝুড়ি রেখে কূপ থেকে পান করল মিষ্টি জল, খেল ঝুড়ির খাবার। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

হঠাৎ ঘুমের মধ্যে তুয়া শুনল কার কণ্ঠস্বর। চোখ মেলে দেখল কাঁটা লাঠিতে ভর দিয়ে একটা লোক অদূরে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে তাদের দিকে। অদ্ভুত চেহারা। অতি বৃদ্ধ। লম্বা সাদা চুল লুটোচ্ছে ঘাড়ে। দাড়ি লুটোচ্ছে হাঁটু পর্যন্ত। একসময়ে অতি দীর্ঘ ছিল নিঃসন্দেহে। এখন হয়েছে কুব্জ। শীর্ণ দেহের হাড়গুলো চামড়া ঠেলে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। কৃষ্ণকালো চক্ষু শৃঙ্গের মত কঠিন অনুভূতিবিহীন—আদৌ দেখতে পাচ্ছে কিনা সন্দেহ। তাই যেন ঝুঁকে পড়ে চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে নির্নিমেষে। মুখ সহস্র বলিরেখাঙ্কিত, রোদে হাওয়ায় প্রায় কালো, তা সত্ত্বেও অপূর্ব সুন্দর এবং কোমল। যেন অনেক বছর আগেকার মৃত কোনো মহান ফারাও—অন্ততঃ তুয়ার তাই মনে হল।

তাই পিতা বলেই ডাকতে সাধ হল। উঠে বসে বললে—'পিতা, বলো

তুমি কোথেকে এলে, কি করতে চাও দীনহীনা এই সেবিকাদের ছিরে।'

সুমিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল বৃদ্ধ—'কন্যা, মরুভূমিতে আমার আবাস, আসছি সেখান থেকেই। আমার সমসাময়িক এবং তাদের সন্তানসন্ততিরা সব মারা গেছে, আমি কিন্তু বেঁচে আছি। তাই আজ আমার একমাত্র বন্ধু মরুভূমি আর অরণ্য—তারা পালটায় না আমার মতই—একমাত্র তারাই জানে শৈশবে আমি ছিলাম কি রকম। দয়া করো আমাকে। বড় গরীব আমি। তিনদিন কিছু খাইনি। তোমার ঝুড়ির ঐ শুকনো মাংসের গন্ধে ছুটে এসেছি। হে কন্যা, দাও ঐ মাংস, খেয়ে বাঁচি।'

'এ মাংস তোমারই—'

'আমার নাম কেফার।'

'কেফার! কেফার!' ভারী আশ্চর্য নাম তো ভিক্ষুকের! মিশরীয়দের কাছে বিশেষ এই গুবরে পোকারা অনন্তের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। মাংসভর্তি ঝুড়ি বৃদ্ধের হাতে তুলে দিল তুয়া।

ঝুড়ি নিয়ে আকাশের পানে মুখ তুলে যেন দেবতাদের বন্দনা করে বসে পড়ল বৃদ্ধ। বুভুক্ষুর মত খেয়ে চলল যা ছিল ঝুড়িতে।

আন্তি বললেন—'কিছুই আর বাকী রাখবে না মনে হচ্ছে। মানুষ নয় ও, পশুপাল।'

তুয়া বললে—'হোক। অতিথি তো, যা পারে খাক।'

ক্ষণেক চুপ করে থেকে আবার মুখর হলেন আন্তি। থামিয়ে দিয়ে তুয়া বললে —'অতিথির সেবা সবার আগে।'

'অতিথি সেবা করতে গিয়ে আমরা তো অনাহারে মরব।'

'বৃদ্ধ তো বাঁচবে। আমাদের দেখবেন আমেন।'

বলতে বলতে চোখ ছলছল করে উঠল। দু-দিনের খাবার দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। না খেয়ে মরা ছাড়া আর উপায় নেই।

ঝুড়ি শেষ করে অভিবাদন জানিয়ে বৃদ্ধ বললে—'হে কন্যা, বহুদিন শূন্য ছিলাম। এখন পূর্ণ হলাম। মিশরের সম্রাজ্ঞীও এমন খাওয়া খাওয়াতে পারত না আমাকে। কিছুই দেবার নেই আমার। তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, কোনোদিন খাদ্যাভাব কাকে বলে যেন টের না পাও।' বলে অদ্ভুত শুষ্ককঠিন চোখে পিট পিট করে চেয়ে রইল তুয়ার পানে।

তুয়ার অশ্রু ঝরে পড়ল বৃদ্ধের শুষ্ক হাতে।

বললে কাঁদতে কাঁদতে—'বিদ্রূপ কোরো না। দেখতেই পাচ্ছো আমরা যাযাবর। খাবারের অভাবে শীগগিরই অনাহারে মারা যাবো।'

অবাক হয়ে বললে বৃদ্ধ—'সেকী! তোমাদের কাছে আর খাবার নেই? সব খাইয়ে দিলে বুড়ো ভিখিরিটাকে? এই জন্যেই বুঝি কাঁদছো?'

'সম্প্রতি খিদে কাকে বলে জেনেছি বলেই চোখে জল এসে যাচ্ছে। চলো, আন্তি, রওনা হওয়া যাক।'

নামটা শুনেই ফিরে তাকালো কেফার। তারপর বললে তুয়াকে—'কন্যা, তোমার মুখ সুন্দর। অন্তর শুদ্ধ। নইলে এভাবে আমাকে পেটভরে খাওয়াতে পারতে না। একটাই শুধু অভাব আছে তোমার—ঈশ্বরে অচল আস্থা। তবে সাহসের অভাব নেই। সিংহ-অধ্যুষিত জঙ্গল যারা পেরিয়ে আসে অক্ষত দেহে—তারা সাহসী তো বটেই, ভরসা রাখে ভাগ্যের ওপর। এবার বলো কোত্থেকে আসছ।'

জবাব দিলেন আন্তি—'মিশর থেকে। আমি এর ধাই-মা। পলাতক বাঁদী আমরা। ফিনিসিয়ান বোম্বেটেরা ধরে এনেছিল নীলনদের তীর থেকে। জাহাজ বালির তীরে থামিয়ে নেমেছিল জল নিতে। ফাঁক পেয়ে পালিয়ে এসেছি।'

'তাই নাকি? পালিয়ে এলে, অথচ পিছু নিল না? কাল রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম এক বিদেহীকে। দুটি মেয়ের সন্ধানে আসতে বললে এদিকে। একজনের নাম মনে আছে—আন্তি। আরেকজনের নাম খেয়াল হচ্ছে না। বিদেহীর নামটা কিন্তু ভুলিনি—মারমিস।'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বৃদ্ধের মুখ নিরীক্ষণ করলেন আন্তি। নিষ্পলকে চেয়ে রইল বৃদ্ধ।

আন্তি বললেন টেনে টেনে—'আপনি তৃতীয় নয়নেরও অধিকারী দেখছি।'

'হয়ত। দীর্ঘ জীবনে দেখেছি পুরুষরা অনেক কিছু জানতে পারে—মেয়েরাও কম যায় না। ধাই-মা হিসেবে তুমি তা ভাল জান। যাক সে কথা। তোমার এই পালিতা-কন্যার নামটা যেন কী?'

'নেফারতে,' ঝটিতি বললেন আন্তি।

'নেফারতে! বিদেহীর মুখে এ নাম শুনিনি বটে। তবে এই রকমই একটা নাম বলেছিল সে। বোম্বেটেদের জাহাজ থেকে পালিয়ে এসেছো তোমরা? অনেক জিনিসপত্র সঙ্গে এনেছো দেখছি। রাজসর্প ইউরোআই খোদাই করা ভারী সুন্দর বীণাটা তো দেখতেই পাচ্ছি। অন্য ঝুড়িটায় কি আছে?'

'মুক্তো,' বলে উঠল তুয়া।

'অতবড় ঝুড়িভর্তি মুক্তো! দেখতে পারি? ভয় নেই। লুঠ করব না। বেইমান নই আমি। যার খাই, তার জিনিস চুরী করি না।'

তুয়া বললে—'চোর হলে কি আর না খেয়ে থাকতে? কিন্তু পিতা, তোমার দৃষ্টি তো প্রখর নয়। মুক্তো আর পাথরের মধ্যে তফাৎ বুঝবে কি করে?'

মৃদু হেসে বললে বৃদ্ধ—'অনুভূতি তো আছে।'

ঝুড়ি বাড়িয়ে দিল তুয়া। মুক্তোর মালার ঘ্রাণ নিল বৃদ্ধ। হাত বুলিয়ে দেখল, জিভ বুলিয়ে নিল কাপড মোড়া বড দানার মুক্তোগুলোয়। তারপর ঝুড়ি সমেত তুলে দিল তুয়ার হাতে।

বললে শুষ্ক কণ্ঠে—'ধাই-মা আস্তি, ফিনিসিয়ান দস্যুগুলো তোমাদের পেছন পেছন তেডে এল না কেন বুঝতে পারছি না। এখানে যা মুক্তো দেখলাম, তা দিয়ে একটা রাজত্ব কেনা যায়।'

'মুক্তো খেয়ে তো আর বেঁচে থাকব না,' বললেন আস্তি।

'কিন্তু খাবার কেনা যায় মুক্তোর বিনিময়ে।'

'মরুভূমির মধ্যে নয়।'

'কিন্তু তোমাদের কপাল ভাল। খুব কাছেই একটা শহর আছে।'

'নাপাতা?' সাগ্রহে শুধোয় তুয়া।

'নাপাতা? না, না। তবে এ নামে একটা শহর একশ বছর আগে ছেলেবেলায় দেখে এসেছিলাম বটে। সোনার শহর বলা হয় সে শহরকে।'

'একশ বছর আগে। কোনদিক দিয়ে যেতে হয়, মনে আছে?'

'আছে। কিন্তু হাঁটাপথে লাগবে এক বছরেরও বেশী। পেরিয়ে যেতে হবে কয়েকটা মরুভূমি আর বর্বরদের এলাকা। খুব কম লোকই পারে সে শহরে পৌঁছোতে।'

'কিন্তু আমরা পারব। নইলে মরব।'

'তা পারবে। কিন্তু তিন মাসের আগে রওনা হতে যেও না। বৃষ্টি নামলে মরুভূমির কুয়োগুলো জলে ভরে উঠলে যেও। এই তিন মাস শহরে থাকো। শহরবাসীরা মুক্তো ভালবাসে। আর গানবাজনা। আস্তি বেচবে মুক্তো, তুমি গাইবে গান। কি বলো?'

'মরুভূমি ছাডা যে কোনো জায়গায় থাকতে রাজী,' বললে তুয়া—'পথ জানা থাকলে নিয়ে চলো।'

'এসো। খাবারের দাম কিছুটা মিটিয়ে দিই।' লাঠি তুলে নিয়ে অগ্রসর হল বৃদ্ধ।

যেতে যেতে তুয়া বললে আন্তিকে—'কেফারকে প্রথম যখন দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল নড়তেও পারবে না। এখন তো দেখছি অদ্ভুত তাড়াতাড়ি হাঁটছে।'

'মানুষ নয় বলেই অমন ভাবে হাঁটছে,' বললেন আন্তি। 'ভুতুড়ে জাহাজের পর আবার এক ভূতের পাল্লায় পড়েছি। মানুষ হলে কি অত খাবার একা খেতে পারতো? একশ বছর আগে দেখা শহরের কথা অমনভাবে বলতে পারতো? আমার মৃত স্বামীকে স্বপ্নে দেখার গল্প বলতে পারত?'

প্রফুল্লকণ্ঠে তুয়া বললে—'ভূতেরাই তো দেখছি এখন আমাদের পরম সহায়।'

রোদের তাতে ঘন্টার পর ঘন্টা একনাগাড়ে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ল দুজনে। কেফার হন হন করে চলেছে অনেক আগে। বিকেল নাগাদ বালি আর পাহাড়ে উঠল বৃদ্ধ। আন্তি আর তুয়া চূড়ায় পৌঁছে দেখল দূরে সবুজ ক্ষেত্রের মাঝে দেখা যাচ্ছে একটা শহর। কেফার একটা গাছের গুঁড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শহরের কিনারায়।

ওরা কাছে পৌঁছোতেই বললে—'মুখে ঘোমটা দিয়ে গাছের আড়ালে বসে থাকো। কেউ এসে পড়লে বলবে, মরুভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে জিরেন নিচ্ছ। এ শহরের নাম টাট। তোমাদের জন্যে খাবার আর থাকার জায়গার জন্যে টাকা দরকার। একটা মুক্তো খসিয়ে দিতে পারো মালা থেকে? বিক্রি করে সব ব্যবস্থা করে আসছি।'

তুয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বললে—'পুরো একটা মালা নাও।'

'না, না। একটা মুক্তোই যথেষ্ট। এ শহরে মুক্তো দুষ্প্রাপ্য, তাই দাম বেশী।'

মালা থেকে বৃদ্ধ নিজেই খসিয়ে নিল একটা মুক্তো। সিল্কের সুতো দিয়ে ফের বেঁধে দিল নিখুঁতভাবে—যা কোনো ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্রুত মিলিয়ে গেল শহরের দিকে।

আন্তি বললেন—'আর ফিরলে হয়।'

তুয়া তখন এত ক্লান্ত যে জবাব দিতে পারল না। বসে থাকতে থাকতে তন্দ্রা এসেছিল। চটকা ভাঙতে দেখল সূর্য ডুবে গেছে, সামনে দাঁড়িয়ে কেফার, দুজন কৃষ্ণকায় পুরুষ আর দুটি অশ্বতর।

'থাকার জায়গা পাওয়া গেছে। উঠে পড়ো,' বললে বৃদ্ধ।

শহরের ফটকে পৌঁছোতেই পাল্লা খুলে গেল কেফারের হাঁকডাকে। সুদীর্ঘ পথ বেয়ে পৌঁছোলো পাঁচিল ঘেরা বাগানের মধ্যে একটা বাড়ীতে।

চমৎকার বাড়ী। ঘরে ঘরে সাজানো বিস্তর আসবাবপত্র। খাবার ঘরে টেবিলে থরে থরে সাজানো খাবার। তিনজনে বসে খেল পেট ভরে। পরিচারিকাকে ডেকে তুয়া আর আস্তিকে শোবার ঘর দেখিয়ে দিতে বলে বৃদ্ধ কেফার নিজে গেল বাগানে রাত কাটাতে।

কোনো প্রশ্ন করল না তুয়া আর আস্তি। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল অঘোরে।

(১৫) তুয়া আর টাট-য়ের রাজা

ভোর হল। পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ এনে দিল পরিচারিকা। সাজপোশাক শেষ হতেই দেখা গেল ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিক্ষুক কেফার—অথচ দুজনের কেউই তাকে আসতে দেখেনি।

অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে বললেন—'বন্ধু, আপনি বড় নিঃশব্দে আসেন। সূক্ষ্মদেহও এত নিঃশব্দে বিচরণ করতে পারে না। তাছাড়া, ছায়া কোথায় আপনার ?'

বাইরে সূর্য উঠেছে, খোলা জানালা দিয়ে রোদ পড়েছে কেফারের গায়ে—কিন্তু ছায়া পড়েনি মেঝেতে।

ভরাট গম্ভীর গলায় বললে কেফার—'অহো, মনেই ছিল না। আমার মত গরীবের পক্ষে ছায়া নিয়ে ঘোরা কি সম্ভব ? যাকগে, ঐ তো এসে গেছে ছায়া। সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধে কি যেন বলছিলে ? তোমার মত বাঁদীর পক্ষে তো তা জানা সম্ভব নয়। তোমার নামে একটি মেয়ে অবশ্য আছে মিশরে। শুনেছি, সে নাকি সূক্ষ্মদেহকে দেখতে পায়, জীবন্ত শরীর থেকে তাকে টেনে বার করার ক্ষমতা রাখে, জাগতিক জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সেই সূক্ষ্মদেহীকে নিয়োগ করতে পারে। আরও শুনেছি, মিশরের রাণীর কা নাকি তাঁর জায়গায় বসে এমন নির্মমভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারে যা দুঃস্বপ্নেও ভাবা যায় না। তাকে দেখেও বোঝা যায় না যে সে আসলে কা, রক্তমাংসের রাণী নয়। আমেন তাকে দান করেছিল রাণীর জন্মমুহূর্তে। বন্ধু আস্তি, মিশরে বাঁদী থাকার সময়ে শুনেছো কি এই সব ব্যাপার ?'

বলে, চোখ পিটপিট করে চেয়ে রইল আস্তির পানে। আস্তিও চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর মাথা নিচু করে চোখ ফিরিয়ে নিলেন আস্তি—কোনো কথা বললেন না।

ভয় পেয়ে গেল কিন্তু তুয়া। প্রকৃত পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে না জানি

কি অনর্থ ঘটে।

তাড়াতাড়ি বললে—'নিঃশব্দে আসুন কি শব্দ করে আসুন—ছায়া ফেলুন কি গুটিয়ে রাখুন—সব সময়ে স্বাগতম জানাবো আপনাকে। বাড়ী দিয়েছেন, দাসদাসী দিয়েছেন, আহার্য দিয়েছেন—পিতা, ধন্যবাদ রইল সে জন্যে। কিন্তু এখন আর খাবেন না?'

'না। মাংস খাই খুব কম—কালকেই তো দেখলে। তাও তিন দিনে একবার। জীবন বড় সংক্ষিপ্ত, খেয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'এত কম খেয়ে যদি একশ বছর আগে যৌবনকে ফেলে আসেন, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে বলুন তো? ভাল কথা, এ শহরে কি করব বলে যান।'

'কালকেই বলেছি—কি করবে। আস্তি মুক্তো বেচবে, আর তুমি আড়ালে থেকে গান গাইবে—কেউ যেন তোমার রূপযৌবন দেখতে না পায়—বিশেষ করে প্রশাসক মহলের কেউ। আরো দুটো মুক্তো দাও, আরও কিছু জিনিস কিনে আনি। তারপর আমাকে অনেকদিন আর দেখতে পাবে না। বিপদে পড়লে যেখানেই থাকো না কেন, সেখানকার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার ঐ বীণার তারে ঝংকার দিয়ে তিনবার 'কেফার, কেফার, কেফার,' বলে ডাকবে। কেউ না কেউ তোমার ডাক শুনতে পাবে, খবর পৌঁছে দেবে মরুভূমিতে। শহর আমার ভাল লাগে না বলেই তো থাকি সেখানে। খবর পেলেই ছুটে আসব।'

'কিন্তু আপনার মত এমন—' বলে থেমে গেল ভুয়া।

'আমার মত এমন বুড়ো কিভাবে তোমাদের বিপদ থেকে বাঁচাবে, এই কথাই তো বলতে চাইছিলে? বাইরে দেখে বিচার করতে যেও না। উৎকৃষ্ট সুরা অনেক সময়ে মামুলী মাটির পাত্রে থাকে। রাস্তার চকমকির স্ফুলিঙ্গ অনেক সময় একটা শহর ধ্বংস করে দিতে পারে।'

শুষ্ক কণ্ঠে মন্তব্য করলেন আস্তি – 'মরুর যাযাবরও দরকার হলে অসহায়া দুই যাযাবরীকে সাহায্য করতে পারে, নিজের ছায়াকে দরকার মত গুটিয়ে রাখতে পারে নিজের মধ্যে। পিতা, অনেক বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী আমি—তাই আর অবাক হচ্ছি না।'

'নিশ্চয়। তোমার ফিনিসিয়ান বোম্বেটে কাহিনীও তো রীতিমত বিচিত্র। যাক, বিদায় মেয়েরা। মুক্তোর বিনিময়ে জিনিসপত্র কিনে পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে যাবো মরুভূমিতে। মনে রেখো, বর্ষা শুরু না হওয়া পর্যন্ত এ-শহর ছেড়ে বেরোবে না। আবার যখন দেখা হবে, আস্তির সঙ্গে

সুন্দরেহ নিয়ে অনেক গল্প করা যাবে'খন। তদ্দিন তোমাদের মিশরের দেবাদিদেব, কি যেন তাঁর নাম?—হ্যাঁ, আমেন—বিপদ থেকে আগলে রাখবেন তোমাদের।'

পেছন ফিরে অন্তর্হিত হল বৃদ্ধ।

সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ ভেসে আসতেই তুয়া বললে—'অদ্ভুত মানুষ তো!'

'মানুষ নয়, প্রেত। মানুষ কখনো ছায়ার ভাঁজ খুলে মেলে ধরতে পারে? ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে হয় অপদেবতা, নয় অধিদেবতা।'

'ভূত হোক কি মানুষ হোক, বিপদের সময়ে বন্ধু তো হয়েছে।'

'শেষ পর্যন্ত আগে দেখি,' বললেন আন্তি।

ঘন্টা খানেক পরে কুলীরা বয়ে নিয়ে এল সোনা আর রুপোর সুতো দিয়ে বোনা বস্ত্র, কারুকাজ করা চামড়া—যা দেখা যায় আরব দেশে, কলস ভর্তি কালো পাথরের বয়েম, সিরিয়ায় তৈরী পেতলের জিনিসপত্র, সাইপ্রাসে বানানো তামার বাসন এবং আরও অনেক মহার্ঘ সামগ্রী যা কোনো ধনবান সওদাগরের গৃহেও দেখা যায় না।

জিনিসপত্র ঘরে ঘরে সাজিয়ে দিয়ে দক্ষিণা দাবী না করে বিদেয় হল কুলীরা। তারপর ভারী সুন্দর একটা সাদা ঘোড়ায় চেপে একটা লোক এসে মাথা হেলিয়ে সূক্ষ্ম পর্দার অন্তরালে বসে থাকা তুয়া আর আন্তিকে অভিবাদন জানিয়ে একটা লেখা কাগজ টেবিলে রেখে চলে গেল তৎক্ষণাৎ। দরজা খুলে বেরিয়ে আন্তি দেখলেন, মিশরীয় হরফে লেখা একটি দলিল পৌঁছে দিয়ে গেল শ্বেত অশ্বারোহী। এই বাগান আর বাড়ীর স্বত্ব তাদের দুজনের। জিনিসপত্রও তাদের দুজনের। দলিলের তলায় লেখা :

'তিনটি মুক্তোর এবং ভরপেট মাংসাহারের বিনিময়ে উক্ত গৃহ, আসবাবপত্র, সামগ্রী এবং জমি গ্রহণ করলেন যাযাবর কেফার।'

তলায় রয়েছে কেফারের স্বাক্ষর। মোমের বিচিত্র নামাংকন। একটা গুবরে পোকা সূর্য-প্রতীককে ধরে রয়েছে সামনের দু-পা দিয়ে।

তুয়া বললে—'শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা যাযাবরের পক্ষে নামাংকনটা একটু বেশী জমকালো।'

আন্তি শুধু বললেন—'ছোট মুক্তোর যদি এত দাম হয় এ শহরে, বড় মুক্তোর দাম কি হবে ভাবছি।'

পুরোদমে মুক্তোর ব্যবসা আর গানের আসর জমিয়ে গেল আন্তি আর

তুয়া। বেলা একটার সময়ে বেসাতি নিয়ে ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসতেন আন্তি। মুক্তোর বিনিময়ে নিতেন সোনার গুঁড়ো অথবা সোনার তাল। বড় মুক্তো একটাও না বেচে শুধু ছোট মুক্তোতেই সাড়া ফেলে দিলেন শহরময়। সোনার ভরে উঠল বাড়ী। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে গেলেই সিল্কের পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে বীণা বাজিয়ে গান আরম্ভ করত তুয়া। বেসাতি-গুটিয়ে নিতেন আন্তি। রাস্তায় ভীড় জমে যেত। গাড়ীঘোড়া চলা দায় হত।

এই ভাবেই চলল সপ্তাহের পর সপ্তাহ। একটা দিনের জন্যেও বাড়ীর বাইরে গেল না দুজনে।

টাট-য়ের রাজা তখন সমুদ্রের ধারে একটা দেশের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিল। সে-দেশ জয় করে প্রচুর সোনাদানা নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরতেই পরিষদরা বললে, যুদ্ধ জয়ের উৎসবে তো অনেক মুক্তো দরকার। মুক্তো পাওয়া যাবে মুক্তোর ব্যাপারী এক মহিলার কাছে। তার মেয়ে নাকি চমৎকার গান গায়। সোনায় বাড়ী ভরে উঠেছে। কিন্তু চোর ডাকাত কাছে ঘেঁসতে ভয় পায়। গুজব, এরা নাকি স্বর্গের দেবী—দেবতারা এদের প্রহরী। কিন্তু আশ্চর্য এই গুজব ছড়িয়েছে কে, তা কেউ জানে না।

রাজার বয়স চল্লিশের কম। নাম, জ্যানীস, বিকেলের দিকে ছদ্মবেশে গেল মুক্তো দেখতে। তখন ঝাঁপি তুলছেন আন্তি। ছদ্মবেশী রাজা মুক্তো দেখতে চাইলে আন্তি তাকে সোজাসুজি বলে দিলে পরের দিন আসতে—এখন গানের সময়—মুক্তো বেচার সময় নয়।

রেগে গেল রাজা। চোখ গরম করে বললে—'জানো আমি টাট-য়ের রাজা? ইচ্ছে করলে জোর করে দখল করতে পারি তোমার মুক্তো।'

'তাই নাকি?' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল আন্তির কণ্ঠে—'জোর করে নিলে তো লোকে আপনাকে চোরেদের রাজা বলবে।'

হো-হো করে হেসে উঠল সমাগত নাগরিকরা। অবস্থা বুঝে গলা মিলিয়ে হাসল রাজাও। শুরু হয়ে গেল তুয়ার গান। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনল রাজা।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে এসে আগে দেখল মুক্তো। ছোট মুক্তো একটাও পছন্দ হল না। শেষকালে আন্তি বার করল বড় মুক্তো। তাও পছন্দ হল না। সবশেষে সবচেয়ে বড় মুক্তো দুটো, যা কিনা পুরুষমানুষের মধ্যমার নখের সমান, দেখেই মাথা ঘুরে গেল রাজার।

কিন্তু চোখ কপালে উঠল দাম শুনে। আন্তি নির্বিকারভাবে যে দাম

হেঁকে বললেন, তা লুট করে আনা সোনার এক চতুর্থাংশ।

দরাদরি করেও সুবিধে হল না। রাজার কোনো হুমকিকে তোয়াক্কা করলেন না আস্তি। মুক্তো তুলে ফেললেন ঝাঁপিতে। মর্মান্তিক চটলেও মুখে কিন্তু রাজা বললে দাম দেবে পরের দিন। এখন গান শোনার সময়—শুরু হোক গান।

শুরু হল গান। মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল রাজা। 'অহো! অহো!' রব উঠল চারিদিকে। স্বর্গীয় সংগীত শুনে কেউ বললে সাক্ষাৎ স্বর্গের দেবী—মানবী নয়। রাজা নিজেও বিমুগ্ধ। কিন্তু পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে পর্দার দিকে—যে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করে চলেছে তুয়ারাণী। আস্তির সেদিকে খেয়াল নেই। মুক্তো তুলে রাখছেন ঝাঁপিতে। রাজা একটু একটু করে গিয়ে দাঁড়াল মিহি পর্দার পাশে। কাঠের খাঁজে আঙুল ঢুকিয়ে এমনভাবে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন গান শুনে অবশ হয়ে এসেছে সর্বদেহ। সাড় নেই চেতনার। অনেক... অনেকক্ষণ পরে সঙ্গীত যখন সমাপ্তপ্রায়, অকস্মাৎ যেন টলে পড়ে গেল রাজা। পড়তে পড়তে তাল সামলাতে গিয়ে পর্দা খামচে ধরতেই পড় পড় করে পর্দা ছিঁড়ে এসে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

দেখা গেল অনিন্দ্যসুন্দরী এক তরুণীকে। ঝলমলে পোশাক পরে বীণা হাতে দাঁড়িয়ে তুয়ারাণী। মুখে অবগুণ্ঠন নেই। মেঘ সরে গিয়ে অকস্মাৎ যেন সূর্যরশ্মিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল সমবেত শ্রোতাদের। মুখে কথা সরল না কিছুক্ষণ। তার পরেই বললে একজন—'মানবী ইনি, কিন্তু মহারাণী।'

জবাবে বললে আর একজন—'উঁহু, মানবীও নন—দেবী।'

পরমুহূর্তেই উধাও হল তুয়ারাণী।

চোয়াল ঝুলে পড়েছিল রাজা জ্যানীসের। বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল এতক্ষণ। তুয়া অন্তর্হিত হতেই এবার সত্যি সত্যিই পা টলে গেল প্রকৃতই মুহ্যমান হওয়ার।

বললে আস্তিকে—'ইনি কি আপনার বাঁদী?'

'না, রাজা। আমার মেয়ে। গুপ্তচরের মত সবার সামনে তাকে আনাটা আপনার ঠিক হয়নি।'

ধীর কণ্ঠে জ্যানীস বললে—'মুক্তো কারবারী, ইনি যদি আপনার মেয়ে হন, তবে হবেন আমার রাণী। বিনিময়ে পাবেন যত সোনা চেয়েছেন—তার চতুর্গুণ।'

চোখোচোখি চেয়ে সটান জবাব দিলেন আস্তি—'ওর চেয়েও বড় প্রস্তাব করেছেন অনেকে—আমার মেয়ে কিন্তু কারও জন্যে নয়—আপনার জন্যে তো নয়ই।'

এক পা এগিয়ে গেল জ্যানীস—ভঙ্গি দেখে মনে হল চপেটাঘাত করবে আস্তিকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে।

'বাচালতার জবাব কিভাবে দিতে হয় আমি জানি। কিন্তু এখন নয়। জোড়া জোড়া চোখ চেয়ে আছে এদিকে। কাল কথা হবে এ নিয়ে। আপাততঃ ফিরিয়ে নিন।'

'সময় নষ্টই করবেন,' বললেন বটে আস্তি, কিন্তু ততক্ষণে উধাও হয়েছে রাজা।

তুয়াকে পাওয়া গেল বাগানে। সব শুনে ঘাবড়ে গিয়ে সে বললে—'কেফারকে এবার ডাকা দরকার। আমি আর কেশ-যুবরাজের মতই জঘন্য এই জ্যানীস।'

আস্তি বললেন—'ডাকাডাকির দরকার নেই। চলো আজ রাতেই পালাই মরুভূমিতে। সেখানেই দেখা হয়ে যাবে'খন।'

'তাই চলো।'

কিন্তু পালাবার পথ তো বন্ধ। খবর নিয়ে এলেন আস্তি। জ্যানীসের সৈন্য বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। কাউকে বেরোতে দিচ্ছে না।

তুয়া বললে—'তবে এসো বাজাই বীণা, ডাকি কেফারকে।'

'এখনো সময় হয়নি, রাণী। আজ রাতেই বিপদ কেটে যেতে পারে, রাজার সুবুদ্ধির উদয় হতে পারে। খামোকা ডেকে আনলে রেগে যেতে পারে কেফার। তার চেয়ে চলো খেয়ে নিই।'

খেতে বসল দুজনে। হঠাৎ দড়াম করে একটা আওয়াজ হতেই মুখ তুলে দেখলে দুজন রক্ষী ঢুকে পড়েছে খাবার ঘরে—পরিচারিকারা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আশ্রয় নিয়েছে এককোণে।

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে পোশাকের আড়াল থেকে একটা ছুরিকা টেনে বার করল তুয়া। কিন্তু পক্ককেশ বৃদ্ধ রক্ষী মাথা নুইয়ে বললে সবিনয়ে—'আমি নিরস্ত্র। ইচ্ছে হলে মারতে পারেন। কিন্তু বাইরে আরো অনেকে আছে। বাধা দিয়ে লাভ নেই। আপনাদের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। রাজার ইচ্ছে, এমন সুন্দরী মহিলার স্থান হোক তাঁর রাজপ্রাসাদে—বাজার অঞ্চলে নয়। তাই আপনাদের এই সমস্ত জিনিসপত্রসমেত নিয়ে যেতে এসেছি আমি। কথা বলবেন উনি সেইখানেই।'

আস্তি বললেন—'ছুরিকা কোষবদ্ধ করো, কন্যা। চলো, যাই। এ ছাড়া আর পথ নেই।'

অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে রওনা হল দুজনে। রাজার পরিচারিকারা দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। তারা জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু করে দিল। মুক্তো আর সোনা দিয়ে নির্মিত শিবিকায় উঠে বসল তুয়া আর আস্তি। সৈন্য পরিবৃত শিবিকা জনহীন নির্জন পথ বেয়ে এল রাজপ্রাসাদে। অনেক সোপানশ্রেণী পেরিয়ে দুজনে পৌঁছোলো প্রশস্ত এবং সুন্দর একটি কক্ষে। রুপোর প্রদীপে সুগন্ধি তেলের আলো জ্বলছে ঘরের কোণে কোণে। পরিচারিকারা অন্যান্য রাজরমণীদের সাহায্যে তাদেরই জিনিসপত্র সাজাচ্ছে এ ঘরে এবং পাশের আরো কয়েকটি ঘরে।

ঘর সাজানো শেষ হলে সুপেয় সুরা এবং সুস্বাদু আহার্য ওদের সামনে রেখে বিদায় নিল মেয়েরা। দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল নিশ্চুপে।

বীণা তুলে নিল তুয়া। বললে—'কেফার যে রকম বলেছিল, ঠিক সেই রকম একটা জানলা রয়েছে ওখানে। বাজাই এবার?'

'এখনো সময় হয়নি,' বললেন আস্তি। 'আগে দেখি কদ্দুর জল গড়ায়। তারপর—'

মুখের কথা শেষ হল না। খুলে গেল দরজা। রাজবেশ পরে ঘরে প্রবেশ করল জ্যানীস।

ঘরের ঠিক মাঝখানে ছিল একটা মর্মর প্রস্তরের জলাধার। সেকালের রাণীরা স্নান করত বোধহয়, অথবা ঘর ঠাণ্ডা রাখার জন্যে বানানো হয়েছে। একদিকে দাঁড়াল তুয়া আর আস্তি, অপরদিকে রাজা। তিনবার মাথা নুইয়ে তুয়াকে অভিবাদন জানিয়ে বললে রাজা—'আপনার নাম শুনেছি নেফারতে—নিবাস মিশরে। আসল নাম যখন জানা নেই, এই নামেই ডাকা যাক। আপনার কাছে যা ঘোরতর অন্যায় মনে হয়েছে, ক্ষমা চাইতে এলাম তার জন্যে। কিন্তু এছাড়া আর কোনো পথ নেই, এই আমার একমাত্র অজুহাত। শুভলগ্নে কি অশুভ লগ্নে জানা নেই, কিন্তু আপনার মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটাই কামনা জাগ্রত হয়েছিল মনের মধ্যে—এ মুখ যেন আবার দেখি, চিরজীবন ধরে দেখি। মিশরে যাকে আপনারা প্রেমের দেবী হাথোর বলেন, তিনি আমাকে তাঁর গোলাম বানিয়ে ফেলেছেন। ঐশ্বর্য, আড়ম্বর অথবা ক্ষমতা—কিচ্ছু আর চাই না, চাই শুধু আপনাকে। আর কোনো নারীকে নয়—শুধু আপনাকে। আপনার কোনো ক্ষতি আমি

করব না—কিন্তু আমার অর্ধেক সিংহাসন আপনি পাবেন। আপনিই হবেন আমার একমাত্র রাণী। বলুন এবার কি বলবেন।'

তুয়া বললে—'রাজা ক্যাবীস, আপনার ঘাড়ে কি ভূত চেপেছে? সামান্য এক যাযাবরী মুক্তো ফেরিওয়ালীর মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছেন? একটা গাইয়ে মেয়েকে পাটরাণী বানাতে চাইছেন? বিশ্বের শ্রেষ্ঠা রমণীর জন্য সংরক্ষিত থাকুক রাণীর সিংহাসন। যেতে দিন আমাকে আমার পথে। কত রাজার কত মেয়ে আছে, এদের কাউকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। গরীব এই গায়িকাকে মুক্তি দিন।'

মৃদু হাসল রাজা—'গরীব এই গায়িকা আর মায়ের যত মুক্তো আছে, তা একটা গোটা রাজ্যের রাজস্বের সমান; এই গায়িকার হাতীর দাঁতের বীণায় খোদাই করা রয়েছে মিশরের রাজ-প্রতীক ইউরোআই; এই গায়িকার সমতুল্য সৌন্দর্য দেখা যেত কেবল প্রাচীন নৃপতিদের কন্যাদের ক্ষেত্রে; এই গায়িকার গান বনের পশু আর জনপদের মানুষের অন্তরে সুধা বর্ষণ করে। আপনার হুঁশিয়ারির জন্যে ধন্যবাদ, নেফারতে। কিন্তু যে মুহূর্তে পর্দা ছিঁড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার গলায় সারা মিশরের উপাস্য পবিত্র চিহ্ন দেখেছি, সেই মুহূর্তেই জেনেছি এই গায়িকা কন্যার রক্ত ধমনীতে নিয়ে কোনো দিনই অনুশোচনায় ভুগবে না আমার ছেলেমেয়েরা।'

শীতল কণ্ঠে তুয়া বললে—'শুনে সম্মানিত বোধ করছি। কিন্তু তা হবার নয়। আমার বহু স্তাবকের একজনকে হৃদয় সমর্পণ করেছি আমি। বিয়ে করব তাকেই—আর কাউকে নয়।'

'তাই নাকি? তাহলে তার নামটা উচ্চারণ করবেন না—ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব। মাথা নাড়ছেন? ভাবছেন, আমার চাইতেও বড় যোদ্ধা সে? কিন্তু সামনাসামনি পড়লে দেখিয়ে দেব বীরত্বে কে বড়। শুনে রাখুন, নেফারতে, রাণী আপনাকে করবই। যদি না হন, বাঁদী বানিয়ে রাখব। সময় দিলাম আজ থেকে ঠিক তিনটে দিন।'

বিষম ক্রোধে অবগুণ্ঠন নিক্ষেপ করে চোখে চোখ রেখে গর্জে উঠল তুয়া—'আমার সম্বন্ধে অনেক উচ্চ ধারণাই যখন পোষণ করেন, তখন এটাও জেনে রাখুন, দেবতারা আমার সহায়—তাঁদের শক্তিতেই শক্তিমতী আমি। হয় মুক্তি দিন, নইলে আবাহন জানাবো দেবশক্তিদের যাদের রোষবহ্নিতে পোকার মত ছাই হয়ে যাবে আপনার মত নগণ্য নৃপতি।'

'দেবী হাথোরকে ডাক দিয়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই—বাকী দেবদেবীদের ধার ধারি না আমি। আজ রাত থেকে ঠিক তৃতীয় রাত্রে আপনি রাণী হন

কি রাণী হন—আমার রাণী হবেনই আপনি—সাক্ষী রইলেন আপনার এই মা—শেষ পর্যন্ত থাকবেন-ও।'

'হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত থাকব,' এই প্রথম কথা বললেন আন্তি—'কিন্তু শেষটা কি হবে, তা এখনো জানি না। আপনি জানতে চান? এ-বিদ্যে আমার কিছু কিছু জানা আছে—গুপ্তবিদ্যে বলতে পারেন—ভোজবিদ্যা। কিভাবে দেবদত্ত এ ক্ষমতা আমার মধ্যে এসেছে, কখন আসে—তা নিজেও বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে চেষ্টা করেও কিছু করতে পারি না। তা সত্ত্বেও চেষ্টা করব শুধু আপনার খাতিরে। কিন্তু জোর করে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে যাওয়ার পরিণামটা দেখে কি আপনি খুশী হবেন?'

'ভোজবিদ্যা? বেশ তো, জানা থাকলে দেখান,' বললে জ্যানীস।

'কিন্তু কথা দিন, পরিণামটা আপনার মনোমত না হলে আমাকে দোষ দেবেন না। আজ থেকে তৃতীয় রাত্রের এই সময়ে জোর করে আমার মেয়ের পানিগ্রহণ করতে যাওয়ার পরিণামটা এবার স্বচক্ষে দেখুন আপনার সামনের এই জলাধারে। সাহস থাকে তো তাকিয়ে থাকুন—নড়বেন না। দেবতাদের প্রার্থনা করার একটু সময় শুধু দিন আমাকে। কন্যা, গাও গান। পবিত্র প্রাচীন সেই গান যা তোমাকে শিখিয়েছি। ঈশ্বর আরাধনার একঘেয়েমি তাতে কিছুটা ঘুচবে।'

নতজানু হয়ে মর্মর জলাধারের পাশে বসে দুহাত জলের ওপর বাড়িয়ে ধরলেন আন্তি। বীণার স্বর্ণতারে ঝংকার দিয়ে গান ধরল তুয়া—ভাবগম্ভীর সুমহান সঙ্গীত।

গানের শব্দ কোমল এবং মধুর—জ্যানীসের কিন্তু মনে হল, বরফ কণার মত তা শিরা-উপশিরার রক্তপ্রবাহে ঝরে পড়ে তুহিনশীতল করে তুলছে সর্বাঙ্গ। প্রথম দিকে অনিমেষে চেয়েছিল সঙ্গীতাবিষ্টা সুন্দরীর পানে—কিন্তু ধীরে ধীরে কি এক অমোঘ আকর্ষণে দৃষ্টি সরে এল জলাধারের ওপর।

একী! কালো কুয়াশা ঘনীভূত হচ্ছে যে জলের ওপর। ধীরে ধীরে অপসৃত হল কুয়াশা। যেন দর্পণের বুকে প্রতিবিম্বিত হল একটি চিত্র। দেখল, নিজেরই উলঙ্গ রক্তাক্ত দেহ। কণ্ঠদেশ দু ফাঁক, পার্শ্বদেশ ফালা ফালা হয়ে গেছে শাণিত অস্ত্রাঘাতে। খোলা চোখে চিৎ হয়ে নগ্ন দেহটা ভাসছে জলাধারে—রক্তে ভেসে গেছে ঘরের মেঝে—যে ঘরে দাঁড়িয়ে দেখছে এই দৃশ্য। আগুনে পুড়ে কালচে মেরে গেছে ঘরটা—অগ্নিদগ্ধ থামগুলো অঙ্গুলি-সংকেতে যেন নির্দেশ করছে চন্দ্রদেবতাকে। পাশেই মুখব্যাদান করে যেন কাঁদছে তার নিজেরই কুকুর।

তুয়ার স্তোত্র সঙ্গীতের রেশ মিলিয়ে যেতেই অদৃশ্য হল ভয়াবহ সেই দৃশ্য। জলাধারের কিনারা থেকে লাফিয়ে পেছিয়ে গিয়ে অঙ্গার চোখে আস্তির পানে চাইল রাজা।

'জাদুকরী। আমার ভাবী বধূর মা না হলে, এই গৃহে তুমি অতিথি না হলে, তোমাকে আজ রাতেই কেটে দু খানা করতাম। শয়তানী, ইন্দ্রজাল দেখানোর ফল হাতে হাতে দিতাম।'

শীতল কণ্ঠে বললেন আস্তি—'কিন্তু মরতাম না। ঈশ্বর যাদের সহায়, মানুষ তাদের কিছু করতে পারে না। তাছাড়া, জানি না আপনি কি দেখেছেন। যা দেখেছেন তা আপনার অথবা আমার মস্তিকের কপোল-কল্পনাও হতে পারে। যাক সে কথা, বড় ক্লান্ত আমরা। ঘুমোতে দিন। তিন রাতের মাথায় দেখা যাক কি ঘটে।'

আর একটিও কথা না বলে পেছন ফিরে দুমদাম পদশব্দে বেরিয়ে গেল জ্যানীস।

'জলাধারে কি দেখালে, ধাই মা? আমি তো কিছু দেখলাম না,' শুধোয় তুয়া।

'খুব সম্ভব মড়ার ছায়া,' বললেন আস্তি। 'তোমাকে যারা কামনা করেছে, তাদের প্রত্যেকের যে দশা হয়েছে—সেই একই পরিণাম। মাঝে মাঝে ভয় হয় রামিসের পরিণামও তাই না হয়।'

চোখে জল এসে গেল তুয়ার। রুদ্ধ হল কণ্ঠস্বর। ফুঁপিয়ে বললে—'এ তোমার অন্যায় ধাই-মা। কেশ যুবরাজকে তো আমি মারিনি। মেরেছে সে।'

'হাঁ, সে। কিন্তু তোমার জন্যে।'

'তুমি কি খুশী হতে পিতৃঘাতক আমিকে বিয়ে করলে? জলাধারে মড়ার ছবি কে দেখিয়েছে? আমি না, ডাইনী আস্তি? জ্যানীস যদি মরে তো মরবে নিজের পাপে—আমার দোষ দেখছো কেন? জন্মের আগেই আমার ললাট লিখন হয়ে গেছে—গ্রহদেবতা আর অগ্নিদেবতারা পথনির্দেশ করবে আমার। আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন?'

ঝরঝর করে এবার কেঁদে ফেলল তুয়া।

বুকে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিলেন আস্তি—'রামেসের মেয়েকে দোষারোপ করার আমি কে? তুমি চলছ তোমার ভাগ্যলিপি অনুসারে—আমি ভয় পেয়েছি আমার একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে। এত জনের এত ভবিষ্যৎ দেখতে পাই, কিন্তু জানতেও পারি না বাছা ইহজগতে আছে না

পরলোকে গিয়েছে। কালো যবনিকা ঝুলছে যেন তার আর আমার মধ্যে।'

আস্তিকে সান্ত্বনা দেওয়ার পালা এবার তুয়ার—'তুমি তো জানো ধাই-মা আমেনের দৈববাণী—রাজবংশীয় পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হবে আমার। অনেক সন্তান-সন্ততি হবে আমাদের। তার মানেই তো রামিস বেঁচে আছে।'

'রাজবংশীয় তো দেখছি অনেকেই রয়েছে।'

'আমার কাছে রামিস ছাড়া আর কেউ নেই।'

তুয়াকে চুম্বন করে আস্তি বললেন—'ঠিক বলেছো। এবার এস কর্তব্য করা যাক। বীণা বাজাও জানলার ধারে—ডাকো সেই ভিক্ষুককে।'

জানলার ধারে গিয়ে বহু নিচের চন্দ্রালোকিত চত্বরের পানে তাকিয়ে বীণায় ঝংকার তুলল তুয়া। ডাকল পর-পর তিনবার—'কেফার! কেফার! কেফার!'

প্রতিটা ডাক গমগমে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এল কাছে। শেষকালে মনে হল যেন স্বর্গমর্ত্য ভরে উঠল কেফারের নাম শব্দে!

(১৬) ভিক্ষুক এবং রাজা

তৃতীয় দিবসের অপরাহ্ন। বিলাসবহুল কয়েদখানার জানলায় বসে কাঠের জালির ফাঁক দিয়ে নিচের প্রশস্ত চত্বরের দিকে তাকিয়ে আছে আস্তি আর তুয়া। প্রতিদিন এই সময়ে রাজা বিচার সভা বসায় সেইখানে। ছায়ায় বসে প্রজাদের আবেদন নিবেদন শোনে। নির্দিষ্ট সময় প্রায় অতি-বাহিত হয়ে আসায় দুই রমণীই অধৈর্য্যে ভুগছে।

তুয়া বললে—'রাত হতে আর দেরী নেই। জ্যানীস আসবে অন্ধকার নামলেই। জানলার দিকে কি রকম তাকাচ্ছে দেখ, ঠিক যেন উপোসী সিংহ। কেফারের পাত্তা নেই। ভবঘুরে তো, মাথায় অনেক উর্বর কল্পনার বাসা। বয়সও হয়েছে, কে জানে আর বেঁচে আছে কিনা। আমেনকে এত ডাকলাম, তিনিও সাড়া দিলেন না। হতাশায় তাই ভেঙে পড়ছি। আস্তি, তুমি জ্ঞানবতী, বলো তো কি করি এখন?'

'ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো,' বললেন আস্তি। 'সূর্য ডুবতে এখনো তিন ঘন্টা দেরী। দেবতাদের কাছে সময় কিছুই নয়—তিন ঘন্টায় তাঁরা বিশ্বধ্বংস করে নতুন করে গড়তে পারেন। মেমফিসের মিনার-অট্টালিকায় অনাহারে থাকার সময়ে কি ঘটেছিল মনে করে দেখো। মনে করে দেখো, মৃত্যু-গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়েও রা-য়ের তরণী কিভাবে আমাদের নিয়ে এসেছে, কারা চালিয়ে এনেছে সেই জাহাজ। আস্থা রাখো ঈশ্বরে—সব ঠিক হয়ে

যাবে।'

'ভরসা আছে বৈকি, আস্তি, কিন্তু এসো, বরং অন্য কথা বলা যাক। মেমফিসে আমার কা এখন না জানি কি কাণ্ড করছে। আমির সঙ্গে যদি বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে দুঃখ হচ্ছে আমির জন্যে। আমার কা হতে পারে সে, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি গায়ের রক্ত হিম করে দেয়। জ্যানীস-পতনের জন্যে আর একটা কা আমার ভেতর থেকে বার করলে কাজ দিত। বিচার পর্ব তো শেষ হয়ে এল দেখছি, জ্যানীসের মন কিন্তু এদিকে। কাঠের পর্দা ফুঁড়ে এমন তাকাচ্ছে যে গা জ্বলে যাচ্ছে। উঠে পড়ল দেখছি। আরে! কে এল ছাখো। আস্তি, চেয়ে ছাখো।'

সভার ফটকে দাঁড়িয়ে শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা দীর্ঘদেহী এক অতি-বৃদ্ধ শুষ্ককঠিন চোখ পিট-পিট করে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন রোদ্দুরে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। একগাল সাদা দাড়ি হাঁটু পর্যন্ত লুটিয়ে হলদে-মুখ বৃদ্ধ একটা কণ্টক-যষ্টিতে ভর দিয়ে যেন বিমূঢ়। ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে এগিয়ে এল রক্ষীরা—কিন্তু শূন্যে কণ্টক-যষ্টি দোলাতেই ঠিকরে পড়ল তারা—যেন অদৃশ্য শক্তি ছুটে গেল যষ্টি থেকে। কচ্ছপের মত ধীর গতি চোখে এবার দেখতে পেল ঝকমকে সিংহাসনটা। দেখতে পেল রাজাকেও। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এসে যষ্টিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালো সিংহাসনের সামনে।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে জ্যানীস—'কে এই দুর্বিনীত? রাজার সামনে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করতেও শেখেনি?'

কেফার বললে—'তুমি রাজা? আমি বড় অন্ধ। ঝলমলে পোশাক পরা সাধারণ মানুষ ভেবে'ছলাম তোমাকে। রাজা হতে গেলে সব কিছুই ফেলতে হয় পায়ের তলায়। তুমি তো এখনো সাধারণ মানুষের মত মৃত্যুকে ডরাও, আশার কুহকে ভুগে কষ্ট পাও। আমার ছেঁড়া পোশাকের তলায় যে রক্ত মাংস, তা তোমার সোনা রুপো দিয়ে ঢাকা রক্ত মাংসের থেকে কিন্তু আলাদা, দুঃখ শোকের ঊর্ধ্বে তুমি নও, নৈরাশ্যের বেদনা তুমি জয় করতে শেখ নি।'

'মূর্খ। তোমার বকবকানি শোনার জন্যে এ সিংহাসনে আমি বসিনি। কে আছো, ঘাড় ধরে বার করে দাও বাচালটাকে। আমার কাজ আছে।'

আবার তেড়ে এল রক্ষীরা, আবার যষ্টি তুলে নিল কেফার, আবার ছিটকে পড়ল রক্ষীরা। বাস্তবিকই শক্তিপুঞ্জের আধার ঐ কণ্টক-যষ্টি।

'কাজ তোমার আছে ঠিকই। কিন্তু রাজা, সে কাজ রাজকার্য নয়, ঐ

কাঠের জালি দেওয়া জানলার আড়ালে যে রূপসী মেয়েটি বসে রয়েছে, কাজ তাকে নিয়ে। কিন্তু তিন ঘন্টা এখনো বাকী সূর্য ডুবতে। ইতিমধ্যে আমার আবেদন তোমায় শুনতে হবে।'

'কোন্ মেয়ের সঙ্গে কি কাজ আছে আমার তার তুমি কি জানো?' কর্কশ কণ্ঠে বললে জ্যানীস।

'মেয়েটা কে, তা জানি। কি কাজ তাও জানি। কারণ আমি তার বাবা। আরও বলব?'

'মিথ্যুক! তুমি তার বাবা?'

'হ্যাঁ, তার বাবা। তাই বলতে এলাম রাজামশায়, যেহেতু আমাদের রক্ত তোমার চেয়ে অনেক প্রাচীন আর বনেদী তাই তোমাকে জামাই হিসেবে পেতে আমার যেমন কোনো ইচ্ছেই নেই, আমার মেয়েরও একদম ইচ্ছে নেই তোমাকে স্বামী বলে মেনে নিতে।'

কিছু সভাসদ হেসে উঠল এই কথায়। জ্যানীস কিন্তু হাসল না। রাগে মুখ সাদা হয়ে গেল। কথা আটকে গেল।

অনেকক্ষণ পরে ফেটে পড়ল—'কে আছো, টেনে নিয়ে গিয়ে এই বদ্ধ উন্মাদটার জিভটা কেটে নাও।'

আবার তেড়ে এল রক্ষীরা। সহসা গলার স্বর পালটে গেল কেফারের। দ্রিমি দ্রিমি বজ্রগর্জন যেন শোনা গেল কণ্ঠস্বরে। ভয়ানক সেই বজ্রকণ্ঠ শুনে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেল যে যেখানে ছিল—গাত্রস্পর্শ করতেও সাহস হল না—জিভ কাটা তো দূরের কথা।

'খবরদার! ছেঁড়া পোশাকের তলায় কে আছে, তা তোমরা জানো না। জ্যানীস, নিজেকে রাজা বলেই বড়াই করো। রাজার রাজা যিনি সূর্যের মাথায় সিংহাসন পেতে বসে সব দেখছেন, তাঁর আদেশ শোনো। রাত নামলেই ওপরের ঐ ঘরে বন্দিনী মেয়েটি আর তার মা-কে তাদের সমস্ত জিনিসপত্র সমেত উত্তরের ফটক দিয়ে সসম্মানে মুক্তি দেবে।'

'রাজার রাজার হুকুম যদি না মানি?' শ্লেষ ভরে বললে জ্যানীস।

'তাহলে আন্তি তোমাকে যে ছবিটা দেখিয়েছে, তা সত্যি হবে।'

'জাদুকর, সেটা একটা মিশরীয় কৌশল, যে-কৌশলে তোমারও যে হাত-সাফাই আছে এখন তা বুঝছি। তোমাদের কারোর হুকুম আমি মানব না। আজ রাতেই ও মেয়ে হবে আমার রাণী।'

'তাহলে রাজার রাজার শেষ নির্দেশটাও শুনিয়ে যাই। আজ রাতেই তোমার যে রাণী হবে, তার নাম মৃত্যু। তোমার অনেক অনুচর ঈশ্বরের

নির্দেশ লঙ্ঘন করার অপরাধে অনুগামী হবে তোমার। কাল তোমার এই সিংহাসনে রাজা হয়ে বসবে আর একজন—তোমার বংশের কেউ নয়।'

পেছন ফিরে সভা ত্যাগ করে ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল কেফার। কর্তৃত্বব্যঞ্জক রাজোচিত পদক্ষেপ দেখে নির্বীর্য হয়ে গেল যেন রক্ষীরা।

সম্মোহনের ঘোর কেটে যেতেই হুংকার ছাড়ল রাজা—'নিয়ে এস জাদুকর শয়তানটকে—বধ করো এখানেই।' শিকারী কুত্তার মত পালে পালে সৈন্য ছুটল রাজাদেশ তামিল করতে।

কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না কেফারকে। একজন স্ত্রীলোক তাকে দেখেছে এক জায়গায়, একজন বালক দেখেছে আর এক জায়গায়। বান্দারা দেখেছে দূর থেকে, কিন্তু ছায়া না থাকায় চম্পট দিয়েছে। এই রকম বহু ধোঁকা খেয়ে শেষ পর্যন্ত খবর পাওয়া গেল দক্ষিণ ফটক দিয়ে একটা বৃদ্ধ ভিক্ষুক বেরিয়ে গেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেছে বাইরের বালুকা-ঝটিকায়। তল্লাসি চালিয়েও বালি-ঝড়ের মধ্যে বৃদ্ধের টিকি দেখা গেল না। প্রাসাদে ফিরতেই তাদের বেত মেরে পায়ের ছাল চামড়া তুলে নিতে হুকুম দিলে রাজা

রাত নামল। সাহসে বুক বেঁধে তুয়া আর আস্তি গিয়ে দাঁড়াল জলাধারের একপাশে। জানলা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শোনা গেল বাইরে হুহুংকার রবে ধেয়ে যাচ্ছে মরু-ঝটিকা—বাতাসে উড়ছে বালুকা কণা।

রাজা এসে দাঁড়াল জলাধারের আর একদিকে।

বললে—'দেবী নেফারতে, সময় হয়েছে। এখন জবাব দিন।'

তুয়া বললে—'রাজা জ্যানীস, যা বলব, তা শুনবেন আমার জন্যে নয়—আপনার জন্যে। আমাকে দেখে যা মনে হয়, আমি তার চাইতে আরও অনেক কিছু। আমার বন্ধু আছে মাটির এই পৃথিবীতে—আছে আকাশের স্বর্গে। তাদেরই একজন আজ বিকেলে দেখা দিয়ে গেছে আপনাকে নিচের সভায়। মুক্তি দিন আমাকে, পাগলামি ছাড়ুন। যদি কথা না শোনেন, অশেষ দুর্গতি লেখা আছে আপনার কপালে। আমিও আত্মঘাতী হতে পারি।'

হিমশীতল কণ্ঠে জ্যানীস বললে—'ভীতি প্রদর্শন যথেষ্ট হয়েছে। এবার চাই আপনার জবাব।'

'রাজা, শেষবারের মত আপনাকে অনুরোধ করছি। ভাবছেন বুঝি নিজে বাঁচবার জন্যে মিথ্যে বলছি। তা নয়। বাঁচাতে চাই আপনাকে। এই দেখুন,' বলে এক ঝটকায় মুখের অবগুণ্ঠন সরিয়ে বক্ষের ঊর্ধ্বদেশ অনাবৃত করল

তুয়া—'কী দেখছেন? পবিত্র এই চিহ্ন যার বুকে, তার ওপর শক্তি প্রয়োগের পরিণামটা কল্পনা করতে পারছেন না কেন?'

তুয়ার সৌন্দর্য দেখে তখন পাগল হয়ে গেছে জ্যানীস। বললে ভাঙা গলায়—'শুনেছি এ চিহ্ন যার বুকে আছে তার অদ্ভুত জন্ম ঘটেছিল থিবসে—সম্রাজ্ঞী সে। সে নারী এখানে আসে কি করে?'

'জবাব দেবে দৈববাণী। কিন্তু গুজব সব সময়ে ভিত্তিহীন হয় না।'

'শুনেছি থিবসের সেই অদ্ভুত মহিলার পিতাও নাকি বড় বিচিত্র।'

'তাহলে ছেড়ে দিন সেই বিচিত্র পিতার অদ্ভুত কন্যাকে।'

'কিন্তু আপনার তো দেখছি আর এক পিতা আছে। জানি না আমার সৈন্যরা এতক্ষণে তাকে জবাই করে ফেলেছে কিনা। বৃদ্ধ ভিক্ষুকও কি আপনার পিতা?'

এই প্রথম কথা বললেন আস্তি—'বৃদ্ধ ভিক্ষুকের কেশাগ্র স্পর্শ করার অথবা তার হদিশ খুঁজে বার করার ক্ষমতা আপনার কোনো অনুচরের নেই।'

আস্তির কথায় কান না দিয়ে বলে চলল জ্যানীস—'আপনি যার কন্যাই হোন না কেন, এই মুহূর্ত থেকে আপনি কেবল আমার। এই নিয়ে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করছি, জবাব দিন। স্বেচ্ছায় রাণী হবেন, না, আমার অনুচররা আপনার সামনেই এই ডাইনীটাকে জলে ডুবিয়ে মেরে আপনাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে?'

তুয়া কিন্তু আর জবাব দিল না। বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে রেখে যেন প্রতীক্ষায় রইল। কিন্তু বিদ্রূপ করে উঠলেন আস্তি। এমন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন যে হারিকেন ঝঞ্ঝার হুহুংকার ছাপিয়ে চিৎকার পৌঁছোলো যেন বাইরে।

'ডাকুন আপনার অনুচরদের। ঝড়েতে গলায় বালি ঢোকায় দম আটকে আসছে—জল পেলে বেঁচে যাব।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল রাজা—'এসো!'

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকল কেফার। শতচ্ছিন্ন ফালি ফালি পোশাকের বদলে পরনে এখন শ্বেত পরিচ্ছদ, মাথাতেও শ্বেত শিরো-ভূষণ। পেছন পেছন ধেয়ে এল রক্তরাঙা তরবারি হাতে মরুর দুর্ধর্ষ উপজাতি-প্রধানরা। গালে তাদের চাপদাড়ি, গায়ের রঙ মিশমিশে কালো, চোখ বর্তুলাকার। বর্মের ওপর ঝন্ঝন্ করে বাজছে স্বর্ণশৃঙ্খল। মরুর এই দলপ্রধানরা নির্ভীক, দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া; প্রাণে ভয় নেই, মায়ামমতাও নেই।

জ্যানীস দেখেই বুঝল কি ব্যাপার। চকিতে তরবারি কোষমুক্ত করল

বটে, কিন্তু দ্বিধা আশ্রয় করায় তরবারি চালনা করতে পারল না। নিষ্ঠুর দল-প্রধানরা গোল হয়ে ঘিরে ধরে নির্দেশের প্রতীক্ষায় চাইল কেফারের পানে।

তুয়া বললে—'পিতা, ছেড়ে দিন রাজাকে। ভালবেসে মাথা খারাপ করে ফেলেছে।'

'কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেল যে!' ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললে কেফার—'ঈশ্বরের হুঁশিয়ারি যারা অবজ্ঞা করে, ঈশ্বরের প্রতিহিংসা তাদের স্পর্শ করে। জ্যানীস, অসহায়া মহিলাদের ওপর জোর খাটাতে যাচ্ছিলে, তাই তোমার শহর আমার দখলে, তোমার অনুগত অনুচররা সব নিহত, তোমার রাজপ্রাসাদে এখন আগুন জ্বলছে। কাল আর এক রাজা বসবে তোমার সিংহাসনে। তোমার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে বিশ্বপিতা আমেনের আদেশে।'

ভারী গলায় পুনরাবৃত্তি করল জ্যানীস—'হ্যাঁ, খুবই দেরী হয়ে গেল দেখছি। নশ্বরদের নিয়ে দেবতারা খেলা করেন, দেবতাদের সঙ্গে তাই নশ্বররা লড়তে পারে না। কিছু দেবতা হুকুম দেন ভালবাসতে, কিছু দেবতা আদেশ দেন আমাকে বধ করতে। তাই সানন্দে মরব আমি। কিন্তু বলে যাও, কোন অশুভ শক্তির প্রভাবে এইভাবে জন্মগ্রহণ করতে হয় আমাদের, চলে পড়তে হয় মৃত্যুর কোলে।'

তুয়া আর আস্তিকে হাতছানি দিয়ে ডাকল কেফার। পেছন পেছন, বেরিয়ে গেল দুজনে। জ্যানীসকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল নির্মম-মুখ উপজাতি-প্রধানরা।

পেছন থেকে বললে জ্যানীস—'বিদায় দেবী নেফারতে, মনে রাখবেন, টার্ট-য়ের রাজা জ্যানীস শুধু আপনাকে ভালবেসেই মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছে।

বেরিয়ে গেল দুজনে। জ্যানীসের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

পেরিয়ে এল বিশাল মর্মর-কক্ষ, দেখল রক্ষীদের প্রাণহীন দেহ গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝেতে; নেমে এল সোপান বেয়ে; অতিক্রম করল ফটকের পর ফটক। ফিরে দেখল আগুন লেগেছে রাজপ্রাসাদে। বাইরের চত্বরে পৌঁছে কেফারের নির্দেশে উঠে বসল একটা শিবিকায়। কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসরা শিবিকা বয়ে নিয়ে চলল অজ্ঞাত অঞ্চলে।

সারারাত কখনো ঘুমোলো কখনো জেগে রইল শিবিকার মধ্যে। সকাল বেলা নামানো হল শিবিকা। বেরিয়ে এসে দেখল মরুভূমির মধ্যে একটা মরুদ্যান। 'বিশাল মরু-সৈন্যবাহিনী ঘিরে রয়েছে তাদের। টার্ট শহরকে আর দেখা যাচ্ছে না। স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেছে জীবনের পাতা থেকে

—আর কখনো এ শহর তারা দেখেনি—শহরের নামও শোনেনি। তাঁবুর মধ্যে কেবল পাওয়া গেল তাদের সোনা আর মুক্তো, আর তুয়ার হাতীর দাঁতের বীণা।

ক্লান্তির দরুন শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল দুজনে। ঘুম ভাঙল পরের দিন ভোরবেলা। সামনে সাজিয়ে রাখা খাবার খেয়ে বেরিয়ে এল তাঁবুর বাইরে। খেজুর গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল কেফার ওদের অপেক্ষায়। পাথর কঠিন মুখে উপজাতি-প্রধানরা মাথা নুইয়ে জানাল অভিবাদন।

কেফার বললে—'রুটি ভিক্ষের জন্যে অনেক দূরে এবার যেতে হবে—এখানকার কাজ আমার ফুরিয়েছে। কিন্তু ভয় পেয়ো না। মরুর এই উপ-জাতি-প্রধানরা তোমার সেবক, তোমাকে সেবা করার জন্যেই এদের জন্ম—এরাই তোমাকে আর আন্তিকে আগলে নিয়ে যাবে। আমার আদেশ শুনিয়ে দাও এঁদের।'

মাথা নুইয়ে বললে সেনানায়ক—'হে যাযাবর মরু-রক্ষক, আপনার আদেশ, এই দুই মহিলাকে কয়েক চন্দ্র ব্যাপী পথ পাড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে সুবর্ণনগরীর তোরণ দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে।'

'শুনলে তো,' তুয়াকে বললে কেফার—'বিশ্বাস রেখো এদের ওপর। যদি এদের কেউ কখনো তোমাকে বিপদে ফেলে, বীণার তারে ঝংকার তুলে আমাকে ডেকো। বিদায়।'

আর একটি কথাও না বলে কণ্টক-যষ্টি তুলে নিয়ে পেছন ফিরল কেফার। উট আর ঘোড়াদের হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিয়ে সৈন্যবাহিনী সম্মান জানালো তাকে। কিছুদূর ধীরপদে গিয়ে একটা বালিয়াড়ির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল কেফার। ক্ষণেক পরেই আচমকা আর তাকে দেখা গেল না। অদৃশ্য হয়ে গেল শূন্যে।

সেনানায়ককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন আন্তি—'কে এই যাযাবর?'

জবাব এল—'আমরা কেউ জানি না। কিন্তু শুরু থেকেই উনি মরু-রক্ষক—মরুবাসীদের রক্ষক। ওঁর আদেশে মরু ঝড় ধেয়ে যায়—যেমন গতকাল ঘটেছিল এই বিপুল সৈন্যবাহিনী আড়াল করে রাখার জন্য। বালি ঝড়ের আড়ালে টাট শহর ঘিরে ধরেছিলাম আমরা। ওঁর হুকুমেই মরুভেদ করে ঝর্ণা উঠে আসে, উপজাতিদের উত্থান এবং পতন ঘটে। আমাদের বিশ্বাস উনি অপদেবতা—যেখানে খুশী যেতে পারেন। স্বর্গের আদেশ তামিল করেন। উনি যখন দেখা দেন, আমরা ওঁর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি। শহরের মানুষ জানে না, ওঁর ঐ ছেঁড়া পোশাকের তলায় কি

বিরাট শক্তি লুকিয়ে আছে—তাই বিদ্রূপ করতে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।'

আন্তি বললেন—'আমিও জানি এই যাযাবর বিরাট এক শক্তি—বিদ্রোহী গুরু—এত বিরাট যে তাঁর নাম আর উচ্চারণ করব না। চলো, সুবর্ণনগরীতে আমাদের নিয়ে চলো।'

দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস মরুভূমির ওপর দিয়ে দক্ষিণ আর পশ্চিমদিকে চলল মরু-সৈন্যরা—ঘিরে নিয়ে গেল তুয়া আর আন্তিকে উটের পিঠে চাপিয়ে—মুখ ঢাকা রইল দুজনেরই। একবার পাহাড় পেরোতে গিয়ে লড়াই লাগল পাহাড়ীদের সাথে। আর একবার প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেল বিরাট এক উপজাতি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে—স্বর্গের দেবীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুনে তারা ধেয়ে এসেছিল দেবীকে নিজেদের মধ্যে আটকে রাখতে। একবার দীর্ঘ দুটি চাঁদ কাটাতে হল একটা মরুদ্যানে বৃষ্টি না হওয়ায় কূপ শুকিয়ে গেছে খবর পাওয়ায়। এইভাবে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন পেরিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে অবশেষে তাঁবু পাতা হল একটা টিলার ওপর।

ভোর হল। বাইরে গিয়ে একটা বিশাল নদী দেখতে পেল তুয়া আর আন্তি। চিনতেও পারল—নীলনদ। দেখল বহু পিরামিড। আর নিচে সুবর্ণনগরী নাপাতা—আমেনের দক্ষিণী শহর।

মরু সৈন্যবাহিনীর নায়ক এসে অভিবাদন জানিয়ে বললে—'কেফারের আদেশ তামিল করলাম। ঐ দেখুন নাপাতা শহর। কিন্তু শহরের ধারে কাছেও আমরা যাব না—শহরের সৈন্যবাহিনী ভাবতে পারে শহর আক্রমণ করতে এসেছি। লড়াই না লাগলে কোনো শহরেও আমরা ঢুকি না। কাজ শেষ হয়েছে। আমার সৈন্যরা দেশে ফিরে যেতে চাইছে। অনুমতি দিন।'

তুয়া বলল—'যাও। যাওয়ার আগে আমার এই উপহার নিয়ে যাও।'

টাট শহরে মুক্তো বেচে যত সোনা পাওয়া গেছিল, সমস্ত দেওয়া হল সেনানায়ককে। নিজেদের মধ্যে যেন ভাগাভাগি করে নেয়। দেওয়া হল না শুধু মুক্তোগুলো। অভিবাদন জানিয়ে সসৈন্য উপজাতি-প্রধানরা পদবিক্ষেপে বালির মেঘ সৃষ্টি করে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

উট চালিয়ে দুজনে এল নীলনদের তীরে—সেখান থেকে রওনা হল নাপাতা শহরের দিকে। অন্যান্য যাত্রীদের ভীড়ে মিশে গিয়ে পিরামিড-ভূমি অতিক্রম করে পৌঁছোলো শহরের উত্তরের তোরণে। স্বর্ণকপাট তখনো বন্ধ। তিনটে গাধার পিঠে শাকসব্জী চাপিয়ে শহরের বাজারে চলেছিল

একটি স্ত্রীলোক। জিজ্ঞেস করলে এদের, আসা হচ্ছে কোথেকে?

'মরুশহর থেকে,' বললেন আস্তি। 'আমরা গান গেয়ে মুক্তো বেচি।'

'তাহলে ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। সমুদ্র এখান থেকে অনেক দূরে বলে মুক্তোর কদর আছে এ শহরে। তরুণ রাজা গান শুনতেও খুব ভালবাসেন।'

'তরুণ রাজা কেন? কি নাম তাঁর? বৃদ্ধরাজা কোথায় গেলেন?,' আস্তির প্রশ্ন।

সন্দিগ্ধ সুরে সব্জীওয়ালী বললে—'মরুশহর থেকে বেশীদিন আসেননি মনে হচ্ছে? এলে জানতেন বৃদ্ধ রাজা দূরের ঐ পিরামিড সমাধিতে আশ্রয় নিয়েছেন মিশরের ফারাওয়ের সেনাপতির হাতে যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর। তিনহাজার সৈন্য আর বৃদ্ধ রাজার একমাত্র পুত্রের মমীদেহ নিয়ে এসেছিলেন এই সেনাপতি। কি কারণে জানি না, রাজপুত্রকে ইনি বধ করে মমীদেহ নিয়ে এসেছিলেন রাজার কাছে শাস্তি নিতে। রাজা রেগে গিয়ে তাঁকে আমেনের পবিত্র জাহাজের মাস্তুলে ফাঁসি দিতে হুকুম দিয়েছিলেন। তরুণ সেনাপতি বলেছিলেন—যদি নাপাতার রাজার সাহস থাকে তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার—ফাঁসিতে মরতে তাঁর আপত্তি নেই। তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রচণ্ড লড়াই। অত্যাচারী রাজার ওপর ভেতরে ভেতরে রেগেছিল অনেকেই। এখন সেই বিদ্রোহীরা তরুণ সেনাপতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বধ করল রাজাকে—সিংহাসনে বসালো মিশরের এই সেনাপতিকে।

'তার নাম?—অনেক নাম তাঁর, অত মনে নেই। কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর। যদিও মাথায় ছিট আছে, তবুও সবাই ভালবাসে তাঁকে। আর কথা নয়, ফটক খুলে গেল। চললাম।'

গাধা তিনটে নিয়ে ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল সব্জীওয়ালী।

ভীড়ে মিশে গিয়ে তুয়া আর আস্তিও ঢুকে পড়ল প্রশস্ত রাজপথে। পৌঁছোলো একটা চৌকোনা প্রাঙ্গণে। চারিদিকে সারি সারি মহীরুহ। একপাশে একটা অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদ। কোন দিকে যাবে, ঠিক করতে না পেরে উট নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেই প্রাসাদের সিংহদ্বার খুলে বেরিয়ে এল বর্মপরিহিত একদল অশ্বারোহী।

ফিস ফিস করে উঠলেন আস্তি—'ঢালের গায়ে কি লেখা আছে দেখেছো?'

দেখল তুয়া। চমৎকৃত হল। তার নিজের নাম আর দীর্ঘ উপাধি।

এতদূরে তার সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছে জেনে বিস্মিতও হল।

অতীব জমকালো একটা ঘোড়া বেরিয়ে এল সিংহদ্বার দিয়ে। দূর থেকেও অশ্বারোহীকে যেন চেনা-চেনা মনে হল তুয়ার।

'কে বলো তো?'

'আমার ছেলে রামিস,' বলে জিনের দড়ি খামচে ধরলেন আন্তি।

(১৭) প্রেমাস্পদকে ফিরে পেল তুয়া

হ্যাঁ, রামিসই বটে। যদিও বয়স বেড়ে গেছে, মুখ প্রস্তরকঠিন এবং বিষাদাচ্ছন্ন রয়েছে, তবুও সেই রামিসই বটে। দ্রুত হল দুই রমণীর হৃদয়-স্পন্দন।

'চেনা দেব?' বললেন আন্তি।

'না,' বললে তুয়া। 'এখানে নয়, এখন নয়। বিশ্বাস হবে না। এত লোকের সামনে মুখের কাপড় খুলতে পারব না। তাছাড়া আরো কিছু খবর জানা দরকার। যেতে দাও পাশ দিয়ে।'

গাছের তলায় সাদা উটের পিঠে বসে থাকা দুটি মেয়েকে দেখে কেন জানি আকৃষ্ট হল রামিস। ঘোড়া নিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। প্রথমে আনমনে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারপর তাকাল দ্বিতীয় বার। আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে—এবার আরো আস্তে তৃতীয়বার তাকিয়ে নিবদ্ধ রাখল দৃষ্টি। কি দেখল সেই জানে। এগিয়ে এল কাছে।

'কে আপনারা? এত সুন্দর উট পেলেন কোথায়?'

এমনভাবে মাথা হেঁট করে অভিবাদন জানাল তুয়া যাতে ঘোমটার কাপড়ে শরীর ঢাকা থাকে।

আন্তি বললেন স্বর বিকৃত করে—'ব্যবসা আমাদের পেশা। দুজনের একজন গানও গায় বীণা বাজিয়ে। সুবর্ণ-নগরীতে এসেছি মুক্তো বেচতে—শুনেছি মুক্তোর কদর আছে এখানে। এ-ও শুনেছি শহরের রাজা গানের কদর করেন। আমার এই সঙ্গিনীটি থিবসে গানবাজনা শিখেছে। কিন্তু আপনি কে জানতে পারি?'

'আমি? আমি একজন মিশরীয়। এই শহরের প্রশাসক—মিশরের সম্রাজ্ঞীর তরফে। একদিন তাঁকে চিনতাম। কিন্তু এখন শুনছি তিনি মেমফিস যুবরাজকে বিয়ে করে ফারাও হয়েছেন। গুপ্তচরের কাছে খবর পেলাম, স্বামীকে নাকি জুতোর শুকতলা বানিয়ে রেখেছেন,' বলে তিক্ত হাসি হাসল রামিস।

আন্তি বললেন—'বহু বছর আগে খিবস থেকে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে মুক্তো বেচাকেনা করছি বলে এত খবর রাখবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু আপনার দেশের মেয়ে আমরা। সেই দাবীতেই অনুরোধ করব, থাকবার জায়গা একটা জুটিয়ে দিন। বিকেলবেলা আপনার প্রাসাদে মুক্তো দেখানোর অনুমতি দিন। তারপর আমার সঙ্গিনীর গানবাজনা শুনুন।'

'কিন্তু আমার কাছে মুক্তোর চেয়ে তরবারির দামই বেশী—আমি যে সৈনিক। তাছাড়া, আমি একা থাকি—প্রাসাদে কোনো মহিলা নেই। তা সত্ত্বেও যখন এসেছেন স্বদেশ থেকে, অনুমতি দিলাম। আমেন জানেন কেন এসেছেন! এখন সৈন্যদের নিয়ে বেরোচ্ছি যুদ্ধবিদ্যা শেখাতে। ফিরব সন্ধ্যায়। তখন আসবেন মুক্তো নিয়ে—গান বাজনাও শুনব তখন।'

একজন উচ্চপদস্থ সৈনিককে ডেকে রামিস হুকুম দিলে অতিথিশালায় যেন এদের জায়গা করে দেওয়া হয়। কেউ যেন এঁদের নিগ্রহ না করে। সন্ধ্যে হলেই যেন রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হয়।

বলে, একদৃষ্টে তুয়া আর আন্তির দিকে চেয়ে থেকে চলে গেল সৈন্যদের নিয়ে।

সন্ধ্যে হল। সেজেগুজে তৈরী হল তুয়া। আন্তি কিন্তু কৃষ্ণবস্ত্রে আচ্ছাদন করলেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

একটু পরেই সৈনিক-প্রধান এসে বললে—'চলুন, মুখ্য প্রশাসকের আবাসে যাওয়া যাক।'

'মুখ্য প্রশাসক?' বললেন আন্তি—'আমি তো ভেবেছিলাম উনি রাজা।'

'রাজা তো বটেই। কিন্তু নিজেকে আবি-পত্নী মর্নিং স্টার নেভার-তুয়ার মুখ্য প্রশাসক বলেন। অথচ, ফারাও হওয়ার গুণাবলী এবং উত্তরাধিকার ওঁর মধ্যে রয়েছে। মাথায় ছিট থাকলে যা হয় আর কি!'

আন্তি বললেন—'সামান্য ফেরিওয়ালী আমরা। এত বৃহৎ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। চলুন তাঁর কাছে—তিনি ফারাও কি সেনাপতি কি মুখ্যপ্রশাসক জেনে আমাদের দরকার নেই।'

অনেক পথ, অনেক সোপান, অনেক কক্ষ, পেরিয়ে আসার সময়ে তুয়া চিনতে পারল বহু সৈনিককে। থিবস থেকে বেছে বেছে পাঠিয়েছিল রামেসের সঙ্গে। অবশেষে পৌঁছোলো অনাড়ম্বর ছোট্ট একটা ঘরে। ক্ষণপরেই দরজা খুলে ঢুকল রামিস। পরনে সাদামিধে মিশরীয় সেনাপতির পোশাক। স্বর্ণ প্রতীক বা কোনো রকম রাজকীয় প্রতীক রাখেনি পরিচ্ছদে। ডান হাতের

কড়ে আঙুল নেই—অনামিকায় জ্বল জ্বল করছে একটি মাত্র আংটি—তুত্নার দেওয়া অঙ্গুরীয়। সঙ্গে কয়েকজন সামরিক অফিসার—আলোচনা করছে সামরিক বিষয় নিয়ে।

তুত্না আর আন্তিকে দেখে সবিনয়ে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করল এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে।

তারপর বললে—'কি যেন দেখাতে চাইছিলেন আমাকে? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মুক্তো। ভুল জায়গায় এসেছেন কিন্তু। সুবর্ণনগরীর রাজস্ব বিপুল হতে পারে, কিন্তু সব অর্থই ব্যয় হয় শহর কল্যাণে—আমি বেতন পাই সামান্য। ছোট্ট এই ঘরসংসার কোনমতে তাতে চলে যায়। দামী পাথর কেনবার মত সঞ্চয় আমার নেই। তবে ভাল পাথর থাকলে খদ্দের জুটিয়ে দিতে পারব আশা আছে।'

শুনে, হৃৎপিণ্ড উত্তাল হল দুজনেরই। কথা বলার মত অবস্থা রইল না কিছুক্ষণ। ভাগ্যিস মুখ ঢেকে এসেছিল, নইলে চোখ মুখের অবস্থা দেখে বিচলিত হত রামিস।

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন আন্তি—'আপনার স্ত্রী অথবা সঙ্গিনীরা নিশ্চয় কিনবেন।'

রাগত কণ্ঠে রামিস বললে—'আগেই বলেছি, আমার স্ত্রী নেই, পুরুষ নয় —এমন কেউ থাকে না আমার সঙ্গে।'

স্বরবিকৃত রেখেই সবিনয়ে বললেন আন্তি—'তা বলেছিলেন। কিন্তু বহু দেশ ঘুরে এসেছি বলেই জানি রাজপুরুষদের পক্ষে মহিলা সঙ্গিনী না রাখাটা বেমানান এবং প্রকৃতি বিরুদ্ধ। যাই হোক, দেখুন আমাদের বেসাতি। আপনি অবিবাহিত থাকলেও নাপাতার সব লোক তো অকৃতদার নয়।'

গৌরচন্দ্রিকা না করে সুরভিত সীডা'র কাঠের বাক্স খুলে রাজপ্রতীক ইউরোআই-য়ের আকারে সাজানো একটা মুক্তোর মালা আর সবচেয়ে বড় মুক্তোগুলো বার করলেন আন্তি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল রামিস—'একজনেরই অধিকার আছে এই মুকুট শিরে ধারণ করার—মিশরের সম্রাজ্ঞী তিনি।'

'তা কেন। তাঁর স্বামীও তো পরতে পারেন,' জবাব দিলেন আন্তি।

তিক্ত হেসে রামিস বললে—'আমির হেঁড়ে মাথায় মানাবে না।'

কথাগুলো যেন কানে ঢোকেনি এমনিভাবে আন্তি বললেন—'গায়ে যাঁর রাজরক্ত আছে, বাহুবলে যিনি বিরাট দেশ জয় করে শাসন করছেন, এমনি কোনো সেনাপতিও পরতে পারেন এই মুকুট—কেউ ভর্ৎসনা করবে না।'

শাণিত হল রামিসের চক্ষু।

বলল—'অদ্ভুত কথাবার্তা আপনার। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে নিশ্চয়। মুক্তো থাকুক। মিশরের প্রাচীন গান গাইতে বলুন আপনার সঙ্গিনীকে। অনেকদিন শুনিনি।'

'কিন্তু এই মুকুট আপনি গ্রহণ না করলে তো আমার সঙ্গিনী গান ধরবে না। এ শহরে নির্বিঘ্নে ব্যবসা করার অধিকার লাভের জন্যেই যে মুকুটটা বানিয়ে এনেছি শুধু আপনার জন্যে।'

'রাখুন ঐখানে। ও-নিয়ে কথা হবে পরে। এবার গান।'

উঠে দাঁড়াল তুয়া। আস্তির মত প্রকৃত স্বর গোপন করে প্রথমে আস্তে, তারপর চড়া গলায় গাইল মিশরের রক্ত-উত্তাল-করা প্রাচীন সঙ্গীত। এক সময়ে শেষ হল গান।

রামিস বললে—'গান ভালই। মনেও পড়ে যাচ্ছে অনেক কিছু—কিন্তু সঠিক স্মরণ করতে পারছি না তা কি। শুভরাত্রি জানানোর আগে আরো গান শোনাতে পারেন না?'

ঝুঁকে পড়ল তুয়া। বললে গাঢ় কণ্ঠে—'এমন গান শোনাতে পারি যা শুনলে আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে অবিবেচক এক পুরুষের ছবি, আকাশের চাঁদ ধরতে গিয়ে যার পতন ঘটেছে এক দেবীর রোষবহ্নিতে।'

'এ-গল্প এর আগেও কানে এসেছে আমার। শোনান সেই গান।'

এবার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বীণায় ঝংকার এবং কণ্ঠে সুর জাগ্রত করল তুয়া। গানের প্রথম কলি কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই মন্ত্রমুগ্ধের মত আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রামিস। থিবসের ভোজসভায় যেভাবে গান গেয়ে যাদু করেছিল রামিসকে, সেইভাবেই আবার অবশ করে তুলল নাপাতার রাজ-কক্ষে দণ্ডায়মান প্রেমাস্পদকে।

শেষ হল গান। ঘর নিস্তব্ধ।

কিন্তু একী! মুখ যে সাদা হয়ে গেছে রামিসের! বজ্রাহতের মত একটা থাম আঁকড়ে ধরে কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। তুয়া নিজেও এলিয়ে পড়েছে চেয়ারে—হাত থেকে বীণা খসে পড়েছে মেঝের ওপর।

রুদ্ধশ্বাসে শুধোয় রামিস—'কোত্থেকে এল এই বীণা? এ জিনিস তো একটাই আছে পৃথিবীতে—দুটো তো নেই! নিশ্চয় চুরী করে এনেছেন। না, না, বীণা চুরি করলেও বাজনা আর কণ্ঠস্বর তো চুরি করতে পারেন না। মাপ করবেন। কিন্তু একটা ভিক্ষা চাইছি। কেন, তা পরে বলব। দয়া করে একবার আপনার অবগুণ্ঠন সরান—মুখখানা দেখতে দিন।'

মুখের অবগুণ্ঠন আর আলখাল্লার দড়ি আলগা করে দিল তুয়া। শিথিল বহিরাবরণ খসে পড়তে দেখা গেল মিশরের সম্রাজ্ঞীর জমকালো পরিচ্ছদ। বপ্লাচ্ছন্ন চোখে দুজনে দুজনের পানে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

পরক্ষণেই বিষম ক্রোধে গর্জে উঠল রামিস—'এ কি চালাকি জুড়েছেন আপনারা? ইনি তো মিশরের অভিষিক্ত সম্রাজ্ঞী—আমেনের তারা। এ বীণা তো কেশ-যুবরাজের উপহার—যাকে স্বহস্তে নিধন করেছি আমি। কণ্ঠস্বর মিশরের, গানের শব্দ মিশরের। কিন্তু এ কি করে সম্ভব হয়? হয় পাগল হয়ে গেছি আমি, না হয় ভোজবিদ্যা দেখাচ্ছেন আপনারা। আমেন কন্যা এই মুহূর্তে হাজার মাইল দূরে আবির সহধর্মিনী! জাদুকরী, বেরোন এখুনি! নইলে, আমেনকে বিদ্রূপ করার অপরাধে সাজা দেব আগুনে পুড়িয়ে!'

খুব ধীরে ধীরে কণ্ঠদেশ অনাবৃত করল তুয়া—জ্বল জ্বল করে উঠল জীবন-প্রতীক—যা তার বুকে আঁকা হয়ে গেছে জন্মের মুহূর্তেই।

বললে কোমল কণ্ঠে—'হে মারমিস-পুত্র, এই প্রতীক দেখেও কি আমাকে পুড়িয়ে মারার সাধ জাগে?'

'কেন নয়? মিশরের সৌন্দর্য যে অপহরণ করতে পারে, ঈশ্বরের খাস-মোহরও সে অপহরণ করতে পারে।'

'তাই নাকি? রামিস, তোমার আঙুলে ঐ যে খাসমোহর, ওটি কিন্তু একদা ফারাও-য়ের আঙুলেই শোভা পেত। ওটাও কি তুমি চুরি করে এনেছো? ডান হাতের কড়ে আঙুলটা খোয়ালে কি ভাবে বলবে? খিবসের গুপ্ত পুষ্করিণীতে অনধিকার প্রবেশের সাজা নয় কি?'

জবাব দিল না রামিস। ঈষৎ দ্বিধাবিভক্ত হল অধরোষ্ঠ—কিন্তু সন্দেহ আবার শক্ত করে তুলল মুখাবয়ব।

তুয়া বললে—'ধাই-মা, পারলাম না আমি, বোঝাতে পারলাম না যে আমিই মিশর—আর কেউ নয়। দেখো তুমি চেষ্টা করে।'

কালো অঙ্গাবরণ চিলে করে মেঝের ফেলে দিলেন আন্তি। শুভ্রকেশ আর চিরপরিচিত মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রামিস, তারপরে ভীষণ চেঁচিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্তির বুকে—'মা... মাগো...শুনে যে শুনলাম মেমফিসে তোমাকে ওরা মেরে ফেলেছে!' ঝর-ঝর কেঁদে ফেলল বলতে বলতে।

বললেন আন্তি—'এখন বিশ্বাস হলো তো? আমিই তোমার মা—যে তোমাকে গর্ভে ধরেছে। আর ঐ তোমার ছেলেবেলার সঙ্গিনী—যে পুরো

দুটো বছর মরুভূমি আর পাহাড় পেরিয়ে, অনেক বহুমানবের শায়েস্তা করে এসেছে তোমার কাছে। বিশ্বাস হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

তুয়া বললে—'হে বিশ্বস্ত সেনাপতি, তাহলে শিরে ধারণ করো এই মুক্তো মুকুট,' বলে একটু আগেই যে বস্তু স্পর্শও করেনি রামিস, তা দু-হাতে তুলে বসিয়ে দিল রামিসের মাথায়—যেমন করে বসিয়েছিল দীর্ঘ দু-বছর আগে এক উষালগ্নে থিবসের রাজকক্ষে—মেনে নিয়েছিল নিজের প্রভুরূপে।

বললে—'গ্রহণ করো সম্রাজ্ঞীর উপহার। আজ থেকে এই মুকুট আর আমি তোমার হলাম।'

রাত্রি।

তুয়া আর আন্তির আশ্চর্য কাহিনী শোনবার পর রামিস বলল নিজের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

সব শেষে বললে—'গুপ্তচরের মুখে যখন শুনলাম আমি জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে হত্যা করেছে ফারাওকে এবং তুয়া বিয়ে করেছে পিতার হত্যাকারীকে, তখন থিবসে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও আর প্রবৃত্তি হয়নি।'

'শুনে বিশ্বাস করলে?' ভর্ৎসনা মিশোনো স্বরে বললে তুয়া।

'অবিশ্বাসই বা করি কি করে? একই গুপ্তচর স্বচক্ষে দেখেছে তোমাকে সিংহাসনে বসে কুকুরের মত আমিকে খাটাতে। কি করে জানবো সে তোমার কা, তুমি নও?'

'আমি অ্যাদ্দিনে জেনেছে নিশ্চয়,' বললে তুয়া। 'কা-রের স্বামী হওয়া যে কি জিনিস, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এবার বলো আমাদের কি করণীয়...

'প্রথমে আমাকে বিয়ে করা।'

'সেটা পরে। আগে আমার সিংহাসন উদ্ধার করে দাও। তারপর বিয়ে। এখানে নয়—থিবসে।'

'করব, কিন্তু কি করে করবো জানি না। সিংহাসনে যে বসে আছে, সে বিদায় নেবে কী?'

'খবর পাঠাচ্ছি আমি,' বললেন আন্তি। 'এবার যাও, বড় ক্লান্ত, একটু ঘুমোই।'

'মা, খবর পাঠাবে কাকে দিয়ে?'

'রামিস, ছেলেবেলা থেকে দেখেও চিনলি না আমাকে? আমার বার্তা-বহদের কখনো চোখে দেখা যায়?'

মধ্যরাত্রি। রামিসের রাজপ্রাসাদে পাশাপাশি বসে প্রার্থনা সমাপন করল তুয়া আর আস্তি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আবার সেই ভয়ংকর মন্ত্রোচ্চারণ করলেন আস্তি—যা তাঁকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন বিদেহিনী আহুরা এবং যা এর আগে একবারই উচ্চারণ করেছিলেন মেমফিসের মিনার-চূড়ায়।

ফিস-ফিস করে কারা যেন কথা কয়ে উঠল, ডানা ঝাপটানোর ঝটপট ঝটপট আওয়াজ শোনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, প্রদীপের আলোক-বৃত্তের বাইরে অন্ধকারে ঘনীভূত হচ্ছে উজ্জ্বল কুয়াশা। একটু একটু করে উজ্জ্বলতর হয়ে জমাট কুয়াশার আকার নিল এক মহিমময়ী। অঙ্গে তার রাণীবেশ। মিশরের সম্রাজ্ঞীর অলঙ্কার। মুখখানাও নেতার-তুয়ার মত—কিন্তু আরও গর্বিত এবং অপার্থিব। নিঃশব্দে সেই প্রেতজ্জ্বল সূক্ষ্মদেহিনী দাঁড়িয়ে রইল দু-জনের সামনে। আকাশের নক্ষত্রের মত কেবল ঝকমকে রইল দুই হীরক-চক্ষু।

'কোত্থেকে এলে সূক্ষ্ম দহিনী?' শুধোলেন আস্তি।

শীতল কণ্ঠে বললে প্রেতাকৃতি—'আবির আলয় থেকে।'

'কি রকম আছে আবি? মিশরের খবর কী?'

'আবি ভাল নেই। কিন্তু মিশর এত ভাল আর কখনো থাকেনি। আদেশ তামিল করেছি। এবার চাই বিশ্রাম—ঐখানে।' তুয়ার বক্ষদেশ অঙ্গুলি-সংকেতে দেখালো সূক্ষ্ম-দহিনী।

'কিন্তু কাজ যে এখনো বাকী। তারপর নেবে বিশ্রাম—পুনর্জাগরণের দিন না আসা পর্যন্ত। শোনো, থিবসে ফিরে যাও। আবি আর তার সভাসদদের কানে কানে একটা মিথ্যে গল্প শোনাও। বলো, বাহুবলে কেশ দখল করে এখন মিশরের ফারাও বলে নিজেকে ঘোষণা করেছে রামিস। আবি যেন বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে দক্ষিণ দেশে রওনা হয় রামিস-নিধনের জন্য। সেনাপতিদের কানে কানে কিন্তু শুনিয়ে রেখো, সম্রাজ্ঞী নেতার-তুয়া পিতা ফারাওয়ের সম্মতিক্রমে কথা দিয়েছে রামিসকে—তারই বধূ হবে সে। আমেনের আদেশও তাই। বলবে, আবির সীমাহীন অপরাধ ক্রুদ্ধ করেছে আমেনকে, শাস্তি সে পাবেই। যারা তার সাগরেদি করবে, তারাও বাদ যাবে না। কিন্তু যারা করবে না, তারা অনুগ্রহ লাভ করবে আমেনের। শহরের দক্ষিণ ফটকে সংঘর্ষ বাঁধবে রামিসের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে। আবির সঙ্গে আসবে তুম—আমার সঙ্গে যাবে এমন একজন যে তোমার আমার চাইতেও অনেক বড়। দক্ষিণ তোরণেই কাজ শেষ হবে তোমার—বিশ্রাম পাবে

অবশেষে। এই আমার আদেশ।'

নিরুত্তাপ শীতল কণ্ঠে কা বললে—'আদেশ প্রতিপালিত হবে। কিন্তু হে গুপ্তবিদ্যার অধীশ্বরী, স্বর্গীয় কর্মকাণ্ডের নায়িকা—দেরী করবেন না। অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে যদি অগ্নিশিখার আকারে ফিরে আসতে হয় আমাকে নিরালা বুকের আশ্রয়ে—ধ্বংস আর মৃত্যুর চিহ্ন রেখে আসব আসবার পথে।'

একটু একটু করে অনুজ্জ্বল হয়ে শূন্যে বিলীন হল সূক্ষ্মদেহিনী।

থিবস শহর। সকালবেলা।

প্রশস্ত হলঘরে বসে রাজকার্য দেখছে আবি প্রধানমন্ত্রী কাকুর সঙ্গে। দুজনেরই চেহারার পরিবর্তন এসেছে। বুড়িয়ে গেছে দুজনেই। ভয়ে আর অপরিসীম দুর্দশায় রোগা হয়ে গেছে আবি। রাজবেশ ঢিলে হয়ে গেছে। হাঁটলেই থর থর করে কাঁপছে কাকু। অসহিষ্ণু কণ্ঠে শুধোয় আবি—'কাজ শেষ হল?'

'দুপুর পর্যন্ত বসিয়ে রাখলেও শেষ হবে না। তারপরেই আপনাকে বসতে হবে উপদেষ্টা আর রাজদূতদের নিয়ে,' বললে কাকু।

'কারও সঙ্গে বসব না। ও সব হবে কালকে। কি পেয়েছো আমাকে? ভারবাহী গর্দভ? কি সুখেই না ছিলাম মেমফিসের যুবরাজ হয়ে। একদণ্ডও বিশ্রাম পাচ্ছি না ফারাও হবার পর থেকে।'

'কিন্তু দেখা যে করতেই হবে, সম্রাজ্ঞীর হুকুম তাই। জানেন তো, তাঁর আদেশ অমান্য করা যায় না।'

'সম্রাজ্ঞী!' গর্জে উঠেই সভয়ে চারদিক দেখে নিল আবি—কেউ শুনে ফেলল না তো?

'কাকু, সম্রাজ্ঞীকে কি কুক্ষণেই না দেখে ফেলেছিলাম। মেয়ে নয় সে—পিশাচী। সাপের মত ধড়িবাজ। অন্তরটা বরফ দিয়ে তৈরী। নামেই আমি ফারাও—পুতুল নাচ নাচিয়ে বেড়াচ্ছে আমাকে। নামেই আমি স্বামী—কিন্তু আজও সে আমার স্ত্রী নয়—কারোরই নয়—অথচ ঐ মোহে পড়ে অনেকেই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। গতরাতে আমাকে হুকুম দিতে দিতে আবার মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে—দেখা গেল একটু পরেই—কিন্তু যেন বড় ক্লান্ত। জিজ্ঞেস করেছিলাম, যাওয়া হয়েছিল কোথায়? বললে, এক বছর আগে যেখানে যেতে—সেইখানে। যাকে সে ভালবাসে প্রাণ দিয়ে, আর যে আমাকে ঘৃণা করে সমস্ত সত্তা দিয়ে—তাকে দেখতে। কাকু, মানে কি কথাটার?'

আতংক-ঘন কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে উঠল কাকু—'রামিস—সে রামিস। কেশ-য়ের সিংহাসনে যে বসে আছে, সম্রাজ্ঞীকে যে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসে। যদিও এই সম্রাজ্ঞী যে আসলে কে, তা হাড়ে হাড়ে বোঝা যাচ্ছে। তবুও ওর হুকুম মতই চলতে হবে আমাদের। নইলে মরতে হবে—যা আমরা কেউ চাই না—ফারাও ওৎ পেতে রয়েছেন যে মৃত্যুর সিংহদ্বারে।'

গুঙিয়ে উঠল আবি। ঘাম জমে গেল কপালে। রাজবেশের কোণ দিয়ে ঘাম মুছে নিয়ে বললে—'খাঁটি কথাই বলেছো, কাকু। ডাকো নকল-নবিসদের—সম্রাজ্ঞীর হুকুম তামিল করা যাক।'

উঠতে যাচ্ছে কাকু, এমন সময়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকল খবরদাতা—'মহিমময়ী সম্রাজ্ঞী সবাইকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন বাইরে ফারাওয়ের জন্য।'

দু-চোখ হতাশায় ভরিয়ে তুলে দৃষ্টি বিনিময় করল আবি আর কাকু।

গলা নামিয়ে বললে আবি—'সসম্মানে নিয়ে এসো সম্রাজ্ঞীকে।'

বেরিয়ে গেল খবরদাতা। অচিরে সোনার দরজা পথে আবির্ভূত হল সম্রাজ্ঞী। জমকালো পরিচ্ছদ এবং আভরণে উজ্জ্বল সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখে ঘোর লাগে—রূপের জৌলুসে চোখ যেন আরো ধাঁধিয়ে যায়। বাতাস করতে করতে প্রবেশ করল মেরিত্রা। দিন রাত এতটুকু বিশ্রাম না নিয়ে সেবা করার ফলে সুন্দরী মেরিত্রা এখন রূপ-যৌবনহীনা। আতংকে শুষ্ক কাঠির মত চেহারা। পেছন পেছন এল উপদেষ্টারা আর সেনাপতিরা।

সিংহাসনের সামনে এসে চেয়ারে বসল সম্রাজ্ঞী।

বলল—'হে ফারাও, কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম রামিসকে। কেশ-যুবরাজকে এই ঘরেই বধ করার অপরাধে তাকে আমি নির্বাসন দিয়েছিলাম। কিন্তু সে কেশ সিংহাসন দখল করে রাজা হয়ে বসেছে। স্বপ্নে দেখলাম, সে থিবস আক্রমণ করে মিশরের সিংহাসন দখল করতে আসছে। শুধু ফারাও নয়, রাজরক্তের দাবীতে আমার স্বামী হওয়ার অভিলাষও তার রয়েছে।'

'তা থাকতে পারে,' বললে আবি। 'বড় ঝঞ্ঝাটে লোক এই রামিস। কিন্তু হাজার মাইল দূরের নাপাতা শহরে যে রয়েছে, যার সৈন্যবাহিনী এতদূর নিয়ে আসতে অনেক মাস কেটে যাবে, তাকে নিয়ে এত চিন্তা কিসের?'

'স্বপ্নের সবটুকু শুনলে বুঝবেন কেন চিন্তায় পড়েছি। মোট দুটো ছবি দেখেছি স্বপ্নে। প্রথম ছবিটায় দেখলাম, রামিস থিবস আক্রমণ করে শহর জয় করে ফেলেছে, আমাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আপনারই

শবদেহের ওপর দিয়ে আমাকে তার স্ত্রী করবে বলে। দ্বিতীয় ছবিটায় দেখলাম, আপনি সসৈন্যে দক্ষিণ ভূমির ফটকে তাকে আক্রমণ করেছেন, বধও করেছেন রামিসকে, দখল করেছেন কেশ রাজ্য, মিশরের হয়ে আমৃত্যু শাসন করছেন সুবর্ণ-নগরী।'

'দুটো দু-রকমের স্বপ্ন। কোনটা ঠিক?'

'তা তো জানি না, ফারাও। আমি না জানলেও আপনার পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে জানতে পারে। জাদুকর শিরোমণি সে, হেঁয়ালীর সমাধানে অভ্যস্ত,' বলে আঙুল তুলে দেখালো কাকুকে।

আমতা আমতা করে কাকু বললে—'কিন্তু এ তো বড় উঁচু দরের স্বপ্ন। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার কোনো নির্দেশও পাচ্ছি না দেবলোক থেকে।'

'কাকু, তুমি চিরকালই বড় বিনয়ী। ফারাও, ও জানে স্বপ্নের মানে। আপনি হুকুম দিলেই মুখ খুলবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও জানে। সব জানে। সব কিছুর ব্যাখ্যা করতে পারে। বলো, কাকু, খামোকা সময় নষ্ট কোরো না,' হুকুম দিল আখি।

কথা জড়িয়ে গেল কাকুর—'আমি পারব না। তবে আমার স্ত্রী মেরিত্রা বলতে পারে। আমার চাইতে জ্ঞানবুদ্ধি ওর বেশী।'

'মেরিত্রার কথা আমার শোনা হয়ে গেছে,' বলল সম্রাজ্ঞী—'এবার তোমার পালা। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার উচিত ঈশ্বরের পথনির্দেশ সবার সামনে উপস্থাপিত করা। না করলে সে আর ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা থাকে না। ঈশ্বরের নির্দেশ গোপন করার সাজাও পেতে হয় দেবতাদের হাতে,' শেষ কথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সম্রাজ্ঞী।

কাঁপরে পড়ল কাকু। জোড়া জোড়া চাহনি তার দিকে নিবদ্ধ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে বলে ফেলল যা বলতে চায়নি ঠিক সেই কথাগুলোই—'আলোর ঝলক দেখছি চোখের সামনে...সম্রাজ্ঞীর দ্বিতীয় স্বপ্নটাই সত্যি। মহামান্য ফারাও যুদ্ধে বধ করবেন রামিসকে।' মুখে কথাটা বললেও মনে মনে কাকু কিন্তু রামিসের নাম উচ্চারণ করতে গিয়েও শিউরে উঠল। 'অন্তিম মুহূর্তে তাদের যেতেই হবে।' এই কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল ভয়ের চোটে।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে আখি বললে—'কাদের অন্তিম মুহূর্তের কথা বলছো?'

'নিশ্চয় যাদের স্বপ্নে দেখেছেন সম্রাজ্ঞী। এক্ষুনি দক্ষিণের ফটক অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ পাচ্ছি আমার মনের মধ্যে।'

বাজখাঁই চিৎকার ছাড়ল আখি—'বদমাস জ্যোতিষী! ফটক ভেঙে পড়ুক

তোমার মাথার। দু-বছরে তিন-তিনটে লড়াই করতে হয়েছে। বুড়ো বয়েসে আবার যাবো কেশয়ের দুর্দান্ত বাহিনীর সঙ্গে লড়তে? আসুক দুর্বিনীত রামিস ফিরসে—ঠেঙিয়ে শায়েস্তা করে দেব।'

'না, না,' শান্ত তাড়াতাড়ি বললে কাকু—'ঈশ্বরের নির্দেশ কিন্তু আপনিই যাবেন। এখান থেকে বহু শত মাইল দূরে মরুভূমির মাঝে তাকে ফাঁসিতে লটকাবেন। দেবতাদের আদেশে এই হল গিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা।'

উল্লসিত কণ্ঠে বললে সম্রাজ্ঞী—'ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মুখ দিয়ে দৈববাণী শুনলেন আপনারা। উঠুন, তৈরী হোন সবাই, যান —মরুভূমির মাঝে কুকুরের মত ফাঁসি দিন লোভী রামিসকে। মিশরের নিরাপত্তা আপনাদের হাতে। লুঠ করুন সুবর্ণনগরী—ভাগ করে নিন সোনাদানা।'

'তাই হোক! তাই হোক!' সমস্বরে সায় দিল সবাই। কাকুর তীক্ষ্ণ স্বর শোনা গেল সবার আগে—যদিও নাটকীয় এই মুহূর্তেও সায় দিল ইচ্ছার বিরুদ্ধে—'সম্রাজ্ঞীও চলুন আমাদের সাথে।'

'হ্যাঁ, আমিও যাবো। যদিও আমি স্ত্রীলোক, তাহলে ফারাও যেখানে, আমিও সেখানে। যাত্রা করব নতুন চাঁদ উঠলেই।'

রাত্রি। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাকু আর আবি।

হুংকার ছাড়ল আবি—'একি করলে তুমি? ভুলে গেলে তুয়াকে নিয়ে আসার আগের রাত্রে স্বপ্নে ফারাও কি বলে গেছিলেন? মারমিস পুত্র রামিস বসবে সিংহাসনে সম্রাজ্ঞীর পাশে—সঙ্গে আসবে এক ভিক্ষুক আমার জন্যে বিশেষ বার্তা নিয়ে?'

শূন্যগর্ভ কণ্ঠে কাকু বললে—'মনে আছে।'

'ভিক্ষুকটা কি বার্তা বহন করে আনবে বুঝতে পারছো? তোমার আর আমার মৃত্যুর পরোয়ানা—যাদের কবর তৈরী শেষ হল গতকাল।'

'তা হবে।'

'তাহলে স্বপ্নের ঐ ব্যাখ্যা করতে গেলে কেন? কেন আমাকে রামিসের মুখে ঠেলে দিলে?'

'না করেও তো পারলাম না,' গুঙিয়ে উঠল কাকু। 'সম্রাজ্ঞী নামক প্রেতিনীটা বাধ্য করল আমাকে। আবি, পরিত্রাণ নেই আমাদের। জালে জড়িয়ে পড়েছি। এখন যদি ঐ তরবারির সাহায্যে—'অর্থপূর্ণ চাহনি নিক্ষেপ করল তরবারির দিকে।

'না, না, সে সাহস নেই আমার,' ককিয়ে উঠল আবি—'যা থাকে

কপালে। যাবই যাব দক্ষিণের ফটকে।'

কান্নার মত শোনালো কাকুর গলা—'কিন্তু দক্ষিণের ফটকের ওপারে তো ওৎ পেতে রয়েছে রামিস—প্রতিহিংসা-পাগল রামিস—সঙ্গে রয়েছে তিতুক—আর আমাদের দুজনের জন্যে অভাবহ এক বার্তা।'

(১৮) দেবতাদের বিচার

তিনমাস পর।

দক্ষিণ ফটকের পাশে শিবির পড়েছে মহামান্য ফারাও আবির। নীল-নদের দু-তীর ছেয়ে গেছে রণতরীতে। গুপ্তচর খবর এনেছে, মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ঝড়ের বেগে উত্তর দিকে এগিয়ে আসছে রামিস। সুতরাং আর এগিয়ে দরকার নেই। সামান্য ঐ সৈন্য-বাহিনীকে এখানেই ধ্বংস করা যাবে। কষ্ট করে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি আবি। ভীষণা সম্রাজ্ঞীও তার ইচ্ছায় বাদ সাধেনি।

একদিন সূর্য ডুবতেই খবর এল, রামিস পৌঁছে গেছে নদীর অপর পাড়ে। হাজার হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা আমেন মন্দিরের চারপাশে পাহাড়ের ওপর তার শিবির পড়েছে।

শুনে বললে সম্রাজ্ঞী—'চমৎকার। কাল সকালেই ফারাও গিয়ে শেষ লড়াই লড়বেন,' বলে হীরক-উজ্জ্বল চোখে তাকাল আবির দিকে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শেষ লড়াই তো বটেই। বড় ক্লান্ত আমি, থিবসে ফিরতে পারলে বাঁচি। কিন্তু,' বলে মিনমিন করে উঠল ক্ষীণ অনিশ্চিত কণ্ঠে—'কেন জানি না, এবার আমি মনে জোর পাচ্ছি না। কাকু, আকাশের দিকে তাকিয়ে একদৃষ্টে কি দেখছো বলো তো?'

উপদেষ্টা মণ্ডলীর প্রত্যেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল জ্যোতিষীর ওপর। দেখল, বড়ই ভাবনায় পড়েছে বেচারী।

কম্পিত আঙুলে আকাশ দেখিয়ে শুধু বললে—'দেখুন, তাহলেই বুঝবেন।'

সন্ধ্যাকাশের ঠিক ঊর্ধ্বে জলজল করছে একটা অত্যুজ্জ্বল তারকা। পাশেই ম্যাড়ম্যাড় করছে একটা ক্ষীণপ্রভ তারকা। প্রথম তারকাটা একটু একটু করে ম্লান করে দিচ্ছে দ্বিতীয় তারকাটাকে। যেন বিলীন হতে আর দেরী নেই।

কথা বলতে গিয়ে যেন দম আটকে এল কাকুর—'ভোরের তারা। ফারাও, পাশের তারাটা আপনার। ভোরের তারা খেতে শুরু করেছে আপনার তারাকে, মিলিয়ে যেতে বসেছে আপনার তারা, আর কোনোদিনই দেখা যাবে

না। আবি, অনেক...অনেক বছর আগে ভবিষ্যজ্ঞান দিয়ে ঠিক এইরকমটিই জানতে পেরেছিলাম। আপনার দিন ফুরিয়েছে, আবি, আসছে মহারাত্রি।'

আতংকে ক্রোধে ক্ষিপ্তের মত চেঁচিয়ে উঠল আবি—'তাই যদি হয়, কুত্তা, তোকেও তার বখরা নিতে হবে।'

মুখের কথা শেষ হতে না হতেই—মুহুর্মুহু আর্তনাদের শব্দ এগিয়ে এল কাছে। চেঁচামেচি হট্টগোলের মধ্যে ঝড়ের মত আবির্ভাব ঘটল কাকুর স্ত্রী মেরিত্রার।

চিলের মত চেঁচাতে চেঁচাতে বললে—'প্রতিহিংসা নিচ্ছেন দেবতারা। শুনুন আবি, রাত্রেও আমি ঘুমোতে পারি না—কিন্তু আজ সন্ধ্যা হতে না হতেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম শিবিরে। জাদু করে যাকে আমরা খুন করেছি, সেই ফারাও আবির্ভূত হলেন স্বপ্নে। বললেন—'খুনী আবি আর বদমাস পিশাচগুরু কাকুকে গিয়ে বলো, আরেক সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই আমার সঙ্গে তাদের দেখা হবে—শয়তানী, তুমিও আসবে সঙ্গে।' আবি, মৃত্যুর আর দেরী নেই আমাদের। ভয়ংকর প্রতিহিংসা নিতে চলেছেন দেবতারা।' বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেরিত্রা। ফেনা বেরোতে লাগল মুখ দিয়ে।

আতংকের চরম সীমায় পৌঁছে উন্মাদ হয়ে গেল আবি।

ভীষণ চেঁচিয়ে বললে—'জাদুকর ওরা—জাদু দিয়ে আমার সবনাশ করার ফন্দী এঁটেছে। নিয়ে যাও দুজনকে—আটকে রাখো কারাগারে। বেত মেরে পায়ের ছাল-চামড়া তুলে দাও কাকুর—দেখি চৈতন্য হয় কিনা। কাল রামিসকে বধ করার পর মাস্তুলের ডগায় ফাঁসি দেব জাদুকরটাকে।'

হেসে উঠল সম্রাজ্ঞী। বললে—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালকেই রামিসকে বধ করার পর জাদুকরকে মাস্তুলের ডগায় ফাঁসি দেওয়া হবে। ভয় নেই ফারাও, যাই ঘটুক না কেন—আমি দেখব যেন ফাঁসিটা হয়ে যায়।'

পাগলামির ঝোঁক কেটে যাওয়ার পর শয্যায় উঠে বসেছে মেরিত্রা, এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক এসে ঝুঁকে দাঁড়াল তার ওপর, চোখ তুলে মেরিত্রা দেখল সম্রাজ্ঞীকে।

বরফ ঠাণ্ডা গলায় বললে সম্রাজ্ঞী—'শোনো মেরিত্রা, যা বলব, তা অক্ষরে অক্ষরে শোনাবে আবিকে। সময় ফুরিয়েছে, তাই তাকে ছেড়ে চললাম আমি। আবার যদি ভোরের তারাকে দেখতে ইচ্ছে হয়, রামিসের শিবিরে দেখতে পাবে তাকে। দেখতে পাবে পাহাড়ের ওপরে তাঁবুগুলোর মধ্যে—

আমেনের মন্দিরে।'

পর মুহূর্তেই উধাও হল সম্রাজ্ঞী।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেরিত্রা। চিৎকার করে ডাকল রক্ষীদের—এখুনি তাকে নিয়ে যাওয়া হোক আবির কাছে। ভীষণ সেই চিৎকার শুনে আর খবরটা এত জরুরী যে দেরী করা একদম সমীচীন হবে না শুনে একজন তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে খবর দিল আবিকে। আবি নিজেই ছুটে এল মেরিত্রার ঘরে।

বললে হাঁপাতে হাঁপাতে—'আবার কি স্বপ্ন দেখলে জাদুকরী? আর কার সর্বনাশ দেখতে পেলে?'

'স্বপ্ন নয়, ফারাও। সম্রাজ্ঞী পালিয়েছেন রামিসের শিবিরে,' অক্ষরে অক্ষরে সম্রাজ্ঞীর কথাগুলো আবিকে শুনিয়ে দিল মেরিত্রা।

'মিথ্যে কথা,' গলার শির তুলে চিৎকার করে উঠল আবি—'রক্ষীদের তিন তিনটে বূহ্য ভেদ করে পালানো সম্ভব নয় কোনমতেই।'

'খুঁজেই দেখুন না।'

খুঁজল আবি। রক্ষীরা কেউ দেখেনি সম্রাজ্ঞীকে, তা সত্ত্বেও তাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

তখন মধ্যরাত্রি। চাঁদের আলোয় সহসা দেখা গেল শতচ্ছিন্ন পোশাক পরে একটা দীর্ঘ মূর্তি কণ্টক-যষ্টিতে ভর দিয়ে ঘুরছে শিবিরে। চাঁদের আলো ঠিকরে যাচ্ছে তার হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সাদা দাড়ি থেকে।

রক্ষীদের নিয়ে সম্রাজ্ঞী অন্বেষণে ব্যস্ত আবি মূর্তিটিকে দেখেই হেঁকে উঠল—'ও কে?'

বৃদ্ধের চিৎকার ঠিক সেই সময়ে ভেসে এল কানে—'শুনুন উপদেষ্টারা, সেনাপতিরা, মিশরের বীরপুরুষরা, পুরোহিতরা—সবাই শুনুন আমেনের নির্দেশ—শুনুন তাঁর দূত ভবঘুরে কেফারের মুখে। কেশ অধিপতি রামিসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না। সে আমার সেবক, আপনাদের ভাবী ফারাও, সম্রাজ্ঞীর ভাবী স্বামী, মিশরের ভাবী রাজাদের জনক। অন্যায়ভাবে সিংহাসন যে দখল করেছে, ভাই হয়েও ফারাওকে যে হত্যা করেছে, গ্রেপ্তার করুন সেই আবিকে—সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করুন জাদুকর কাকু আর বিশ্বাস-হন্ত্রী মেরিত্রাকে—ভোর হলেই তিনজনকে নিয়ে আসুন ঐ পাহাড়ের ওপর আমার মন্দিরে—মন্দিরের পবিত্র স্থানে আমি শাস্তি বিধান করব এদের। চিরশান্তি নেমে আসবে মিশরে—জীবনকে উপভোগ করতে পারবেন আপনারা।'

রক্ত-জমানো ভয়ংকর এই সব কথা শুনে এবং একদিন এক ভিক্ষুক বিশেষ বার্তা বহন করে নিয়ে আসবে—এই ভবিষ্যদ্‌বাণী মনে পড়ে যাওয়ায় নিমেষমধ্যে তরবারি কোষমুক্ত করে ধেয়ে গেল আবি, কিন্তু ভিক্ষুকের কাছে যেতেই দেখল অবাক কাণ্ড। বৃদ্ধ ভিক্ষুক সেখানে নেই—অনেক দূর থেকে আসছে তার উচ্চকণ্ঠের বিশেষ বার্তা। তৎক্ষণাৎ সদলবলে সেদিকে দৌড়োলো আবি, কিন্তু ততক্ষণে শেষ বিচারের বার্তা উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত হচ্ছে জাহাজের ওপর। গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল দীর্ঘদেহী বৃদ্ধকে। সেখানে ছুটে যেতে না যেতেই ভিক্ষুক হাজির হল অন্যত্র।

'দৈববাণী। দৈববাণী।' তুমুল সোরগোল উঠল পুরোহিতদের মধ্যে। 'মাথা পেতে নাও দেবতাদের আদেশ!' বলেই আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল আবির ওপর। বেঁধে ফেলল আষ্টেপৃষ্ঠে। বাঁধা পড়ল কাকু আর মেরিত্রাও। কিন্তু দীর্ঘদেহী শ্বেত ভিক্ষুককে আর কোথাও দেখা গেল না।

ঠিক সেই সময়ে পাহাড়ের ওপরে মন্দিরের একটা ঘরে ঘুমোচ্ছিল তুয়া। আন্তি চোখে চোখে রেখেছে তাকে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল ঘরের মধ্যে দিয়ে। চোখ তুলে আন্তি দেখলেন নিদ্রিতা তুয়ার সূক্ষ্ম-দেহিনী দাঁড়িয়ে আছে সামনে, অবিকল একই মূর্তি।

'বলো কি চাও,' শুধোলেন আন্তি।

'বিশ্রাম কাজ শেষ। বড় ক্লান্ত। গুপ্ত-মন্ত্র বলুন। যে ঘুমের কন্দর থেকে জাগ্রত হয়েছি, সেই কন্দরেই ফিরে গিয়ে ঘুমোতে দিন পুনর্জাগরণের দিন না আসা পর্যন্ত।'

ফিরে যাওয়ার সময় যে হয়েছে, তা আন্তিও বুঝেছিলেন। তাই মন্ত্র পাঠ করলেন, অমনি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর ক্ষীণতম হয়ে শূন্যে বিলীন হল সূক্ষ্মদেহিনী। আড়মোড়া ভেঙে ঘুমের মধ্যেই উঠে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ল তুয়া। অঘোরে ঘুমোলো সারা রাত, সকালে উঠে আন্তিকে বললে, ভেতর ভেতর যেন একটা পরিবর্তন এসেছে। বড় ভাল লাগছে।

'রাণী, আমেনের আদেশে যে তোমার স্থূল দেহ ত্যাগ করে গিয়েছিল, কাজ শেষ করে আবার সে ফিরে এসেছে তোমার স্থূল দেহে। তাই এত ভাল লাগছে। নাও, উঠে পড়ো, সাজ গোজ করো। আজ তোমার জয়ের দিন, বিয়ের দিন।'

সূর্য উঠতেই অন্য দিনের চাইতে আরো রূপের রাশি নিয়ে মন্দির তোরণে গেল তুয়া। রামিস বর্মাচ্ছাদিত দেহে দাঁড়িয়ে ছিল তার প্রতীক্ষায়। দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসছিল। যেন এগিয়ে আসছে অনেক সৈন্য।

'ব্যাপার কী?' বলে চলচলে সুনীল আঁখি মেলে রামিসের পানে তাকাল তুয়া। নীলনদেও এত জল নেই যত ভালবাসা সেদিন দেখা গেল তার নীল চোখে।

হাঁটু ভেঙে অভিবাদন জানিয়ে রামিস বললে—'আমি আক্রমণ করতে আসছে বোধহয়। ভয় হচ্ছে তোমার জন্যে। আমার সৈন্যবল তো তেমন নেই।'

'ভয় কিসের? যদিও আজ তোমার স্বাধীনতা হারানোর দিন,' বলে মধুর হাসল তুয়া। হাসির মানে বুঝতে গিয়ে মহাধাঁধায় পড়ল রামিস।

মুখ খোলার আগেই দৌড়ে এল দুজন সেনানায়ক। আমির সৈন্যবাহিনী থেকে শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছে পুরোহিত আর বার্তাবহরা।

রামিস বললে—'আসতে দাও ভেতরে, কিন্তু সাবধান থেকো। আমি ছলচাতুরির আশ্রয় নিল কিনা বুঝতে পারছি না। সম্রাজ্ঞী, তুমিও এসো। ওরা কথা বলতে চায় তোমার সঙ্গে—আমার মত সামান্য একজন সেনাপতির সঙ্গে নয়।' ভেতরের ঘরে বেদীর সামনে পাতা চেয়ারে গিয়ে সম্রাজ্ঞীর মতই বসল তুয়া।

ঘরে ঢুকল মিশরের নামী সেনাপতিরা। এল পুরুৎরা। সঙ্গে নিয়ে এল তিনটে ঢাকনা দেওয়া শিবিকা। একযোগে সকলেই প্রণিপাত হল রাণীর সামনে—শিবিকা বাহকরা ছাড়া। তারপর দলের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল থিবসের প্রধান পুরোহিত। রাণীর সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়াতেই হস্ত সঞ্চালনে কথা শুরু করতে আদেশ দিল তুয়ারাণী।

প্রধান পুরুৎ বললে—'হে ভোরের তারা, গতকাল আপনি শিবির ত্যাগ করার পরেই দেবজননের এক দূত এসেছিল—'

বাধা দিয়ে তুয়া বললে—'সবুর। আপনাদের শিবির আমি ত্যাগ করে আসিনি—শিবিরে কোনো কালেই ছিলাম না। গত দু-বছর পবিত্র মিশরের মাটি স্পর্শও করিনি। মৃত্যু এড়োতে এবং মৃত্যুর চাইতেও অধিক আমির সঙ্গে পরিণয় এড়োতে পালিয়ে এসেছিলাম মেমফিস থেকে। তারপর এই প্রথম এলাম মিশরের মাটিতে।'

পেছন ফিরে চোখ বড় বড় করে দলের সবার দিকে তাকাল প্রধান পুরুৎ। একই বিস্ময়বোধ জাগ্রত হল প্রত্যেকের চোখে। ফ্যাল ফ্যাল

করে চেয়ে রইল সম্রাজ্ঞীর পানে।

'কিন্তু গত দু-বছর আপনাকে তো প্রতিদিন দেখেছি আমাদের মধ্যে আবির স্ত্রীরূপে।'

তুয়া তাকাল আন্তির দিকে। আন্তি বললে প্রধান পুরুৎকে—'আমাকে চেনেন তো?'

'কে না চেনে? আপনি মারমিসের স্ত্রী, রাজবংশে আপনার জন্ম, কেশ অধিপতি রামিসের মাতা, মিশরের শ্রেষ্ঠা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, গুপ্ত-বিদ্যার অধিরাণী। কিন্তু জানতাম মেমফিসের যে মন্দিরে ফারাও নিহত হন, আপনিও সেখানে দেহ রেখেছিলেন। এখন বুঝছি, জাদুবিদ্যা প্রয়োগে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।'

'শিবিকায় কাদের এনেছেন?'

'বার করো কয়েদীদের।'

প্রধান পুরুতের হুকুম শুনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আবি, কাকু আর মেরিত্রাকে শিবিকা থেকে বার করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল রাণীর সামনে।

'কেন এনেছেন এদের আমার সামনে? এরাই তো হত্যা করেছে ফারাওকে, অপরিসীম লাঞ্ছনার কারণ হয়েছে আমার।'

'ভিক্ষুকবেশী দেবদূতের আদেশে,' জবাব দিল প্রধান পুরুৎ। 'এখন বুঝছি দেবপ্রতিম ফারাও-হত্যার বিচারের জন্যেই এদের এখানে আনতে বলা হয়েছে আমাদের।'

'তাই নাকি?' চিৎকার করে বললে আবি। 'স্ত্রী কখনো স্বামীর বিচার করতে পারে?'

কঠিনকণ্ঠে তুয়া বললে—'আমি কোনো দিনই স্ত্রী হইনি আপনার। ফারাওয়ের মৃত্যুর পর থেকে আর দেখিনি আপনাকে—বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না। শুনুন সবাই, শুনুন সেই আশ্চর্য কাহিনী। জন্ম মুহূর্তে আমার দেবপিতা আমেন বিপদে আপদে আমাকে আগলে রাখার জন্যে আমার সত্তার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছিলেন একটি কা-কে। বিপদ যখন এল, তখন আমার এই ধাই-মা আমার গর্ভধারিনীর কাছে শেখা মন্ত্রপাঠ করে কা-কে বার করে নিয়ে আসেন আমার ভেতর থেকে—আমার জায়গায় তাকে পাঠান—আবি বিয়ে করেছে তাকেই—এমন বউ পেয়েছে যা কোনো স্বামী কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। আমেন কিন্তু আমাকে আর আন্তিকে রা-য়ের তরণীতে চাপিয়ে বার করে আনেন মেমফিস থেকে এবং অনেক বাধা বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে দেন নাপাতা শহরে—যেখানে দেখা পাই আমার এমন এক অনুগত সেবকের

যাকে আমি—ভালবাসি।' বলে রাশিদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল তুয়া।

'ইতিমধ্যে যে কাজের জন্যে পাঠানো হয়েছিল আমার কা-কে, সে কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে আমার সেই রাণীরূপিনী একাধারে সুশাসনে রাখল মিশরকে এবং তিল তিল করে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গেল আমিকে। কিন্তু গতরাতে সে ফিরে এসেছে আমার মধ্যে। আর তাকে কেউ দেখতে পাবে না—আবার সে জাগবে আমার মৃত্যুর পর কবরের মধ্যে। এবার বিচার করে দেখুন আশ্চর্য এই কাহিনী সত্য কিনা। বাচাই করে নিন আমিই সেই আমেন-কন্যা নেতার-তুয়া কিনা।'

বলে কণ্ঠদেশ অনাবৃত করে বুকের ঠিক ওপরেই পবিত্র প্রতীক মেলে ধরল তুয়া।

বললে—'প্রধান পুরুৎমশায় চেনেন এই চিহ্ন, আমার জন্মের সময়ে দেখেছিলেন উনি।'

এগিয়ে এলেন প্রবীণ পুরোহিত। নিরীক্ষণ করলেন জরুল চিহ্ন।

বললেন—'হ্যাঁ, এই সেই দাগ। ইনিই আমাদের ভোরের তারা—অন্য কেউ নন। তা সত্ত্বেও স্বীকার করছি, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। আমি, আপনি খুলে বলবেন?'

আমি এগিয়ে এসে বললেন তাঁর কাহিনী—কিচ্ছু বাদ দিলেন না। তারপর বলল রাশিদ, তার সঙ্গে জুড়ে দিল যৎসামান্য। কাহিনী শেষ হল যখন, সূর্য তখন মাথার ওপর। তবুও কাউকে ক্লান্ত মনে হল না। নেতিয়ে পড়েছিল কেবল আমি, কাকু আর মেরিত্রা। প্রত্যেকটা শব্দ মারণ মুগুর হয়ে আঘাত হানছিল প্রাণপাখীর ওপর।

অনেকক্ষণ পর সবার কাহিনী শেষ হলে নৈঃশব্দ্য নেমে এল ঘরে। এতক্ষণ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল প্রধান পুরোহিত। এবার স্বর্গ অভিমুখে মুখ তুলে বললে উদাত্ত কণ্ঠে:

'হে আমেন, রাণীর দেবপিতা, বলুন এবার আপনার কি অভিপ্রায়, আদেশ করুন।'

কিছুক্ষণ সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা বিরাজ করল ঘরে। তারপর বেদীর পেছনে যেখানে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠ, যেখানে স্থাপিত দেবপিতা আমেনের বিগ্রহ, সহসা ঠুক-ঠুক-ঠুক-ঠুক ঠুক আওয়াজ শোনা গেল সেখানে। যেন গ্র্যানাইট পাথরের মেঝেতে লাঠি ঠুকে ঠুকে কে এগিয়ে আসছে। তারপরেই দু-পাশে সরে গেল পবিত্র মঞ্চের পর্দা। ফাঁকে আবির্ভূত হল এক অতি-বৃদ্ধ—তার পরনে শতচ্ছিন্ন ভিক্ষুকবেশ, হাতে কণ্টক-যষ্টি, গালে হাঁটু পর্যন্ত

লুটোনো সাদা দাড়ি, দু-চোখে পাথুরে চাহনি। এই সেই বৃদ্ধ যে মরুপ্রান্তরে তুয়া আর আভির কাছে খাবার চেয়ে খেয়েছিল, এই সেই বৃদ্ধ যে মরু রাজার প্রাসাদ থেকে তাদের উদ্ধার করেছিল, এই সেই বৃদ্ধ যে গত রাতে আবির শিবিরে শিবিরে ঘুরে বার্তাবাহকের কাজ করেছিল।

সেই বৃদ্ধই এখন বললে ভরাট গম্ভীর গলায়—'সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ যাকে কেফার নামে ডেকে এসেছে, আমিই সেই বার্তাবাহক। আমি মরুপ্রান্তরের বাসিন্দা—যাকে চিনত তোমাদের পিতৃগণ, চিনবে তোমাদের সন্তানগণ। আমি দান ভিক্ষা করে নিই, বিনিময়ে দিই জীবন আর মৃত্যু। আমিই লিপিকার টথ-এর লেখনী, অসিরিসের চাবুক। আমিই দেবাদিদেব আমেনের কণ্ঠ। মিশরের মানুষ, শোনো—অকারণে বা সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এত কাণ্ডের অবতারণা হয়নি। স্বর্গের পরিকল্পনা আছে সব কিছুর মধ্যে—বিচার আছে মর্ত্যে, আছে দণ্ডবিধান। এই মহাসভাই তোমাদের শেখানোর দরকার ছিল। দেবপ্রতিম ফারাওকে জানোয়ারের মত হত্যা করেছে তারই ভাই আবি—যাকে সে বিশ্বাস করেছিল অন্তর দিয়ে। ফারাও-কন্যা এবং আমেন-দুহিতা নেতার-তুয়াকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল চরম অবমাননা এবং লাঞ্ছনার মধ্যে। রাজবংশীয় রামিসকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল দূরদেশের বিপদ আর মৃত্যুর মুখে। স্বর্গীয় এই পরিকল্পনার অন্তে রয়েছে এই দুই আত্মার মিলন—নেতার-তুয়া আর রামিসের শুভবিবাহ। উত্তরাধিকার সূত্রে বিয়ে হোক এদের—শান্তি আসুক মিশরে। কিন্তু হত্যাকারী আর জাদুকরদের—'বলে যষ্টি সংকেতে দেখালো আবি, কাকু আর মেরিত্রাকে—'রেখে দেওয়া হোক আমেনের পাদমূলে—তাদের প্রাপ্য তিনি পাঠাবেন।'

বলে অন্তর্হিত হল বার্তাবহ কেফার। সেই প্রজন্মে তাকে আর কেউ দেখেনি।

আবি, কাকু আর মেরিত্রার বন্ধন কেটে নিক্ষেপ করা হল অন্ধকার আমেন-প্রকোষ্ঠে—দেবতার শিলামূর্তির পায়ের তলায়। বন্ধ করে দেওয়া হল সুদৃঢ় দরজা। কর্ণপাত করা হল না কান্নাকাটি, কাকুতি, মিনতিতে। বিবাহ-বন্ধনে হাত মিলিয়ে দেওয়া হল নেতার তুয়া আর রামিসের।

বিয়ের পর সোনার রথে চেপে ফারাও আর মহারাণী গেল উত্তরের থিবসে নাগরিক সম্বর্ধনায়। ফিরে এল রাত্রে। বিবাহ ভোজউৎসবে পাশাপাশি বসল দুজনে। আবার হাতীর দাঁতের আর সোনার তারের বীণা তুলে নিয়ে সুমধুর প্রাচীন সঙ্গীত গেয়ে অভ্যাগতদের বিমুগ্ধ করল তুয়ারাণী।

পরম সুখে সাম্রাজ্যশাসন করেছিল এই. দুজন। অমরধামে লেখা আছে সেই কাহিনী। সে আজ অনেক হাজার বছর আগের কথা।

ভোরবেলা কিন্তু সাহসে বুক বেঁধে আমেনের পবিত্র মন্দির কক্ষের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিয়েছিলেন আন্তি। দেখেছিলেন একটা ভয়াবহ দৃশ্য। বিগ্রহের পায়ের তলায় পড়েছিল ভ্রাতৃঘাতক আবি, জাদুকর কাকু আর বিশ্বাসঘাতিনী মেরিত্রার নিষ্প্রাণ দেহ। হয় নিজেরাই নিজেদের অথবা পরস্পরকে হত্যা করেছে তিনজনে। পাথুরে চোখ মেলে দেবতা তাকিয়েছিলেন দেহ তিনটির দিকে। □



শী

এইচ রাইডার হ্যাগার্ড

(১) দর্শনার্থী

আজ থেকে প্রায় বাইশ বছর আগের কথা। এই একই মাসে অঙ্ক কষছিলাম কেম্ব্রিজে আমার ঘরে।

আমার নাম লাডউইগ হোরেস হোল্লি।

কি অঙ্ক কষছিলাম অতশত মনে নেই। ফেলোশিপ পরীক্ষা দিন সাতেক পরেই। গণিতচর্চায় ডুবেছিলাম সেই কারণেই।

কলেজের প্রত্যেকের এমন কি মাস্টার মশায়দেরও বড় ইচ্ছে, পরীক্ষায় যেন রেজাল্ট ভালো করি। তাই লেগেছিলাম আদা জল খেয়ে। একটানা বেশ কিছুক্ষণ মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করার পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বইপত্তর সরিয়ে রাখলাম। ম্যান্টলপিসের সামনে গেলাম। ধূমপানের পাইপে তামাক ঠাসলাম।

মোমবাতি জ্বলছিল ম্যান্টলপিসে। লম্বাটে সরু আয়নাটা ছিল মোম-বাতির পেছনেই। শিখার আগুনে পাইপ ধরাতে গিয়ে আয়নায় দেখলাম নিজেকে।

শিকেয় উঠলো পাইপ ধরানো। তন্ময় হলাম নিজের চিন্তায়।

বেশীর ভাগ মানুষই বাইশ বছর বয়েসে দেখতে শুনতে ভালোই হয়। তারুণ্যের লাবণ্য থাকে চোখে মুখে। কিন্তু আমি তার ব্যতিক্রম। সুশ্রী আমি কোনমতেই নই। বেঁটে, ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা। বুকের খাঁচার গড়ন জঘন্য—দেখলেই বিকলাঙ্গ মনে হয়। হাত দুটো বেধড়ক লম্বা—দড়ির মতো পেশীতন্তুর ফলে কদাকার। চোখমুখ শানানো বা সূক্ষ্ম নয় মোটেই—ভোঁতা এবং ভারী। চোখের রঙ ধূসর এবং কোটরে ঢোকানো। কপালটা আরো যাচ্ছেতাই—চওড়া তো নয়ই, রীতিমত সরু, তার ওপর অর্ধেক ঢাকা ঘন কালো চুলে। দেখলেই হাসি পায়। ঠিক যেন নিবিড় জঙ্গল কিনারার দিকে একটু সাফ সুতরো করতে না করতেই আবার তেড়ে ফুঁড়ে এসে দখল করেছে নিজের জায়গা।

প্রায় সিকি শতাব্দী আগে এই ছিল আমার আহা মরি চেহারা। আজও প্রায় তাই আছে—সামান্যই পালটেছে। আমাকে অস্বাভাবিক কুৎসিত করে যিনি গড়েছেন, কৃপা করে তিনিই কিন্তু আমাকে দিয়েছেন অস্বাভাবিক দুটো শক্তি—দেহের এবং মগজের।

হ্যাঁ, দৈহিক শক্তি আমার প্রচণ্ড। সহিষ্ণুতা অবিশ্বাস্য। কলেজের বন্ধুদের বুক দশ হাত হ'ত তাই নিয়ে। কিন্তু কদাকার এই মূর্তিটার পাশে

হাঁটতে প্রবৃত্তি হত না।

ফলে, নির্বান্ধব ছিলাম আমি। একাই সব কাজ করতাম, একা-একাই আকাশপাতাল চিন্তা করতাম। নিঃসঙ্গ সব দিক দিয়েই। বাবা, মা, ভাই, বোন—কেউ নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীহীন অবয়ব দেখতে দেখতে যখন উৎকট আত্মপ্রসাদে মগ্ন হয়েছি, ঠিক তখনি শুনলাম দরজায় আঙুলের গাঁট ঠোকার খটখট শব্দ।

রাত তখন প্রায় বারোটা। এত রাতে কাউকে ঘরে ঢোকানোর ইচ্ছে ছিল না। কলেজে প্রাণের বন্ধু বলতে ছিল একজনই। শুধু কলেজ কেন বলি, সারা দুনিয়ার বন্ধু বলতে ঐ একজনই। কে জানে, হয়তো টোকা মারছে সে-ই।

এমন সময়ে তার কাশির আওয়াজ শুনলাম বাইরে। শুনেই চিনতে পারলাম। দৌড়ে গিয়ে খুলে দিলাম দরজা।

টলতে টলতে ঘরে ঢুকল বছর তিরিশেক বয়সের এক দীর্ঘকায় পুরুষ। অত্যন্ত সুদর্শন। এক হাতে ঝুলছে একটা পেল্লায় লোহার বাক্স। টেবিলে বাক্স রেখেই কাশতে কাশতে প্রাণ বেরিয়ে যায় আর কি। লাল হয়ে গেল মুখ, এলিয়ে পড়ল চেয়ারে এবং থুথুর সঙ্গে বেরিয়ে এল রক্ত। গেলাসে হুইস্কি ঢেলে তাড়াতাড়ি ধরলাম সামনে।

মিনিট কয়েক পরে ধাতস্থ হয়ে সে বললে খিটখিটে গলায়—'আশ্চর্য লোক তো তুমি! এই ঠাণ্ডায় বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলে কেন? কনকনে হাওয়ায় মেরে ফেলার জন্যে?'

'কি মুস্কিল! জানবো কি করে তুমি এসেছো রাত দুপুরে?'

'তা ঠিক। হোল্লি, এই হয়তো আমার শেষ আসা। কালকের সূর্য হয়তো আর দেখতে পাবো না,' মুখটা বীভৎস হয়ে উঠল ক্লিষ্ট, কাষ্ঠ হাসিতে।

বললাম—'বাজে বকছো। বসো ডাক্তার ডেকে আনি।'

'না। ডাক্তার ডাকার আর দরকার নেই। ডাক্তারী আমিও পড়েছি হোল্লি। আয়ু আমার ফুরিয়েছে, টেনে লম্বা করার ক্ষমতা কোনো ডাক্তারের নেই। স্রেফ কপালজোরে বেঁচে আছি পুরো একটা বছর। এবার শোনো যা বলি। বছর দুয়েক বন্ধুত্ব আমাদের। বলো তো কি জানো আমার সম্পর্কে?'

'ঢের টাকার মালিক তুমি। যে-বয়েসে সবাই কলেজ ছাড়ে, সেই বয়েসে তোমার সখ হয়েছে কলেজে পড়ার। বিয়ে একটা করেছিলে স্ত্রী

গত হয়েছেন। আর তো কিছু জানি না ভাই।'

'জানো না আমার একটা ছেলে আছে?'

'না তো।'

'বয়স তার পাঁচ বছর। তার মুখদর্শন করার প্রবৃত্তি হয় না। কেন জানো?'

'না।'

'স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী—তাই। যাকগে সে কথা, এই ছেলের একমাত্র অভিভাবক করে যেতে চাই তোমাকে। রাজী?'

লাফিয়ে উঠলাম চেয়ার ছেড়ে—'আমাকে?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই। হোল্লি, এই দুটো বছর নানাভাবে তোমাকে যাচাই করেছি। বেশ কিছুদিন ধরেই জানতাম, আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। খুঁজছিলাম এমন একজনকে যার হাতে সঁপে দিয়ে যেতে পারি এই ছেলে, আর এই বাক্স। তাই হোল্লি, তুমিই সেই একজন। শুকনো শক্ত মজবুত গাছের মতোই তোমার বাইরে থেকে ভেতর পর্যন্ত শুকনো শক্ত মজবুত। পৃথিবীতে যে-কটা প্রাচীনতম পরিবার আছে, আমার এই ছেলে তার একটার প্রতিনিধি। জানি তুমি হাসবে, তাহলেও বলি। আমার পঁয়ষট্টিতম অথবা ছেষট্টিতম পূর্বপুরুষ ছিলেন মিশরের আইসিস-য়ের পুরুৎঠাকুর। ধমনীতে ছিল কিন্তু গ্রীক রক্ত। নাম, কাল্লিক্রেট্‌স্‌। মেন্‌ডেসিয়ান ফারাওদের উনত্রিশতম রাজবংশে হাক-হোর নামে যে ফারাও ছিলেন, তাঁর সেনাদলে ছিল একদল মাইনে করা গ্রীক সৈনিক। কাল্লিক্রেট্‌স্‌-য়ের বাবা ছিলেন তাদের একজন। হেরোডোটাস যে কাল্লিক্রেট্‌স্‌ য়ের উল্লেখ করেছেন, তিনি ছিলেন আইসিস-য়ের এই পুরুৎঠাকুরের পিতামহ অথবা প্রপিতামহ। মিশরের পুরুৎঠাকুরদের শপথ করতে হত, সারা জীবন বিয়ে করবে না। কাল্লিক্রেট্‌স্‌ কিন্তু শপথ-ভঙ্গ করেছিলেন। খৃষ্টজন্মের ৩৩৯ বছর আগে যখন ফারাওদের চূড়ান্ত পতন ঘটে, সেই সময়ে আমার পূর্বপুরুষ এই পুরুৎঠাকুর এক রাজকুমারীকে নিয়ে পালিয়ে যান মিশর ছেড়ে। বিয়েও করেন। কিন্তু পালিয়ে বেশীদূর যেতে পারেন নি। আফ্রিকার উপকূলে ডেলাগোয়া উপসাগরের কাছাকাছি জাহাজ ডুবে যায়। সঙ্গীরা সবাই মারা যায়। ওঁরা দুজন কেবল প্রাণে বেঁচে যান। প্রচণ্ড দুর্ভোগ সইবার পর দুজনেই ঠাঁই পান বর্বরদের এক দুর্দান্ত রাণীর আশ্রয়ে। অসাধারণ সুন্দরী এই রাণীর গায়ের রঙ সাদা। এই মুহূর্তে এর সম্বন্ধে বেশী বলতে পারছি না। যদি বেঁচে থাকো, এই বাক্সর মধ্যেকার জিনিসপত্র থেকে সবই জানবে। পূর্বপুরুষ

কালিক্রেট্স্কে শেষপর্যন্ত কিন্তু খুন করে এই রাণী। কিভাবে জানি না, প্রাণ নিয়ে পালায় তাঁর স্ত্রী। এথেন্সে পৌঁছোনোর পর একটি ছেলে হয়। তার নাম দেওয়া হয় তিসিসথেন্স। ভয়ানক প্রতিহিংসা নিতে হবে বলেই এই নাম দেওয়া হয় ছেলেটির। নামের মানে তাই। পাঁচশ কি তারও বেশী বছর পরে তিসিসথেন্স পরিবার রোমে চলে আসে। কি পরিস্থিতিতে আসে, সে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নি। তবে প্রতিশোধ-কামনা জিইয়ে রাখার জন্যই তিসিসথেন্স নামটা টিকিয়ে রাখা হয় ফ্যামিলিতে—সেইসঙ্গে আসল নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় একটা বংশগত উপাধি—ভিনডেক্স। এ-উপাধির মানেও সেই এক—ভয়ানক প্রতিশোধ নিতেই হবে। পাঁচশরও বেশী বছর রোমে থাকার পর ৭৭০ খৃষ্টাব্দে তিসিসথেন্স-ভিনডেক্স ফ্যামিলি ঘর বাঁধে লোমবার্ডিতে। পরিবার-প্রধানের সঙ্গে সম্রাটের হৃদ্যতা সৃষ্টির পর আল্পস্ পেরিয়ে ফ্যামিলি চলে আসে বৃটানি তে। পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু হয় সেখানেই। আট পুরুষ পরে আসে ইংলণ্ডে। ক্ষমতা আর অর্থ—দুটোই আসে দখলে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমার সব পূর্বপুরুষদের নাম আমি জানি। ইংরেজদের দেশে পাকাপোক্তভাবে বসবাস করার ফলে পদবী পাল্টে যায়। ভিন্সি পদবীতেই এখন আমার পরিচয়। শুধু পদবীই পাল্টায়নি—সামাজিক প্রতিপত্তিতেও খাটো হয়ে যায়। তুঙ্গে কখনো পৌঁছোয় নি। কখনো হয়েছে সৈনিক, কখনো কারবারী। পারিবারিক সম্মান কিন্তু বজায় রেখেছে আগাগোড়া—মধ্যবিত্ত অবস্থাতেও। দ্বিতীয় চার্লস্-য়ের আমল থেকে আরম্ভ করে এই শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বাণিজ্যই করে গেছে। ১৭৯০তে আমার ঠাকুর্দা মদের কারখানা করে প্রচুর পয়সা কামিয়ে অবসর নেন। ১৮২১তে তাঁর মৃত্যুর পর আমার বাবা দু হাতে পয়সা ওড়াতে থাকেন। দশ বছর আগে বাবা মারা যাবার পর আমি যে সম্পত্তি পেলাম, তার আয় বছরে দু-হাজার পাউণ্ড। এই বাক্স সম্পর্কে অভিযান শুরু করি তখনি। বিষম বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে ভণ্ডুল হয় সেই অভিযান। ফিরে আসি দক্ষিণ ইউরোপের মধ্যে দিয়ে। এথেন্সে পৌঁছে বিয়ে করি। এক বছর পরে ছেলের জন্ম দিয়ে বউ বেচারী মারা যায়।'

ক্ষণিক বিরতি দিল ভিন্সি। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর বললে—'যে কাজ হাতে নিয়েছিলাম, বিয়ের ফলে তা থেকে সরে এসেছি। এর মধ্যে ঢোকা আর সম্ভব নয়। সময় আর নেই, হোলি, আর সময় নেই! একদিন সবই জানবে—যদি নাও আমার দেওয়া এই

দায়িত্বের বোঝা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার এই নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে দেখলাম প্রাচ্য দেশের কিছু ভাষা, বিশেষ করে আরব ভাষাটা আমার শেখা দরকার। পড়াশুনা করে শিখতেই এসেছিলাম এখানে। ছেলেকে আঁতুড়ে দেখেছি শেষবার—আর দেখিনি। দেখবার প্রবৃত্তিও নেই। তবে শুনেছি নাকি খুব চটপটে আর সুশ্রী। এই খামটার মধ্যে লিখে রেখেছি ছেলের শিক্ষা কি ধরনের হওয়া উচিত। শিক্ষাদীক্ষা একটু অদ্ভুত ধরনের হবে—খুঁটিয়ে লিখেছি। এ দায়িত্ব অচেনা অজানা কারোর হাতে দিতে রাজী নই। তুমি নেবে?'

পকেট থেকে একখানা খাম বার করে আমার হাতে দিল ডিজি। খামের ওপর লেখা আমার নাম।

বললাম—'আগে জানতে চাই দায়িত্বটা কি ধরনের।'

'ছেলেটার নাম লিও। পঁচিশ বছরে পা না দেওয়া পর্যন্ত, তার সঙ্গে তুমি থাকবে। স্কুলে রেখে দেবে না। পঁচিশ বছরের জন্মদিনে ফুরোবে তোমার অভিভাবকত্ব। ধরো এই চাবিটা—লোহার বাক্সটা খুলবে। ভেতরের কাগজপত্র ওকে দেখাবে। বলবে, অভিযানে বেরোতে ইচ্ছে আছে কিনা। আমার এক বছরের আয় এখন দু-হাজার দু-শ পাউণ্ড। লিও র অভিভাবক হলে তুমি পাবে অর্ধেক। এক হাজার তোমার—সারা জীবন পাবে। বাকী একশ লিও-র পড়াশুনোর পেছনে খরচ করবে। বাকী এগারশ পাউণ্ড জমতে থাকবে সুদে আসলে ছেলে পঁচিশ বছরে পা না দেওয়া পর্যন্ত। অভিযানে বেরোতে যদি ইচ্ছে যায়, টাকার অভাব ঘটবে না।'

'যদি তার আগে মারা যাই?'

'তাহলে চ্যান্সারীর ছাত্র হবে লিও—কপালে যা আছে ঘটবে। কিন্তু ইচ্ছাপত্রে লিখে যেও, লোহার বাক্স যেন ওর হাতেই যায়। হোলি, না বোলো না। লাভ তোমারও আছে। সংসার তোমাকে চায় না—জোর করে সবার সঙ্গে মিশতে গেলে ধাক্কা খাবেই। আর কয়েক হপ্তা পরেই কলেজের ফেলো হয়ে যাচ্ছো। তখন যে টাকা পাবে, সেই টাকার সঙ্গে আমার দেওয়া এই টাকা জুড়ে লেখাপড়া নিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারবে। মৃগয়া তোমার প্রিয় সখ—সে চর্চাও বজায় রাখবার সময় আর সুযোগ পাবে।'

উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে রইল ভিন্সি। দ্বিধায় পড়লাম। দায়িত্ব বড় বিচিত্র।

'হোলি, আমার মুখ চেয়ে রাজী হও। বন্ধুত্বে যখন খাদ নেই, আমারও বিকল্প ব্যবস্থা করার আর সময় নেই—অমত কোরো না।'

'বেশ, তাই হবে। তবে—' থামটা নেড়ে বললাম—'এর মধ্যে অমত করার মতো কিছু থাকলে কিন্তু রাজী হতে পারবো না।'

'সে রকম কিছুই নেই হোল্লি। কথা দাও, ঈশ্বরের নামে শপথ করো, আমার ছেলের বাবা হয়ে থাকবে, যা বললাম—তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে।'

'শপথ করলাম।'

'মনে রেখো, শপথ ভঙ্গ হলে হিসেব নিকেশের জন্যে কিন্তু ফিরে আসবো। মরে গেলেও আসবো। মৃত্যু বলে কিস্সু নেই। মৃত্যু নিছক একটা পরিবর্তন ছাড়া কিছু নয়। মরণের পরেও আমার জীবন থাকবে। তুমি নিজেও জানবে যথাসময়ে, বিশেষ পরিস্থিতিতে এই পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখা যায় অনির্দিষ্টকালের জন্যে,' বলতে বলতে আবার ভয়ংকর কাশির দমকে যেন পাঁজরা খুলে আসার উপক্রম হ'ল ভিন্সি-র।

'চললাম। বাক্স রইল। ছেলে যখন তোমার জিম্মায় আসবে, আমার ইষ্টিপত্রও কাগজপত্রের সঙ্গে আসবে। অর্থ পাবে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমার বিদেহী সত্তা তোমাকে রেহাই দেবে না।'

মোমবাতি তুলে ধরে আয়নায় নিজের মুখের দিকে চেয়ে রইল ভিন্সি। এককালে সৌন্দর্য ছিল এ-মুখে, ব্যাধিতে বারোটা বেজেছে।

বললে—'আর ক'ঘন্টা পরেই মরে কাঠ হয়ে যাবো। ভাবতেও অদ্ভুত লাগছে। যাত্রা শেষ হ'ল—খেলা কিন্তু শেষ হ'ল না।'

'ভিন্সি, কেন বাধা দিচ্ছো? ডাক্তার ডেকে আনি।'

'না। মরতে দাও। বিষ খেয়ে ইঁদুর যেমন একাই মরে—আমারও মৃত্যু হোক সেইভাবে।'

আটকাতে গিয়েও পারলাম না। ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসি ঝুলিয়ে বাইরে শুধু বলে গেল ভিন্সি—'মনে রেখো।'

শূন্য ঘরে একা বসে রইলাম। স্বপ্ন দেখলাম যেন। ভিন্সি কি সুরাপান করে এসেছিল? জানি, ওর শরীর ভাল নয়। কিন্তু রাত ভোর হবে না, এই প্রতীতি কিন্তু অসম্ভব বলেই মনে হল আমার কাছে। শরীর সে-রকম হলে নিশ্চয় ভারী লোহার বাক্সটা নিয়ে হেঁটে আসত না। গল্পটাও মনে হল একেবারেই অবিশ্বাস্য। আঁতুড়ে অবস্থায় দেখার পর পাঁচ বছর নিজের ছেলেকে না দেখে থাকা কারোর পক্ষে কি সম্ভব? না। এত নিশ্চিতভাবে নিজে মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করা কি কারো পক্ষে সম্ভব? না। খৃষ্টজন্মের তিনশ বছর আগে পর্যন্ত নিজের পূর্বপুরুষদের নামধাম এত সঠিক ভাবে বলা কি

সম্ভব? না। সম্ভব কি সম্পত্তির আধখানা কলেজ বন্ধুকে আচমকা দান করে যাওয়া? একমাত্র ছেলের অভিভাবক করে যাওয়া? না, না। কখনোই না। হয় মদ খেয়ে এসেছিল, নয় মাথা খারাপ হয়েছে বন্ধুর। তাই যদি হয়, উদ্দেশ্যটা কী? লোহার বাক্সের মধ্যেই বা আছেটা কী?

ভেবে কূল কিনারা পেলাম না। মাথা গরম হয়ে গেল। ঘুমিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করব বলে ঠিক করলাম।

মনে হয় যেন মিনিট কয়েক দু-চোখ বুঁজেছিলাম। ডাকাডাকিতে চোখ মেললাম। দিনের আলো দেখলাম। সকাল আটটা।

আমাকে আর ভিন্সি-কে দেখাশুনো করত যে লোকটি, নাম তার জন। আঁৎকে উঠলাম তার মুখের চেহারা দেখে।

'ব্যাপার কী? ভূত দেখে এলে নাকি?'

'বলতে পারেন। ভূত না হলেও, একটা মড়া দেখে এলাম। মিস্টার ভিন্সিকে ডাকতে গেছিলাম রোজ যেমন যাই। দেখলাম, তিনি মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছেন!'

(২) বছরের পর বছর যায়

ভিন্সির মৃত্যু কলেজে সাড়া ফেলেছিল। অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যেহেতু সবাই জানত শরীর ওর বরাবরই খারাপ, ডাক্তারের সার্টিফিকেটেও যখন সেই কথা বলা হল, তখন তদন্তের প্রশ্ন আর ওঠেনি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন লণ্ডন থেকে এসেছিল একজন আইনবিদ। ফিরে গেল ওর সব কাগজ-পত্র নিয়ে। লোহার বাক্সটা বাদে। সেটা রইল আমার জিম্মায়। আইন-বিদের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। শেষ কাজেও যোগ দিতে পারিনি। পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসে বসলাম নিজের ঘরে আর্ম চেয়ারে। মন খুব হাল্কা। জানি রেজাল্ট ভালই হবে।

পরীক্ষার চাপে ক'টা দিন আর কিছু ভাবতে পারিনি। ভিন্সির মৃত্যুর রাতের ঘটনা মন থেকে সরে গেছিল। এখন আবার তা মন জুড়ে বসল। কি করব ভেবে পেলাম না লোহার বাক্সটা নিয়ে।

এমন সময়ে টোকা পড়ল দরজায়। চিঠি এসেছে। একটা বিরাট নীল লেফাপা। নীল রঙের। আইনবিদের চিঠি।

'মহাশয়,—স্বর্গতঃ এম এল ভিন্সি আমাদের মক্কেল ছিলেন। ন'তারিখে উনি মারা যান। ওঁর উইলপত্রের একটা নকল এই সঙ্গে দিলাম। পড়লেই বুঝবেন, ওঁর সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক অংশে আপনার জীবন-স্বত্ব রয়েছে।

শর্ত একটাই। ওঁর পাঁচ বছরের পুত্র লিও-র দেখাশুনার ভার আপনাকে নিতে হবে। ইচ্ছাপত্রটি বড়ই বিচিত্র। ওঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে এই ইষ্টিপত্র রচনা করতে হয়েছে আমাদেরকেই। ওঁর বুদ্ধিমত্তাও উচ্চমানের। যা করেছেন, জ্ঞানতঃই করেছেন। নইলে শিশুপুত্রটির স্বার্থে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতাম। সুস্থ মস্তিষ্কে এ-রকম অসাধারণ শর্তাবলী কেউ শেষ ইচ্ছাপত্রে আরোপ করেন না। কিন্তু যেহেতু তাঁকে আমরা ভালভাবেই জানি, তাঁর মতো দূরদর্শী স্থিতধী ভদ্রলোক খুব কমই দেখেছি এবং যেহেতু ছেলের ভার নেওয়ার মতো তাঁর কোনো আত্মীয় নেই এই দুনিয়ায়, তাই তাঁর শেষ ইচ্ছাকে কার্যকর করতে এগিয়ে এসেছি।

'ছেলেটিকে এবং আপনার প্রাপ্য অর্থ কবে আপনার কাছে পৌঁছে দেব, সেই নির্দেশের প্রতীক্ষায় রইলাম।

'ভবদীয়,

"জিওফ্রে অ্যাণ্ড জর্ডান"

'শ্রীযুক্ত হোরেস এল হোল্লি।"

চিঠি রেখে উইলটা পড়লাম। আইনের সুকঠিন বিধি নিষেধের বেড়াজাল দেওয়া ভাষা পড়তে গিয়ে কালঘাম ছুটে গেল। অতিশয় দুর্বোধ্য। এইটুকু বুঝলাম, মৃত্যুর আগে ভিন্সি যা-যা বলেছিল আমাকে, ইষ্টিপত্রে তাই লেখা আছে। মনে পড়ল. ভিন্সি নিজেও একটা খাম দিয়ে গেছিল আমাকে। খুঁজে বার করলাম খামটা। পড়লাম ভেতরের নির্দেশ-পত্র। নতুন কিছুই নয়। ভিন্সি মুখে যা বলে গেছিল, চিঠিতেও তাই লিখেছে। লিওকে কি কি পড়াতে হবে, তার মোটামুটি ফিরিস্তি। গ্রীক ভাষা, উচ্চগণিত আর আরব ভাষা আছে ফর্দের মধ্যে। চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে. পঁচিশ বছরে পা দেওয়ার আগে যদি লিও মারা যায়, যদিও তা কখনোই ঘটবে না বলেই ভিন্সির বিশ্বাস, তাহলে যেন বাক্সটা আমি খুলে ফেলি। ভেতরে যা আছে তা দেখা এবং পড়ার পর বিবেক যা বলে, তাই যেন করি। যদি কিছুই না করার ইচ্ছে হয়, তাহলে বাক্সের ভেতরকার সব জিনিস যেন নষ্ট করে ফেলি। কোনোক্রমেই কোনো জিনিস অচেনা অজানা লোকের হাতে গিয়ে না পড়ে।

আপত্তিকর কিছুই নেই চিঠিতে। কাজেই 'জিওফ্রে অ্যাণ্ড জর্ডান' কে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম লিওর ভার নিতে আমি প্রস্তুত—তবে দশ দিন সময় দিতে হবে। চিঠি ডাকে ফেলে গেলাম কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে। ভিন্সির শেষ ইচ্ছা সম্পর্কে যে টুকু বলা দরকার, সেইটুকুই বললাম। ফেলোশিপ

আমি পাবোই, এ বিষয়ে আমার মতো কলেজ কর্তৃপক্ষও নিশ্চিত ছিলেন। সেক্ষেত্রে ছেলেটিকে আমার সঙ্গে থাকতে দিতে হবে, এই প্রার্থনা জানালাম। প্রার্থনা মঞ্জুর হল একটি শর্তে। কলেজের ঘর ছেড়ে দিতে হবে। ঘর পেয়ে গেলাম কলেজ ফটকের কাছেই। তারপর জোগাড় করলাম শিওকে দেখাশুনা করার জন্যে নার্স। মেয়ে নার্স নয়। শিও-র ভালোবাসা গোড়া থেকেই যেন পুরোপুরি আমি একা পাই, তাই জোগাড় করলাম একটি ছোক-রাকে। ভালো ঘরের ছেলে। চাকপানা মুখ। নাম, জব। শহরে গেলাম। লোহার বাক্সটা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখলাম। শিশু-পালনের খানকয়েক বই কিনলাম। জব-কে নিয়ে ফিরে এলাম ঘরে।

যথাসময়ে শিও-কে নিয়ে এল একজন বয়স্ক নার্স। ছেড়ে যাওয়ার সময়ে সেকী কান্না!

শিও-র মতো ফুটফুটে ছেলে কখনো দেখিনি। ঐটুকু বয়েসেই চোখ মুখ নিখুঁত। চোখ ধূসর, কপাল চওড়া, দামী পাথরের ওপর উঁচু করা খোদাই নকশার মতো অপরূপ মুখ। সবচেয়ে সুন্দর মাথার চুল। সোনার মতো উজ্জ্বল হলুদ। ঢেউ খেলানো। নার্স বিদায় নেওয়ার সময়ে কেঁদে কেটে অস্থির হলেও তারপরের দৃশ্যটা জীবনে ভুলব না। রোদ পড়েছে ঢেউ খেলানো সোনালী চুলে, চোখ মুছছে এক হাত দিয়ে। তারপরেই হঠাৎ দু-হাত বাড়িয়ে দৌড়ে এসেছিল আমার দিকে।

'বিচ্ছিরি দেখতে তোমাকে। তবুও তুমি ভালো, খু উ-উ-ব ভালো!'

আধো-আধো উচ্চারণের কথা ক'টি আজও জড়িয়ে আছে কানে।

দুদিনেই কলেজের প্রত্যেকের অন্তর জয় করেছিল শিও। যেখানে যাওয়া নিষেধ, যেত সেখানেও। অবাধ গতি হয়েছিল সর্বত্র।

বড় সুখে কেটে গেল একটার পর একটা বছর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীর হল দুজনের ভালবাসা। কোনো বাবা ছেলেকে এভাবে ভালবাসে না—কোনো ছেলেও বাবাকে এভাবে কাছে টেনে নেয় না।

শৈশব থেকে কৈশোর। কৈশোর থেকে যৌবনে পৌঁছোলো শিও। একই সঙ্গে বৃদ্ধি পেল দেহের আর মনের সৌন্দর্য। ওর বয়স যখন পনেরো, তখন কলেজে ওর নাম হয়েছিল বিউটি, আমাকে বলা হত বীস্ট। অর্থাৎ শিও সৌন্দর্য আর আমি কদর্য জানোয়ার। দুজনে পাশাপাশি বেড়াতে বেরোতাম রোজই। নামকরণ হয়েছিল তখনি। শিও আর একটু বড় হলে নতুন নাম দেওয়া হল দুজনের। ওকে দেখতে তখন গ্রীক দেবতা আপোলোর মতো। যেন খোদাই করা পাথরের মূর্তি। বয়স তখন মোটে একুশ। তার পাশে

আমার এই কদর্য মূর্তি। কাজেই ওর নাম হল গ্রীক দেবতা আর আমার নাম চ্যারন! গ্রীক উপকথার সেই কদাকার মাঝি যে মৃত্যুর পর আত্মাদের মুখে পয়সা গুঁজে দিয়ে নিয়ে যেত নরকে!

এত সুদর্শন হয়েও সৌন্দর্য সম্বন্ধে আত্মসচেতন ছিল না লিও কোনদিনই। মাথা পরিষ্কার, বুদ্ধি ধারালো, মন নির্মল—কিন্তু ছাত্র হিসাবে দারুণ কিছু নয়। ভিন্সির ইচ্ছা অনুযায়ী সবই শেখালাম। বেশী শিখল গ্রীক আর আরব ভাষা।

লিও আঠারোয় পড়তে ওকে ভর্তি করলাম আমারই কলেজে। একুশ বছরে স্নাতক হয়ে বেরুলো মোটামুটি ভালো ফল নিয়ে।

এতদিন কিছু বলিনি। ডিগ্রী অর্জন করার পর সেই প্রথম বললাম ওর বাবা মারা যাবার আগে কি-কি বলে গেছিল আমাকে। ভাবীকালে অনেক রহস্যভেদ করতে হবে—প্রস্তুত থাকে যেন।

কিন্তু পঁচিশ বছর বয়স না হলে তো লোহার বাক্স খোলা যাবে না। কাজেই প্রবল আগ্রহ চেপে রেখে আইন পড়া নিয়ে সময় কাটিয়ে গেল লিও।

তারপর এল পঁচিশতম জন্মদিন। ভয়াবহ ইতিহাসটা প্রকৃতপক্ষে শুরু হল সেইদিন থেকেই।

(৩) আমেনার্তাস-য়ের মৃন্ময় পাত্রের ভাঙা টুকরো

লিও র পঁচিশতম জন্ম দিবসের আগের দিন দুজনেই গেলাম লণ্ডনে। বিশ বছর আগে যে রহস্যময় লোহার বাক্স ব্যাঙ্কে জমা রেখেছিলাম, সেটা নিয়ে ফিরে এলাম কেম্ব্রিজের আস্তানায়।

ফিরলাম রাত্রে। উত্তেজনায় সে রজনী বিনিদ্র অবস্থায় কেটেছিল দুজনেরই। ভোর হতেই ড্রেসিংগাউন পরেই আমার ঘরে এল লিও। এখুনি খোলা হোক বাক্স। আমি বলেছিলাম, বিশ বছর যখন অপেক্ষা করা গেছে, প্রাতরাশ না খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে।

খাওয়া শেষ হল। টেবিল সাফ হল। জব লোহার বাক্স এনে রাখল টেবিলে। মুখটা নিম তেঁতো। বাক্সকে যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

চলে যাচ্ছিল জব। আমি ধরে রাখলাম। একজন সাক্ষী দরকার। জবের সামনেই খোলা হোক লোহার বাক্স।

দরজায় চাবি দিল জব। নিয়ে এল ভিন্সির দেওয়া চাবি তিনটে।

একটা প্রায় আধুনিক চাবি। সাইজে সবচেয়ে বড়। দ্বিতীয়টা অত্যন্ত প্রাচীন। তৃতীয়টার মত চাবি আমরা কেউই দেখিনি। রুপোর পাত। কিনারায় খাঁজকাটা। এক প্রান্তে হাতল।

হাত কাঁপছিল। বড় চাবিটা ফোকরে লাগাতে একটু সময় গেল। তারপর খুলে গেল তালা, ঝুঁকে পড়ল লিও। চাড় মেরে খুলল মরচে-ধরা ভারী ডালা। ভেতরে ধুলোজমা আর একটা পেটিকা। বার করে রাখলাম টেবিলে।

ধুলো ঝাড়বার পর মনে হল আবলুস কাঠের পেটিকা অথবা ঐ জাতীয় ছোটদানার কালো কাঠ। চ্যাপ্টা লোহার পাত দিয়ে বাঁধানো চারদিকেই। অতিশয় প্রাচীন পেটিকা। নানা জায়গায় কাঠ খসে পড়ছে বয়সের ভারে।

লাগালাম দ্বিতীয় চাবি।

রুদ্ধনিশ্বাসে নীরবে ঝুঁকে পড়ল লিও আর জব। ডালা খুলে ভেতরে দেখল ম অপূর্ব সুন্দর একটা রুপোর পেটিকা। চৌকোনা। লম্বা চওড়ায় বারো ইঞ্চি। উচ্চতা আট ইঞ্চি। মিশরীয় কারুকাজ নিশ্চয়। কেন না, পায়া চারটেতে স্ফিংক্স মূর্তি রয়েছে। গম্বুজের মত ডালাটাও ঘিরে রয়েছে একটা স্ফিংক্স মূর্তি। কালজীর্ণ পেটিকার নানা অংশ টোল খেয়েছে, ময়লায় হতশ্রী হয়েছে—তা সত্ত্বেও এখনো অটুট। অপরূপ কারুকাজ তারিফ করার মতো!

নীরবে রৌপ্য আধার বার করে রাখলাম টেবিলে। রুপোর চাবি লাগালাম ফোকরে। বার কয়েক এদিকে সেদিকে নাড়াচাড়া করার পর খুলে গেল তালা। ছিটকে উঠে গেল ডালা।

গাছপাতা জাতীয় কুচি দিয়ে ঠাসা কানায় কানায় বাদামী রঙের।

ইঞ্চি তিনেক জায়গা খালি করলাম এই কুচি তুলে এনে। পেলাম একটা আধুনিক লেফাপায় মোড়া চিঠি। ভিন্সির হাতে লেখা নাম আর নির্দেশ রয়েছে ওপরে :

'আমার ছেলে লিও যদি জীবিত থাকে এবং এই পেটিকা খোলবার সুযোগ পায়, তাহলে যেন এই চিঠি পড়ে।'

চিঠি দিলাম লিও'র হাতে। খামে চোখ বুলিয়ে নামিয়ে রাখল পাশে। ইসারায় বললে আমাকে পেটিকা খালি করে ফেলতে।

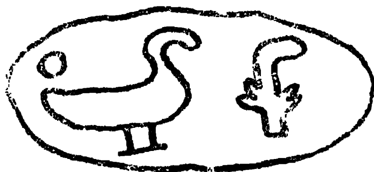
হাতে উঠে এল সযত্নে পাকানো একটা পার্চমেন্ট কাগজ। খুলে দেখলাম ভিন্সির লেখা রয়েছে তাতে। ওপরের শিরোনামা—'মৃৎপাত্রের ভাঙা টুকরোর গোটা-গোটা গোল-গোল প্রাচীন হরফে লেখা গ্রীক লিপির 'তর্জমা'

পার্চমেন্ট সরিয়ে রাখলাম থামের পাশে।

এরপর পেলাম আর একটা সুপ্রাচীন পার্চমেন্ট কাগজ—গোল করে পাকানো। কালজীর্ণ। হলদেটে। জায়গায় জায়গায় খসে পড়ছে। খুললাম। মূল গ্রীক লিপির তর্জমা—তবে ল্যাটিন ভাষায়। বাঁকা হরফে। মনে হল, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় অনূদিত। এর ঠিক নিচেই হাতে ঠেকল হলদে ন্যাকড়ায় মোড়া শক্ত, ভারী একটা জিনিস। রয়েছে গাছপাতার সেই পুরু স্তরের ওপর। সন্তর্পণে খুললাম ন্যাকড়া। পেলাম একটা সুপ্রাচীন মৃৎপাত্রের ভাঙা টুকরো। বেশ বড়। রঙটা নোংরা হলদে। প্রাচীন গ্রীকদেশের দু-হাতলওলা মৃৎপাত্র অ্যামফোরার ভাঙা টুকরো বলেই মনে হল। লম্বায় সাড়ে দশ ইঞ্চি, চওড়ায় সাত ইঞ্চি। সিকি ইঞ্চি পুরু। উত্তল বা স্ফাতোদর দিকটা ছিল বাক্সের তলার দিকে। এই দিকেই খুব গায়ে গায়ে ঠেসে সেকালের গোল-গোল বড়-বড় গ্রীক হরফে লেখা রয়েছে অনেক কিছু। পুরোনো রীতিতে নলখাগড়ার কলম দিয়ে লেখা অতি যত্নে। জায়গায় জায়গায় বিবর্ণ হয়ে এলেও বেশ পড়া যায়। সুদূর অতীতে টুকরোটা ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেছিল। সিমেন্ট জাতীয় কিছু দিয়ে জোড়া হয়েছে—আট জায়গায় লম্বা কীলক দিয়ে আঁটা হয়েছে। ভেতর দিকেও লেখা রয়েছে অনেক কিছু। কিন্তু তা বিভিন্ন হাতে, বিভিন্ন সময়ে জবরজং ভাবে লেখা।

উত্তেজনায় ফিসফিসানি স্বরে বলেছিল লিও—'আর কিছু আছে?'

হাতড়ে বার করলাম ন্যাকড়ার থলিতে সেলাই করা ছোট্ট শক্ত একটা জিনিস। হাতীর দাঁতে খোদাই করা একটা ছবি—অপরূপা একটা নারী-চিত্র। পেলাম আরও একটা বস্তু। গুবরে পোকার সাইজে কাটা একটা চকলেট রঙের রত্ন। ওপরে রয়েছে এই চিহ্ন:



প্রতীক চিহ্নটার অর্থ পরে যাচাই করেছিলাম। 'সুতেন সে রা'—তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'সূর্য অথবা রা-য়ের রাজপুত্র'। হাতীর দাঁতে আঁকা ক্ষুদে ছবিটা লিও-র গ্রীক মা য়ের। কৃষ্ণচক্ষু রূপসী। পেছনে ভিন্সি লিখে রেখেছে—'আমার প্রাণাধিকা স্ত্রী'।

বললাম—'আর কিছু নেই।'

হাতীর দাঁতের ছবির দিকে নির্নিমেষে চেয়েছিল লিও। নামিয়ে রেখে বললে—'তাহলে চিঠিখানা পড়া যাক।'

বলে, কোনো ভূমিকা না করে খাম ছিঁড়ে উচ্চকণ্ঠে পড়ে গেল অতীব আশ্চর্য সেই পত্র :

'লিও আমার ছেলে—যদি বেঁচে থাকো, বড় হয়ে এই চিঠি পড়তে বসবে। আমি তখন থাকবো লোকান্তরে। চিঠি পড়তে পড়তে কিন্তু মনে হবে আমার অস্তিত্ব রয়েছে তোমার ধারেকাছেই। মৃত্যুলোক থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি তোমার দিকে, কবরের নৈঃশব্দ্য ভেদ করে ভেসে আসছে আমার কণ্ঠস্বর। মারা গেছি ঠিকই, আমার স্মৃতিও তোমার মনে থাকার কথা নয়, তাহলেও এই চিঠি পড়ার মুহূর্তে আমি আছি তোমারই সঙ্গে। তোমার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত তোমার মুখ দর্শন করিনি বললেই চলে। ক্ষমা কোরো সে জন্যে। তোমার জন্ম এমন একজন মহিলাকে কেড়ে নিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে যাকে আমি এই দুনিয়ায় সবচেয়ে ভালবেসেছিলাম—সে বেদনা আজও যায়নি বুক থেকে। দেহের আর মনের এই কষ্ট আর সইতে পারছি না। তোমার ভবিষ্যতের সুব্যবস্থা সাঙ্গ করার পর অবসান ঘটাবো এই কষ্টের। পাপ যদি করি,ঈশ্বর যেন ক্ষমা করেন। বড় জোর বাঁচব আর একটা বছর।'

'এই ভয়টাই করেছিলাম। ভিন্সি আত্মহত্যা করেছে,' বিস্ময় ফেটে পড়েছিল আমার চিৎকারে।

জবাব না দিয়ে চিঠি পড়ে গেছিল লিও—'নিজের কথা যথেষ্ট হয়েছে, আর না। যা লিখব, তা শুধু তোমার জন্যে। আমার জন্যে নয়। আমি মারা গেছি অনেকদিন—লোকে ভুলেও গেছে আমার নাম। বন্ধুবর হোল্লির হাতে সঁপে দেব তোমাকে। তার কাছেই শুনবে তোমার অসাধারণ প্রাচীন কুলপঞ্জীর ইতিবৃত্ত। প্রমাণ পাবে এই বাক্সের মধ্যে। আমার বাবা মৃত্যু শয্যায় খাপরা ভাঙাটা তুলে দিয়ে গেছিলেন আমার হাতে। ভাঙা টুকরোয় তোমার পূর্বপুরুষ মহিলাটি যা লিখলেন, তা প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে গেছে আমার কল্পনাকে। এলিজাবেথের আমলে আমাদেরই এক পূর্বপুরুষ এই এই কাহিনী পড়ে অভিযানে বেরিয়ে অনেক দুর্ভোগ সয়েছিলেন। উনিশ বছর বয়সে আমিও স্থির করলাম অভিযান করবো—প্রাচীন রহস্যভেদ করবো। তারপর যা-যা ঘটেছিল, সব লিখতে পারবো না। নিজের চোখে যা দেখেছি, শুধু তাই লিখছি। মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরোটায় একটা

পাহাড়চূড়োর কথা লেখা আছে। দেখতে নিগ্রো-মুণ্ডুর মতো। আফ্রিকার উপকূলে এই পর্বত শিখর আমি দেখেছি। জায়গাটা আজও অনাবিষ্কৃত। জামবেসি যেখানে সমুদ্রে পড়েছে, তার একটু উত্তরে। জাহাজ থেকে সেখানে আমি নেমেছিলাম। আলাপ হয়েছিল একজন নিগ্রোর সঙ্গে। কুকর্মের জন্যে তাকে নির্বাসন দেওয়া হয় সেখানে। তার মুখেই শুনেছিলাম, গহন অঞ্চলে বিশাল বিশাল পাহাড় আছে। দেখতে কাপের মতো। আছে অনেক গুহা। সব কিছু ঘিরে রেখেছে ধু-ধু জলাভূমি। সেখানকার মানুষ আরব উপভাষায় কথা বলে। পরমা সুন্দরী এক শ্বেতাঙ্গনা তাদের রাণী। কদাচিৎ তাকে দেখা যায়। কিন্তু জীবন্ত এবং মৃত সব কিছুই নাকি তার বিচিত্র ক্ষমতার অধীন। যা শুনেছিলাম, তা যাচাই করেছিলাম। যাচাই করার দু-দিন পর নিগ্রোটি মারা যায়। জলাভূমি পেরোতে গিয়ে কালজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল। আমার নিজের শরীরও খারাপ হয়েছিল। খাবারদার ফুরিয়ে এসেছিল। তাই ফিরে এসেছিলাম জাহাজে।

'এরপর যে অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে গেছি, তা আর বলতে চাই না। ফেরার পথে গ্রীস দেশে আলাপ হয় তোমার মা-য়ের সঙ্গে। তোমার জন্মের পর সে মারা যায়। কালব্যাধি নিয়ে ফিরে আসি এখানে মরবার জন্যে। তবুও হাল ছাড়িনি। আরব ভাষা শিখেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, আফ্রিকার উপকূলে ফিরে যাবো। বহু শতাব্দী ধরে যে কিংবদন্তী সবাই শুনে এসেছে এই বংশে, সেই রহস্যভেদ করবো। শরীর কিন্তু খারাপের দিকেই গেছে। আমার গল্পও ফুরিয়ে এসেছে।

'কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তা শুরু হতে চলেছে। অনেক মেহনৎ করে যা জেনেছি, তা তোমার হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। সেইসঙ্গে দিচ্ছি কাহিনী-উৎসের বংশগত প্রমাণপঞ্জী। প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এইসব তথ্যপ্রমাণ তোমার হাতে দেওয়া হবে না—এই আমার ইচ্ছে। কেন না, পূর্ণবয়স্ক হলেই তোমার বিচারবুদ্ধির যথা প্রয়োগ করতে পারবে। কাহিনীটা এক মহিলার অসুস্থ মস্তিষ্কের প্রলাপ, না, সত্য—তা নিজে ভেবে ঠিক করতে পারবে। অভিযানে বেরোনো উচিত হবে কিনা, সে সিদ্ধান্তও নিজে নিতে পারবে। নিছক গালগল্প উপকথা মনে করলে মাথা ঘামিও না। যদি সত্য বলে প্রমাণ করতে পারো তাহলে জেনো পৃথিবীতে এর চাইতে বড় প্রহেলিকা আর নেই।

'আমি নিজে কিন্তু এই উপাখ্যানকে অলীক উপকথা বলে মনে করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পৃথিবীতে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে দুনিয়ার

মূল এবং অপরিহার্য শক্তিসমূহ দৃশ্যতঃ বিদ্যমান। জায়গাটার পুনরাবিষ্কার দরকার, তাহলেই এই আশ্চর্য তথ্য প্রমাণিত হবে। প্রাণের অস্তিত্ব আছে আমরা জানি। তাই যদি হয়, এই অস্তিত্বকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টিকিয়ে রাখা যাবে না কেন? নিশ্চয় সে পন্থাও আছে—এই পৃথিবীতেই আছে। আগে থেকেই তোমার মনে কোনো ধারণা ঢুকিয়ে দিতে চাই না। পড়বার পর নিজস্ব বিচারবুদ্ধি খাটাও। সন্ধানী-অভিযানে রওনা হওয়ার বাসনা থাকলে, অর্থের অভাব হবে না। সে ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। এই পৃথিবীকে প্রাণময় করে রেখেছে যে-সব বিপুল গুপ্ত শক্তি, তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে হয় তো রেহাই পাবে না। কিন্তু যদি সফল হও পরীক্ষায়, বেরিয়ে আসবে অক্ষয়-যৌবন আর অম্লান সৌন্দর্য নিয়ে—অনন্তকাল তা থাকবে, ক্ষয় নেই তার, ক্ষয় নেই। মহাকালকে হারিয়ে দেবে, অশুভ শক্তিরা পদানত হবে। জীব মাত্রই নশ্বর, দেহ-বুদ্ধির বিনাশ আছে। কিন্তু তুমি হবে অবিনশ্বর। চিরস্থায়ী হবে তোমার পঞ্চভূতের এই শরীর আর ধীশক্তি। ভয়ংকর সেই পরিবর্তন যে সুখাবহ হবে না, এমন কথা তখন কি কেউ বলতে পারবে? কি করবে, তা ভেবে ঠিক করো। যে শক্তির অধীন বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ, সেই শক্তিই চালিত করবে তোমাকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে। কতটুকু জানা দরকার আর কতটুকু এগোনো দরকার—তা বলে দেয় এই মহান শক্তি। শুধু নিজের সুখের জন্যে নয়, সারা বিশ্বকে সুখী করার জন্যে, সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বিশুদ্ধ শক্তি বলে বলীয়ান হয়ে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্যে—ভেবে ছাখো কোন্ পথ তোমার নেওয়া উচিত।—বিদায়!'

শেষ হয়ে গেল চিঠি অতর্কিতে। তলায় না আছে সই, না আছে তারিখ।

'কি বুঝলে হোল্লিকাকা?' প্রশ্ন করে লিও।

'বিশ বছর আগে টলতে টলতে যখন ঘরে এসেছিল তোমার বাবা, তখন যা বুঝেছিলাম—এখনো তাই বুঝছি। মাথা বিগড়েছিল ভিন্সির। তাই আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে। আবোলতাবোল লিখে গেছে চিঠিতে। রাবিশ!'

ভিন্সির হাতে লেখা অনুবাদটা তুলে নিল লিও।

বলল—'দেখাই যাক না, মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরোয় কি লেখা আছে।'

'আমার নাম আমেনার্তাস। মিশরের ফারাও রাজভবনের মেয়ে আমি। কাল্লিক্রেট্স্ আমার স্বামী। মহাশক্তিধর কাল্লিক্রেট্স্—আইসিস-এর পুরোহিত। দেবগণ যাঁর সহায়, অসুরগণ যাঁর পদানত। মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে

লিখে যাচ্ছি এই কাহিনী আমার শিশুপুত্র তিসিসথেন্স-কে। প্রচণ্ড প্রতিহিংসা নিতে হবে বলেই এই নাম দিয়েছি তোমাকে। তোমার বাবা শপথ নিয়েছিল জীবনে বিয়ে করবে না। শপথ ভেঙেছিল আমার জন্যে। তাকে নিয়ে পালিয়েছিলাম মিশর থেকে। তখন নেকটানেব্‌স্‌-য়ের রাজত্ব। রওনা হয়েছিলাম দক্ষিণ দিকে। লিবিয়া (আফ্রিকা) উপকূল বরাবর চব্বিশ চাঁদ সময় লেগেছিল সমুদ্রযাত্রায়। পৌঁছেছিলাম একটা নদীর পাশে। দেখে-ছিলাম একটা বিশাল পাহাড়। চূড়োটা এক ইথিওপিয়ানের মুণ্ডের মতো। নদীপথে চারদিন যাওয়ার পর জাহাজডুবি হয়। জলে ডুবে মারা যায় অনেকে, রোগে বাকী সবাই। জংলীরা ধরে নিয়ে গেছিল আমাদের গহন গভীরে। অনেক জলাভূমি পেরিয়ে দশদিন পর পৌঁছেছিলাম একটা ফোঁপরা পাহাড়ে। এককালে মস্ত শহর ছিল তার ভেতরে, এখন তা ভগ্নস্তূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু গুহা আছে সেখানে—কেউ জানে না সে-সব গুহার শেষ কোথায়। রাণীর সামনে নিয়ে গেছিল আমাদের। নতুন মানুষদের মাথায় পাত্র চাপিয়ে দেয় রাণীর প্রজারা। জাদুকরী রাণী। মহাজ্ঞানী। মৃত্যুঞ্জয়ী। চির রূপসী। তোমার বাবা কাল্লিক্রেট্‌স্‌কে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমাকে বধ করতে চেয়েছিল। রাজী হয়নি তোমার বাবা। অক্ষয়যৌবনা চিররূপসী অমর রাণী আমাদেরকে জাদুমন্ত্রে ভুলিয়ে অনেক ভয়ংকর গোলক ধাঁধার মতো পথের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায় বিশাল এক গহ্বরের ভেতরে। প্রাণ-স্তম্ভ পাক খেয়ে খেয়ে হুহুংকারে ছুটছে সেখানে। অনির্বাণ সেই প্রাণ-স্তম্ভর কণ্ঠস্বর বজ্রধ্বনির মতো। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাণী। অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিল আরো রূপসী হয়ে। বলেছিল তোমার বাবাকেও অমর করে দেবে—কিন্তু আমাকে বধ করতে হবে নিজের হাতে। রাণীর হাতে আমি অবধ্য। কেন না, আমিও জাদু-বিদ্যা জানি। সেইটাই আমার রক্ষাকবচ। তোমার বাবা দু-হাতে চোখ চাপা দিয়েছিল। রাণীর রূপ চোখ মেলে দেখতে চায়নি, আমাকেও বধ করতে চায় নি। রেগে গিয়ে জাদুশক্তি দিয়ে রাণী মেরে ফ্যালে তোমার বাবাকে। অনুতপ্ত হয়ে বিষম শোকে হাহাকার করতে থাকে। ভয় পেয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেয় নদীর মোহানায়। সেখান থেকে জাহাজে করে এথেন্সে পৌঁছোনোর পথে জাহাজেই ভূমিষ্ঠ হও তুমি। তিসিসথেন্স ,আমার পুত্র, আমার ইচ্ছে শোনো। খুঁজে বার করো সেই রাণীকে, বধ করো তাকে—শোধ নাও পিতৃহত্যার। নেমে ওঠো অগ্নিধারায়—শিখে নাও জীবনের গুপ্তরহস্য। যদি ভয় পাও—যেতে না পারো—তাহলে যেন তোমার বংশের একজন না একজন সাহসী

পুরুষ আমার ইচ্ছে পূরণ করে এবং অগ্নিকুণ্ডে স্নান করে উঠে ফারাওদের সিংহাসনে বসার যোগ্যতা অর্জন করে। জানি এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু জেনো, আমি যা দেখেছি, জেনেছি—তাই বললাম, মিথ্যা আমি বলি না।'

'আহারে, শান্তি হোক আত্মার!' বিড়বিড় করে বলেছিল জন লিও স্তব্ধ হতেই।

কিছু না বলে আমি মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরোটা তুলে নিয়ে গ্রীকভাষায় লেখা মূল লেখাটা পড়তে শুরু করেছিলাম। উদ্দেশ্য, ভিন্সির অনুবাদ যাচাই করা। মাথা খারাপ না হলে এমন উদ্ভট কাহিনী কেউ লেখে?

টুকরোটার উঁচু দিকের ওপরের অংশে রয়েছে প্রতীক চিহ্ন—উলটোবো অবস্থায়—ঠিক যেন মোমে চেপে ছাঁচ তোলা হয়েছে। ম্যাড়মেড়ে লাল রঙের ওপর এই ছাঁচটা পরবর্তী কালে কেউ বসিয়ে দিয়েছে কিনা ধরার উপায় নেই। প্রতীক চিহ্নটা কাল্লিক্রেটস্-য়ের স্ত্রীর রাজবংশের প্রতীক-চিহ্ন কিনা তাও বোঝার উপায় নেই। লাল রঙে লেখার তলায় রয়েছে একটা দু-ডানাওলা স্ফিংক্সের ছবি, পাশে পবিত্র ষাঁড় আর দেবগণের ছবি।

ডানদিকে আড়াআড়িভাবে লাল রঙে লেখা:

বিস্ময়কর বস্তু আছে
জল স্থল অন্তরীক্ষে।
হক ফেসিট
ডরোথি ভিন্সি

হতভম্ব হয়ে চোখ বুলিয়ে গেলাম লেখাগুলোর ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত। গ্রীক, ল্যাটিন এবং ইংরেজী ভাষায় ছোট ছোট হরফে এবং সইতে ঠাসা ঐটুকু জায়গা। সবার ওপরে প্রাচীন গ্রীক ভাষায় লিখেছে তিসিসথেন্স—'আমি যেতে পারলাম না। আমি, তিসিসথেন্স, লিখে গেলাম ছেলে কাল্লিক্রেটস্‌কে।'

প্রাচীন গ্রীকদেশে রেওয়াজ ছিল পূর্বপুরুষদের নামানুসারে বংশের উত্তরসূরীদের নামকরণ করা। তিসিসথেন্সও তার বাবার নামে নামকরণ করেছিল নিশ্চয় ছেলের কাল্লিক্রেটস নামধারী এই ছেলেও অস্পষ্ট দুর্বোধ্য হরফে লিখে গেছে—'আমিও মূলসূত্রি রাখলাম। দেবগণ যেন ক্ষমা করেন আমাকে। আমি, কাল্লিক্রেটস্ লিখে গেলাম আমার ছেলেকে।'

এর পরের লেখা খুব অস্পষ্ট। ভিন্সি নিজেও তর্জমা করতে পারেনি।

তারপরে আড়াআড়িভাবে স্পষ্ট অক্ষরে সই রয়েছে খুব সম্ভব লিও-র ঠাকুর্দার—জে বি ভি। এর তলায় অনেকগুলো প্রাচীন গ্রীক ছাঁদে সই। হেলা-ফেলা করে লেখা অনেক কিছু। একই কথার পুনরাবৃত্তি—'আমার ছেলেকে লিখে গেলাম।' নিষ্ঠার সঙ্গে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে হাত বদল হয়েছে ভাঙা টুকরোটা। তারপর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে একটা গ্রীক স্বাক্ষর—'রোমে, এ-ইউ-সি।' অর্থাৎ এই সময়ে রোমে চলে এসেছিল পরিবার।

এর নিচে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে রয়েছে গোটা বারো ল্যাটিন স্বাক্ষর। ছেলেদের উদ্দেশে যা লেখবার লিখে যেটুকু জায়গা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে ঠেসেঠুসে দেওয়া হয়েছে সইগুলো। তিনটে বাদে বাকী সইগুলোর শেষে 'ভিনডেক্স' শব্দটা রয়েছে। মানে, প্রতিহিংসা-পাগল। গ্রীক' 'তিসিসথেন্স' রূপান্তরিত হয়েছে 'ভিনডেক্স'-য়ে রোমে আসবার পর। সবশেষে 'ভিনডেক্স' দাঁড়িয়েছে 'ভ ভিন্সি' এবং আরও আধুনিক 'ভিন্সি'-তে।

রোমান নামগুলোর পর ফাঁক রয়েছে বেশ কয়েক শতাব্দীর। তমসাবৃত এই সময়ে ভাঙা টুকরো নিয়ে কি-কি ঘটে গেছিল, তা জানার উপায় নেই। ভিন্সি কিছু জেনেছিল। আমাকে বলেওছিল—কিভাবে তা বুঝলাম না। এর পরেই রক্ত বা লাল রঙের ওপর দুটো ক্রশ আঁকা, পাশে লাল আর নীল রঙে লেখা 'ডি-ভি'—নিশ্চয় ডরোথি ভিন্সির আদ্যাক্ষর। এর পাশে নীল রঙে লেখা 'এ-ভি', ১৮০০।

সবচেয়ে আশ্চর্য লিপির কথা এবার বলা যাক। লাল ক্রুশ অথবা ধর্ম-যোদ্ধাদের তরবারি চিহ্নর ওপর দিয়ে কালো হরফে অনেক কিছু লিখে তারিখ দেওয়া হয়েছে চোদ্দশ পঁয়তাল্লিশ। লেখক মধ্যযুগীয় ল্যাটিনবাসী। কৃষ্ণবর্ণ ল্যাটিন অক্ষরের ইংরেজী তর্জমা দেখে অবাক হলাম আরো বেশী। এ লেখাটা পেলাম পাকানো পার্চমেন্ট কাগজে। কালো হরফে লেখাটা কিন্তু ল্যাটিন লেখার চাইতে পুরোনো বলেই মনে হল।

কালো হরফের আধুনিক তর্জমা অত্যন্ত দুর্বোধ্য। তখন যা আধুনিক, এখন তা মান্ধাতার আমলের। দাঁত ফুটোনো যায় না। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

তারপরের লেখাটা ১৫৬৪ সালের—এলিজাবেথের আমলের। কে এক জন ভিন্সি লিখে গেছেন আফ্রিকার উপকূলে তাঁর বাবার জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে পর্তুগীজ কামানবাহী জাহাজ। অদ্ভুত ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন পিতৃদেব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের লেখাটা রয়েছে সবশেষে। লেখার

স্টাইল দেখেই সময়কাল আঁচ করে নিলাম। 'হ্যামলেট' থেকে একটা উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হয়েছে। স্বর্গে মর্ত্যে নাকি অনেক বিস্ময় আছে যা দর্শন বিচারেও কল্পনায় আসে না।

বাকী রইল একটাই প্রাচীন দলিল—কালো হরফে মধ্যযুগীয় ল্যাটিন ভাষায় লেখা মৃৎপাত্রের ভাঙা টুকরো থেকে দুর্বোধ্য গ্রীক লিপির অনুবাদ করেছেন আইনজ্ঞ এক ব্যক্তি—এডমণ্ড প্রাট।

সব দেখার পর লিওকে বললাম—'তোমার এই মিশর-রাজকুমারী পূর্ব-পুরুষের নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়েছিল স্বামীর মৃত্যুর পর। মাটির ভাঙা টুকরোটা অবশ্য আসল—নকল নয়। হাবিজাবি লিখে গেছেন টুকরোয়—খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে টুকরোটা হাতবদল হয়েছে পুরুষানুক্রমে।'

'বাবাও তো দেখেছে, শুনেছেও অনেক কিছু?' বললে লিও।

'স্রেফ কাকতালীয়। নিগ্রো মুণ্ডর মতো দেখতে পাহাড় চূড়ো থাকতে পারে আফ্রিকার উপকূলে, আরব উপভাষায় কথা বলতে পারে সেখানকার মানুষ। জলাভূমি থাকাও বিচিত্র নয়। বাকীটা তোমার বাবার কল্পনা। রোগে শোকে মাথা বিগড়েছিল, এমনিতে দারুণ কল্পনাপ্রবণ ছিল। এই রকম একটা প্রাচীন কাহিনী পড়ে তাই নিয়েই মেতেছে—সব সত্যি বলে মনে হয়েছে। পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত শক্তি থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু যা দেখিনি, তা মেনে নিতে আমি রাজী নই। মৃত্যুই এই জীবনের শেষ—মৃত্যুকে কলা দেখানো যায় না। আফ্রিকার জলাভূমির গহনে শ্বেতাঙ্গনা কোনো জাদুকরীও নেই। রাবিশ, স্রেফ মনগড়া কল্পনা! জব, তুমি কি বলো?'

'আমিও তাই বলি, স্যার। মিস্টার লিওর উচিত নয় এই বাজে ব্যারাপ নিয়ে মাথা ঘামানোর।'

শান্তস্বরে লিও বলে—'হয়তো তাই। কিন্তু আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব। একাই যাবো—যদি কেউ না যাও সঙ্গে।'

ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি, গোঁ চাপলে লিও-র মুখের চেহারা বিশেষ-ভাবে কঠিন হয়ে ওঠে। অবিকল সেই অবস্থা দেখলাম সেদিন ওর মুখাবয়বে। যাবেই—ফেরানো যাবে না। কিন্তু ওকে ছেড়ে থাকা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

'গড়ানে প্রাণ-স্তম্ভ না পাই, আশ মিটিয়ে শিকার করে আসতে তো পারবো। কিন্তু যাবোই যাবো,' বললে লিও।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম আমি—'তাহলে আমিও যাবো। অনেক

দিনের সাধ একটা ঘোর মারার। তোমার অভিযান নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও বাবা, আমি যাবো শিকার করতে।'

'টাকা?'

'দেদার আছে। তোমার বাবার টাকা তো রয়েছে, আমাকে যা দিয়ে গেছে, তার দুই তৃতীয়াংশ জমিয়ে রেখেছি তোমার জন্যেই।'

'চমৎকার। তব তুমিও চলো। দুনিয়াটা দেখে আসবে।'

'বিশ বছর আপনাদের সেবা করার পর একা-একা ছেড়ে দেওয়া কি যায়? আমি তো যাচ্ছিই।'

তিনমাস পর ভাসলাম সমুদ্রে—জানজিবার অভিমুখে।

(৪) প্রভঞ্জন

শিকার করার এমন মওকা কি ছাড়া যায়?—এই অছিলা নিয়ে রওনা হয়েছিলাম। মুখে কিন্তু মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরোয় লেখা আজগুবি কাহিনী নিয়ে হাসিঠাট্টা চালিয়ে গেছি সমানে। একথাও অবশ্য বলেছি, যা লেখা আছে, তা যদি সত্যি হয়ে দাঁড়ায় এবং আমার অথবা নিকট জনের কপালে কোনো অঘটন ঘটে, তাহলে ইষ্টিপত্র পালটাবো মাথা খারাপ হওয়ার অজুহাতে। নইলে, কেম্ব্রিজে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। টিটকিরির ঠেলায় টেঁকা দায় হবে।

যাই হোক, সমুদ্র যাত্রার মনোরম বর্ণনা দিয়ে শ্বাসরোধী এই উদ্ভট অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীকে টেনে লম্বা করতে চাই না। বিশেষ সেই রাতটার কথাই কেবল বলা যাক। কলেজের প্রিয় পরিবেশ ছেড়ে এসেছি, তাকভর্তি গাদা গাদা বইয়ের জন্যে মন কেমন করছে—তা সত্ত্বেও চন্দ্রালোকিত সমুদ্র-বক্ষের সেই অপরূপ শোভা মুগ্ধ করে তুলেছে মনকে। যেন বিশাল রুপোর চাদর ছড়ানো দিগন্ত পর্যন্ত—আফ্রিকার চাঁদ ঝকঝকিয়ে তুলছে সেই রজত-দরিয়াকে। রাত প্রায় বারোটা। জাহাজের প্রায় সবাই ঘুমিয়ে কাদা, হাল ধরে অলসভাবে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে চলেছে কেবল একজন আরব। নাম, মহম্মদ। গাঁট্টাগোট্টা মজবুত পুরুষ। মাইল তিনেক দূরে দেখা যাচ্ছে মধ্য আফ্রিকার পূব উপকূলের অস্পষ্ট রেখা।

পাশে বসে পাইপ টানছে লিও।

বললাম—'কাল দশটা নাগাদ দেখা যাবে সেই রহস্যময় পাহাড—যার চুড়োটা মানুষের মুণ্ডুর মতো। আমার মৃগয়া পর্বও শুরু হয়ে যাবে তক্ষুনি।'

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে হেসে ফেলল লিও—'সেই সঙ্গে শুরু হবে

শহরের ধ্বংসস্তূপ আর প্রাণ-অগ্নির অন্বেষণ।'

'ননসেন্স! মহম্মদের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল এই কদিন? আরব ভাষাটা ঝালিয়ে নিচ্ছিলে বুঝলাম। এছাড়াও কিছু কানে এল?'

'ভাঙা শহর, গুহা, মানুষ-পাহাড় জাতীয় কিছুই শোনেনি।'

'কি বলেছিলাম? যত্তো সব আজগুবী—'

'তবে জলাভূমি আছে বিস্তর। উপকূল বরাবর মাইলের পর মাইল। বিষধর সাপ, ময়াল সাপ কিলবিল করে সেখানে।'

'সেইসঙ্গে ম্যালেরিয়া। পাগল ছাড়া কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না ওখানে। চিন্তাটা আমাকে নিয়ে নয়। ভেবে মরছি তোমার জন্যে, জব-য়ের জন্যে। ইংলণ্ডে কবে ফিরব, তাই ভাবছি।'

'হোরেস কাকা, আমার কথা অত না ভাবলেও চলবে। ঝুঁকি যখন নিয়েছি, দেখাই যাক না জল কদ্দূর গড়ায়। মেঘটা কিসের?'

আকাশের কোণে এক ধ্যাবড়া কালো দাগ দেখে কপাল কুঁচকে গেল আমার। লিও কে পাঠালাম মহম্মদকে জিজ্ঞেস করে আসতে। মহম্মদ বলে পাঠালে, ভয়ের কিছু নেই। ঝড়ের মেঘ। তবে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

এই সময়ে বাদামী ফ্লানেলের শিকারী পোশাক পরে গটমট করে ডেকে উঠে এল জব।

উদ্দেশ্য তার মহৎ। স্কটল্যাণ্ডের ডানডি থেকে ফরমাস দিয়ে একটা তিমি নৌকো বানিয়ে এনেছিলাম এই জাহাজে। নদীপথে জাহাজ ঢুকবে না ক্যাপ্টেন আগেই বলেছিল। তাই খাড়ি, নালা দিয়ে যেতে সুবিধে হবে বলে বানিয়ে নিয়েছিলাম নৌকোটা। বাতাস ভর্তি বিশেষ কুঠরি ছিল নৌকোয়—জলে ডুববে না কিছুতেই। জল নিরোধক কুঠরির মধ্যে ছিল খাবার দাবার গুলিবারুদ। কিংবদন্তীর মানুষ-পাহাড় দেখলেই যাতে নৌকোয় চড়ে বেরিয়ে পড়তে পারি, সেইভাবে সারা সকাল খেটে নৌকো প্রস্তুত রাখাও হয়েছে। জব চিন্তায় পড়েছে সেইজন্যেই। মাঝি মাল্লাগুলো ছিঁচকে চোর। নৌকোয় শুয়ে রাত কাটাতে চায়। খাবার দাবার গুলি বারুদ তো সব নৌকোর ভেতরেই।

উত্তম প্রস্তাব। কম্বলের তো অভাব নেই নৌকোয়। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেই হল।

আলুর বস্তার মতো নৌকোর মধ্যে ঢুকে গেল জব।

ডেকে বসে রইলাম আমি আর লিও। ধূমপান এবং মাঝে মাঝে কথার

ফাঁকে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আঁৎকে উঠলাম বুক কাঁপানো ঝড়ের হুংকারে। কানে ভেসে এল মাল্লাদের আর্তনাদ। মুখের ওপর চাবুকের মতো সপাং করে আছড়ে পড়ল জল।

সেই হ'ল শুরু। বিস্তারিত বর্ণনা আর দেব না—মূল কাহিনীর সঙ্গে তার যোগসূত্র নেই বলে। কুচকুচে কালো আকাশের একদিকে আলোয় আলো হয়ে রয়েছে ঝকঝকে চন্দ্রকিরণে। সভয়ে দেখলাম প্রায় বিশ ফুট উঁচু একটা ঢেউয়ের মাথায় আলো পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে। পরমুহূর্তেই ঢেউ আছড়ে পড়ল জাহাজে—ছিটকে গেলাম আমি—মড় মড় করে ভেঙে গেল জাহাজের মাস্তুল।

পলকের মধ্যে দেখলাম অনেক উঁচু দিয়ে ঢেউয়ের মাথায় ভেসে যাচ্ছে আমাদের তিমি নৌকো।

বোধহয় সেকেণ্ডে কয়েক ডুবেছিলাম জলে—মনে হয়েছিল যেন হাবুডুবু খাচ্ছি মিনিটের পর মিনিট। তারপরেই আবার দেখলাম কালো আকাশ চাঁদ আর ঝকঝকে ঢেউ। দেখলাম, অনেক ওপর দিয়ে বায়ুতাড়িত পতাকার মতো পাল সমেত মাস্তুলটা উড়ে যাচ্ছে পত পত করে। একটা ঢেউ চলে গেছে—আসছে আর একটা ঢেউ।

পাশেই শুনলাম জব-য়ের চিৎকার। নৌকোর দড়ি ধরতে বলছে। প্রাণপণে কাছি আঁকড়ে ধরে নৌকো টেনে আনলাম কাছে, বাহু খামচে ধরে একটানে ভেতরে টেনে তুলল জব।

ফিরে তাকালাম। জলভর্তি মাস্তুলবিহীন জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কাছি বাঁধা এই নৌকোও যে ডুববে!

কিন্তু বাঁচিয়ে দিল মহম্মদ। বাঘের মতো লাফিয়ে এসে দড়ি কেটে দিল ছুরী দিয়ে—লাফিয়ে এসে উঠল নৌকোয়।

কিন্তু লিও কোথায়?

ঝড়ের হুহুংকারে ফিসফিসানির মতো শোনালো জব-য়ের চিৎকার—'ভেসে গেছেন! সাবধান! আবার ঢেউ আসছে।'

বলতে না বলতেই যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল নৌকোর ওপর। কিন্তু ভেতরে বাতাস ভর্তি কুঠরি থাকায় ডুবল না—ভেসে উঠল ঢেউ চলে যেতেই।

দেখলাম ডুবে যাচ্ছে জাহাজ। ভারী লোহার মতোই আঠারো জন সঙ্গীকে নিয়ে তলিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

আবার একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল নৌকোয়। পড়বার আগের মুহূর্তে

দেখেছিলাম, ঢেউয়ের মাথায় চাঁদের আলোয় কালো মতো একটা জিনিস। ঘাড়ে পড়ার আগেই হাত দিয়ে ঝটকান মেরে ফেলে দিতে গিয়ে হাতে ঠেকল একটা বাহু। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে খামচে ধরলাম কব্জি। অত্যন্ত বলবান পুরুষ আমি। কিন্তু আমারও হাত খুলে বেরিয়ে যাবে বলে হল অস্থিসন্ধি থেকে। আর দু-সেকেণ্ড ঐভাবে ধরে রাখতে হলে আমিও ভেসে যেতাম মারাত্মক সেই ঢেউয়ের টানে।

কিন্তু বেঁচে গেলাম। ঢেউ বেরিয়ে গেল বিপুল জলোচ্ছ্বাসের শব্দে কানে তালা ধরিয়ে দিয়ে। চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম যাকে ধরে আছি, তার মুখ।

লিও! হয় জ্ঞান হারিয়েছে, নয় মারা গেছে!

পাগলা ঝড়ের প্রতাপ তখন কমে এসেছে। আকাশ কালো করে ছুটে যাচ্ছে দূর হতে দূরে। কানে ভেসে এল ঢেউভাঙার বিপুল নির্ঘোষ। দূর থেকেই দেখতে পেলাম ম্লান চন্দ্রালোকে কিছুদূর অন্তর সাদা ঢেউ—একের পর এক ভেঙে পড়ছে উপকূলের কাছাকাছি গিয়ে।

মহম্মদ তুলে নিয়েছিল দাঁড়। হাত লাগালো জব। অতি কষ্টে পোঁছোলাম শান্ত জলে—ডাঙার কাছে। সমুদ্র তখন উত্তাল নারীবক্ষের মতোই ফুলে ফুলে উঠছে—তার বেশী কিছু নয়।

লিও ঘুমোচ্ছে।

ঘুমোক। একটু পরেই চাঁদ হারিয়ে গেল দিগন্তে। তারও কিছু পরে উষার অরুণাভা দেখা দিল পূবে।

আঠারোজনকে গ্রাস করে কালান্তক সমুদ্র রেহাই দিয়ে গেল আমাদের চারজনকে!

(৫) ইথিওপিয়ানের মুণ্ড

ঝড়-মৃত্যু-বিপদ-ধ্বংসের সব চিহ্ন মুছে দিয়ে সূর্য উঠল আকাশে। দুলন্ত নৌকোয় বসে একদৃষ্টে আমি চেয়ে রইলাম অদ্ভুত পাহাড়টার দিকে।

নৌকো ভাসছে বিশাল নদীর মোহানায়। ঝড়ের সময়ে বেগে জল ঢুকেছিল ভেতরে, এখন তা বেরিয়ে যাচ্ছে হুড়হুড় করে। অসংখ্য বালির চড়া ডুবে গেছিল রাত্রে—এখন তা একে-একে মাথা তুলছে জলের ওপর।

আমি কিন্তু নির্নিমেষে চেয়ে আছি অদ্ভুত পাহাড়টার দিকে। প্রায় আশি ফুট উঁচু পাহাড়, তলার দিকে দেড়শ ফুট। চুড়োর গড়ন অবিকল নিগ্রো-মুণ্ডর মতো। থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, মোটা হনু। বহু বছর ধরে ঝড় জলে

মাথাটাকে বেশ গোল করে এনেছে। গোল মাথায় গজিয়েছে শ্যাওলা আর আগাছা, দূর থেকে মনে হচ্ছে কুঁচকোনো চুল।

অতিকায় নিগ্রো-মস্তকই বটে! বীভৎস আকৃতি। পৈশাচিক মুখভাব। রক্ত হিম হয়ে যায়। গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।

মনের আনন্দে রোদ পোহাচ্ছিল জব। ডেকে দেখালাম।

সেই প্রথম শয়তান-সদৃশ মুণ্ডখানা দেখল জব। সঙ্গে সঙ্গে সে কী চিৎকার—'আরে গেল যা! পাহাড়ের বুকে ছবি আঁকানোর জন্যে বসে আছে নাকি!'

শুনে হো-হো করে হেসে উঠেছিলাম। ঘুম ভেঙে গেছিল লিও-র। চোখ রগড়ে উঠে বসে জানতে চেয়েছিল, ব্যাপারটা কী? জাহাজ কোথায়? গা-হাত-পা এত আড়ষ্ট কেন? একটু ব্র্যাণ্ডি হবে?

'একেবারেই আড়ষ্ট হয়ে যেতে, বাবা—স্রেফ কপাল জোরে বেঁচে গেছো। অলৌকিক কাণ্ডও বলা যায়।'

রাতের ঘটনা বলে গেলাম। কান খাড়া করে শুনল লিও। ইতিমধ্যে জল-নিরোধক কুঠরি থেকে ব্র্যাণ্ডি বার করে আনল জব। চার জনেই একটু করে খেয়ে অনেকটা চাঙা হলাম।

প্রস্তর-মুণ্ড দেখিয়ে লিও বললে—'কাকা, এবার কি মনে হয়? বাবার মাথা যদি খারাপই হয়ে থাকে, এটা এখানে কেন?'

তর্ক করতে ছাড়লাম না। ভিন্সি যা দেখেছে তাই লিখেছে। কিন্তু এইটাই যে সেই মুণ্ড, তার কি প্রমাণ আছে? মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরোয় লেখা বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে? যাক না। তাতে কি প্রমাণিত হয় উদ্ভট কাহিনীটা বর্ণে বর্ণে সত্যি?

গাম্ভীরি চালে হাসল লিও—'হোরেস কাকা, ইহুদীদের মতোই সব কিছুতে তোমার অবিশ্বাস। সত্যি কি মিথ্যে, তা বেঁচে থাকলেই যাচাই যাবে।'

'তা তো হবেই। আপাততঃ চলো নদীর ভেতরে নৌকো নিয়ে যাওয়া যাক; ডাঙায় নামা দরকার।'

স্রোত ঠেলে দাঁড় টেনে মহম্মদ আর জব নৌকো নিয়ে গেল মোহানার দিকে। কাজটা কঠিন। কিন্তু দিনের আলোয় এবং বিশেষ করে জল নেমে যাওয়ায় বিপদে পড়তে হল না। মিনিট কুড়ি পরে পৌঁছোলাম প্রায় আধ মাইল চওড়া মোহানার মুখে। দুপাড়ে জলাভূমির পর জলাভূমি। কাদায় পড়ে কুমীর—ঠিক যেন কাঠের গুঁড়ি। সামনেই মাইলখানেক দূরে এক

ফালি শক্ত জমি। মিনিট পনেরো পরে পৌঁছোলাম। নৌকো বাঁধলাম একটা ভারী সুন্দর গাছে। ম্যাগনোলিয়া জাতীয় গাছ। ফুলগুলো কিন্তু সাদা নয়—গোলাপী। পাতা বেশ চওড়া—ঝকঝকে সবুজ। নৌকো থেকে নেমে স্নান করলাম, জামাকাপড় ডাঙায় মেলে ধরে শুকিয়ে নিলাম। গাছের ছায়ায় বসে প্রাতরাশ খেলাম। কপাল ভালো, ঝড় ওঠার আগেই ভাঁড়ার বোঝাই করে নিয়েছিলাম—নইলে যে কি হত ঈশ্বর জানেন।

খাওয়াদাওয়া সেরে চোখ বুলোলাম চারপাশে। আমরা নেমেছি একটা লম্বাটে শক্ত জায়গায়। প্রায় দুশ গজ চওড়া, পাঁচশ গজ লম্বা। একপাশে নদীর জল—তিন পাশে ধু-ধু জলাভূমি। পাঁকজমি আর নদীর জল থেকে পঁচিশ ফুট উঁচু। দেখলেই মনে হয় যেন মানুষের হাতে গড়া।

লিও তো বলেই বসল—'এককালে জাহাজঘাটা ছিল।'

'ননসেন্স!' ঝটিতি জবাব দিয়েছিলাম আমি।' জংলীদের আস্তানায় ভয়াবহ এই জলাভূমির কিনারায় জাহাজঘাটা কেউ বানায়?'

'জলাভূমি এখন—আগে হয়তো ছিল না। মানুষজনও তখন জংলী ছিল না। ঐ জায়গাটা দেখলেই বুঝবে।'

হাত তুলে যেখানটা দেখালো, সেখানে একটা ম্যাগনোলিয়া গাছ শেকড়সমেত উপড়ে পড়েছে গত রাতের ঝড়ে। এক চাবড়া মাটিও উঠে এসেছে। ফাঁকে দেখা যাচ্ছে একটা লম্বাটে পাথর।

কাছে গেলাম। ছুরী দিয়ে আঁচড় কাটলাম। অত্যন্ত শক্ত। মানুষের কাজ নিঃসন্দেহে।

'ননসেন্স!' গোঁ ছাড়িনি এ-দৃশ্য দেখা সত্ত্বেও।

লিও তখন দেখিয়েছিল আংটাটা। মস্ত আংটা। পাথরের। ব্যাস প্রায় এক ফুট! ইঞ্চি তিনেক মোটা। লেগে রয়েছে পাথরের চাঁইয়ের এক পাশে।

বাদামী সিমেন্ট জাতীয় পলস্তারাও দেখলাম প্রস্তরখণ্ডে। পাথরে জোড়া হয়েছিল সিমেন্ট দিয়ে।

শিস্ দিয়ে উঠেছিলাম। জবাব দিতে পারিনি। জেটিই বটে—মানুষের হাতে গড়া। কিন্তু···

কানে ভেসে এসেছিল লিও-র উত্তেজিত কণ্ঠস্বর—'বড় জাহাজ বাঁধা হ'ত. তাই না হোরেস কাকা?'

'ননসেন্স,' বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছিলাম। ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদের সুরে বলেছিলাম, 'সম্ভাবনাটা যে একেবারেই আজগুবি, তা আর বলা যায় না।

কেন না, মিশরীয় সভ্যতার বয়স কত, কেউ তা জানে না। তাদেরই কোনো শাখা উপনিবেশের পত্তন করেছিল হয়তো সুদূর অতীতে। এ ছাড়াও তো আছে ব্যাবিলোনিয়ান, ফিনিসিয়ান আর পারসিয়ান মানুষ। মোটামুটি সভ্য ছিল প্রত্যেকেই। হয়তো বাণিজ্য কেন্দ্র খুলেছিল তাদেরই কেউ। হারানো সভ্যতার নিদর্শন রয়ে গেছে আজও। আফ্রিকার মতো মহাদেশে অসম্ভব কিছুই নয়।'

মুচকি হেসে লিও বলেছিল—'তাই বলো। একটু আগে কিন্তু অন্য সুর ছিল তোমার কথায়।'

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম তখুনি। এখন কি করণীয় তাই ভাবা দরকার। ধু-ধু জলাভূমির দিকে তাকিয়ে তো গা হিম হয়ে আসছে। রোদ্দুর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিষবাষ্প উঠছে ঘন মেঘের মতো। দিগন্তবিস্তৃত ঐ জলাভূমি পেরিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হয় ফিরে যেতে হবে সমুদ্রে, ভাঙা জাহাজের টুকরো টাকরা পেলে তাকেই সম্বল করে কপাল ঠুকে রওনা হতে হবে দেশের দিকে। নইলে নৌকো বেয়ে যাওয়া যেতে পারে নদীর ভেতরে।

শেষের প্রস্তাবটাই লুফে নিল লিও। শুনে গুঙিয়ে উঠেছিল জব, 'হে আল্লা' বলে কাতরে উঠেছিল মহম্মদ। আমি কিন্তু মনে মনে খুশিই হয়েছিলাম। নিগ্রো-মুণ্ড দেখে ইস্তক রোমাঞ্চকর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল লোমকূপে লোমকূপে—পাথরের জেটি দেখে তা তুঙ্গে পৌঁছেছিল। মুখে তা প্রকাশ না করলেও কাজে দেখিয়ে দিলাম। নৌকোয় মাস্তুল তুলে দিয়ে, রাইফেল বাগিয়ে, রওনা হলাম ভেতর দিকে।

হাওয়া অনুকূলে থাকায় ঘণ্টা তিন চার তর তর করে ভেসে গেল নৌকো। জব আর আমি দুজনেই একবার রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম হাঁকডাক করে একপাল জলহস্তী নৌকো ছেঁকে ধরায়। দেখলাম, শয়ে শয়ে কুমীর রোদ পোহাচ্ছে দুই তীরে, উড়ছে হাজার হাজার জলপক্ষী।

দুপুর নাগাদ বাড়লো রোদের তাত। জলাভূমির বিষবাষ্প কুণ্ডলী পাকিয়ে ভেসে এল নদীর ওপরেও। দুর্গন্ধে প্রাণ যায় আর কি। তাড়াতাড়ি মুখে পুরলাম কুইনাইন বড়ি—প্রতিষেধক মাত্রায়। আস্তে আস্তে পড়ে এল হাওয়া। দাঁড় টেনে টেনে হাত ব্যথা হয়ে যাবার পর বেদম হয়ে ঠাঁই নিলাম বেশ কয়েকটা উংলো গাছের ছায়ায়।

হরিণ শিকার করেছিলাম তখনি। বাহারি শিং নামিয়ে জলপান করতে এসে দেখতে পায়নি আমাদের গাছের ছায়ায় মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। দেখেই

শিকারের নেশায় হাত সুড়সুড় করে উঠেছিল লিও-র। এক্সপ্রেস রাইফেল তুলে দিয়েছিলাম ওর হাতে। আমিও তুলে ধরেছিলাম আমার রাইফেল। লিও-র গুলি কিন্তু ফসকে গিয়েছিল—তা সত্ত্বেও ছুটে গিয়েও পালাতে পারে নি হরিণ। আমার গুলিতে শিরদাঁড়া ভেঙে আছড়ে পড়েছিল মাটিতে।

নৌকো থেকে নেমে ছাল ছাড়িয়ে মাংস কেটে নিয়েছিলাম মিনিট পনেরোর মধ্যেই। তখন সূর্য ডুবছে। নৌকোয় উঠে গিয়েছিলাম কিছুদূরেই উপহ্রদের মতো বলয়াকার একটা দ্বীপ-সরোবরে। নৌকো পাড়ে রাখিনি—সরোবরের ভেতরে প্রায় তিরিশ ফ্যাদম দূরে নোঙর ফেলেছিলাম। জলাভূমির বিষবাষ্প থেকে, স্থলভূমির বুনো জন্তুর খপ্পর থেকে রেহাই পেতে হলে জলের ওপরেই থাকা ভালো।

লণ্ঠন জ্বালিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমোতে গিয়ে দেখলাম ঘুমোনো সম্ভব নয় মশার জ্বালায়। লাখে লাখে রক্তলোলুপ ছিনেজোঁক বিরাট মশা হুল ফুটিয়ে অস্থির করে তুলল চারদিক থেকে। ইয়ামোটা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসেও রেহাই নেই। কম্বল ফুঁড়ে চামড়ায় ফুটছে হুল। নিঃশব্দে সয়ে যাচ্ছি যন্ত্রণা, এমন সময়ে নৈঃশব্দ্য খান্‌ খান্‌ হয়ে গেল গুরুগম্ভীর গজরানিতে।

সিংহনাদ! প্রায় যাট গজ দূরে নলখাগড়ার বনের মধ্যে ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলছে দু জোড়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

'কি গো চাচা, ভাগ্যিস ডাঙা থেকে দূরে নোঙর ফেলেছিলাম,' কম্বলের বাইরে মুখ বাড়িয়ে বলেছিল লিও। মাঝে মাঝে ওর এই ধরনের সম্বোধন শুনতে হত আমাকে—হাড়পিত্তি জ্বলে যেত বিটলেমিতে।

এমন সময়ে কানের কাছে শুনলাম খটাখট আওয়াজ। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগেছে জব বেচারীর—'সি-সিংহ! স্যার! ইদিকেই আসছে!'

বাধ্য হয়ে তাকালাম সেদিকে। নৌকোর কাঁচা মাংসর গন্ধেই বোধ হয় পশুরাজদের আর তর সইছে না। জল ভেঙেই এগিয়ে আসছে।

কম্বল ফেলে তুলে নিলাম এক্সপ্রেস রাইফেল। দিলাম লিওকেও।

পনেরো ফুট দূরে জল ঝেড়ে বালির চড়ায় যেই মাথা তুলেছে একটা সিংহি, গুলি চালালো লিও। গুলি হাঁ-য়ের মধ্যে ঢুকে বেরিয়ে গেল ঘাড় ফুঁড়ে। দেহটা কাৎ হয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

ঠিক পেছনেই বিপত্নীক স্বামী দেবতা রুদ্ররোষে প্রচণ্ড গর্জনে কাঁপিয়ে তুলল নিস্তব্ধ রাত্রি।

অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটে গেল ঠিক সেই মুহূর্তে। ইংলণ্ডে দেখেছি ছোট

ছোট মাছকে পাইক মাছ এসে খাচ্ছে তীরের মত গতিবেগে। তার চাইতেও হাজার গুণ বিরাট আর হিংস্র একটা জীব প্রচণ্ড বেগে জল তোলপাড় করে ধেয়ে গেল পশুরাজের দিকে। পরক্ষণেই বিকট গর্জন ছেড়ে বালির চড়া ছেড়ে এক লাফে কাদাটে জমিতে গিয়ে পড়ল সিংহটা—দূর থেকেই দেখলাম কালো মতো কি যেন একটা হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভয়ানক ঝাপটানি দিতে দিতে।

'জয় আল্লা! কুমীর ধরেছে সিংহকে!' সেকী উল্লাস মহম্মদের।

অসাধারণ সেই দৃশ্য ভোলবার নয়। হাজার তর্জন গর্জন লাফ ঝাঁপেও কুমীরের কামড় থেকে মুক্তি না পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে খ্যাঁক করে বেচারীর একটা চোখ কামড়ে তুলে নিয়েছিল সিংহ। কামড একটু শিথিল হতেই দাঁত বসিয়েছিল কুমীরের গলায়। বিশাল সরীসৃপের বিকট চোয়ালও তৎক্ষণাৎ চেপে বসেছিল পশুরাজের ধড়খানার ঠিক মাঝখানে।

কিছুক্ষণ মরণান্তক আর্তনাদ, রক্ত জল করা গর্জন আর ভয়াবহ ঝটাপটির পর আগে নেতিয়ে পড়েছিল কিন্তু পশুরাজ। কামড় আলগা করে পরক্ষণেই উল্টে গিয়ে নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল জলের বিভীষিকা কুমীরটা।

পরে দেখেছিলাম, মরণ-কামড়ে সিংহকে প্রায় দু-টুকরো করে ছেড়েছে সরীসৃপ-সম্রাট—কুমীরেরও চোখ তুলে এনে তাকে চিরতরে অন্ধ করে দিয়েছে পশু-সম্রাট।

ফের নিথর হয়ে গেল অজ্ঞাত অঞ্চলের নিশীথ রাত্রি। মহম্মদকে পাহারায় বসিয়ে মশাদের উপদ্রব সয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম বাকী রাতটা।

(৬) সুপ্রাচীন খৃষ্টীয় রীতি

উপকূল থেকে প্রায় ১৩৫ থেকে ১৪০ মাইল আসার পর পঞ্চম দিনে যা ঘটল, তা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। সেদিন সকালে বেলা এগারোটা নাগাদ হাওয়া পড়ে গেল। টেনেটুনে কিছুদূর গিয়ে থামতে বাধ্য হলাম এমন একটা জায়গায় যেখানে মূল নদীতে এসে পড়েছে প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া একটা উপনদী। এই কদিন গাছগাছড়া বিশেষ দেখিনি—দেখলাম এই উপনদীর দুই তীরে। নৌকো ভেড়ালাম গাছের ছায়ায়। জিরিয়ে নিয়ে নামলাম ডাঙায়। জমি এখানে বেশ শুকনো। তাই তীর বরাবর কিছুটা হেঁটে গেছিলাম নতুন জায়গা দেখবার লোভে। শিকার পেলে বধ করবার মতলবও ছিল। কিছুদূর গিয়েই বুঝলাম জলপথে নৌকো নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। শ-দুই গজ দূরের জল খুবই অগভীর। কাদা-চড়া বেরিয়ে পড়েছে।

জলের গভীরতা খুব জোর ইঞ্চি ছয়েক।

ফিরে এলাম। মূল নদীর তীর ধরে কিছুদূর হেঁটে গেলাম। নানা চিহ্ন দেখে অচিরেই বুঝলাম, আদৌ এটা নদী নয়। খাল। সুপ্রাচীন খাল। সুদূর অতীতে মানুষের হাতে খোঁড়া হয়েছিল এই খাল। দু-পাড়ে উঁচু মৃত্তিকা-পথে রয়েছে তার নিদর্শন—গুণ টেনে নৌকো নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত। স্রোতের টান নেই বললেই চলে। ফলে, খালের জলে জন্মেছে বিবিধ জলজ উদ্ভিদ। তারই মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছে সঙ্কীর্ণ পরিষ্কার জল। জলপক্ষী, ইগুয়ানা এবং অন্যান্য পশুপক্ষীদের যাতায়াতের পথ।

নদীপথে যাওয়া তাহলে আর সম্ভব নয়। অন্য খাল ধরে রওনা হব, না, সমুদ্রে ফিরে যাব—এই নিয়ে শুরু হল জল্পনাকল্পনা। চুপচাপ বসে থাকাও তো যায় না। রোদের তাতে ঝলসে যাবো, মশায় খেয়ে ফেলবে—জ্বরে ধুঁকে জলাভূমিতে বেঘোরে মরতে হবে।

সবাই মিলে ঠিক করলাম জলপথেই এগোনো যাক। দেখাই যাক না কপালে কি আছে।

সূর্য যখন পশ্চিমে চলেছে, বাতাসও আর সহায় নয়, তখন দাঁড় টেনেই রওনা হওয়া গেল। ঘণ্টা খানেক অতি কষ্টে দাঁড় টানবার পর দেখা গেল আর যাওয়া যাচ্ছে না। জলজ উদ্ভিদে দাঁড় আটকে যাচ্ছে। তখন শুরু হল আদিমতম পন্থায় অভিযান। গুণ টেনে নৌকো নিয়ে যাওয়া হল অগভীর জলের ওপর দিয়ে। কালঘাম ছুটে গেল প্রত্যেকেরই। এক পাড়ে দড়ি টেনে নিয়ে গেল মহম্মদ আর জব। আরেক পাড়ে আমি একা। গায়ের জোরে আমি তো ওদের দুজনের সমান। গলুইতে বসে মহম্মদের তলোয়ার দিয়ে আগাছা কেটে সাফ করতে লাগল লিও। এইভাবে ঘণ্টা দুয়েক যাওয়ার পর ঘনিয়ে এল অন্ধকার। মাঝরাত পর্যন্ত মশক-দংশন উপভোগ করলাম। বিশ্রাম করলাম। তারপর ঠাণ্ডা হাওয়ায় আবার শুরু হল গুণ টানা। ভোরবেলা জিরিয়ে নিলাম ঘণ্টা তিনেক। তারপর নৌকা টেনে গেলাম বেলা দশটা পর্যন্ত। এরপরেই বজ্র বিদ্যুৎসহ এমন ঝড়জল আরম্ভ হল যে পরের ছ ঘণ্টা স্রেফ জলের তলায় কাটিয়ে দিলাম বললেই চলে।

এইভাবেই কষ্ট ভোগ চলেছিল পর-পর চারদিন। খুঁটিয়ে লিখতে আর চাই না। জীবনে এত মশার কামড়, এত রোদে পোড়া, এত গুরু পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়নি আমাকে। তৃতীয় দিনে জলভূমির ওপরকার বাষ্পের মধ্যে দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখা গেছিল একটা গোলমতো পাহাড়।

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যা নাগাদ যখন ফিরেন নিতে বসলাম, তখন মনে হল পাহাড় রয়েছে মাত্র পঁচিশ কি তিরিশ মাইল দূরে। অত্যন্ত ক্লান্ত তখন। হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে গুণ টেনে। আর এক গজও দড়ি টানবার ক্ষমতা নেই। শুয়ে পড়েছিলাম নির্জীবের মতো। ভয়াবহ এই জলাভূমির বিপুল বিস্তৃতির মধ্যে মৃত্যু হয় হোক—আর এক পা-ও যাওয়া সম্ভব নয়।

ঝিমিয়ে পড়ার মুহূর্তে কি-কি ভেবেছিলাম, তা আজও মনে আছে। মাস দু-তিন পরে ভাঙা নৌকো হাওয়ায় দুলবে পচা জলে। জলাভূমির দুর্গন্ধ-ময় বিষবাষ্প খেলে যাবে আমাদের এই ক-জনের হাড়ের মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতির গুপ্ত রহস্য খুঁজতে উপকথার নির্দেশ যারা আসবে, তাদেরও হবে সেই একই দশা।

চোখ খুলেই শিউরে উঠেছিলাম কুয়াশাচ্ছন্ন আঁধারের মধ্যে দুটো বিশাল জলন্ত চোখকে আমার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে। ধড়মড় করে উঠে বসে-ছিলাম। বিষম আতংকে পাগলের মতো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বার বার চেঁচিয়ে গেছিলাম। ঘুম ভেঙে গেছিল তিন সঙ্গীর। পরমুহূর্তেই আচম্বিতে ঝলসে উঠেছিল শীতল ইস্পাত—কণ্ঠদেশে চেপে বসেছিল একটা মস্ত বর্শা। আরও অনেক বর্শা রক্তলোলুপ ভঙ্গিমায় উদ্যত দেখেছিলাম তার পেছনে।

বজ্রধ্বনির মতো কানের পরদায় আছড়ে পড়েছিল বিচিত্র একটা ভাষা—যে-ভাষার মধ্যে আরব শব্দ রয়েছে প্রচুর, কিন্তু তা খাঁটি আরব নয়।

'শান্তি। জল সাঁতরে এসেছো তোমরা কারা?'

গলায় আরো চেপে বসেছিল ইস্পাতের ফলা। শিহরণ বয়ে গেছিল আপাদমস্তক।

জবাব দিয়েছিলাম খাঁটি আরব ভাষায়—'পর্যটক। হঠাৎ এসে পড়েছি।'

মানে বুঝল নিশ্চয় বর্শাধারী। পেছন ফিরে বললে—'পিতা, বলুন হত্যা করব কিনা।'

যাকে 'পিতা' সম্বোধনে সম্মানিত করা হল, দীর্ঘকায় ছায়ার মতো সে দাঁড়িয়েছিল বর্শাধারীর পেছনে।

কানে ভেসে এল তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর—'গায়ের রঙ কী?'

'সাদা।'

'বধ কোরো না। চার সূর্য আগে খবর পাঠিয়েছে 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ-মানতেই-হবে'—সাদা মানুষ আসছে। বধ কোরো না। নিয়ে চলো ওদের তাঁর ভবনে—সমস্ত জিনিসপত্র সমেত।'

হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে এবং তিন সঙ্গীকে

নৌকোর ভেতর থেকে।

তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম জনা পঞ্চাশেকের একটা দলকে। ক্ষীণ আলোয় দেখেছিলাম, পুরুষ প্রত্যেকেই। হাতে বিরাট বর্শা। মাথায় দৈর্ঘ্যে লম্বা। রীতিমত বলিষ্ঠ। গায়ের রঙ হাল্কা। কোমরে চিতা চর্মের কৌপিন ছাড়া গায়ে আর কিছু নেই।

লিও আর জবকে ঠেলে এনে ফেলা হয়েছিল আমার পাশে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে শুধিয়েছিল লিও অবাক গলায়—'ব্যাপার কী, কাকা?'

হট্টগোল শুনেছিলাম পেছনে। বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে ঠেলে আনা হচ্ছে মহম্মদকে। প্রাণের ভয়ে বেচারী আল্লা-কে ডাকছে।

'পিতা, এর গায়ের রঙ কালো। 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ-মানতেই-হবে' কি নির্দেশ দিয়েছেন এর সম্বন্ধে?'

'কিছু বলেন নি। কিন্তু বধ কোরো না। কাছে এসো, পুত্র।'

এগিয়ে গিয়েছিল বর্শাধারী। ঝুঁকে পড়ে কানে কানে ফিসফিস করে কি যেন বলেছিল দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি।

'ঠিক, ঠিক,' রক্ত জমানো হাসি হেসে সায় দিয়েছিল বর্শাধারী।

'সাদা মানুষ তিনজন আছে তো?'

'আছে।'

'নিয়ে চলো। ঐ যে জিনিসটা ভাসছে জলে, ওর ভেতরে থেকে তুলে নাও যা পাও।'

মুখের কথা খসতে না খসতেই তিনটে পাল্কী এসে গেছিল সামনে। ঘাড়ে করে বইছে চারজন—দুজন বাড়তি লোক রয়েছে পাশে। বুঝলাম এর মধ্যেই উঠতে হবে আমাদের।

লিও কিন্তু খুব খুশী। এত কষ্টের পর ঘাড়ে চেপে যাওয়ার মজা তো পাওয়া যাবে।

লিও আর জব দ্বিরুক্তি না করে যে যার পাল্কীতে উঠে বসতেই আমিও উঠলাম আমারটায়।

বসতে না বসতেই ঠিক যেন স্তোত্রপাঠ আরম্ভ হয়ে গেল একঘেয়ে সুরে। পাল্কী-বেহারাদের গান। গান গাইছে আর দুলে দুলে ছুটছে। কোথায় যাচ্ছি, কপালে কি আছে—সাত পাঁচ দুশ্চিন্তা নিয়ে কিছুক্ষণ খুব ভেবেছিলাম। তারপর বন্দনা সঙ্গীতের একঘেয়েমি আর একটানা দুলুনিতে ঘুম এসে গিয়েছিল।

মনে হয় একটানা ঘুমিয়েছিলাম সাত আট ঘন্টা। জাহাজডুবির পর

সেই প্রথম সত্যিকারের বিশ্রাম পেয়েছিলাম। চোখ খুলে দেখেছিলাম সূর্য মধ্যগগনে। পাল্কী ছুটছে ঘণ্টায় প্রায় চার মাইল বেগে। ফিন-ফিনে পর্দার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুব স্বস্তিবোধ করেছিলাম অন্তহীন জলাভূমি অঞ্চল পেরিয়ে এসেছি দেখে। চলেছি ঘাস-ছাওয়া প্রান্তরের ওপর দিয়ে একটা কাপ-আকৃতি পাহাড়ের দিকে। তাকিয়েছিলাম পাল্কী-বাহকদের দিকে। অপূর্ব গঠন। মাথায় ছ-ফুটের নিচে মাত্র জনাকয়েক। গায়ের রঙ হলদেটে। পূর্ব আফ্রিকার সোমালি-দের সঙ্গে আকৃতির সাদৃশ্য আছে—তফাৎ শুধু চুলে। কোঁকড়ানো নয়। গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুল। লুটোচ্ছে ঘাড়ের ওপর। মুখাকৃতি ঈগল চঞ্চুর মতো বক্রাগ্র, বহুক্ষেত্রেই অতীব সুশ্রী। দাঁত সমান, সাজানো এবং সুন্দর। সৌন্দর্য সত্ত্বেও খটকা লাগল তাদের প্রত্যেকের কুটিল মুখভাব দেখে। এমন ক্রূর আকৃতি কখনো দেখিনি। হিমশীতল নির্মমতা মাখানো সেই ভয়াল মুখচ্ছবি দেখলে অন্তর বিদ্রোহী হয়। কয়েকজনের মুখের পরতে পরতে এই নিষ্ঠুরতা এমনই উগ্রভাবে প্রকট যে অলৌকিক ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে হয়।

অদ্ভুত লেগেছিল আরো একটা ব্যাপার। হাসতে একেবারেই জানে না এরা। একঘেয়ে গান গাইছে তো গাইছেই। গান যখন বন্ধ, তখন একেবারে চুপ। ক্রূর, কুটিল, ভয়ানক মুখে হাসির রেশটুকুও দেখা যায় না। অথচ হাসির আলোয় ঐ মুখ কত ঝলমলেই না হয়ে উঠতো। কোন প্রজাতির মানুষ এরা? আরব নিশ্চয় নয়—ভাষাটা যদিও খাদ মিশোনো আরবভাষা। গায়ের রঙ বেশ গাঢ় অথবা হলদেটে। জানি না কেন নামহীন আতংকে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম ঐ মুখাবয়ব দেখে। শিহরিত অন্তরে যখন এইসব কথাই ভাবছি মনে মনে, এমন সময়ে আর একটা শিবিকা এল আমার শিবিকার পাশে। পর্দা সরানো থাকায় দেখতে পেলাম ভেতরে বসে রয়েছে ঢিলেঢালা মোটা কাপড়ের সাদা আলখাল্লা পরা এক বৃদ্ধ। দেখেই চিনেছিলাম। গত রাতের সেই দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি। 'পিতা' নামে ডাকা হয়েছিল একেই। অপূর্ব চেহারা বৃদ্ধের। তুষারশুভ্র দাড়ি লুটোচ্ছে শিবিকার মেঝেতে। বক্রনাসিকার ওপর ঝলসে উঠছে সাপের মতো শাণিত একজোড়া চক্ষু। প্রজ্ঞা এবং শ্লেষাত্মক কৌতুক হাসতে প্রোজ্জ্বল মুখভাব।

গুরু গুরু গম্ভীর গলায় জানতে চেয়েছিল বৃদ্ধ—'বিদেশী মানুষ, জেগে আছো কী?'

সৌজন্যবিনীত স্বরে জবাব দিয়েছিলাম—'হ্যাঁ, পিতা।'

'আগন্তুক পুত্র, যে দেশে তোমার জন্ম, সে দেশের সন্তানদের শিষ্টাচারটা

ভালোভাবেই শেখানো হয় দেখছি। বৎস, মৃত্যুভয় কি তোমাদের নেই? যে দেশের হদিশ কেউ রাখে না, সে অঞ্চলে এসেছো কেন? এসেছো কোন মুলুক থেকে?'

দৃঢ় স্বরে দিয়েছিলাম জবাবটা—'এসেছি নতুনের সন্ধানে, পুরোনোর মধ্যে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি বলেই পা বাড়িয়েছি অজানাকে আবিষ্কার করতে—সমুদ্র পথে। শ্রদ্ধেয় পিতা, মৃত্যুভয় আমাদের নেই, যে প্রজাতির মানুষ আমরা—তাদের কারোরই নেই। নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতেও তাই নির্ভয় আমরা।'

'বটে! কথাটা সত্যি। মধ্যে যদি মনে হত, তাহলে তোমাদের মৃতদেহ রেখে আসতাম কাদার ওপর। যাক সে কথা, 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ মানতেই-হবে' তোমাদের ব্যবস্থা করবেন নিজেই।'

সকৌতূহলে প্রশ্ন করেছিলাম—'কে এই 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ-মানতেই-হবে'?'

'বৎস আগন্তুক, খুব শীগগিরই তা জানবে। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, শরীরী কায়া নিয়ে দেখাও দেবেন।'

'শরীরী কায়া মানে? পিতা, বুঝিয়ে দেবেন কি বলতে চাইছেন?'

লোমহর্ষক হাসি জাগ্রত হল বৃদ্ধের কণ্ঠে—জবাবটা পেলাম না।

শুধোলাম—'পিতার প্রজাতির কি নাম জানতে পারি?'

'আমাহাগ্গার—পাথর দেশের মানুষ।'

'পুত্রের কৌতূহল ক্ষমা করবেন। পিতার নাম কি জানতে পারি?'

'বিল্লালি আমার নাম।'

'চলেছি কোথায়?'

'যথাসময়ে দেখতে পাবে,' শিবিকা থেমে গেল সামনে। পৌঁছোলো জব-রের শিবিকার সামনে। সে তখন এক পা বাইরে ঝুলিয়ে ঘুমোচ্ছে। বৃদ্ধের কৌতূহল মিটল ঐ দৃশ্য দেখেই। শিবিকা ছুটে গেল লিও-র শিবিকার পাশে।

এরপর নতুন কিছুই ঘটেনি। দোলায়েন ঢুলুনিতে ফের ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

নিদ্রাভঙ্গের পর দেখলাম এক মনোরম দৃশ্য। রোমক রঙ্গমঞ্চের মতো এক বিশাল সবুজ ক্ষেত্র। চার থেকে ছ-মাইল জায়গা জুড়ে যেন একটা প্রকাণ্ড কাপ। কাপের চারপাশ ঝোপঝাড়ে ঢাকা। কিন্তু মাঝখানে উজ্জ্বল সবুজ তৃণভূমি। বর্ণোজ্জ্বল শাখাপত্রে বিশালকায় মহীরুহ দাঁড়িয়ে

প্রায় সমান ব্যবধানে। আঁকাবাঁকা স্রোতস্বিনীর জলধারায় পুষ্ট সেই ক্ষেত্রভূমিতে গরু ছাগল চরছে, কিন্তু মেষ একেবারেই নেই। গরুছাগল চরানোর মানুষ দেখলাম অনেক, কিন্তু মানুষ বসবাসের কোনো নিদর্শন না দেখে অবাক হয়েছিলাম বিলক্ষণ। নিবাস কোথায় এদের? বাঁ দিকে সার বেঁধে চলেছে শিবিকার পর শিবিকা আলামুখের পাহাড়ি গা বেয়ে। শুরু হল আধ মাইলটাক পথ যাওয়ার পর। পালক পিতা বিল্লালি নেমে দাঁড়াতেই নেমে এলাম আমি, লিও এবং জব। মহম্মদকে দেখলাম ঘাসের ওপর নেতিয়ে পড়েছে। কুত্তার মত হাঁপাচ্ছে। বুঝলাম, শিবিকা জোটেনি বেচারীর বরাতে। এতটা পথ দৌড়ে আসতে হয়েছে।

শিবিকা নামানো হয়েছে একটা বিশাল গুহামুখের সামনে মঞ্চের মতো চত্বরে। নৌকোর যাবতীয় জিনিস স্তূপীকৃত রয়েছে সেখানে। পাল, দাঁড় এবং হালও বাদ যায় নি। যাদের সঙ্গে এসেছি, গুহামুখের সামনে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদেরই মতো আকৃতির আরো অনেক নারী এবং পুরুষের সঙ্গে।

স্ত্রীলোকদের পরনে সাদা হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরী পোশাক—চিতা-চর্মের নয়। একেবারে সাদা নয়, ঈষৎ কালচে। অসাধারণ রূপসী প্রত্যেকেই। বিশাল কালো চোখ। নিখুঁত মুখ। ঢেউ খেলানো লম্বা চুল গুচ্ছগুচ্ছ আকারে লুটোচ্ছে কাঁধের ওপর—নিগ্রোদের চুলের মতো ঘন কুঞ্চিত নয়। সবচেয়ে সুন্দর তাদের চুলের রঙ। কালো থেকে বাদামীর মধ্যে সব রঙই আছে। কয়েকজনের পরনে হলদেটে সুতির বস্ত্র। বিল্লালির পরিচ্ছদও সুতির। পরে জেনেছিলাম, উঁচু মহল ছাড়া এ-পোশাক পরার অনুমতি আর কারো নেই। পুরুষদের মতো ভয়াল মুখভাব নয় কারোরই। হাসতেও জানে। কদাচিৎ। শিবিকা থেকে নেমে দাঁড়াতেই ঘিরে দাঁড়ালো আমাদের। কৌতূহল আছে, কিন্তু উত্তেজনা নেই।

কিন্তু সাড়া ফেলল লিও। ওর ঐ কন্দর্পকান্তি আকৃতি, খেলোয়াড়ি চেহারা, গ্রীক মুখ, তাগড়া মূর্তি দেখেই মুণ্ড ঘুরে গেল মেয়েগুলোর। তারপর যখন টুপি খুলে অভিবাদন জানাতে গিয়ে একমাথা ঢেউ খেলানো অপূর্ব সুন্দর হলুদ চুল দেখিয়ে ফেলল অসাধারণ সুপুরুষ লিও, তখন উত্তেজনার বিস্ফোরণ ঘটল মৃদু গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে। সপ্রশংস চোখে ঘিরে ধরল তাকে মেয়েরা। ঐখানেই যদি ইতি ঘটে যেত ব্যাপারটার, তাহলে আর বলার কিছু থাকত না। কিন্তু ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চুলচেরা চোখে খুঁটিয়ে দেখার পর এগিয়ে এল সব চাইতে সুন্দরী মেয়েটা। ডাগরকাটা

পরী বললেই চলে। কি মুখ, কি চোখ! গায়ে অত্যন্ত বাহারি আলখাল্লা। একমাথা চুলে যেন রামধনুর বর্ণসুষমা—বাদামী রঙ তো আছেই, সেই সঙ্গে চেস্টনাট রঙের ঝিকিমিকি। পায়ে পায়ে লিওর সামনে এসে দাঁড়ালো সেই পরমাসুন্দরী। ঘাড় বেঁকিয়ে অনেকক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থাকার পর আলগোছে গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁট রাখল রাখল লিও-র ঠোঁটের ওপর!

দেখেই দম আটকে এসেছিল আমার। বিষম আতংকে চেঁচিয়ে উঠেছিল জব। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিলাম বর্শা-ফলকে লিও-র বক্ষবিদীর্ণ হওয়ার প্রতীক্ষায়।

কিন্তু ঘটল ঠিক উল্টো।

অজানা খৃষ্টীয় রীতি বোধ হয় এখনো মেনে চলা হয়, এই ধারণায় মুখচুম্বন ফিরিয়ে দিয়েছিল লিও মেয়েটিকে গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে।

আরো শোচনীয় হয়েছিল আমার অবস্থা। দম নিতে পারি না—উৎকণ্ঠায় প্রাণ এসে ঠেকেছে গলায়। একী বিপদ ডেকে আনল উজবুক লিও!

পরক্ষণেই বিষম বিস্ময়ে চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল আমার।

চুম্বন বিনিময় দেখে সুন্দরীদের অনেকেই মুখ বেঁকালেও বয়স্কারা এবং পুরুষরা মুচকি হাসছে দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিলাম। রহস্যটা পরিষ্কার হয়েছিল অজানা দেশের মানুষদের রীতিনীতি জানবার পর। অসাধারণ মানুষ এরা, অসাধারণ এদের সামাজিক নিয়ম। বিশ্বের সর্বত্র বর্বর সমাজে যে কানুন প্রচলিত, এখানে তার নামগন্ধ নেই—ঠিক উল্টো কানুন প্রচলিত এ দেশে। মেয়েরা পুরুষদের অধীন তো নয়ই—কোনো বন্ধনেই আবদ্ধ নয়। সমান অধিকার ভোগ করে। ছেলেপুলেরা মাতৃপরিচয় রেখে যায় বংশধারায়—পিতৃপরিচয় নয়। মায়ের নামেই নাম, মায়ের পরিচয়েই পরিচয় —পিতৃপরিচয়ের কোনো স্থান নেই—পিতা কে, তা ভালভাবে জানবার পরেও। বাবার পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামানো দূরে থাক, স্বীকারই করে না। একজন পুরুষকেই কেবল তারা 'পিতা' বলে ডাকে। উপজাতির শীর্ষস্থানীয় এই পুরুষ সব উপজাতির মধ্যে একজনই থাকে—তার বেশী নয়। সমগ্র উপজাতিটাকে এরা বলে 'গেরস্থালি'। এক-একটা 'গেরস্থালি'র পিতা একজনই। যেমন, বিল্লালি একটা 'গেরস্থালি'রই পিতা। সাত হাজার মানুষের একক 'পিতা' সে—অন্য কোনো পুরুষ এই উপাধি পায়নি। কোনো পুরুষকে যদি ভাল লেগে যায় কোনো মেয়ের, পাঁচজনের সামনে খোলাখুলিভাবে তাকে আলিঙ্গন করে ব্যক্ত করে মনের ইচ্ছা। যেমন করেছে উসটেন সুন্দরী লিওকে বাহুপাশে বেঁধে। ভারী চটপটে মেয়ে। পছন্দ হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে এসেছে এগিয়ে—সময় দেয়নি অন্য কোনো সুন্দরীকে। পুরুষটির যদি ভাল লেগে যায় মেয়েটিকে, তাহলে চুম্বন ফিরিয়ে দিতে হবে তৎক্ষণাৎ। তাহলেই সমাজ সায় দেবে দুজনের মিলনে। একসঙ্গেই থাকবে দুজনে যদ্দিন না একজন আর একজনকে নিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। অনুরাগে ভাঁটা পড়লেই ছিন্ন হবে বিচিত্র বিবাহ-বন্ধন। তাই বলে হরবখৎ স্বামী পালটায় না কেউই। আশ্চর্য সেইখানেই। পুরুষরা তো একেবারেই নির্বিকার স্ত্রীর যদি পছন্দ হয় আর কাউকে। সভ্য দুনিয়ায় যেমন আয়কর বা বিবাহ আইনকে নির্বিবাদে মেনে নিই, ভাল না লাগলেও সামাজিক কল্যাণের কথা ভেবে প্রতিবাদে মুখর হই না—এদেশেও স্ত্রী অন্য পুরুষের কণ্ঠলগ্না হলে কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না।

(৭) উসটেন-য়ের গান

চুম্বন-পর্ব সাঙ্গ হবার পর আমার ধারে কাছেও কিন্তু কোনো সুন্দরীকে ঘুর ঘুর করতে দেখিনি। একজন শুধু এগিয়েছিল জব-য়ের দিকে। সে বেচারী ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে দেখেই বোধহয় বিল্লালি আমাদের গুহার ভেতরে যেতে বললে হাত নেড়ে। উসটেন-য়ের পেছন পেছন ঢুকলাম পর্বত-কন্দরে।

পাঁচ পা যেতে না যেতেই বুঝলাম, গুহাটা প্রকৃতির হাতে গড়া নয়—মানুষের তৈরী। পাহাড় কুঁদে বানিয়েছে মানুষ। লম্বায় প্রায় দেড়শ ফুট, চওড়ায় পঞ্চাশ ফুট। গির্জের উঁচু ছাদ দেখতে যেমন কষ্ট হয়, এ-গুহার ছাদও তেমনি উঁচু। হলঘর বলা যায়। হলঘর থেকে দশ বারো ফুট অন্তর একটা করে সুড়ঙ্গ চলে গেছে সম্ভবত: এক-একটা ঘরে। প্রবেশমুখ থেকে পঞ্চাশ ফুট ভেতরে জ্বলছে একটা মস্ত অগ্নিকুণ্ড। ছায়া পড়েছে দেওয়ালে। বিল্লালি এখানেই থামতে বলল আমাদের।

খাবার-দাবার আসবে এখুনি। পশুচর্ম পেতে দেওয়া হল বসবার জন্যে। আরাম করে বসলাম তার ওপর। একটু পরেই তরুণী মেয়েরা নিয়ে এল খাবার। টাটকা ছাগমাংস সিদ্ধ, মাটির পাত্রে তাজা দুধ আর ফুটানো শস্য। খিদের পেট জ্বলে যাচ্ছিল। খেয়ে এমন তৃপ্তি পাইনি জীবনে।

এতক্ষণ নিঃশব্দে আমাদের খাওয়া দেখছিল বিল্লালি—মুখ যার শয়তানের মুখের মতোই পৈশাচিক। খাওয়া শেষ হতেই দাঁড়াল সামনে। বললে, খুবই অসাধারণ ব্যাপার। এ-দেশে আজ পর্যন্ত কোনো শ্বেতকায় বিদেশী আসেনি। পাথর দেশের মানুষরা এই প্রথম দেখল এবং জানল সাদা

আগন্তুকদেরও ঢুকতে দেওয়া এ-দেশে। খালের ওপর দিয়ে নৌকো টেনে আনছি দেখেই হুকুম দিয়েছিল বিল্লালি আমাদের যেন হত্যা করা হয়। বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ এ-অঞ্চলে—তাই তিলমাত্র দ্বিধা করেনি বিল্লালি। মারা পড়তামও তৎক্ষণাৎ—কিন্তু আদেশ এল 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ-মানতেই-হবে'র কাছ থেকে। রেহাই দেওয়া হয় যেন বিদেশীদের—নিয়ে আসা হয় তাঁর সামনে।

বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'পিতা, কৌতূহল প্রকাশ করছি, ক্ষমা করবেন। 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ-মানতেই-হবে' থাকেন নিশ্চয় বহু দূরে। আমরা যে আসছি, তা জানলেন কি করে?'

বিল্লালি উঠে দাঁড়াতেই দূরে সরে গিয়েছিল উসটেন। ধারে কাছে কেউ আছে কিনা দেখে নিল বিল্লালি। তারপর বললে অদ্ভুত হেসে—'পুত্র, কেউ কি নেই তোমাদের দেশে যিনি চোখ ছাড়াই দেখতে পান, কান ছাড়াই শুনতে পান? প্রশ্ন কোরো না। 'সেই-নারী' সব জানেন।'

অর্থ বুঝলাম না। শুনে গেলাম বিল্লালির বক্তিমে। 'সেই নারী' আর কোনো আদেশ পাঠাননি আমাদের ব্যাপারে। তাই তাকেই এখন যেতে হবে তাঁর কাছে।

কদ্দিন লাগবে ফিরে আসতে, জানতে চেয়েছিলাম। কম করেও পাঁচ দিন, বলেছিল বিল্লালি। 'সেই-নারী' এখন ঠিক কোথায় আছেন, তা খুঁজে বার করতে হবে। মাইলের পর মাইল জলাভূমির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তার অবর্তমানে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না—সব ব্যবস্থাই করে যাচ্ছে সে। আমাদের ভালো লেগেছে বলে 'সেই-নারী'র কাছ থেকে প্রাণভিক্ষাও চাইবে। হয়তো প্রার্থনা মঞ্জুর হবে। নাও হতে পারে। কেন না, ঠাকুরমার আমল থেকে নিজের সারা জীবনে কাউকে সে জীবিত থাকতে দেখেনি নিষিদ্ধ এই দেশে অনধিকার প্রবেশের পর।

অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলাম তা কি করে সম্ভব হয়? বিল্লালির নিজের বয়স হয়েছে। ঠাকুরমার আমল থেকে 'সেই-নারী' কি করে বেঁচে থেকে বিদেশী-নিধনের হুকুম দিয়ে আসবেন? তাঁর নিজেরই তো এতদিনে মৃত্যু হওয়া উচিত।

জবাব দেয়নি বিল্লালি। অদ্ভুত হেসে বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিয়ে গেছে 'সেই-নারী'র সঙ্গে দেখা করতে। পাঁচদিন আর তাকে দেখিনি।

কথা শুনে কিন্তু ভয় পেয়েছিলাম। সঙ্গীদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আলোচনায়

বলেছিলাম। 'সেই-নারী' সম্পর্কে যা শুনেছিলাম, তা সত্যিই ভয়াবহ। নির্দয়ভাবে বিদেশী মাত্রই নিহত হয় যাঁর নির্দেশে, তাঁকে আর যাই হোক, পুজো করা যায় না। লিও নিজেও খুব মুষড়ে পড়েছিল। উল্লসিতও হয়েছিল। ভাঙা মৃৎপাত্রের টুকরোয় লেখা আজব কাহিনী এবং তার বাবার লেখা উদ্ভট চিঠির উপাখ্যানে বর্ণিত মহিলার সঙ্গে কিন্তু আশ্চর্যভাবে মিলে যাচ্ছে বিল্লালি-বর্ণিত 'সেই-নারী'র কথা। কাহিনী তাহলে অলীক নয়। বিল্লালি নিজেই তার প্রমাণ রেখে গেল—'সেই-নারী'র বয়স এবং শক্তি দুটোই অমানবিক এবং অপার্থিব। তর্ক করার মতো মনের অবস্থা ছিল না। তাই বললাম, স্নান করে আসা যাক।

অভিপ্রায় ব্যক্ত করলাম যার কাছে, বিল্লালির নির্দেশে দেখাশুনার ভার ছিল তার ওপরেই। ভয়াল মুখ এদের প্রত্যেকেরই—এর মুখ যেন আরো বেশী। স্নান করার ইচ্ছে হয়েছে শুনে, তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ল আমাদের নিয়ে। তার আগে ধরিয়ে নিলাম ধূমপানের পাইপ। গুহামুখে ভীড় জমে গেছিল আমাদের দেখবার জন্যে। কিন্তু গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে আসছি দেখে চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রত্যেকেই। বিরাট জাদুশক্তির অধিকারী নাকি আমরা—ধারে কাছে না থাকাই মঙ্গল। বন্দুক দিয়েও এত আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারিনি—যতটা করেছিলাম তামাকের ধোঁয়ায়। নির্বিঘ্নে পৌঁছেছিলাম একটা ঝিরঝিরে স্রোতস্বিনীর পাড়ে। ঝর্ণার জল বয়ে এসেছে ছোটনদীর আকারে। স্নান করেছিলাম পরমানন্দে। বেশ কিছু মেয়ে কিন্তু ছিনেজোঁকের মত লেগেছিল সঙ্গে। উসটেনও ছিল তাদের মধ্যে।

স্নান যখন করছি, সূর্য তখনি ডুবছে। গুহায় যখন ফিরলাম, সূর্য একেবারেই ডুবেছে। বেশ কয়েকটা ধুনি জ্বলছে গুহার চারিদিকে। জ্বলছে নানা ধরনের লম্ফ মেঝেতে এবং দেওয়ালে। শুরু হয়েছে রাতের খাওয়া।

খাচ্ছে নিঃশব্দে। মুখে কথা নেই, চোখে হাসি নেই। দেওয়ালে কাঁপছে ছায়া। ভয়াবহ দৃশ্য।

নীরবে সেই দৃশ্যের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর শুতে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম।

তদারকির ভার যার ওপর, তৎক্ষণাৎ দ্বিরুক্তি না করে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। লণ্ঠন তুলে নিয়ে সবিনয়ে আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে। আগেই বলেছি মূল প্রস্তর-কক্ষের গা থেকে এমনি বিস্তর সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে দশ বারো ফুট অন্তর। পাঁচ পা যেতে না যেতেই

এসে পড়েছিলাম একটা চৌকোনা প্রস্তর-কক্ষে। এক-একদিক আট ফুট লম্বা। নিরেট পাথর খুদে নির্মিত। তিন ফুট উঁচু একটা পাথরের বেদী ঘিরে রয়েছে চারদিকে দেওয়ালের গা বরাবর। এইখানেই শুতে বলা হয়েছিল আমাকে। আমি কিন্তু শিউরে উঠেছিলাম। বেদী দেখেই মনে হয়েছিল, মড়া ফেলে রাখার জন্যেই নির্মিত হয়েছে ঐ বেদী আর জানলাবিহীন এই ঘর। জীবন্ত মানুষের ঘুমোনোর জন্যে নয়। ঘরে আসবাবপত্রও কিছু নেই। পরে জেনেছিলাম, অনুমানটা মিথ্যে নয়। কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসেছিলাম হলঘরে কম্বল নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সেখানে এসে দেখি জব পালিয়ে এসেছে ঐরকমই একখানা মড়ার ঘরে তাকে শুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে। আমার সঙ্গেই একঘরে রাত কাটাতে চায় যদি অনুমতি দিই।

বেঁচে গেলাম জবকে সঙ্গে পেয়ে। রাত কাটালাম মড়ার মতোই ঘুমিয়ে। ঘুম ভাঙলো বৃংহিতধ্বনির মতো কানফাটা আওয়াজে। ভোর হয়েছে। শিঙা ফুঁকছে আমাহাগ্গার-রা। হাতীর দাঁতে ফুটো করে বানিয়ে নেওয়া শিঙা—ঘুম ভাঙানোর জন্যে।

আগে স্নান সারলাম। তারপর প্রাতরাশ খেতে বসলাম। খাওয়া শেষ হতেই আর একটি বয়স্কা মেয়ে সবার সামনেই চুমু খেয়ে বসল জব-কে।

সেকী পরিত্রাহি চিৎকার জব-য়ের। এঁটো কাষ্ঠ-চামচ দিয়ে মেয়েটিকে এই মারে কি সেই মারে! নিষ্কলুষ চরিত্র তার, আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ের দিকে হাত বাড়ায়নি—তাকেই কিনা প্রকাশ্যে চুম্বন!

শেষে দৌড়োলো পাঁই-পাঁই করে গুহামুখের দিকে। রেগে লাল হল মেয়েটি। অট্টহেসে হলঘর কাঁপিয়ে তুলল আমাহাগ্গার-রা।

যাই হোক, প্রাতরাশ শেষ করে সবাই মিলে বেরোলাম। আমাহাগ্গার-দের কৃষিপদ্ধতি দেখলাম। গরু ছাগল দেখলাম। দু ধরনের গরু পোষে এরা। এক ধরনের গরুর হাড় খুব মোটামোটা, কিন্তু বেশী মাংসল নয়। শিং নেই, কিন্তু ভালো দুধ দেয়। আর এক ধরনের গরুর গায়ের রঙ লাল, আকারে ছোট, বেশ মোটাসোটা—মাংস চমৎকার, কিন্তু দুধেলা নয়। ছাগলদের গায়ে লম্বা লম্বা লোম। মাংস চমৎকার—দুধ দিতে কখনো দেখিনি। লোহার কোদাল দিয়ে চাষবাস করে আমাহাগ্গাররা। লোহা গলাতে জানে, লোহার জিনিস বানাতে জানে।

অসাধারণ এই মানুষদের উৎস আর রীতিনীতি জানতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল। কেউই তো মুখ খুলতে চায় না। উসটেন মেয়েটা ছায়ার

মতো লেগে থাকতো লিও-র পেছনে। তাকেই চারদিন ধরে একটু একটু করে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম অনেক তথ্য। আমাহাগ্গাররা আদিতে ছিল কোথায়, উসটেন নিজেও তা সঠিক জানে না। 'সেই-নারী' যেখানে থাকেন, সেখানে নাকি অনেক ইমারত আর থামের চিবি আছে। জায়গাটার নাম 'কোর'। জ্ঞানীরা বলেন, এককালে নাকি সেখানে অনেক বাড়ী ছিল, বহু মানুষ বসবাস করত সেইসব বাড়ীতে। আমাহাগ্গারদের পূর্বপুরুষ তারাই। এখন আর সেই বিশাল ভগ্নস্তূপের ছায়াও কেউ মাড়ায় না—দূর থেকে দেখেই পালিয়ে আসে। পুরো তল্লাটটা নাকি এখন ভূত-প্রেতদের আস্তানা। জলাভূমির যেখানে যেখানে উঁচু পাহাড়, আরো ভগ্নস্তূপ রয়েছে নাকি সেই সব জায়গাতেও। পাহাড় খুদে বানানো গুহাগুলিও সুদূর অতীতের সেই মানুষদের কীর্তি। শহর যারা গড়েছিল, গুহাও তারা বানিয়েছে পাথর কেটে। লিখিত কোনো কানুন নেই এ-দেশে, আছে কেবল সামাজিক বিধি, আইনের মতোই যার নিগড় অতিশয় কঠিন।

রানী একজন আছেন। 'সেই-নারী' তাদের রানী। কদাচিৎ দেখা যায় তাঁকে। আসেন দু-তিন বছরে একবার অপরাধীকে সাজা দিতে। তখনও কিন্তুও তাঁর মুখ দেখা যায় না। বোরখায় ঢেকে থাকেন আপাদমস্তক, সেবকদের প্রত্যেকেই বোবা এবং কালা। কাজেই কোনো খবরও ফাঁস হয় না। তাসত্ত্বেও শোনা যায়, তিনি নাকি অসামান্যা রূপসী। এত রূপ আর কোথাও দেখা যায় না। গুজবে প্রকাশ, তিনি অমর। জড় এবং সজীব—সব কিছুই তাঁর শক্তির অধীন—চালিত হয় তাঁরই ইচ্ছায়। এর বেশী আর কিছু জানা নেই উসটেন-য়ের। তবে তার বিশ্বাস, মাঝে মাঝে একটি পুরুষকে স্বামী বানান 'সেই নারী'। মেয়ে-সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই নিহত হয় স্বামী। মেয়ে বড় হলে এবং মারা গেলে, রানী হয় সেই মেয়ে। বিশাল গুহাগুলোতেই কবর দেওয়া হয় মায়েদের। তবে এ ব্যাপার নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয় কারোর পক্ষেই, 'সেই-নারী'র হুকুম শিরোধার্য করতে হয় প্রত্যেককেই। পুরো তল্লাটের একক অধীশ্বরী তিনি। অন্যথা ঘটলেই তৎক্ষণাৎ নিহত হয় অবাধ্য ব্যক্তি।

বিরাট এই দেশে 'গেরস্থালি' আছে মোট দশটা। রানীর 'গেরস্থালি ও পড়ছে তার মধ্যে। এই রকমই উঁচু পাহাড়ি জমি আছে বিস্তীর্ণ জলা-ভূমিময় দেশের নানান জায়গায়। 'গেরস্থালি'গুলো আছে সেই সব উঁচু জায়গায়। জলাভূমি পেরিয়ে যাওয়ার পথ কিন্তু সবাই জানে না। যখন লড়াই লাগে এক 'গেরস্থালি'র সঙ্গে আর এক 'গেরস্থালি'র, তখন যোদ্ধারা ব্যবহার

করে এই সব সঙ্কীর্ণ গুপ্তপথ। কিন্তু 'সেই-নারী'র নির্দেশ এলেই তৎক্ষণাৎ থেমে যায় যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলে লোকক্ষয় হয়। জলাভূমি পেরোতে গিয়ে অনেও মারা যায় অনেকে। লোকসংখ্যা তাই বাড়ে না কখনোই। অন্য কোনো প্রজাতির সঙ্গে এদের যোগাযোগ নেই। ধারেকাছে কেউ থাকেও না। থাকলেও দুর্গম জলাভূমি পেরিয়ে আসার ক্ষমতা কারোর নেই। পথ জানা না থাকলে জলাভূমি অতিক্রম করা একেবারেই অসম্ভব। আমরাও পারতাম না—যদি না আমাদের নিয়ে আসা হত।

চারদিনে এই সবই জানলাম উসটেন-রের মুখে। ভাঙা মাটির পাত্রের টুকরোয় লেখা অনেক কিছুর সঙ্গেই কিন্তু আশ্চর্যভাবে মিলে গেল এই দেশ এবং 'সেই-নারী'র কাহিনী। সত্যিকারের দুঃসাহসিক অভিযানের সূচনা হিসেবে তা বিস্ময়কর বইকি।

অভাভুত ঘটনাটা ঘটল এই সব বিচিত্র কাহিনী শোনার পরেই, ভাবলেও এখনো গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দেয়।

উসটেনকে নিয়ে আমরা তিনমূর্তি বসেছিলাম আগুন ঘিরে গুহার মধ্যে। শুতে যাওয়ার সময় হয়েছে। গুম হয়ে কি যেন ভাবছে উসটেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাত রাখল লিও-র সোনালী চুলের স্তবকে।

এবং, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল লোমহর্ষক স্তোত্রপাঠ। কথামালাও বলা চলে। বলছে যেন লিও-কে উদ্দেশ করেই।

আজও চোখ বুঁজে স্পষ্ট দেখতে পাই সেই দৃশ্য। দেখতে পাই উসটেনের দৃপ্ত, সুগঠনা তন্বীমূর্তি সটান দাঁড়িয়ে লিও র পাশে। আগুনের লেলিহান শিখা পর্যায়ক্রমে রক্তাভা এবং গাঢ় ছায়াপাত করে চলেছে চোখে মুখে বুকে—সর্বাঙ্গে। যেন দুঃস্বপ্ন মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে এক দুঃস্বপ্ন-দৃশ্যের কেন্দ্রস্থলে। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ ভাবনার কথাচিত্র বুকের ভেতর থেকে মুচড়ে এনে লিও-র সামনে তুলে ধরছে ছন্দিত সুরে।

আচমকা স্তব্ধ হয়েছিল গানের সুরে কথামালা। মাথামুণ্ড কিস্সু বুঝতে পারিনি। শুধু চেয়েছিলাম অকস্মাৎ এই ভাবান্তরের কারণ বুঝতে না পেরে। গান থামিয়েই ঝলকিত চোখে উসটেন চেয়ে রইল সামনের দিকে—যেখানে পাকসাট খেয়ে নড়ে নড়ে সরে যাচ্ছে আগুন রঙীন কালো ছায়া। পরমুহূর্তেই অপসৃত হল দামিনী-নয়নের বিদ্যুৎ-ঝলক—শূন্যগর্ভ চাহনি মেলে আতংক-বিস্ফারিত চোখে তাল তাল ছায়ার মধ্যে অর্ধস্ফুট এক মহা-বিভীষিকার ছবি প্রত্যক্ষ করার প্রয়াসে যেন অপার্থিব লোকে প্রবেশ করল উসটেন। এতক্ষণ হাত রাখা ছিল লিও-র কাঁধে। এবার

তা তুলে নিয়ে অঙ্গুলি সংকেতে কি যেন দেখালো পুঞ্জীভূত তমিস্রার মধ্যে। নিমেষে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি ঘুরে গিয়েছিল সেই দিকে। নির্নিমেষে তাকিয়েও কিছু দেখিনি। সে কিন্তু দেখেছিল। অথবা, দেখেছিল বলেই বিশ্বাস করে নিয়েছিল। সে দৃশ্য এমনই ভয়াবহ যে কাঁপিয়ে দিয়েছিল উসটেনের মতো শক্তধাতের মেয়ের লৌহ-স্নায়ুও। মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরোয়নি। আচম্বিতে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল আমার আর লিও-র মাঝখানে।

লিও নিজেই এই কদিনে আকৃষ্ট হয়েছিল পরমাসুন্দরী উসটেনের প্রতি। তার ব্যক্তিত্ব, তার লাবণ্য, তার প্রাণঢালা ভালোবাসা উত্তরোত্তর মুগ্ধ করে চলেছিল লিও-কে। তাই তাকে ঐভাবে ধড়াস্ করে পড়ে যেতে বিষম উদ্বেগে ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠেছিল লিও। ভয়ে উৎকণ্ঠায় কালো হয়ে গিয়েছিল মুখ।

আমি নিজেও বাদ যাইনি। কুসংস্কার মিশোনো আতংকে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম আচমকা এই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে যাওয়ায়।

উসটেন অবশ্য একটু পরেই সামলে নিয়েছিল নিজেকে। সারা শরীর দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল উপর্যুপরি কয়েকটা শিহরণে। উঠে বসেও কাঁপুনি থামাতে পারেনি কিছুতেই।

এত বছরের শিক্ষাদান বিফলে যায়নি। চোস্ত আরব ভাষায় কথা বলতে পারত লিও। শুধিয়েছিল ভয় তরাসে গলায়—'উসটেন, হল কি তোমার?'

কাষ্ঠহেসে বলেছিল উসটেন—'মনপসন্দ পুরুষ, গান গেয়ে শোনাচ্ছিলাম তোমাকে আমার মনের কথা। এদেশের রীতি যে তাই। আর কিছু নয়। যা এখনো ঘটেনি সে ব্যাপারে কিছু বলা তো যাবে না।'

চোখে চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম শাণিত গলায়—'কি দেখলে বলো তো এতক্ষণ?'

'কিছুই না। জিজ্ঞেসও করো না, কি দেখেছি। ভয় দেখাতে চাই না—এইটুকুই শুধু জেনে রাখো।' বলতে বলতে উসটেন আবার চাইল লিও-র পানে। এবার দুচোখে মায়া মমতা স্নেহ আদরের যে বিমূর্ত প্রকাশ দেখলাম তা কোনো বর্বর বা সভ্য স্ত্রীলোকের চোখে মুখে আজও দেখিনি। খুব আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে আলতো চুমু খেল লিও-র কপালে—যেভাবে মরম চুম্বন এঁকে দেয় মা সন্তানের ললাটে—ঠিক সেইভাবে।

বললে ধীর গম্ভীর স্বরে—'মনপসন্দ, একদিন তোমার কাছে আমি থাকবো না। সেইদিন যখন নিশীথ রাতে হাত বাড়িয়ে আমাকে পাবে না

তোমার পাশে, মনে পড়বে এই হতভাগিনীর কথা—যে তোমাকে ভাল-বেসেছিল প্রাণ দিয়ে, তোমার পা ধুইয়ে দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন না করেও। সেই দিন থাক্ দূরে। মনপসন্দ, এসো ভুলে থাকি বর্তমানকে নিয়ে, খেলি সেই ভালবাসার খেলা যে খেলা খেলা যায় না কবরের অন্ধকারে। সেখানে নেই ভালবাসা, নেই উষ্ণতা, আছে কেবল অনন্ত অমানিশা। মনপসন্দ, এসো, সুখী হও যা পেয়েছি তাই নিয়ে। ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকানোর এ সুযোগ তো আর পাবো না সমাধির তমিস্রায়, তখন তো তিক্ত স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না তোমার এই সুন্দর অন্তরে। তাই এ রাত শুধু আমাদেরই হোক—কে জানে আগামীকাল নিয়ে আসবে কি বিপর্যয় আমাদের ভাগ্যাকাশে ?'

(৮) ভোজ, এবং তারপর।

অত্যাশ্চর্য এই দৃশ্য দেখার পরের দিন ঘোষণা শুনলাম সন্ধ্যায় ভোজ-সভা বসবে আমাদের সম্মানে।

রাত হল। জড়ো হলাম মূল গুহার হলঘরে। সে রাতের অগ্নিকুণ্ড অন্যান্য রাতের আগুনের চেয়ে অনেক বিশাল। অস্বাভাবিক প্রকাণ্ড। আগুন ঘিরে মস্ত বৃত্তাকারে বসে পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ এবং দুজন নারী—উসটেন আর সেই স্ত্রীলোকটি, জবকে যে প্রকাশ্যে চুম্বন করেছিল। প্রথামতো নিঃশব্দে বসে পুরুষরা। বিরাট বর্শাগুলো সটান খাড়া রয়েছে প্রত্যেকের পেছনে পাথরের গর্তের মধ্যে। পাথর ফুটো করা হয়েছে ঐ উদ্দেশ্যেই—বর্শার হাতল ঢুকিয়ে যাতে খাড়া রাখা যায়। মাত্র দু-এক জনের পরনে রয়েছে হলদেটে সুতির পোশাক—যে পোশাকের কথা আগেই বলেছি। বাকী সবার পরনে চিতা চর্মের কৌপিন ছাড়া কিছু নেই।

ভ্রূকুটিকুটিল ললাটে প্রশ্ন করেছিল জব—'স্যার, ব্যাপার ভালো ঠেকছে না। ঐ মেয়েটাও তো রয়েছে দেখছি, যা খাতির করেছি সেদিন, ওরপর আমার কাছে আর ঘেঁসবে বলে মনে হয় না। গা শির শির শির করে এদের প্রত্যেককে দেখলেই, তাই না? আরে, আরে! মহম্মদকেও খেতে ডেকেছে, দেখেছেন? আমাকে ছেড়ে এখন মহম্মদকে ধরেছে মেয়েটা—কত সোহাগ! মরুগ গে, আমাকে ঘাঁটাতে তো আর আসছে না!'

চোখ তুলে দেখি, সত্যিই জব-য়ের কাছে তাড়া-খাওয়া সেই মেয়েটা মহা সমাদরে কোণ থেকে তুলে আনছে মহম্মদকে। অজানা আতংকে এক

কোণে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল বেচারী। বিড় বিড় করে আল্লা নাম জপ করছিল। মেয়েটার সোহাগ ভালবাসাতেও ভয় যায় নি। উঠে আসবার কোনো ইচ্ছেই নেই। কেন ইচ্ছে থাকবে? এতদিন তাকে আলাদা খেতে দেওয়া হয়েছে—আমাদের সঙ্গে নয়। খাতির-যত্ন ছিটেফোঁটাও জোটেনি কপালে। তাই হঠাৎ এত আপ্যায়ন তার ভাল লাগার কথা নয়। নিঃসীম আতংকে ঠক্ ঠক করে কাঁপছে হাঁটুজোড়া—অতবড় ভারী শরীরটাকে যেন আর সিধে রাখতে পারছে না। টলমল করতে করতে উঠে আসছে কিন্তু নিরুপায় হয়ে—মেয়েটার আকর্ষণে নয়—পেছনেই বিশাল বর্শা বাগিয়ে বিরাটকায় এক আমাহাগ্গারকে দেখেই ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছে বেচারার।

দেখেই গতিক সুবিধের মনে হল না আমার। জব আর লিও-কে বললাম রিভলবার তৈরী রাখতে।

কোমরের কোল্ট রিভলবারে হাত ছুঁইয়ে জব বললে—'আমার রিভলবার তো এখানেই। কিন্তু স্যার, মিস্টার লিও-র কোমরে তো শিকারী ছুরী ছাড়া কিস্সু নেই। যদিও খুবই বিরাট ছুরী, তবুও—'

'রিভলবার খুঁজতে যাওয়ার সময়ও এখন নেই। চলো, গিয়ে বসি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে।'

উঠে পড়লাম তিনজনে। দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে পাশাপাশি বসলাম দেওয়ালে পিঠ দিয়ে।

বসতে না বসতেই হাতে হাতে চালান হয়ে গেল একটা মাটির বয়েম। সুরাপাত্র। স্বাদ ভালোই। ঘন্টাখানেক কিছুই ঘটল না। হাতে হাতে ঘুরছে মদিরা পাত্র। মাঝে মাঝে তেল নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অগ্নিকুণ্ডে। সবই হচ্ছে নিঃশব্দে। মুখে কথা নেই কারোরই। নীরব আমরা তিনজনেও। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছি সামনের দিকে। দেখছি, বিরাট অগ্নিকুণ্ডের লাল আভা ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছে দেওয়ালে—জ্বলন্ত মাটির লম্ফগুলোর কালো ছায়া কাঁপছে, দুলছে, মিশছে লাল আভার সঙ্গে। আগুন আর আমাদের মাঝখানে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। একটা মস্ত কাঠের বারকোশ বসানো রয়েছে সেখানে। বারকোশের চারদিকে চারটে খাটো হাতল। কশাইয়ের বারকোশের মতোই বলা চলে—কিন্তু খুবলোনো নয়। বারকোশের পাশেই রয়েছে লম্বা হাতলওলা একটা লোহার চিমটে। দেখে বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল আমার। সভয়ে সাবস্ময়ে তাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিলাম বারকোশ, চিমটে আর বৃত্তাকারে বসে-থাকা ভয়াল-আকৃতি মানুষগুলোর দিকে। এছাড়া আর করবার কিছুই ছিল না। কি

ঘটবে, তা জানি না। শুধু বুঝেছিলাম পরিবেশ ক্রমশঃ থমথমে হয়ে উঠছে এবং আমরা প্রত্যেকেই এখন জিঘাংসা-নিষ্ঠুর এই মানুষগুলোর হাতের মুঠোয়। যেহেতু এদের চরিত্র-রহস্য তখনও অজ্ঞাত আমার কাছে, তাই আরও ভয়ংকর মনে হচ্ছে প্রত্যেককেই। এরকম ভোজসভাও জীবনে দেখিনি। খাবারের কণামাত্রও কোথাও নেই, অথচ খিদে বাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে সুরাপান করে। অদ্ভুত ভোজ-উৎসব তাই নামহীন আতংকের আবর্ত রচনা করে চলেছিল আমার লোমকূপে লোমকূপে।

ঝাড়া একটি ঘন্টা এইভাবে নিঃশব্দে সুরাপাত্র হাতবদল এবং সুরাপান দৃশ্য দেখতে দেখতে যখন প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়েছি, ঠিক সেই সময়ে শুরু হয়ে গেল লোমহর্ষক নাটক। আচমকা, সাবধান হওয়ার তিলমাত্র সুযোগ না দিয়ে, বৃত্তের উল্টোদিক থেকে উচ্চৈঃস্বরে নিনাদিত হল একটা পুরুষ কণ্ঠ :

'কোথায় আমাদের খাওয়ার মাংস?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল বৃত্তে আসীন প্রত্যেকেই—একই রকম গুরুগম্ভীর চাপা গলায়—একই সুরে। সেই সঙ্গে ডান হাত বাড়িয়ে ধরল আগুনের দিকে :

'আসছে, আসছে, মাংস আসছে।'

ক্ষণিক বিরতি। সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের গমগমে রেশ তখনও ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলে চলেছে বিশাল পর্বতকন্দরে। সহসা বিষম আতংকে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল আমার।

মহম্মদের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা সেই মেয়েটা আদর সোহাগে বিপর্য করে তুলেছে তাকে। সে কী ভালবাসা। গাল টিপে দিচ্ছে, সারা গায়ে হাত বুলোচ্ছে, মিষ্টি মিষ্টি কত নামেই না ডাকছে। কিন্তু ধিকি ধিকি অগ্নিময় দুই চোখ লকলকে শিখা মেলে যেন লেহন করে যাচ্ছে বেচারার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। মহম্মদ তখন কাঁপছে...ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। কেন যে এই দৃশ্য দেখে সীমাহীন আতংকে শিউরে উঠেছিলাম, তা বলতে পারবো না। কিন্তু আমি একা ভয় পাইনি, আমার একার গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসেনি—হয়েছিল প্রত্যেকের—বিশেষ করে লিও র। হাত বুলোনো, আদর করা, গালে ঠোনা মারা—সব কিছুর সঙ্গে মিল আছে নাগিনী আলিঙ্গনের। সর্পিণী নিঃশ্বাসে যেন জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে মহম্মদ। কুটিলা সরীসৃপ যেন শীতল স্পর্শে অসাড় করে আনছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সবই যেন ধরাবাঁধা একটা ছকের অঙ্গ—বাইরের কিছুই ঘটছে না। আতংকে মানুষের গায়ের রঙ পালটে যায় শুনেছি। সেদিন দেখলাম

স্পষ্ট। মহম্মদের বাদামী চামড়া সাদা হয়ে এসেছে অপরিসীম বিভীষিকায়।

'মাংস কি রান্নার জন্যে তৈরী?' দ্রুততর ধ্বনিত হ'ল সেই কণ্ঠস্বর।

'তৈরী, তৈরী।'

'গরম হয়েছে কি রান্নার কড়া?' প্রশ্ন তো নয়, যেন একটা বুকচেরা আর্তনাদ বিষম যাতনার ঘূর্ণিপাক রচনা করে নিমেষে ছুটে গেল বিশাল গুহার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

'গরম, গরম।'

'সর্বনাশ!' কানের কাছে শুনলাম লিও-র চিৎকার—'মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরোতে কি লেখা ছিল মনে পড়ছে?—'নতুন মানুষদের মাথায় পাত্র চাপিয়ে দেয় রানীর প্রজারা।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা একই সঙ্গে—এত তাড়াতাড়ি যে কথার মানে বোঝবার বা নড়বার সময়ও পেলাম না। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল দু-দুটো ষণ্ডামার্কা শয়তান, চিমটে দুটো খপাৎ করে খামচে ধরেই ঢুকিয়ে দিল গনগনে আগুনের ঠিক মাঝখানে। একই সঙ্গে মহম্মদের পাশের সদাময়ছা মেয়েটাও এক ঝটকায় কোমর থেকে একটা ফাঁস খুলে নিয়ে গলিয়ে দিল মহম্মদের গলায়, হ্যাঁচকা টানে চেপে বসিয়ে দিতেই বেচারীর দু-পা ধরে সবলে টান মেরে আছড়ে ফেলল পাশের লোকগুলো। চিমটে-হাতে ষণ্ডা দুটো প্রচণ্ড ঝাঁকুনি মেরে গুহার মেঝেতে জলন্ত অঙ্গার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে এক টানে বার করে আনল আগুনে তেতে সাদা হয়ে যাওয়া একটা মাটির পাত্র। চোখের পলক ফেলবার আগেই দুজনেই একযোগে চিমটেশুদ্ধ পাত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মহম্মদ যেখানে ধস্তাধস্তি করছে—ঠিক সেইখানে। মহম্মদ তখন মরিয়া। লড়ছে মূর্তিমান পিশাচের মতো। নিঃসীম নৈরাশ্যের মুহুর্মুহু আর্তনাদে গুহার দেওয়াল যেন চৌচির হয়ে যাচ্ছে। গলায় ফাঁস, দু-পা নরপশুদের মুঠোয়—তা সত্ত্বেও তাকে বাগে আনা যাচ্ছে না কিছুতেই। পিশাচ-পুরুষদের অভিপ্রায় সিদ্ধিও হচ্ছে না এত কাছে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও। অভিপ্রায়টা যে কী, তা বুঝতে আর বাকী নেই তিনজনের কারোরই। নরপিশাচ! নরপিশাচ! সাক্ষাৎ নরপিশাচ! আগুন-রাঙা পাত্রটাকে জোর করে বসিয়ে দিতে চায় ওর মাথায়।

গগনভেদী আতংক-আর্তনাদে গুহার ছাদ পর্যন্ত থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম আমি। আপনা থেকেই হাতটা টেনে বার করে নিয়েছিল রিভলবার। তিলমাত্র দ্বিধা না

করে পিশাচিনী মেয়েটাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিলাম নির্ভুল লক্ষ্যে। এতক্ষণ আদর সোহাগ করার পর এখন সে ঝাপটে ধরেছিল মহম্মদকে। বুলেট গিয়ে লাগল তার পিঠে, মারাও গেল তৎক্ষণাৎ। যদি না লাগত, যদি সেই মুহূর্তে তাকে বধ করতে না পারতাম, অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে মরতাম আজও। কেন না, পরে জেনেছিলাম, জবের কাছে লাঞ্ছিতা হয়ে রুদ্ররোষে ফুঁসে উঠে শোধ নেওয়ার চক্রান্ত করেছিল এই শয়তানী-ই—নরখাদক আমাহাগ্গারদের লালসাকে উদ্দীপ্ত করে বলির আয়োজন করেছিল নরবলি প্রথার সুযোগ নিয়ে। এক বুলেটেই খতম হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল পাপিষ্ঠা—সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম যুগপৎ আতঙ্ক এবং নৈরাশ্যে। অতিমানবিক প্রচেষ্টায় অত্যাচারীর বাহুপাশ থেকে শূন্যে ছিটকে গিয়েই নিহত পিশাচিনীর ওপর দমাস করে আছড়ে পড়েছিল মহম্মদের প্রাণহীন দেহ। পিস্তলের ভারী বুলেট একই সাথে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে দুজনকে—খুনী মেয়েটাকে আগে, তারপরেই খুন হতে যে যাচ্ছে, তাকে। বাঁচিয়ে দিয়েছে খুন হওয়ার চাইতেও একশগুণ ভয়াবহ মৃত্যু থেকে। দুর্ঘটনাটা নিতান্তই রোমাঞ্চকর নিঃসন্দেহে —নিরতিশয় শুভঙ্করও বটে।

মুহূর্তের জন্যে বিপুল বিস্ময়ে থ হয়ে গেল প্রত্যেকেই। সূচীভেদ্য নৈঃশব্দ্য নেমে এল অতবড় হলঘরখানায়। আগ্নেয়াস্ত্র-নির্ঘোষ জীবনে শোনেনি আমাহাগ্গাররা। প্রতিক্রিয়ায় স্থাণু হয়ে গিয়েছিল চকিতের জন্যে। পরমুহূর্তেই সামলে নিল আমাদের সবচেয়ে কাছের পুরুষটি। খপ্ করে বর্শা তুলে বিরাট লাফ মেরে এগিয়ে এল লিও-র বুক টিপ করে। লিও-ই ছিল তার হাতের সবচেয়ে কাছে।

'মারো দৌড়!' বলেই উদাহরণ হাজির করেছিলাম আমি নিজেই। দু-পায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে টেনে দৌড়েছিলাম গুহামুখের দিকে। ছুটছি আগে আমি, আমার পেছনেই লিও আর জব, ওদের পেছনে নরখাদকদের পুরো দলটা। দলের মেয়ে নিহত হওয়ার ক্রোধে উন্মাদ প্রত্যেকেই—বজ্র-নাদে থর থর করে কাঁপছে গুহাঘর। গুহামুখের ঠিক সামনেই তিন ফুট উঁচু আর আট ফুট ব্যাসের একটা পাথুরে মঞ্চের ঠিক মাঝখানে জ্বলছিল নৈশ প্রদীপ। টপাটপ লাফিয়ে উঠলাম তিনজনে তার ওপর। প্রস্তুত হলাম প্রাণের বিনিময়ের প্রাণ দেওয়ার জন্যে। চড়া দামই নেব অবশ্য। সস্তায় প্রাণ বিকোবো না কেউই। বোঁ করে, ঘুরে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি দেখে মুহূর্তের জন্যে পেছনের দলটা থমকে গিয়েছিল। লিওর একদিকে আমি

আর একদিকে জব। পেছনে জ্বলছে প্রদীপ দুটো। আর, অদ্ভুত আলো জ্বলছে লিও-র চোখে। সুশ্রী মুখ পাথরের মতো কঠিন। ডান হাতে ভারী শিকারী ছুরী। ছুরীর হাতলে বাঁধা চামড়ার ফিতেটা কব্জিতে গলিয়ে নিয়ে একহাতে আমাকে সবলে জড়িয়ে ধরল বুকের ওপর।

বললে আবেগভরা স্বরে—'বিদায় কাকা, বিদায় আমার প্রাণের বন্ধু। বিদায় আমার বাবার চেয়েও কাছের মানুষ। চাচা, শয়তানদের খপ্পর থেকে এ যাত্রা আর রেহাই নেই। এখুনি টুকরো টুকরো করে ফেলবে তিন জনকেই। তারপর কোঁৎ কোঁৎ করে গিলবে সেই মাংস। আমিই তোমাকে টেনে এনেছিলাম এর মধ্যে। যদি পারো, ক্ষমা কোরো। বিদায়, জব, বিদায়।'

দাঁতে দাঁত পিষে বলেছিলাম—'যা ঘটছে, তা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটছে, লিও।'

রিভলবার নির্ঘোষ শুনলাম কানের কাছে। জবের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে এক নরপিশাচ। যাকে তাগ করে গুলি ছুঁড়েছিল, তার গায়ে আঁচড়টিও কিন্তু লাগেনি। জব বরাবরই এই ধরনের লক্ষ্যভেদী। যাকে টিপ করে তার প্রাণের আশংকা থাকে না মোটেই।

একজন ধরাশায়ী হতেই বাকী সকলে বাঁধভাঙা বন্যার মতোই ধেয়ে এল ভীমবেগে—একযোগে। রুখে দিলাম আমি আর জব। পিস্তলের গুলি ফুরোনোর পর দেখা গেল রক্ত গঙ্গায় মুখ থুবড়ে পড়ে পাঁচটি পুরুষ।

বিশালাকৃতি একজন লাফিয়ে উঠে ছিল মঞ্চে। লিও-র ছুরিকাঘাতে শূন্যে বিলীন হল তার প্রাণবায়ু। অসুরের শক্তি ওর গায়ে। লম্বা ফলা বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল পিঠ দিয়ে। ছুরী চালালাম আমিও—খতম হল আরও একজন। ফস্কে গেল কিন্তু জবের ছুরী। জবকে জাপটে ধরেই আততায়ী ঠিকরে পড়ল মঞ্চ থেকে নিচে। ছুরীখানাও ঠিকরে গেছিল হাত থেকে। পাথরে পড়েই ফলা উঁচু হয়ে যেতেই বিরাটদেহী আমাহাগ্গার আছড়ে পড়েছিল সেই ফলার ওপরেই—ছুরী গেঁথে গেল তার বুকে। জব নিজেও দেখলাম নিস্পন্দ দেহে পড়ে রয়েছে ছুরীবিদ্ধ মড়ার ওপর।

আমার নিজেরই তখন হাতাহাতি লড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে দু-দুটো আমাহাগ্গারের সঙ্গে। কপাল ভালো আমার, হুটোপাটি করে ছুটে আসায় বর্শা আনবার কথা খেয়াল ছিল না দুজনের কারোরই। ফলে, ঈশ্বর-প্রদত্ত দানবিক শক্তিকে কাজে লাগালাম সেই প্রথম। তরবারির মতোই প্রায় দীর্ঘ ছুরীখানা প্রচণ্ড বেগে একজনের খুলি দু ফাঁক করে দিয়ে চোখ শুদ্ধ

ভাগড়ে দিতে গতায়ু দেহটা ঠিকরে গেল নিচে—সেই সঙ্গে শক্ত হয়ে এঁটে থাকা ছুরীটাও আমার হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল খুলিতে-লাগা অবস্থাতেই।

সঙ্গে সঙ্গে দু-দুটো দানবাকার চিতাচর্ম পরা শয়তান লাফিয়ে পড়েছিল আমার দিকে। নিরস্ত্র আমি। কিন্তু গরিলার বাহুর মতো বলবান বাহু দুটো তো আছে। পলক ফেলার আগেই কোমর জড়িয়ে ধরেছিলাম দুজনের এবং ঝটাপটি করতে করতে তিনজনেই দড়াম করে আছড়ে পড়েছিলাম মঞ্চের নিচে পাথুরে মেঝেতে। দুজনেই শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু আমিও ক্রোধে উন্মাদ। হত্যাপাগলও বটে। মৃত্যু যখন আসন্ন, প্রাণ যখন বিপন্ন, তখন সব সভ্য মানুষেরই অন্তরের কোণ থেকে হত্যালালসা মাথা চাড়া দেয়। ব্যতি-ক্রম ঘটেনি আমার ক্ষেত্রেও। খুনের নেশায় এবং সীমাহীন রোষে আমার পেশীতন্তুগুলো তখন হস্তীবলে বলীয়ান হয়ে উঠেছে। দুই শয়তানকে দু-বগলে চেপে ধরে ময়াল-বন্ধনে মট মট করে ভাঙতে লাগলাম একটা একটা করে পাঁজরার হাড়। দম আটকে এল তাদের, জিভ বেরিয়ে এল, চোখ ঠেলে এল। তবুও আমি বাহু শিথিল করলাম না। বর্শার আঘাত এড়িয়ে গেলাম দুই বগলদাবা শত্রুকে ঢালের মতো ব্যবহার করে।

ঐ অবস্থাতেই হাঁপাতে হাঁপাতে দেখলাম মঞ্চ থেকে নেমে পড়েছে লিও। প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত তার মুখাবয়ব। লড়ছে ভয়ানকভাবে। কিন্তু সে একা। একপাল নেকড়ে যেন ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকে—শিংওলা পাহাড়ি হরিণকে যেন বাগে আনতে পারছে না কিছুতেই। লড়াই চলছে প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে। তাই বর্শা ব্যবহার করতে পারছে না আমাহাগ্গাররা। ছুরী বা লাঠিও নেই কারো সঙ্গে। সুযোগটা নষ্ট করেনি লিও। ধারালো ফলার এক কোপে একজনকে ফর্দাফাঁই করল সে বিদ্যুৎবেগে এবং হাতের ছুরীও কিভাবে যেন ফস্কে গেল মুঠো থেকে। সভয়ে দেখলাম, আমার মতোই সে এখন নিরস্ত্র। মৃত্যুরও আর দেরী নেই। কিন্তু না—পলকের মধ্যে তেল্কী দেখিয়ে দিল লিও। নিহত জোয়ানকে দু-হাতে এক ঝটকায় তুলে নিল মাথার ওপর। সবলে নিক্ষেপ করল আগুয়ান শত্রুদের গায়ের ওপর। ভারী লাশের সংঘাতে জনা পাঁচ ছয় শয়তান ঠিকরে গেল মেঝের ওপর। পরমুহূর্তেই কিন্তু ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল আবার ছেঁকে ধরল মহিমা সিংহকে—পেড়ে ফেলল পাথুরে মেঝেতে।

বিষাণ বেজে উঠল যেন যেন একজনের কণ্ঠে—'আনো বর্শা, কাটো গলা, পাত্র ভরে নাও তাজা রক্তে।'

বন্ধ হয়ে এল আমার চোখের পাতা। এ-দৃশ্য আর না দেখাই ভালো।
চোখ বন্ধ করার আগেই দেখেছিলাম, বর্শা হাতে ধেয়ে আসছে রুধিরপিয়াসী
এক নরপিশাচ। আমার নিজের ওঠবার ক্ষমতাও তখন নেই। বগলদাবা
দুই শত্রুর প্রাণ এখনো পিঞ্জরছাড়া হয়নি। বিরামবিহীন শক্তিক্ষয় কাহিল
করে এনেছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। মাথা ঘুরছে, চোখে ধোঁয়া দেখছি। মৃত্যুব্যাধিতে
যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি।

আচমকা কানে ভেসে এল একটা ভয়ানক সোরগোল। চোখ খুলে
গিয়েছিল আপনা থেকেই। সটান চেয়েছিলাম নরমেধ যেদিকে অনুষ্ঠিত
হতে চলেছে, সেইদিকে। উমটেন লাফিয়ে পড়েছে লিও-র বুকে। নিজের
দেহ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে লিও-র সারা দেহ। দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে
তার গলা। পিশাচ-পুরুষরা তাকে সবলে খসিয়ে আনতে গিয়েও পারছে না।
দু-পা দিয়ে লিও-কে বেষ্টন করে ধরেছে উমটেন—ঝুলছে ঠিক বৃক্ষবেষ্টিত
লতার মতো। পাশ থেকে লিও-র দেহে বর্শা ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও
ব্যর্থ হচ্ছে উমটেনের অসমসাহসিক প্রচেষ্টায়— দুমড়ে মুচড়ে প্রতিবারেই
ব্যর্থ করছে বর্শার আঘাত। জখম হচ্ছে লিও ঠিকই—কিন্তু তার বেশী
কিছু নয়।

'গেঁথে ফ্যালো দুজনকেই বর্শা দিয়ে। বিয়েটা হয়ে যাক ভালো করেই।'
এ-সেই কণ্ঠস্বর যা বীভৎস ভোজসভায় ধ্বনিত হয়েছিল সবার আগে।

শরীর পেছনে হেলিয়ে মাথার ওপর বর্শা তুলল বর্শাধারী। নৈশপ্রদীপের
আলো ঠিকরে গেল শীতল ফলা থেকে। আবার বন্ধ হয়ে এল আমার
দু-চোখের পাতা।

ঠিক সেই মুহূর্তে কানের পর্দায় আছড়ে পড়ল একটা ভৈরব-গর্জন।
বজ্রকণ্ঠের সংক্ষিপ্ত আদেশ। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতে গমগম্ করে উঠল
অতবড় গুহাটা পুরুষ কণ্ঠের ঐ একটি শব্দেই।

'থামো !'

অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম তারপরেই। কালো যবনিকা নেমে এসেছিল
মনের চোখে। মৃত্যুকূপে তলিয়ে যাচ্ছি, লীলা খেলা সাঙ্গ হচ্ছে—বিদ্যুৎ-
ঝলকের মতো মনে হয়েছিল ঐটুকু সময়ের মধ্যে।

(৯) ছোট্ট পা

চোখ খুললাম। দেখি, শুয়ে আছি অগ্নিকুণ্ডের অনতিদূরে। এই সেই
অগ্নিকুণ্ড যা প্রজ্বলিত হয়েছিল বীভৎস ভোজসভা উপলক্ষ্যে। লিও শুয়ে
আছে পাশেই। অজ্ঞান হয়ে গেছে বোধহয়। উমটেনের দীর্ঘ মূর্তি ঝুঁকে

রয়েছে তার ওপর। লিও-র কোমরে বর্শা বিঁধেছিল। ক্ষতস্থান ধুইয়ে দিচ্ছে ঠাণ্ডা জলে। পাশেই ব্যাণ্ডেজ রয়েছে, বেঁধে দেবে ধোওয়া হয়ে গেলেই। পেছনের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে জব। অক্ষত। কিন্তু কালসিটে পড়ে গেছে সারা গায়ে। কাঁপছে। অগ্নিকুণ্ডের ওদিকে পড়ে অনেকগুলো মৃতদেহ। মরণপণ লড়াইয়ে যাদের খতম করেছি, তারা। এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে যেন অসীম ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাঁদিকে একদল পুরুষ পিছমোড়া করে বাঁধছে জীবিত নরখাদকদের। পেছনে হাত টেনে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে বেঁধে ফেলছে দুজনকে। দুই চোখে রোষাগ্নি সত্ত্বেও উদাসীন থাকার চেষ্টা করছে রশিবদ্ধ পাষণ্ডরা। এদের সামনে দাঁড়িয়ে তদারক করছে বিল্লালি। আমাদের বন্ধু। ক্লান্ত। কিন্তু গোষ্ঠীপতির মর্যাদায় অটল। লম্বা দাড়ি লুটোচ্ছে বুকের ওপর। প্রশান্ত। যেন ষাঁড়বলির তদারকি চালিয়ে যাচ্ছে ধীরস্থিরভাবে।

আমি উঠে বসতেই কাছে এসে দাঁড়াল বিল্লালি। জিজ্ঞেস করল, সুস্থবোধ করছি কিনা।

বলতে বলতে ঝুঁকে পড়ল লিও-র ওপর—'খুবই মারাত্মক চোট। তবে নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত বর্শার ফলা পৌঁছোয়নি। বেঁচে যাবে।'

বললাম—'পিতা, আর এক মিনিট দেরাতে যদি আসতেন, কেউই বাঁচতাম না। চাকরটাকে যেভাবে খুন করেছে, সেইভাবেই খতম করত আমাদেরও আপনার শয়তান স্যাঙাৎরা।'

দাঁতে দাঁত ঘষল বৃদ্ধ। প্রদীপ্ত হল দুই চোখ অস্বাভাবিক নারকীয় দ্যুতিতে—'পুত্র, ভয় কী? 'সেই-নারী' এদের সাজা দেবেন নিজের হাতে—তোমার কৃষ্ণ অনুচর এমনিতেই মরত, কিন্তু এরা মরবে সাতগুণ বেশী যন্ত্রণা পেয়ে। 'সেই-নারী'র সামনেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উচিত সাজার জন্যে। কিন্তু এ ব্যাপার ঘটল কি করে শুনি।'

সংক্ষেপে বললাম সব কথা।

'তাই বলো। পুত্র, এ দেশের রীতি বিদেশী এলেই মাথায় গরম পাত্র চাপিয়ে মেরে ফেলা।'

'তারপরে খেয়ে ফেলা?'

'হ্যাঁ।'

'পিতা, এ-যে উল্টো আতিথেয়তা। আমাদের মুলুকে বিদেশীকে খেতে দেওয়া হয়, তাকে খাওয়া হয় না। আপনারা দেখছি বিদেশী খেয়েই মজা পান।'

'এই রীতিই চলে আসছে আবহমানকাল, করার কিছু নেই। তবে আমার নিজের কথা যদি শোনো বলতে পারি। বিদেশীদের মাংস মোটেই ভাল লাগে না। জলাভূমি পেরিয়ে বুনো মুরগী খেয়ে যারা আসে, তাদের মাংস তো মুখে দেওয়াই যায় না। 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ-মানতেই-হবে' বলে পাঠিয়েছিলেন তোমাদের যেন বধ করা না হয়। কালো মানুষ সম্বন্ধে তো কিছু বলেন নি। তাই এই হায়নার দল ওকেই খাওয়ার মতলব করেছিল। যে মেয়েটা উস্‌কে দিয়েছিল, তাকে খুন করে ভালোই করেছো। যাকগে, পুরস্কারও তেমনি পাবে। 'সেই-নারী'র ভয়ংকর ক্রোধের সামনে দাঁড়ানোর মতো ভয়ানক ব্যাপার আর নেই—তার আগেই মরে গেলে কিন্তু বেঁচে যেতো। তোমরা যাদের মেরেছো, তারা কিন্তু মরে বেঁচে গেছে।'

ভোর হল। সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট। উঠে দাঁড়াতেও পারলাম না। সাতটা মাগাদ বিচ্ছিরিভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল জ্বর। চাকাপানা গোল মুখটা পচা আপেলের মতো রঙীন হয়ে উঠেছে। শুনলাম, শিশু ঘুমিয়েছে ভালই। তবে বড় কাহিল। ঘণ্টা কয়েক পরে এলো বিল্লালি নিজেই।

এই ফাঁকে বলে রাখি, বিল্লালিকে জ্বর 'বিল্লি-ছাগল' বলে ডাকত। 'বিল্লি'র মতোই লম্বাটে সাদা দাড়ি দেখে উপমাটা এসেছিল ওর মাথায়।

বিল্লালির হাতে লক্ষ্য। তালঢ্যাঙা বপু যেন ফুঁড়ে প্রকোষ্ঠের ছাদে গিয়ে ঠেকছে। মটকা মেরে পড়ে রইলাম বটে, চোখের পাতা দিয়ে নজর রাখলাম বিদ্রূপ কৌতুক মাখানো সুশ্রী কালজীর্ণ মুখখানার ওপর। দেখলাম যুগল চক্ষু নিবদ্ধ আমার ওপর।

স্বগতোক্তি ভেসে এল কানে। বিল্লালির এই এক মুদ্রাদোষ। বিড় বিড় করে কথা বলতো নিজের সঙ্গেই।

'বাকী দুজনের মতো সুদর্শন নয়—অত্যন্ত কদাকার—ঠিক যেন বেবুন। ভাল লাগে তবুও। এত বুড়ো বয়েসে কেন যে একে এত ভালো লাগছে জানি না। প্রবাদ আছে 'বিশ্বাস কোরো না কোনো পুরুষকেই—বেশী অবিশ্বাস যাকে, তাকে বধ করবে তৎক্ষণাৎ। তফাতে থাকবে মেয়েদের কাছ থেকে। বড় দুষ্ট এরা, শেষ পর্যন্ত হনন করবে তোমাকেই।' চমৎকার প্রবাদ বাক্য, বিশেষ করে শেষের অংশটা। প্রাচীন পুরুষরা রচনা করে গেছিলেন নিশ্চয়। বেবুনটাকে ভালো লাগছে তা সত্ত্বেও। এত মিষ্টি কথা বলে, এত চমৎকার লড়তে জানে—কায়দাগুলো শিখল কোত্থেকে জানি না। 'সেই-নারী'র জাদু যেন এর ওপর বর্ষিত না হয়। লড়াই করে ইস্তক বেচারা ধুঁকছে। ঘুমোক, ঘুম ভাঙাতে চাই না।'

পা টিপে টিপে প্রবেশপথের দিকে এগোলো বিল্লাশি। মটকা মেরে রইলাম দূরে না যাওয়া পর্যন্ত। তারপর ডাকলাম পেছন থেকে।

'পিতা, আপনি ?'

'হ্যাঁ পুত্র, আমি। ঘুমোও, বিরক্ত করতে চাই না। কি রকম আছো দেখতে এসেছিলাম। যাদের নিগ্রহে এই অবস্থা তোমার, তারা রওনা হয়ে গেছে 'সেই-নারী'র ডেরার দিকে। তোমাদেরও যেতে হবে এখুনি—আদেশ তাই।'

'কিন্তু একটু সুস্থ না হলে তো যেতে পারব না। পিতা, বাইরের আলোয় নিয়ে চলুন—এ জায়গা ভালো লাগছে না।'

'জানি লাগবে না। বড় বিষণ্ণ হাওয়া এখানকার। যে বেঞ্চিতে শুয়ে আছো, ঐ বেঞ্চিতেই একটা সাদা নারীকে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম ছেলেবেলায়। ধবধবে সাদা গায়ের রঙ, চুলের রঙ হলদে—পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। এ রকম দেহ আরো আছে 'সেই-নারী' যেখানে থাকেন, সেখানকার সমাধি মন্দিরে। কি ভাবে যে মৃত্যুর পরেও দেহটাকে টিঁকিয়ে রাখা হয়, আমার তা জানা নেই। এতটুকু নষ্ট হয় না শরীর, দেহ নিষ্প্রাণ হলেও। রোজ আসতাম সাদা মেয়েটিকে দেখতে। ছেলেমানুষ তখন। ভালোবেসে ফেলেছিলাম তাকে। হেসো না। জানতাম, খোলসটুকুই কেবল পড়ে, প্রাণ নেই ভেতরে—তবুও ভালোবেসে ছিলাম। পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে চুমু খেতাম কপালে। অবাক হয়ে ভাবতাম, জীবদ্দশায় না জানি কত পুরুষ ভালবেসেছে তাকে, বেঁধেছে, বাহুপাশে। জীবনের মস্ত পাঠ নিয়েছিলাম তখনি। জেনেছিলাম, জীবন অনেক ছোট্ট মৃত্যুর চেয়ে—মৃত্যু অনেক দীর্ঘ জীবনের চেয়ে। সূর্যতলে যা কিছু দেখছি, সবই একদিন জীবনের উষ্ণতা হারিয়ে মৃত্যুর শীতল পথে রওনা হবে—বিস্মৃত হবে প্রত্যেকেই। দিনে দিনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম এই জীবন দর্শনে। একদিন খটকা লাগে আমার মায়ের। বড় সজাগ ছিলেন। পেছন পেছন এসে দেখেছিলেন আমার কাণ্ড। আর দেরী করেননি। ভেবেছিলেন মড়ার জাদুতে পেয়ে বসেছে আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন চুলে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল মেয়েটি। আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল পা পর্যন্ত। এই ধরনের টিকিয়ে রাখা দেহ শুকনো মশালের মতোই জ্বলে উঠতো একটুতেই। আমি কিন্তু ফিরে এসে পা-খানা কেটে নিয়ে ন্যাকড়ায় মুড়ে রেখে দিয়েছিলাম বেঞ্চির তলায় ছোট্ট ঐ গর্তটায়। এখনো থাকতে পারে। সেইদিন থেকে আর তো ঢুকিনি এখানে। দেখি আছে কিনা,' বলে হেঁট হয়ে বেঞ্চির তলায় সরু ফুটোটায় হাত গলিয়ে

দিয়েছিল বিল্লালি। একটু পরেই ধুলোভর্তি একটা ন্যাকড়ায় মোড়া পুলিন্দা বার করে এনে ফেলেছিল মেঝেতে। সে কী উল্লাস। ধুলো ঝাড়তে গিয়ে খসে পড়েছিল জীর্ণ ন্যাকড়ার বেশ কিছুটা। মোড়ক খুলতেই চমকে উঠেছিলাম। ফুটফুটে সাদা একটা পা। স্ত্রীলোকের পা। একেবারে টাটকা বললেই চলে। যেন গতকাল রাখা হয়েছে ফোকরে।

পা-খানা আমার হাতে তুলে দিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেছিল বিল্লানি—'দেখুন, তোমাকেই দিলাম। রেখে দাও। মিথ্যে যে বলিনি, তার প্রমাণ।'

কি যে মোহিনীশক্তি ছিল ঐ একখানি পায়ের মধ্যে, আজও তা আমার কাছে এক বিরাট রহস্য। ভয়ে বিস্ময়ে চেয়েছিলাম নির্নিমেষে। জীবদ্দশায় যতটা ভারী ছিল, এখন আর ততটা নেই। বেশ হাল্কা সুবাস লেগে চামড়ায়। জ্যান্ত মানুষের মতোই প্রায় টাটকা বলা চলে। মাংস আর চামড়া শুকিয়ে যায়নি, গা ঘিনঘিনে আকৃতি নেয়নি। বেশ ফুলো ফুলো এবং ফর্সা টুকটুকে। পোড়া জায়গাটা বাদ দিলে বাদবাকী অংশ জ্যান্ত পায়ের মতোই নরম তুলতুলে। মামীকরণ যে এত উচ্চাঙ্গের হয়, জানা ছিল না।

জীর্ণ বস্ত্রটা দিয়েই পা-খানা মুড়ে রেখে দিয়েছিলাম আমার গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগে। তারপর বিল্লানির হাত ধরে গিয়েছিলাম লিওকে দেখতে। আমার চাইতেও সারা গা থেঁৎলেছে বেশী। গায়ের রঙ বড় বেশী সাদা বলেই বোধ হয় কালসিটেগুলো বেশী করে চোখে পড়ছে। রক্তক্ষরণের ফলে বেশ কাহিল। কিন্তু খুশীর পেয়ালা যেন উপচে পড়ছে। আমাকে দেখেই তার ইচ্ছে হল প্রাতরাশ খাওয়ার।

তৃতীয় দিবসে বেশ সেরে উঠলাম আমি আর জব। লিওর অবস্থা ভালোর দিকে দেখে বিল্লানির পীড়াপীড়িতে সায় না দিয়ে পারলাম না। 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ-মানতেই-হবে' থাকেন 'কোর' নামক জায়গায়। সদলবলে রওনা হওয়া দরকার আর দেরী না করে। রাজী হলাম বটে, কিন্তু মনের অস্বস্তি গেল না। 'সেই-নারী' সন্দর্শনের প্রতিক্রিয়াটা লিও-র ওপরে ভাল নাও হতে পারে, ক্ষতমুখ এখনো জোড়েনি—যাওয়ার পথে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গেলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। রাজী হলাম কেবল বিল্লানির উদ্বেগ দেখে। দেরী করলে নিশ্চয় মহাবিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে, এই ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে বৃদ্ধ—মুখে প্রকাশ করতে চাইছে না। ওর এই উদ্বেগ দেখেই যেতে রাজী হলাম, নইলে যেতাম না।

(১০) দূরকল্পনা

রাজী হওয়ার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই গুহামুখে হাজির হল পাঁচটা

শিবিকা। প্রত্যেক শিবিকা বইবে চারজন বেহারা, সঙ্গে যাবে বাড়তি দুজন। মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবে আরও পঞ্চাশজন—প্রত্যেকেই সশস্ত্র। রক্ষীর কাজও করতে হবে বলেই এই অস্ত্রসজ্জা, তিনটে শিবিকা আমাদের তিনজনের জন্য, একটা বিল্লালির, আর একটা উসটেনের।

উসটেন সঙ্গে যাবে শুনে অবাক হয়েছিলাম। বিল্লালি বলেছিল উদাসীন স্বরে, ইচ্ছে হলে যাবে বইকি। এদেশে নাকি মেয়েরাই সবার পূজা পায়। সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখেছে তো তারাই। তাই কেউ বাধা দেয় না মেয়েদের ইচ্ছায়। তবে যা খুশী তা করবার মর্জি বরদাস্ত করা হয় একটা বয়স পর্যন্ত। অসহ্য হয়ে উঠলেই প্রতি দ্বিতীয় প্রজন্মে মাথা চাড়া দেয় পুরুষরা—মেরে ফ্যালে বুড়িদের। প্রমাণ করে ছায়, পুরুষই শ্রেষ্ঠ—নারী নয়। এইভাবেই নাকি বছর তিনেক আগে খতম হয়েছে বিল্লালির নিজের বউও, বেঁচেছে তারপর থেকে। বুড়ো বলে আর কোনো মেয়ে জ্বালাতে আসে না।

উসটেন তো সঙ্গে যাবেই। অত সাহস ক'জনের আছে? সিংহকে আঁকড়ে ধরে প্রাণে বাঁচিয়েছে তো সে-ই। দেশের রীতি অনুযায়ী দুজনের বিয়েও হয়ে গেছে। লিও র সঙ্গে যত্রতত্র যাওয়ার অধিকারও তার আছে—যদি না বাধা দেন 'সেই-নারী'।

প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি, বিল্লালিকে জব যেমন আড়ালে বলতো 'বিল্লি-ছাগল,' বিল্লালিও তেমনি সবার সামনেই আমাদের তিনজনের তিনটে নাম দিয়েছিল। আমাকে ডাকতো বেবুন বলে, লিও-কে সিংহ আর জবকে শুওর। বেচারীর গোল মুখ আর কুৎকুতে চোখ দেখে শুওরের কথাই মনে হয়েছিল বিল্লালির। লিও-র বীরত্ব এনে দিয়েছিল তাকে সিংহ খেতাব। আমি হয়েছিলাম বেবুন—আমার কুৎসিত চেহারার জন্যে।

'সেই-নারী' উসটেন-লিওর বিয়েতে বাগড়া দিতে পারে শুনে প্রশ্ন করেছিলাম—'উসটেন যদি লিও-কে ছেড়ে যেতে না চায়?'

'ঝড়ে যে গাছ নুয়ে পড়তে চায় না, তার কি হয়?' বলে শিবিকায় গিয়ে উঠেছিল বিল্লালি। দশ মিনিট পরেই শিবিকা রওনা হল 'কোর' অভিমুখে। আগেয়-সমতল পেরোতে লাগল একঘন্টার একটু বেশী। দূরের ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল আধঘন্টার মতো। ওপরে ওঠার পর ভারী ভালো লাগল সামনের দৃশ্য। দীর্ঘবিস্তৃত ঘাসছাওয়া খাড়াই ঢাল—মাঝেমাঝে কাঁটাঝোপ আর কাঁটাগাছের জটলা, ঢালু জমির তলদেশে ন-দশ মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার মত একটা জলাভূমি—মেঘের মতো বিষবাষ্প

ভাসছে ওপরে। জলাভূমি না বলে তাকে জলাসমুদ্রই বলা উচিত। দুপুর নাগাদ পৌঁছোলাম ফাড়হিম করা জলার কিনারায়। খাওয়া দাওয়া সেরে আঁকাবাঁকা পথে ঢুকে পড়লাম জলার ভেতরে।

সূর্য যখন ডুবু ডুবু, তখন পৌঁছোলাম একটা উঁচুমতো ছ-বিঘে পরিমিত অঞ্চলে—জলাসমুদ্রের ক্ষুদে মরুদ্যান বললেই চলে। বিল্লাশির হুকুম হল এইখানেই রাত কাটাতে হবে। শুকনো ঘাস পাতার ধুনি জ্বালিয়ে বসে পড়লাম চারপাশে। অতি যাচ্ছেতাই জায়গা, কখনো গরম, কখনো ঠাণ্ডা, খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে পড়লাম কম্বল মুড়ি দিয়ে।

চোখে কিন্তু ঘুম এল না। কয়েকশ' বছর আগে লেখা উদ্ভট উপাখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অ্যাডভেঞ্চারের পরিণতি কি হবে, সাতপাঁচ সেই ভাবনাতেই মাথা গরম হয়ে গেল। 'সেই-নারী' নামক মহিলাটির কথা ভেবে মাথা গুলিয়ে গেল। প্রস্তাদের মতো রানীও অসাধারণ। তা সত্ত্বেও লুপ্ত সভ্যতায় রানী হয়ে পড়ে আছে কেন বুঝলাম না। আশ্চর্য আগুন নাকি সীমাহীন আয়ুদান করে। আগুনটা আসলে কী? বিশেষ কোনো তরল পদার্থ অথবা সার পদার্থ নয়তো? পচনরোধ করে মাংসকে অক্ষয় করে তুলতে পারে? মহাকাল শত আঘাত হেনেও কালজীর্ণ করতে পারে না প্রাণের আধার এই দেহ-কাঠামোর মাংস-প্রাচীরকে? কে জানে সত্যিই এরকম কোনো বস্তু ধরায় আছে কিনা। যদিও বা থাকে এবং 'সেই-নারী নামক মহিলাটি যদি সত্যিই অমরত্ব লাভ করে থাকে এই অমৃত-অগ্নির পরশে (যদিও আমি বিশ্বাস করি না একবর্ণও), তাহলে এত শক্তি নিয়েও নরখাদক-দের সমাজে পড়ে রয়েছে কেন?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙলো উষালগ্নে। রক্ষী আর বেহারারা প্রেতচ্ছায়ার মত ঘুরছে ভোরের কুয়াশার মধ্যে। যাত্রা শুরুর আয়োজন চলছে। উঠে বসলাম। ভোরের স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড পর্যন্ত কেঁপে উঠল। লিও-র দিকে তাকিয়ে দেখি সে বেচারী মাথা চেপে বসে আছে। মুখ রক্তাভ। চোখ প্রদীপ্ত। তারারন্ধ্র হরিদ্রাভ।

শুনলাম, মাথা ফেটে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। সারা শরীর কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। জ্বর এলো নাকি?

জবের অবস্থাও দেখলাম ভালো নয়। পিঠ টনটন করছে, মাথা ঘুরছে, চোখে ধোঁয়া দেখছে। দুজনকেই দশ গ্রেণ করে কুইনাইন গিলিয়ে দিয়ে আমি নিজেও খেলাম অল্প মাত্রায়। বিল্লালিকে ডেকে এনে দেখালাম দুজনের অবস্থা। মাথা নেড়ে সে জানালে, এ হল গিয়ে জলাভূমির রোগ। কিন্তু

জয় হয়েছে বলে শুয়ে থাকলে চলবে না—নির্ঘাৎ মারা যাবে তাহলে। পাল্কী চেপে পেরিয়ে যেতে হবে জলাভূমি দিনের আলো থাকতেই—রাত্তে পাওয়া যাবে ভালো হাওয়া। শিবিকায় চেপে গেলে শরীর অত খারাপ লাগবে না—যেতে যেতেই খেয়ে নিতে হবে।

রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম তীক্ষ্ণ চীৎকার, 'গেল-গেল' চেঁচামেচি, পরক্ষণেই ঝপাস্ করে একটা শব্দ। দাঁড়িয়ে গেল শিবিকা বাহিনী।

লাফিয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে দেখি, জলাভূমির খাড়াই পাড় বরাবর পথ বেয়ে যেতে গিয়ে বিল্লালির শিবিকা গড়িয়ে গেছে পাঁকের মধ্যে। লোকজন হাত তুলে দেখাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে—কিন্তু পাঁকে নেমে গিয়ে বুড়োকে টেনে তোলার কোনো লক্ষণই দেখাচ্ছে না। এক ঝটকায় সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সটান ঝাঁপ দিলাম পচা পাঁকে, অতি কষ্টে নাগাল পেলাম বিল্লালির। সে বেচারী ধড়াচূড়া নিয়ে তখন এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে আঠালো কাদায় যে নড়তেই পারছে না। আগে টান মেরে খুলে দিলাম জাঁকালো খাল্লা, তারপর বাহু ধরে কি কষ্টে যে টেনে নিয়ে এলাম নরম কাদার মধ্যে দিয়ে শক্ত জমির ওপর—তা ঈশ্বরই জানেন। বুদ্ধিমান বিল্লালি জলমগ্ন নির্বোধদের মত মরিয়া হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরতে যায়নি বলেই সম্ভব হল কাজটা। পাড়ে উঠে দুজনের পাঁক সাফ করতেই গেল বেশ কিছুটা সময়। সবুজ পাঁকে সেকী চেহারা দুজনের। বুড়োর সাদা দাড়ি পর্যন্ত বিলকুল সবুজ হয়ে লেপটে গেছে সারা গায়ে। সেই অবস্থাতেও মর্যাদা অটল রেখেছিল বৃদ্ধ। একটু ধাতস্থ হয়ে রোষকম্পিত গলায় শাসিয়েছিল অনুচরদের—প্রাণে মরতে বসেছে দেখেও কেউ তাকে বাঁচাতে যায় নি—বিদেশী বেবুন না থাকলে প্রাণটা তো বাঁচত না। বিল্লালি কিছু ভোলে না—সব মনে থাকবে।

হ্যাঁ, আমার কথাও মনে থাকবে, বলেছিল বৃদ্ধ। তার প্রাণ যখন বাঁচিয়েছি, তখন কে জানে হয়তো একদিন আমার প্রাণ বাঁচানোরও মুহূর্ত আসবে। সেই মুহূর্তে এগিয়ে আসবে গোষ্ঠীপতি বিল্লালি স্বয়ং।

(১১) 'কোর'

সূর্যাস্তের এক ঘন্টা আগেই পেরিয়ে এলাম জলা সমুদ্রের এলাকা। বাঁচলাম। সামনেই তরঙ্গায়িত ভূমি ওপর দিকে উঠে গেছে একটু একটু করে। প্রথম তরঙ্গের শীর্ষে শিবিকা নামানো হল সেই রাতের মতো। প্রথমে দেখলাম লিও-র অবস্থা। কষ্ট বেড়েছে। বমি শুরু হয়েছে। চলল সূর্য না ওঠা পর্যন্ত। ঘুমোতে পারিনি মুহূর্তের জন্যেও। উসটেন আর

আমি সবাকে সেবা করে গেছি লিও আর জবের। উদটেনের মতো অক্লান্ত সেবাময়ী মেয়ে কখনো দেখিনি।

ভোর হল। প্রলাপ বকতে লাগল লিও। ধড়খানা বাকি দু-টুকরো হয়ে রয়েছে। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আমার নিজের অবস্থাও হল শোচনীয়। এই ধরনের জ্বর আর প্রলাপের পরিণতি আমার অজানা নয়। আকাশ-পাতাল ভাবছি, এমন সময়ে বিল্লালি এসে হুকুম দিলে এখুনি রওনা হওয়া দরকার—লিও-র জন্যেই। বারো ঘণ্টার মধ্যে যদি ওর উপযুক্ত শুশ্রূষার ব্যবস্থা না হয়, তাহলে দু-একদিনের বেশী বাঁচানো যাবে না। এই যুক্তির পর রাজী না হয়ে পারা যায় না। তৎক্ষণাৎ লিওকে তোলা হল শিবিকায়। উসটেন দৌড়ে চলল শিবিকার পাশে। হাতে হাতপাখা। বাতাস করে মাছি তাড়াচ্ছে। নজর রেখেছে যেন জ্বরের ঘোরে শিবিকা থেকে ছিটকে পড়ে না যায়।

সূর্য ওঠার আধঘন্টার মধ্যেই পৌঁছোলাম তরঙ্গায়িত উচ্চভূমির শীর্ষদেশে। চোখের সামনে ভেসে উঠল অতি সুন্দর দৃশ্য। পায়ের তলায় সবুজ তৃণভূমি। বহুদূর বিস্তৃত। প্রকৃতি বুঝি আশ মিটিয়ে সাজিয়েছেন এই সমতলভূমিকে। ফুল আর ফলের কতই না রঙ। চোখ জুড়িয়ে যায় অপূর্ব সুন্দর উদ্ভিদ-শোভায়। প্রায় আঠারো মাইল দূরে অতর্কিতে সমতল ছেড়ে সটান আকাশ পানে মাথা তুলে রয়েছে অতি-অসাধারণ এক পর্বত। তলদেশে সবুজ ঘাস ছাওয়া জমি ঢালু হয়ে একটু একটু করে উঠে গেছে প্রায় পাঁচশ ফুট পর্যন্ত। তারপরেই একেবারে খাড়াই পর্বত—ন্যাড়া রুক্ষ পাথর-প্রাচীর—বারো থেকে পনেরোশ ফুট উঁচু। এতবড় পাহাড়ের পরিধি আন্দাজ করা কঠিন। আমার তো মনে হয় প্রায় পঞ্চাশ মাইল জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে সেই বিশাল পর্বত।

শিবিকায় বসে রোমাঞ্চকর এবং জমকাল সেই নিসর্গ দৃশ্যের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছি, এমন সময়ে বিল্লালির শিবিকা এসে দাঁড়ালো পাশে।

'ওহে বেবুন, 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ-মানতেই হবে'র ভবন লাগছে কেমন?'

'অপূর্ব। কিন্তু ঢোকবার রাস্তা কোথায়? খাড়াই পাহাড়ে ওঠার জায়গা তো দেখছি না।'

'সবই দেখতে পাবে। নিচে তাকাও। ঐ যে রাস্তাটা দেখছো, বলো তো ওটা কী?'

ঝোপে ছাওয়া রাস্তার মতো একটা বিস্তৃত পথ রয়েছে পর্বত প্রাচীরের

তলদেশ পর্যন্ত। দুপাশের উঁচু পাড় ভেঙে গেছে বেশ কয়েক জায়গায়। অদ্ভুত নির্মাণ পদ্ধতি দেখে খটকা লাগল।

বললাম—'আপাতঃ দৃষ্টিতে রাস্তা বলেই মনে হয়। তবে হয়তো এক-কালে নদী ছিল, অথবা হাতে কাটা খাল।'

'ঠিকই বলেছো, পুত্র। পূর্বপুরুষরা খুঁড়েছিল এই খাল জল নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। পাহাড়-ঘেরা অঞ্চলে এককালে ছিল একটা বিরাট সরোবর। যাচ্ছি কিন্তু সেইখানেই।'

'সরোবরে ?'

'এখন নেই। পূর্বপুরুষরা অনেক আশ্চর্য শিল্পবিদ্যা জানতো—তার কিছুই জানি না আমরা। পাহাড় ফুটো করে ফেলেছিল সরোবরের তলা পর্যন্ত। কিভাবে করেছিল, তাও জানি না। খালও কেটেছিল—ঐ সেই খাল। খাল কাটার পর নিরেট পাথর ফুটো করে দিতেই সরোবরের জল বেরিয়ে গিয়েছিল খালের মধ্যে দিয়ে—নিচু জমি ভাসিয়ে দিতে সৃষ্ট হয়েছিল জলাভূমির—যে জলাভূমি পেরিয়ে এলাম আমরা। সরোবরের জল নেমে যাওয়ার পর জলশূন্য বিশাল অঞ্চলে নির্মাণ করেছিল প্রকাণ্ড শহর। নাম তার 'কোর'—আজ আছে তার ধ্বংসস্তূপ। 'কোর' নামটা কিন্তু এখনো রয়ে গেছে। তারপর অতিবাহিত হয়েছে শতাব্দীর শতাব্দী। পরের যুগের মানুষরা পাথর কেটে বানিয়েছে গুহা আর পথ। সবই দেখবে একটু পরে।'

'বৃষ্টির জলে আর ঝর্ণার জলে সরোবর আবার ভরে ওঠে না কেন ?'

'পূর্বপুরুষদের দূরদৃষ্টি আর জ্ঞানবুদ্ধি সে সম্ভাবনাও বন্ধ করেছে। নর্দমা কেটে দিয়েছে জল বার করে দেওয়ার জন্যে। ডানদিকের ঐ নদ'টা ছাখো।'

মাইল চারেক ডাইনে প্রান্তরে প্রবহমান একটা ছোট স্রোতস্বিনী দেখালো বিল্লালি।

'ঐ সেই নর্দমা। পাহাড়ের যে ফুটো দিয়ে সরোবরের জল বার করে দেওয়া হয়েছে, ড্রেনের জল আসছে সেই ফুটো দিয়েই। খুব সম্ভব প্রথম দিকে খাদ দিয়ে জল বয়ে যেত। তারপর ঘুরিয়ে দেওয়া হয় জলের গতিপথ। রাস্তার মতো ব্যবহার করা হয়েছে কাটা নদীখাতকে।'

'ড্রেন ছাড়া পাহাড়ের ভেতরে ঢোকার আর পথ নেই ?'

'আছে। গুপ্তপথ। গরুছাগল আর মানুষ অতিকষ্টে যাতায়াত করে সেই পথ দিয়ে। একবছর ধরে খুঁজলেও তার হদিশ পাবে না। পাহাড়ের গায়ে ঐ যে গরুছাগল চরে বেড়াচ্ছে, বছরে একবার ওদের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। পথের ব্যবহার হয় তখন।'

শিবিকা পৌঁছোলো খাড়াই পর্বতপ্রাচীরের তলদেশে। সামনেই দেখলাম একটা সুড়ঙ্গ। অন্ধকারে ঢাকা। হড় হড় করে জলধারা বেরিয়ে আসছে সুড়ঙ্গ দিয়ে। আসবার পথে দেখে এসেছি, এই জলধারার পাশ দিয়েই আসতে হয়েছে আমাদের। পাথর কেটে বানানো নদীখাতের মধ্যে দিয়ে অর্ধেক পথ গিয়েই ডানদিকে মোড় নিয়েছে নর্দমার জল—বাকী অর্ধেক খটখটে—যাতায়াতের পথ। জল যদ্দুর গড়িয়েছে খাতের মধ্যে দিয়ে, ততখানি খাল প্রান্তরের জমি থেকে আট ফুটের মতো—দুপাশে উঁচু পাড়। উঁচু খাত থেকে মোড় নিয়ে প্রান্তরে নেমে জল বয়ে গেছে নিজস্ব পথে। সুড়ঙ্গের মুখে শিবিকা থেকে নেমে দাঁড়াতেই বিল্লালি কাছে এসে সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললে, এখন থেকে আমাদের চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে 'সেই-নারী'র নির্দেশে। পর্বত-গহ্বরের গুপ্ত গোলক ধাঁধা আমাদের দেখতে দেওয়া হবে না। দেখলাম, লোকজন প্রস্তুত হচ্ছে ভেতরে ঢোকার জন্যে। মাটির লম্ফ জ্বালাচ্ছে।

চোখ বেঁধে ফের তোলা হল আমাদের শিবিকায়। কানে ভেসে এল বেহারাদের পদশব্দের প্রতিধ্বনি। সঙ্কীর্ণ পরিসরে জলস্রোত গুরুগম্ভীর শব্দে আবর্ত রচনা করে আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে খেয়ে চলেছে গুমগুম শব্দে। এই আওয়াজ থেকেই বুঝলাম ঢুকে পড়েছি সুবিশাল পর্বতকন্দরের গভীরে। অনুভূতিটা রোমাঞ্চকর। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির সেই অশ্রুতপূর্ব শব্দলহরী যেন মরজগতের কোনো শব্দই নয়—চন্দ্রসূর্যনক্ষত্রের এই পরিচিত জগৎ থেকে যেন প্রবেশ করছি পাতালপুরীর এক অজানা প্রেতলোকে। গুরু গুরু গুম্‌গুম্ আওয়াজে শুধু কানের পর্দা নয়, বুকের রক্ত ছলকে ছলকে উঠছে, লোমকূপে লোমকূপে শিহরণের তরঙ্গ বইছে। এই কদিনে এ ধরনের চমচমে অনুভূতি এত সয়েছি যে এখন তা গা সওয়া হয়ে এসেছে বলেই রক্ষে। মনকেও প্রস্তুত রেখেছি এর চাইতে চিত্তচাঞ্চল্যকর হতবুদ্ধিকর বহু বিচিত্র ঘটনা সমাবেশের জন্যে। আশ্চর্য এই অভিযানের পদে পদে অনেক আপাতঃ অবিশ্বাস্য এবং অবর্ণনীয় কাণ্ডই তো ঘটছে। ঘটবেও বিচিত্রতর অনেক কিছুই। গা শিরশির করছে, করুক। লোমখাড়া হয়, হোক। ভাগ্যে যা ঘটবার, তা ঘটুক।

এইভাবে কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই অ চম্বিতে আবার আরম্ভ হয়ে গেল সেই স্তোত্রপাঠের মতো একঘেয়ে একটানা সম্মোহনী সুরে পালকি বেহারাদের সৃষ্টিছাড়া গান। তিমি নৌকোয় গ্রেপ্তার হওয়ার রাতে শুনেছিলাম এই গান। শুনলাম আবার শিলাকন্দরের নিভৃত অন্তঃপুরে। গুরুগুরু

গুম্‌গুম্‌ জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ পদশব্দ—তালে তালে অজানা ভাষায় আপাতঃ অর্থহীন মন্ত্রোচ্চারণ অথবা সঙ্গীত। অত্যুৎকট এবং অবর্ণনীয় সেই প্রতিক্রিয়া ভাষায় বর্ণনা করতে আমি অপারগ। অপার্থিব এই শব্দলহরী যখন আমার অণুপরমাণুকে ঝিমিয়ে এনেছে উত্তরোত্তর রোমাঞ্চ-কল্পনায় আবেশ ছিটিয়ে, ঠিক তখনি উপস্থিত হল শ্বাসকষ্ট। বাতাস ভারী হয়ে উঠছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ফুসফুস যেন ফেটে পড়তে চাইছে। পৃথিবীর বাতাস যে এত গুরুভার, এত দুর্বিসহ, এত অস্বস্তিকর হয়, এ-অভিজ্ঞতা লাভ করলাম সেই প্রথম। আচম্বিতে অনুভব করলাম, বাঁক নিয়েছে শিবিকা। পর পর তিনবার এইভাবে আচমকা মোড় নিয়ে এগিয়ে গেল শিবিকা। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল জলনির্ঘোষ। কর্ণকুহরের ওপর মায়াময় শব্দলহরীর অত্যা-চার স্তব্ধ হওয়ার পরেই ফুসফুসও রেহাই পেল কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে। বাতাস আবার লঘু হয়ে এসেছে, তাজা বাতাসের দমকা ঝাপটায় দেহমন আবার গ্লানি ঝেড়ে ফেলে সতেজ হয়ে উঠছে। ঘনঘন চকিত মোড় নেওয়া কিন্তু অব্যাহত রইল। যেন পাতালপুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে নির্মিত অজ্ঞেয় প্রহেলিকাবৎ বিপুল গোলকধাঁধার জটিল জটাজালের শেষ নেই…শেষ নেই। চোখবাঁধা অবস্থায় অবশেষে মাথা ঘুরতে লাগল আমার। কখনো সমকোণে কখনো তার চাইতেও ছোট কোণে মুহুর্মুহু বাঁক নিয়ে শিবিকা ছুটে চলেছে তো চলেছেই। সেইসঙ্গে পাতাল পুরীর অগণিত সুড়ঙ্গপথ দিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে পাল্কী বেহারাদের সাম্মিলিত কণ্ঠের জাদুমন্ত্রের মতো সেই সঙ্গীত লহরী। আরও আধঘন্টা গেল এই হৃৎবুদ্ধিকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে। তারপরেই মুখের ওপর আছড়ে পড়ল এক ঝলক টাটকা বাতাস। সবুজ হরিত্রীর চেনা বাতাস। বুঝলাম, বেরিয়ে এসেছি গুয়াল পর্বতরন্ধ্রের বাইরে —আবার পৌঁছেছি খোলা আকাশ-চন্দ্রাতপের তলদেশে। চোখের পটির ফাঁক দিয়ে আলোর রেশ টের পেলাম মণিকায়। মিনিট কয়েক পরেই দাঁড়িয়ে গেল শিবিকা, স্তব্ধ হল বেহারাদের গান আর পায়ের আওয়াজ। বিল্লাদির হুকুম ভেসে এল কানে। উনটেনকে বলছে নিজের চোখের পটি খুলে নিয়ে আমাদের পটি খুলে দিতে। তর সইল না আমার। এক ঝটকায় নিজেই নামিয়ে আনলাম আবার চোখের কাপড়। মেলে ধরলাম দুই চক্ষুর উদগ্র দৃষ্টি সামনের অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যের দিকে।

কি দেখলাম? দেখলাম যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। পেরিয়ে এসেছি আকাশচুম্বী দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত-প্রাচীর—পাতাল প্রদেশ দিয়ে। এসেছি প্রাচীরের অপর দিকে—তলদেশে দাঁড়িয়ে আমাদের সারি সারি শিবিকা। প্রাচীরের

উচ্চতা কিন্তু এদিকে ততটা নয়— বাইরে থেকে ওদিকে যা দেখেছিলাম ; পাঁচশ ফুটের অনধিক। অর্থাৎ, উত্তুঙ্গ পর্বতবেষ্টিত এই গোলাকার বাটির মত অঞ্চলটি বাইরের দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের চেয়ে উচ্চে অবস্থিত। হয়তো এককালে সুবিশাল আগ্নেয়গিরি ছিল এই পর্বত। মৃত গিরির জ্বালামুখে সঞ্চিত হয়েছিল বৃষ্টি আর ঝর্ণার জল। সে জল নিষ্কাশনের পর দেখা গেছে সরোবরের তলদেশ বেশ উঁচু। পুরো অঞ্চলটা পাহাড়ঘেরা বিরাট কাপ বা বাটির মতো—প্রথম যে অঞ্চলটি দেখেছিলাম…অবিকল তারই মতো। কিন্তু সাইজে দশগুণ বড়। বেশ খানিকটা অঞ্চল সংরক্ষিত চাষবাসের জন্যে। পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা—গরু ছাগল যাতে ঢুকতে না পারে, বাগান তছনছ না করতে পারে। অগুন্তি গৃহপালিত পশু চরছে খোলা জায়গায়, সবুজ ঘাস ছাওয়া জমিতে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সুবিশাল মহীরুহ, অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে একটা অতিশয় প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ। অতীতের এক মহানগরীর শেষ নিদর্শন। সেই মুহূর্তে এর বেশী কিছু খুঁটিয়ে দেখবার সময় পাইনি। কাতারে কাতারে আমাহাগ্গার পরিবৃত হয়েছিলাম বিল্লালির নিনাদী নির্দেশ কানে বর্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পর্বত গহ্বর থেকে সারিবদ্ধ পিপীলিকার মতো সৈনিক কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে এসেছিল আমাদের দিকে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত প্রতিটি বাহিনীর পুরোধা একজন উচ্চপদস্থ সেনাধ্যক্ষ। হাতে হাতীর দাঁতের যষ্টি। দূর থেকে দেখে সত্যিই মনে হয়েছিল যেন পিলপিল করে পিঁপড়ে বেরিয়ে আসছে সারি সারি বিবর থেকে। প্রত্যেকেরই পরনে চিতাচর্মের কৌপিন ছাড়াও রয়েছে জবকাল পরিচ্ছদ। পরে জেনেছিলাম, 'সেই-নারী'র নিজস্ব রক্ষীবাহিনী এরা—তাই সাজপোশাক, চালচলন, শৃঙ্খলাবোধ চোখে পড়ার মতো।

প্রধান সেনাধ্যক্ষ গটমট করে এগিয়ে এসে দাঁড়াল বিল্লালির সামনে। হাতের হস্তীদণ্ড আড়াআড়িভাবে কপালে রেখে অভিবাদন জানালো বিচিত্র কায়দায়। কি যেন বললে বিল্লালিকে—বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলাম না। শুধু বুঝলাম—পরের পর প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, দ্বিরুক্তি না করে জবাব দিয়ে যাচ্ছে বিল্লালি। পরক্ষণেই পুরো সৈন্যবাহিনী পেছন ফিরে কুচকাওয়াজ করে অগ্রসর হল পর্বত-প্রাচীরের গা ঘেঁসে—পেছন পেছন গেল আমাদের শিবিকা পাঁচখানা, বাহক এবং এবং রক্ষীবৃন্দ। আধমাইলটাক পথ যাওয়ার পর শিবিকা নামানো হল প্রকাণ্ড একটা গুহামুখের সামনে। এতবড় গুহা জীবনে দেখিনি। প্রায় ষাটফুট উঁচু, আশি ফুট প্রশস্ত। বিল্লালির নির্দেশে নেমে দাঁড়ালাম শিবিকা থেকে—লিও বাদে। অত্যন্ত অসুস্থ বলেই তাকে

রাখা হল শিবিকার মধ্যে। প্রবেশ করলাম ভেতরে। সূর্যালোক গেলাম কিছুদূর পর্যন্ত। তারপর নিয়মিত ব্যবধানে সারি সারি লম্ফ। বহ্ন্যালোকিত বিশাল গুহার বুঝি সীমা নেই, অন্ত নেই।

রক্ষীবৃন্দ ভেতরে আসেনি। গুহামুখেই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখল আমাদের প্রত্যেকের ওপর পর্বতাভ্যন্তরে প্রবেশের সময়ে। বিবরে প্রবেশের পর অবশ্য শ্বেতবস্ত্র পরিহিত এক বৃদ্ধ সবিনয়ে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানিয়েছিল আমাদের। মুখে কোনো কথা বলেনি। পরে জেনেছিলাম, তার বাক্‌শক্তি এবং শ্রবণশক্তি কোনোটাই নেই—বোবা এবং কালা।

মূল গুহাটা প্রবেশমুখ থেকে বিশ ফুট গিয়েই দু দিকে ভাগ হয়ে গেছে। পাহাড় ফুঁড়ে সমকোণে দুটো ছোট গুহা বিস্তৃত ডাইনে এবং বাঁয়ে। সাধারণ নয়। দীর্ঘ ও সংকীর্ণ দালান। যেন, নাট্যশালা সাজানো অলিন্দ-পথ। বাঁদিকের গুহা মুখে পাহারারত দুজন সশস্ত্র রক্ষী। আন্দাজে বুঝলাম, 'সেই-নারী'র কক্ষ ঐ দিকেই। ডানদিকের গুহামুখ প্রহরাহীন। বোবা কালা বৃদ্ধ ইঙ্গিতে সেইদিকেই যেতে বললে আমাদের। কয়েকগজ যাওয়ার পর দেখলাম দুপাশে জ্বলছে লম্ফ। তারপরেই পৌঁছোলাম একটা বিশাল কক্ষের দরজার সামনে। জাঞ্জিবার মাদুরের মতো ঘাস বোনা এক ধরনের পর্দা ঝুলছে দরজায়। আবার আভূমি প্রণত হয়ে পর্দা সরিয়ে দিলে বোবা কালা বৃদ্ধ। প্রবেশ করলাম ভেতরে। বেশ প্রশস্ত কক্ষ। যদিও নিরেট পাথর নির্মিত, তবুও এক প্রান্তে পর্বতপ্রাচীরের ফুটো দিয়ে আলো আসছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। একটা পাথরের খাট রয়েছে ঘরে। পাশেই পাত্র বোঝাই হাতমুখ ধোওয়ার জল। খাটের ওপর চিতাচর্মের ভারী সুন্দর কম্বল।

লিও রইল এই ঘরে—উস্‌টেন রইল তাকে সেবা করার জন্যে। এই রকমই আর তিনটে ঘর দখল করলাম আমি, জব আর বিল্লালি।

(১২) 'সেই-নারী'

জাহাজডুবির পর থেকে জামাকাপড় পাল্টানোর সুযোগ হয়নি। ঘরে ঢুকেই তাই ঐ কাজটি সারলাম আমি আর জব। স্নান করে গ্লানিমুক্ত হলাম।

কালো দাড়ি আর চুল আঁচড়ে ফিটফাট হওয়ার পরই কিন্তু ক্ষিদের চোটে চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম। বোবা কালা একটি তরুণী আচমকা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে ইসারায় বুঝিয়ে দিলে খাবার তৈরী। গেলাম তার পেছন পেছন। পাশের ঘরে বসেছিল জব। তাকেও ইসারায় শোবার ঘর থেকে ডেকে

এনেছে বোবা কালা আর একটি মেয়ে। মোটেই তা ভালো লাগেনি জবের। 'গরম পাত্র' মাথায় চাপানোর বীভৎস অনুষ্ঠানের পর থেকেই এ দেশের কোনো মেয়েছেলে কাছে এলেই অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায় বেচারীর।

খেয়েদেয়ে গেলাম শিওকে দেখতে। বিল্লালির ঘ্যানোর ঘ্যানোর শুনতে হল নতুন করে। 'সেই-নারী' এখুনি দেখতে চান শিও-কে। কিন্তু শিও তখন প্রলাপের ঘোরে উদ্ভট কথাবার্তা বলছে। সেইসঙ্গে এত জোরে হাত পা ছুঁড়ে গোটা শরীর তেউড়ে ফেলছে যে উসটেন বেচারী সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও বিছানায় শুইয়ে রাখতে পারছে না। প্রলাপবকুনি একেবারেই অর্থহীন। কোথায় নাকি দারুণ নৌকো প্রতিযোগিতা চলছে। শিও মারদাঙ্গা কাণ্ড করে চলেছে সেই প্রতিযোগিতায়। আমার গলা কানে যেতে শান্ত হল অনেকটা। স্থির হয়ে এল খেঁচুনি।

ঘন্টাখানেক ছিলাম ওর পাশে। আচমকা হন্তদন্ত হয়ে এসে বিষম উত্তেজিতভাবে বিল্লালি জানালে, বেড়ালের ভাগ্যে নাকি শিকে ছিঁড়ে পড়েছে। আমার মতো নগণ্য একজন বিদেশীর প্রতি খুব বেশী সম্মান দেখাচ্ছেন 'সেই-নারী'। এখুনি দেখা করতে চান আমার সঙ্গে।

শুনে পুলকিত তো হলামই না, বরং এমন নির্বিকার রইলাম যে আতংকে পাংশুবর্ণ হল বিল্লালির বদন। কিন্তু কোথাকার কে এক বর্বর নরপশুদের রহস্যময়ী জাদুকরী অসীম ক্ষমতার অধিকারিণী রানীর সঙ্গে দেখা করতে আমার বয়ে গেছে। ঐ প্রাণান্তকর অবস্থায় রানীর তলব পড়লেই কি আমাকে যেতে হবে? মন তো পড়ে শিও-র কাছে। আমার প্রাণের চাইতেও শিও-কে ফেলে যাবো রানীর হুকুম তামিল করতে? যতো প্রতাপই তার থাকুক না কেন, তাই কৃতার্থ হতে পারিনি।

যাই হোক, তবুও যেতে হলো। উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম মেঝেতে একটা চকচকে জিনিস পড়ে রয়েছে। কুড়িয়ে নিলাম। পাঠকপাঠিকার মনে থাকতে পারে, ভিলির লোহার বাক্সে ভাঙা মাটির পাত্রের সঙ্গে একটা রত্ন পাওয়া গেছিল। বাঁ কোণে গোল 'O', মাঝখানে একটা রাজহংস, ডাইনে বিদঘুটে একটা সাংকেতিক চিহ্ন—অনেকটা গাছের মতো দেখতে। অর্থটাও উদ্ধার করেছিলাম—'সুতেন সে রা'; সূর্য অথবা রা-য়ের রাজপুত্র।

পাথরটা সোনার আংটিতে বাঁধিয়ে আঙুলে পরতো শিও। তড়কার খেঁচুনিতে ছিটকে পড়েছে মেঝেতে। আমি পরে নিলাম কড়ে আঙুলে। রওনা হলাম বিল্লালির পেছন পেছন।

অলিন্দ-গুহা পেরিয়ে পৌঁছোলাম বিপরীত দিকের অলিন্দ-গুহার

সামনে। আগেই বলেছি প্রস্তরমূর্তির মতো দুজন সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন ছিল সেখানে। ঢুকলাম সেই গুহায়। এখানে আলো আরো বেশী। একটু যেতেই আভূমি প্রণত হয়ে দুটি বোবাকালা মেয়ে পেছন নিল আমাদের। একই ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দুটি মূকবধির পুরুষ চলল সামনে। শোভাযাত্রা সহকারে যেতে যেতে দেখলাম দু-পাশে মাদুরের পর্দা ঝোলানো অগুন্তি প্রকোষ্ঠ। পরে জেনেছিলাম, 'সেই-নারী'র মূকবধির পরিচারক পরিচারিকারা থাকে সেখানে। বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর শেষ হল গুহাপথ। ভারী পর্দা ঢাকা দরজা আগলাচ্ছে হলুদ পোশাক পরা দুজন শান্ত্রী। ওদের মাঝ দিয়ে ঢুকলাম লম্বা-চওড়ায় চল্লিশ ফুট চৌকোনা একটা বেশ বড় ঘরে। আট দশজন রূপসী তরুণী হাতীর দাঁতের ছুঁচ দিয়ে কাঠের ফ্রেমে এমব্রয়ডারী করছে। প্রত্যেকেরই চুলের রঙ হলদে। মুখে টুঁ শব্দটি নেই। মূক বধির নিঃসন্দেহে। দীপ-আলোকিত এই ঘরের অপর প্রান্তে একটা বেশ বড় দরজায় ঝুলছে রীতিমত ভারী পর্দা—এত বাহারি পর্দা আমাদের ঘরেও দেখিনি। দুটি অত্যন্ত সুন্দরী বোবাকালা মেয়ে বুকে দুহাত ভাঁজ করে সবিনয়ে দাঁড়িয়ে সামনে। আমাদের দেখেই দুজনেই একযোগে এক হাত বাড়িয়ে পর্দা টেনে সরিয়ে দিলে দুপাশে। অমনি সটান মাটিতে থুবড়ে পড়ল বিল্লালি। উপুড় হয়ে কেঁচোর মত ঘষটে চলল মেঝেতে ওপর দিয়ে। লম্বা দাড়ি লম্বা হয়ে লেপটে রইল বুকের তলায়।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম স্বাভাবিক ভঙ্গিমায়। ঘাড় ফিরিয়ে তা দেখেই আঁৎকে উঠল বুড়ো—'শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো বেবুন। 'সেই-নারী'র কক্ষে ঢুকেছো খেয়াল থাকে। স্পর্ধা দেখিও না। ফাটিয়ে চৌচির করে দেবেন খাড়া অবস্থাতেই।'

ভয় যে পাইনি, তা নয়। বিল্লালির প্রত্যেকটা কথা বিষ-বল্লমের মতোই অসাড় করে এনেছিল আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বুদ্ধি চেতনা। পরক্ষণেই মাথা চাড়া দিয়েছিল খাঁটি ইংরেজের আত্মম্ভরিতা। কোথাকার কে এক রানীর সামনে মাথা নুইয়ে বুকে হেঁটে একবার যদি যাই, বরাবরই তো যেতে হবে ঐভাবেই। তার চাইতে মাথা উঁচিয়েই যাওয়া যাক। প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা দেখলে না হয় নতিস্বীকার করা যাবে—তার আগে কেঁচো হতে যাবো কেন?

কাজেই বীরদর্পে উন্নত মস্তকে গটগট করে হেঁটে গেলাম বিল্লালির পায়ে পায়ে। দেখলাম ঘরটা আগাগোড়া কারুকাজ করা পর্দায় মোড়া। বাইরের ঘরে মেয়েরা যে বস্ত্রবয়ন করছে, সূচীকর্ম করছে—তাই দিয়েই

সাজানো এই ঘর। দেওয়ালে—মেঝেতে—সর্বত্র সুন্দর সূচীকর্মের নিদর্শন। অতি-সুন্দর কালোকাঠের সোফাসেটও রয়েছে ঘরের নানা দিকে—কাঠের হাতলে হাতীর দাঁতের কাজ। ঘরে অন্য প্রান্তে একটা ভারী পর্দা ঝুলছে। আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে পর্দার পেছনে।

পর্দার সামনে পৌঁছেই বিল্লালির মতো অকুতোভয় ব্যক্তিও দেখলাম বিষম আতংকে মেঝেতে বুকপেট মিশিয়ে কপাল ঠেকিয়ে সামনে দুহাত বাড়িয়ে একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হয়ে পড়ে রইল। আমি তো হতবাক! কি করব ভেবে পেলাম না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম ঝোলানো পর্দাটার দিকে। পর্দা নড়ছে না, দুলছে না, খুলে যাচ্ছে না। তাসত্ত্বেও সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করছি পর্দার অন্তরালে এক জোড়া চক্ষু নিমেষহীন নয়নে নিরীক্ষণ করে চলেছে আমাকে। যার চক্ষু, তাকে দেখা না। কিন্তু তার দেহ বিচ্ছুরিত অপার্থিব শক্তি যেন শিহরণের তরঙ্গ তুলেছে আমার লোমকূপে। নামহীন আতংকে অবশ হয়ে এল আমার সর্বাঙ্গ। বিন্দু বিন্দু ঘাম দাঁড়িয়ে গেল ললাটে। জীবনে এমন ভয় পাইনি সেদিন সেই মুহূর্তে যে-রকম পেয়েছিলাম।

মিনিটের পর মিনিট চলে গেল এইভাবে। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। তারপর অকস্মাৎ স্পন্দিত হল নিথর পর্দা। সহসা তুষারধবল একখানি হাত দেখা গেল পর্দার ফাঁকে। এত সুন্দর হাত অতিবড় শিল্পীও কল্পনায় আনতে পারতে কিনা সন্দেহ। চাঁপার কলির মতো সরু হয়ে আসা শ্বেত অঙ্গুলির প্রান্তদেশের সুচারু নখ গোলাপ ফুলের মতোই রঙীন। ঈষৎ পর্দা সরিয়ে ধরল এই হাত। সেইসঙ্গে কানে ভেসে এল ভারী মিষ্টি এক কণ্ঠস্বর। সেই স্বরের কোমলতার সঙ্গে রুপোর ঝুমঝুমির তুলনাই চলে কেবল। পাহাড়ী নদীর ঝিরঝির সঙ্গীত অনেক শুনেছি—ঠিক সেই রকমই সঙ্গীতময় মনে হল সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর।

ভাষাটা খাঁটি আরবী। সুপ্রাচীন আরবী। আমাহাগ্গারদের মতো ভেজাল আরবী নয়।

'বিদেশী, এত ভয় কেন?'

শুনেই তো ছাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। গোড়া থেকেই নিদারুণ ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু মুখে তার প্রকাশ ঘটতে দিইনি। তাই যুগপৎ বিস্ময় এবং আতংক পেয়ে বসল আমাকে। জবাব দেওয়ার আগেই সরে গেল পর্দা। সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম দীর্ঘকায়া এক রমণীকে: ফিনফিনে পাতলা বস্ত্র ঝুলছে মুখ থেকে পা পর্যন্ত। দেখেই গা শিরশির

করে উঠেছিল আমার। শবাধারের শব যেন শবাচ্ছাদনে অঙ্গ আবৃত করেই সটান দাঁড়িয়ে আমার সামনে। অথচ এত ভয় পাওয়ার কথা নয়। কেন না, পাতলা কাপড়ের ফাঁক দিয়ে বরতনুর গোলাপী আভা যেন ফুটে বেরুচ্ছে। প্রেতিনী মূর্তি তাই আর এক পশলা আতংক বৃষ্টি করে গেল আমার অসাড় চেতনায়। আর কিছু বুঝি না বুঝি, এইটুকুই শুধু বুঝলাম সমস্ত সত্তা দিয়ে, সামনে দাঁড়িয়ে এই যে রহস্যময়ী, তার সত্তায় মরলোকের উপাদান প্রায় নেই বললেই চলে।

আবার ধ্বনিত হল সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম সুরের মারাত্মক মোচড়ে হৃৎপিণ্ডখানা যেন উপড়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

'এত ভয় কেন, বিদেশী? পুরুষ মানুষ এত ভয় পাবে কেন আমাকে দেখে? কি আছে আমার মধ্যে? পুরুষ জাতটা কি তাহলে আর আগের মতো নেই?'

বলে, ঈষৎ কাৎ হয়ে লীলায়িত ভঙ্গিমায় এক হাত তুলতেই দাঁড়কাক-কালো দীর্ঘ চুল সহস্র তরঙ্গভঙ্গে লুটিয়ে পড়ল চটিপরা পা পর্যন্ত তুষারধবল পরিচ্ছদের ওপর দিয়ে।

'হে রানী, ভয় পেয়েছি আপনার অমর্ত্য রূপরাশি দেখে।'

কথাটা সবিনয়ে বলেছিলাম অতশত না ভেবেই। কিন্তু অস্ফুট তারিফ শোনা গেল বিল্লাসির দিক থেকে—'সাবাস! বেবুন! সাবাস!' উপুড় হয়ে মুখ গুঁজড়ে শুয়েও ওর চৈতন্য এখনো আছে দেখে হাসি পেয়েছিল অত ভয়ের মধ্যেও। প্রত্যুত্তরে যেন দূরাগত রজত ঘন্টার মতো সুমিষ্ট হাস্যধ্বনি আবেশের আবর্ত রচনা করে গেল আমার কানে—'চমৎকার! স্তোকবাক্যে রমণী-মনোরঞ্জনে এখনও পুরুষরা বেশ পটু দেখছি! ভয় পেয়েছিলে কিন্তু তোমার অন্তরের মণিকোঠায় আমার সন্ধানী দৃষ্টি বুলোচ্ছিলাম বলে। যাক সে কথা, এখন বলো কেন এসেছো এই গুহাবাসীদের রাজ্যে, জলাভূমির দেশে, মড়াদের মৃত ছায়াচ্ছন্ন দুষ্ট প্রেতাত্মাদের তল্লাটে। বলো কি দেখতে এসেছো এই নিষিদ্ধ অঞ্চলে। 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ-মানতেই-হবে' কাউকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেয় না—তা সত্ত্বেও বলো কেন প্রাণ সঁপে দিতে এসেছো তার খপ্পরে? আমার ভাষাই বা তুমি জানলে কি করে? সুপ্রাচীন সিরিয়াক অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তা তোমার কণ্ঠে শুনছি কেন? তবে কি সে দেশ এখনো আছে পৃথিবীতে? থাকি গুহায় মড়াদের সঙ্গে—মানুষের খবর নিয়ে মাথা ঘামাই না—জানিও না। কিন্তু—'বলতে বলতে পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত বিল্লাসিকে দেখেই যেন সম্বিৎ ফিরে এল 'সেই-নারী'র।

'বৃদ্ধ! বলো তোমার এলাকায় আমার অতিথিদের ওপর নিদারুণ নিগ্রহ হয়েছিল কেন? জানো তার শাস্তি কী? জল্লাদরা তোমার কি হাল করবে, তা কি খেয়াল আছে?'

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ আতীক্ষ্ণ ঘন্টাধ্বনি মতোই রণরণিয়ে আছড়ে পড়েছিল পাথরের দেওয়ালে। সেইসঙ্গে দেখেছিলাম নয়নের বিদ্যুৎ-ঝলক যেন বস্ত্রাবরণ ভেদ করে ঠিকরে আসছে শাস্তিত বৃদ্ধের দিকে। বিল্লালিকে বিলক্ষণ সাহসী বলেই জানতাম। নির্ভীক বলেই মনে করতাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখলাম সীমাহীন আতংকে তার প্রাণপাখী উড়ু উড়ু হয়েছে।

মাটিতে সাদা মাথাখানা ঘষতে ঘষতে সেকী আকুতি—'হে পরমারাধ্যা 'হিয়া'! হে বজ্রিকা 'সেই-নারী'! করুণার আপনার সীমা নেই, উদারতা আপনার অন্তহীন, বিশালতায় আপনি অতুলনীয়া! ক্ষমা করুন আমাকে। আপনার দাসানুদাস আমি। অপরাধ আমার নয়। অনুচর সম্পর্কে আপনার কোনো নির্দেশ না থাকায় লাঞ্ছিতা একটি স্ত্রীলোক চক্রান্ত করেছিল তার মাথায় গরম পাত্র চাপিয়ে মাংস খাওয়ার। তিন বীরপুরুষ তাদের অনেককেই বধ করেছে অবিশ্বাস্য লড়াইয়ে—আমি গিয়ে লড়াই থামিয়ে জীবিত পাপিষ্ঠদের নিয়ে এসেছি আপনার দরবারে উচিত সাজার জন্যে।'

'যাও! ক্ষমা করলাম তোমাকে! সবই আমি জানি। কাল দরবারে বিচার করব তাদের। যাও। আর নয়!'

অবিশ্বাস ক্ষিপ্রবেগে হাঁটু গেড়ে বসল বিল্লালি, মাথা নুইয়ে তিনবার অভিবাদন করেই ফের অষ্টাঙ্গ মাটিতে ঠেকিয়ে দাড়ি ঘষটে বেরিয়ে গেল বাইরে।

সভয়ে আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম ভয়াবহ অথচ চমকপ্রদ এই মহিলার সামনে।

(১৩) আয়েশার ঘোমটা উন্মোচন

পর্দার অন্তরালে বিল্লালি অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললে 'সেই-নারী' —'বিদেয় হয়েছে বুড়ো! নির্বোধ কোথাকার! দাড়ি পাকিয়ে সাদা করে ফেলেছে, কিন্তু জ্ঞান অর্জন করে নি কিছুই। বিদেশী, স্বদেশে তোমাকে ডাকে কি নামে?'

'হোল্লি।'

'হোল্লি।' উচ্চারণটা জিভে আটকে গেলেও কান জুড়িয়ে গেল আমার —'হোল্লি মানে?'

'কাঁটা গাছ।'

'কাঁটা তোমার আছে ঠিকই, দেখতেও গাছের মতো। মজবুত। কদাকার। অথচ জ্ঞানী। বিশ্বাসযোগ্য। চিন্তাশীলও বটে। হোল্লি, এসো, ভেতরে এসো, দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। বোসো আমার পাশে। নচ্ছার ঐ গোলামগুলোর মতো মাটি ঘষটে যাওয়া তোমাকে অন্ততঃ মানায় না। হাঁফিয়ে উঠেছি পূজো পেয়ে, আতংক দেখে। বিরক্তি চরমে উঠলে দিই ফুটিফাটা করে স্রেফ মজা করার জন্যে, বাদবাকীর রক্ত জমে যায় তাই দেখে।' বলতে বলতে হাতীর দাঁতের মতো সাদা হাতে পর্দা সরিয়ে ধরল 'সেই নারী'।

ভেতরে ঢুকলাম কিন্তু কম্পিত কলেবরে। ভয়ংকর এই মহিলার সান্নিধ্যে যেন বিকল হয়ে আসছিল হৃদ্‌যন্ত্র। পর্দার ওপাশে ছোট্ট একটা কুঠরি। লম্বায় প্রায় বারো ফুট, চওড়ায় দশ। ঐটুকু ঘরেই রয়েছে একটা কৌচ আর একটা টেবিল। টেবিলের ওপর সাজানো ফল আর ঝিকমিকে জল। ঘরের শেষ প্রান্তে পাথর খুদে তৈরী একটা জলাধার। গির্জেতে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জলপাত্রের মতো দেখতে। সুন্দর লম্ফের নরম আলোয় মায়াময় হয়ে উঠেছে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। বাতাসে ভাসছে হাল্কা সৌরভ।

কৌচ দেখিয়ে বললে 'সেই-নারী'—'বোসো। ভয় নেই আমাকে। ভয়ের কারণ যদি ঘটিয়ে থাকো তাহলে আমার হাতেই মৃত্যু হবে তোমার। কাজেই মন হাল্কা রাখো।'

কৌচের একদিকে বসলাম আমি, আর একদিকে বসল 'সেই-নারী।' জলভর্তি প্রস্তর-পাত্র রইল আমার পাশেই।

'হোল্লি, আরবী ভাষা জানলে কি করে?'

'শিখেছি। মিশর এবং অন্যান্য অনেক দেশেও এ-ভাষা চালু আছে।'

'তাই নাকি? আরবী ভাষায় এখনো কথা বলা হয়? মিশর দেশও আছে এখনো? কোন্ ফারাও এখন বসছেন সিংহাসনে? পারসিক ওকাসয়ের হাতের পুতুল কেউ নাকি? আকেমেনিয়ানদের যুগ কি ফুরিয়েছে?'

'প্রায় দু-হাজার বছর আগে মিশর থেকে বিদায় নিয়েছে পারসিকরা। তারপর এসেছে এবং গেছে টলেমি, রোমান এবং আরও অনেকে।'

হেসে উঠল 'সেই-নারী'। হিমেল স্রোত বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে।

'গ্রীস দেশটা আছে তো এখনো?'

'আছে। তবে প্রাচীন গ্রীস আর আধুনিক গ্রীস-য়ে আকাশ পাতাল তফাৎ। সে গৌরব আর নেই। এখনকার গ্রীস আগের গ্রীসের হাস্যকর

ছায়া।'

'তাই নাকি? হিব্রুরা এখনো আছে জেরুসালেমে? জ্ঞানী রাজার তৈরী মন্দিরটা আছে? কোন দেবতার পূজো হয় এখন মন্দিরে? ইহুদীদের ভাবী ত্রাণকর্তা এসেছিলেন? ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে? এখন কি তাঁরই রাজত্ব চলছে সারা বিশ্বে?'

'ইহুদীরা এখন ছত্রভঙ্গ। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। জেরুসালেম আর নেই। হেরড যে মন্দিরটা নির্মাণ করেছিলেন—'

'হেরড! হেরড-কে তো চিনি না। যাক গে, বলে যাও।'

'রোমানরা পুড়িয়ে দিয়েছে। ধ্বংসস্তূপে উড়েছিল রোমান ঈগল। জুডা এখন মরুভূমি।'

'আচ্ছা! হোলি, তুমি জানো অনেক, তবুও বলবো পৃথিবীর অনেক ব্যাপারেরই খবর রাখো না। ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল সব কিছুরই একদিন মৃত্যু আছে। এ বিশ্বাস কি তোমারও আছে? যদি থাকে, তাহলে শুনে রাখো—কিছুই মরে না। মৃত্যু বলে কিছুই নেই—যা আছে, তার নাম পরিবর্তন।' দেওয়ালের পাথরে কয়েকটা খোদাই-কর্ম দেখিয়ে বললে 'সেই-নারী'—'এই কাজ যাদের, তিন দুগুণে ছ-হাজার বছর আগে তারা মারা গিয়েও কিন্তু মরে নি। আজও বেঁচে আছে। এই মুহূর্তে হয়তো তাদের বিদেহী আত্মারা ঘিরে ধরেছে আমাদের।' আশপাশে তাকিয়ে নিয়ে অদ্ভুত স্বরে শেষ কথাগুলো বললে রহস্যময়ী—'মাঝে মাঝে মনে হয় এই চোখে তাদের দেখাও যায়।'

'কিন্তু পৃথিবীর সামনে তারা মৃত।'

'সাময়িকভাবে। এই পৃথিবীতেই আবার তারা পুনর্জন্ম নেয় বারবার। বিদেশী, আমার নাম আয়েশা। আমি পথ চেয়ে আছি সেই রকমই একজনের প্রতীক্ষায়। যে পুনর্জন্ম নিয়ে ফিরে আসবে এইখানে আমার কাছে। পশুদের চাইতেও অধম এই বর্বরদের মধ্যে আমি পড়ে আছি কেন জানো কী? হেলেনের চাইতেও আমি রূপসী। পৃথিবীর এবং যাবতীয় পার্থিব সম্পদের গুপ্ত রহস্য আমি জানি। আমার কাজে লাগাতে পারি যে-কোনো বস্তুকে। পরিবর্তন আমার করায়ত্ত, মৃত্যু আমার পদানত। তা সত্ত্বেও এই ইতরদের দেশে পড়ে আছি কেন বুঝতে পারো না?'

'না।'

'যাকে ভালবাসি, তার পথ চেয়ে বসে আছি বলে। পাঁচ হাজার বছরও যদি কালগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, তাহলেও পুনর্জন্ম নিয়ে সে ফিরে আসবেই

আমার কাছে। অশেষ পাপ করেছি তার প্রতি। সব জেনেও ক্ষমা করবে তখন। চিনতে না পারলে ভালবাসবে আমার রূপ দেখে।'

হতভম্ব হয়ে গেলাম! বাক্যস্ফূর্তি ঘটল না। বিষয়টা এমনই হতবুদ্ধিকর যে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ হল আমার ধীশক্তি।

কিছুক্ষণ পরে বলেছিলাম—'পুনর্জন্ম যদি মানতেই হয়, আপনার ক্ষেত্রে তা তো ঘটেনি। জানি না আপনি সত্যি বলছেন কিনা' —দপ্ করে 'সেই-নারী'র ঘোমটাবৃত চোখ জ্বলে উঠতেই শেষ করলাম ঝটিতি—'যদি তাই হয়, আপনার তো কখনো মৃত্যু হয়নি?'

'না হয়নি। কারণ এই দুনিয়ার সবচেয়ে গূঢ় গুপ্তরহস্যের সমাধান আমি করেছি। করেছি অর্ধেক সাধনা দিয়ে, বাকী অর্ধেকটার সুযোগ দৈবাৎ হাতে এসে যাওয়ায়। বিদেশী, প্রাণকে প্রলম্বিত করা যাবে না কেন? জড়জগতে বিস্ময় বলে কিছুই নেই। পরমবিস্ময় রয়েছে কিন্তু প্রাণের মধ্যে। বিস্ময়কর এই প্রাণকে একটু দীর্ঘ করে তোলার মধ্যে কিন্তু আর বিস্ময় নেই। যদি কোনোদিন মেজাজ আসে, এ সম্পর্কে তোমার সঙ্গে কথা বলা যাবে। যদিও বলব না বলেই বিশ্বাস। এদেশে তোমরা এসেছো আমি জানলাম কি করে বলো তো? জেনেছিলাম বলেই তো গরম পাত্র মাথায় চাপিয়ে মরণ থেকে বাঁচিয়েছি তিনজনকে!'

'হে রানী, ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়।'

'ওদিকে তাকালেই বুঝবে জেনেছি কি ভাবে,' বলে অঙ্গুলিনির্দেশে পাথর-পাত্রের টলমলে জল দেখিয়ে ঝুঁকে পড়ল 'সেই-নারী', দু'হাত মেলে ধরল জলের ওপর।

বিস্ফারিত চোখে উঠে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম চকিতে মিশমিশে কালো হয়ে গেল স্বচ্ছ জল। পরিষ্কার হয়ে গেল পরক্ষণেই। সুস্পষ্ট যে দৃশ্য দেখলাম—তা জীবনে দেখবার সুযোগ আমার হয়নি। দেখলাম, ভয়াবহ খালের জলে ভাসছে আমাদের নৌকো। পাড়ে দাঁড়িয়ে গুণ টানছি আমি, মহম্মদ আর জব। খোলের মধ্যে মুখে কোট চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছে লিও। মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্যেই কোট চাপা দিয়েছে মুখে। ফলে, মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

পুরো দৃশ্যটা চকিতে মনে পড়ে যাওয়ায় বলেছিলাম ক্ষিপ্তকণ্ঠে—'ম্যাজিক!'

'ম্যাজিক নয়, হোলি, ম্যাজিক নয়। অজ্ঞ লোকেই একে বলে ম্যাজিক। ম্যাজিক বলে কিছুই নেই এই পৃথিবীতে—প্রকৃতির গুপ্তরহস্য না জানা থাকলেই

যান্ত্রিক বলে প্রবোধ দেওয়া হয় মনকে। এই জলই আমার আয়না। খুশীমত ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারি জলের আয়নায়—সব সময়ে কিন্তু নয়। তোমার অতীতের অনেক ঘটনা যা তুমি জানো অথবা আমি জানি—ফুটিয়ে তুলতে পারি জল-দর্পণে। মনে মনে ভাবো না কারো মুখের ছবি, আমার মনের মধ্যে দিয়ে তা এক্ষুনি ফুটে উঠবে ঐ জলে। গুপ্তরহস্যের সবটুকু এখনো জেনে উঠিনি, ভবিষ্যতের কথাও বলতে পারি না। খুবই প্রাচীন গুপ্তবিদ্যা—সবটুকু উদ্ধার করতে পারিনি। বহু শতাব্দী আগে আরব আর মিশর দেশের জাদুকররা জানত এই বিদ্যে। বিশ যুগ আগে ঐ খাল দিয়ে নৌকোয় করে এসেছিলাম। হঠাৎ সেদিন খালটার কথা মনে পড়ায় জলের দিকে তাকাতেই দেখলাম তোমাদের। নৌকোয় ঘুমন্ত যুবাপুরুষের মুখ দেখতে পাইনি। তাই খবর পাঠিয়েছিলাম, যেন বধ করা না হয় সাদা মানুষ তিনজনকে। বিল্লালির কাছে শুনলাম যুবাপুরুষের নাম লিও। খুবই অসুস্থ। জ্বর হয়েছে।'

'এতই যখন জানেন, জ্বরটা সারিয়ে দিতে পারেন না?'

'নিশ্চয় পারি। কিন্তু বিদেশী, চোখে জল কেন তোমার? তোমার ছেলে নাকি?'

'পালিত পুত্র। আনবো তাকে আপনার সামনে?'

'না। জ্বর কদ্দিনের?'

'আজ নিয়ে তিনদিন হল।'

'তাহলে আর একদিন ছাখো। নিজের শক্তিতেই জ্বর তাড়াবে, নইলে আমার শক্তিতে ওর প্রাণে ঝাঁকুনি লাগবে। কাল রাতে যদি জ্বর না যায়, আমি যাবো—জ্বর সারাবো। সেবা করছে কে?'

'আমারই অনুচর। বিল্লালি তাকে শূওর বলে ডাকে, সেই সঙ্গে—' একটু আমতা আমতা করে বললাম—'আছে উসটেন নামে একটি মেয়ে। প্রথম দর্শনেই আলিঙ্গন করেছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে থাকে—আপনারই প্রজাদের সামাজিক নিয়মে।'

'আমার প্রজা? ওরা আবার আমার প্রজা হল কবে? কুত্তার দল! গোলামের মতো খেটে মরছে এবং মরবেও আমার মুক্তির দিন না আসা পর্যন্ত। বিদেশী, তোষামোদ আর খেতাব আর ভাল লাগে না। রানী বলে আমাকে ডেকো না। আয়েশা আমার নাম, যে নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অতীতের অনেক কথা, শুনলেও কান জুড়িয়ে যায়…এখন থেকে ঐ নামেই ডাকবে আমাকে। উসটেন মেয়েটাকে আমি চিনি না। জানি না এর সম্বন্ধেই হুঁশিয়ার করা হয়েছিল কিনা আমাকে। দাঁড়াও তো

দেখি।'

বলেই জলপাত্রের ওপর দু-হাত মেলে ধরে বললে 'সেই-নারী'—'এই মেয়েটা?'

অস্বাভাবিক দৃশ্যটা দেখে আবার গা শিরশির করে উঠেছিল আমার। বলেছিলাম—'হ্যাঁ এই সেই মেয়ে। ঘুমন্ত লিও-র দিকে চেয়ে আছে।'

'লিও!' আনমনা স্বর 'সেই-নারী'র। 'লিও তো ল্যাটিন শব্দ। মানে, সিংহ। ঠিক নামই দিয়েছে তো বুড়ো। অদ্ভুত! খুবই অদ্ভুত! হুবহু সেইরকম—কিন্তু···কিন্তু তাও কি সম্ভব?' শেষের কথাগুলো স্বগতোক্তি।

অসহিষ্ণুভাবে জলদর্পণের ওপর হস্ত সঞ্চালন করতেই কালো হয়ে গেল জল—পরক্ষণেই জল পরিষ্কার হয়ে যেতেই দেখলাম মিলিয়ে গেছে জলের ছবি, লম্ফের আলো ছাড়া জীবন্ত মুকুরের প্রশান্ত বুকে নেই আর কোনো প্রতিফলন।

ক্ষণেক আত্মনিবিষ্ট থাকার পর বললে 'সেই-নারী'—'হোল্লি, যাওয়ার আগে কিছু বাসনা থাকলে ব্যক্ত করতে পারো।'

'বাসনা একটাই আছে, আয়েশা,' বেশ দৃপ্ত কণ্ঠেই জবাব দিয়েছিলাম তৎক্ষণাৎ—'আপনার মুখটা দেখতে চাই।'

আবার সেই হাসি। যেন অনেকগুলো ছোট ছোট রুপোর ঘণ্টা বেজে উঠল এক সঙ্গে। 'হোল্লি, ভাল করে ভেবে ছাখো। গ্রীস দেশের দেব-কাহিনী কি জানো না? বেশী রূপ দেখে ফেলেছিল বলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল অ্যাকটিয়ন? আমার মুখ দেখলে তোমার দশাও তাই হতে পারে। নিষ্ফল কামনায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে এ-মুখ দেখলে। শুধু একজন—একজন ছাড়া কেউ আমাকে পাবে না। সে ছিল, এখনো আসে নি। কিন্তু আসবেই, আসতেই হবে। তোমার জন্যে তো আমি নই, হোল্লি।'

'রূপকে আমি ডরাই না, আয়েশা। মেয়েদের রূপের দেমাক আমার কাছে ক্ষণস্থায়ী ফুলের মতোই। আজ আছে, কাল নেই।'

'ভুল করলে। কিছুই যায় না, রূপও থেকে যায়। আমারও আছে। এখনো ভেবে ছাখো। হঠকারিতা তোমাকে মানায় না। দেখতে চাও?'

'চাই।' বলেছিলাম কৌতূহল-অভিভূত স্বরে।

সুগোল সাদাবাহু ওপরে তুলল 'সেই-নারী'। এমন সুডৌল ভুজলতা আমি জীবনে দেখিনি। খুব ধীরে, আস্তে আস্তে চুলের পেছন দিকের একটা বন্ধন খুলে দিলে 'সেই-নারী'। আচম্বিতে শববস্ত্রের মতো দীর্ঘ আবরণ খসে পড়ল মাটিতে। বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে গেলাম পা থেকে মাথায়। রাজ-

রাণীর মতোই সুচারু বরতনুতে এখন শ্বেতশুভ্র পরিচ্ছদ ছাড়া আর কিছু নেই। মিহি বস্ত্র অঙ্গ লেপটে থাকায় অত্যাশ্চর্য দেহসুষমা নক্ষত্রালোকের মতো বিচ্ছুরিত হচ্ছে সহস্র ধারায়। প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত অপরূপ সেই দেহবল্লরী নিছক প্রাণের আধার যেন নয়—তারও অধিক কিছুর—আমার জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়ে সেই 'কিছু'র নাগাল ধরা কঠিন। মাথার ঘনকৃষ্ণ কেশদাম থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত এমনই বিচিত্র লাবণ্যের প্রলেপ—যে-লাবণ্যকে মানবিক লাবণ্য বলা যায় না কোনোক্রমেই—নাগিনী সুষমার সঙ্গে তার সাদৃশ্য অধিকতর। সুচারু ক্ষুদ্র পদদ্বয় সুবর্ণখচিত সুচিত্রিত চটিজুতায় আবৃত। গোড়ালী অতিশয় নিখুঁত—বিশ্ববন্দিত ভাস্করও কল্পনায় আনতে পারবে না। কটিদেশের ঘাগড়া নিরেট সোনার দু-মুখো সাপের বন্ধনীবদ্ধ। ঘাগড়া যেখানে শেষ, তার ওপর থেকে ফুলে উঠেছে রৌপ্যসদৃশ তুষারধবল নয়ন-সুন্দর বক্ষদেশ। মোহিনী কান্তির ওপর ভাঁজ করে রাখা দু-বাহু। দৃষ্টি সরে গেল ঠিক তার ওপরের মুখাবয়বে। অতিরঞ্জন করছি না, কিন্তু দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল—বিস্ময় বিষয়ে চমকিত হয়েছিলাম। স্বর্গীয় সৌন্দর্য কাহিনী অনেক শুনেছি, প্রত্যক্ষ করলাম সেই প্রথম। যেন তারাচূর্ণ রজতের স্রোত সহসা জমাট বেঁধেছে বিমল আলোকে প্রদীপ্ত অপরূপ সেই আননে। যেন ব্রহ্মলোক থেকে স্বর্গ-সূর্যের কিরণপাতে আলোকিত সেই মুখ। ভুরু তো নয়, যেন কনকের রেখা। অধরেতে স্খলিত-চরণা মদির হিল্লোলময়ী হাসি। ঝিকিমিকি সোনার কিরণ আঁকা ইন্দুস্নিগ্ধ মুখখানিতে বিষাদ সৌন্দর্য। তা সত্ত্বেও ধমনীর রুধিরপ্রবাহ শীতল হয়ে এসেছিল আমার। সৃজনের আরম্ভ সময়ে ছিল যে অনাদি অন্ধকার, সৃজনের ধ্বংস-যুগান্তরে থাকবে যে অসীম হুতাশন, জগতের মহা চিতানলের সেই তেজোময় প্রকাশ দেখেছিলাম তার অতুল রূপরাশির মধ্যে। মোহন ইন্দ্রজালে আবৃত অপরূপার মুখে প্রচ্ছন্ন দেখেছিলাম আঁধার পিশাচিনীর ঘনীভূত অট্টহাস। সৌন্দর্যের মরীচিকা, মোহিনী ছলনা যে এ-ভাবে মূর্ত হতে পারে—সে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম সেই প্রথম। স্বর্গীয় রূপের অন্তরালে এ-হেন অতলান্ত নারকীয় রূপ যে কল্পনাও করা যায় না। মুখাবয়বে বয়সের ছাপ তিরিশের বেশী নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা আর শোকতাপ, আবেগ আর অবর্ণনীয় বহুদর্শনের ছাপ তার চাইতেও অনেক বেশী। যৌবনের শত ফোয়ারায় উচ্ছলিত আননে যেন হিমানীর গ্লানি, শ্মশানধূমের কুহেলিকা। অধরের মৃদুমন্দ মদির হাসিও গোপন করতে পারেনি অন্তরের মহাপাপ আর মহা-বিষাদকে। মাণিক্য উজ্জ্বল দুই চোখে, ললাটে, অধরে, উরু 'পরে, কটিতটে,

স্তনাগ্রচূড়ায় লাবণ্যের মায়ামন্ত্র যেন স্থির অচঞ্চল—অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল। নিমেষহীন নিশ্চল নয়নে, শান্ত প্রসন্ন বয়ানে কিন্তু বিমূর্ত এক বিস্ময়বার্তা—'বিদেশী, প্রত্যক্ষ করো, পান করো এই রূপসুধা। কিন্তু ভুলো না, আমার মৃত্যু নেই। আমার এক অঙ্গে অমরলোকের আশীর্বাদ, আর এক অঙ্গে মৃত্যুলোকের বিজয়কেতন। যুগে যুগে আমি ছিলাম, আমি থাকব। কামনাবাসনায় উদ্বেলিত হয়েছি, আবার হব। পাপ করেছি, দুঃখ পেয়েছি—আবার পাপ করব, আবার দুঃখ পাবো। উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত শত সহস্র বছর অব্যাহত থাকবে পাপ-তাপ হর্ষ-বিষাদের চক্রাবর্ত।'

গলা ভেঙে গিয়েছিল কথা বলতে গিয়ে—'দেখেছি! দেখেছি আপনার অতুল রূপরাশি। কিন্তু চোখ যে ধাঁধিয়ে গেল!' বলতে বলতে হাতচাপা দিয়েছিলাম দুই চোখে।

'হুঁশিয়ার করেছিলাম আগেই। রূপ তো বিজলী সমান। দেখতে ভালো-কিন্তু পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়—বিশেষ করে বৃক্ষকে,' বলেই আবার রজত নূপুরনিক্কণের মতো রিন রিন টিন টিন হাসি।

সহসা স্তব্ধ হল হাস্যধ্বনি। আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখলাম আচমকা পালটে গিয়েছে আয়েশার মুখচ্ছবি। বিশাল নয়নে ছুটোপাটি চলছে যেন অমানিশাসম আতংকের সঙ্গে নিরন্ধ্র অন্তরের অন্তস্থল থেকে উঠে আসা বিপুল প্রত্যাশার। কমনীয় মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে অকস্মাৎ—ঋজু হয়ে গেছে নবনীত-কোমল তনু। আড়ষ্ট। শক্ত।

ছোবল দেওয়ার পরমুহূর্তে ফণিনীর মতোই সহসা মাথা সোজা করে হিসহিসিয়ে উঠল আয়েশা চাপা স্বরে—'বিদেশী, তোমার আঙুলে এ-রত্ন এল কোত্থেকে? বলো, কথা বলো, নইলে প্রাণসার বর্ষণ করে এই মুহূর্তে ঝলসে চৌচির করে দেবো যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে—ঐ অবস্থাতেই।'

বলেই এক পা এগিয়ে এসেছিল আয়েশা আমার দিকে। ভয়ানক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল দামিনী-গর্ভ দুই চক্ষু থেকে। নিছক রশ্মি নয়—যেন অগ্নিশিখা। আছড়ে পড়েছিলাম তার পদতলে—নিঃসীম আতংকে কথা বলতে পারিনি। কষ বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়েছিল—বুদ্‌বুদ ওঠার মত ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গিয়েছিল কণ্ঠে।

কোনমতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম স্খলিত চরণে। প্রকৃত জবাব দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। লণ্ডভণ্ড কাণ্ড চলছিল মাস্তিষ্কের কোষে কোষে। কালকূটও বুঝি অত যন্ত্রণাদায়ক নয়। সেই মুহূর্তে তাই শুধু মনে পড়েছিল, এই তো একটু আগেই মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আঙুলে গলা-

য়েছি সোনার আংটি।

আবিল স্বরে বলেছিলাম শুধু সেইটুকুই—'কুড়িয়ে পেয়েছি।'

'অদ্ভুত! অদ্ভুত! অদ্ভুত!' বিমূঢ় কণ্ঠে যেন স্বগতোক্তি করে গিয়েছিল আয়েশা। ক্ষণপূর্বেই যার ভয়ংকর সুন্দর রূপ আর দুর্বোধ্য প্রকৃতি হৃৎকম্প উপস্থিত করেছিল আমার—সেই মুহূর্তে চকিতের জন্যে সাধারণ রমণীর মতোই বিপুল উত্তেজনায় শিহরিত হতে দেখেছিলাম তাকে। পরের কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল সামান্যা মানবীর মতো—'কিন্তু...কিন্তু...এ যে ছিল তারই গলায়...যাকে আমি ভালবেসে ছিলাম বহু যুগ আগে—বাসব বহু যুগ পরেও—এ-রত্ন যে দেখেছি তারই গলায়! কিন্তু তখন তো সোনায় বাঁধানো ছিল না! তবে কি অবিকল সেই রকমই পাথর ...তাও কি সম্ভব! হোল্লি, যাও! এখানে আর নয়! যদি পারো, ভুলে যেও আয়েশার রূপসুধা ক্ষণেকের জন্যেও অন্তর ভুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তোমার।'

বলেই মুখ গুঁজরে কোচে আছড়ে পড়েছিল আয়েশা।

টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছিলাম কক্ষের বাইরে। কিভাবে যে নিজের গুহায় পৌঁছেছিলাম তা নিজেই জানি না।

(১৪) নরকে পতিত আত্মা

রাত দশটা নাগাদ বিছানায় আছড়ে পড়েছিলাম। যুক্তি-বুদ্ধি-ঘুলিয়ে-যাওয়া যে সব কাণ্ডকারখানা দেখে এলাম, তাই নিয়ে পাগলের মতো ভাবতে শুরু করেছিলাম। যা শুনে এলাম, যা দেখে এলাম, তার বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা হাজির করার প্রাণান্তকর চেষ্টায় মাথার কোষগুলো যেন ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। ভেবে ভেবে কিন্তু কোনো কূল কিনারা পাই নি। মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পাইনি—অযৌক্তিক আবোল তাবোল ব্যাপার স্যাপারকে প্রশ্রয় দেওয়া আমার ধাতে অন্ততঃ নেই। ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত কোনো ঘটনাই অজানা নেই। তামাম ইউরোপে অতিপ্রাকৃত নামে প্রচলিত উদ্ভট বাজে ব্যাপারকে পাত্তা দিইনি কস্মিনকালেও। তা সত্ত্বেও দু-হাজার বছর বয়সের এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করে এলাম এতক্ষণ—এই ঘটনাকে মেনে নিই কি করে? জলের ওপর প্রতিবিম্ব দেখলাম, সুদূর অতীতের অনেক কিছুর সঙ্গে স্ত্রীলোকটির নিবিড় পরিচিতির প্রমাণ পেলাম, পরবর্তী ইতিহাসের ধারা প্রবাহে তার অজ্ঞতা বা আপাতঃ অজ্ঞতা দেখে হকচকিয়ে গেলাম—সৃষ্টিছাড়া এ-সব ব্যাপারে কি ব্যাখ্যা হওয়া উচিত মাথায় এল না

কিছুতেই। আশ্চর্য ভয়ংকর লাবণ্য প্রত্যক্ষও তো করলাম। ভাষায় বর্ণনা করা যায় না—এমন রূপরাশি মর্ত্যলোকে সম্ভব হয় কি করে? সব চাইতে ভয়ংকর তার ঐ চোখের জ্যোতি—ভাবলেই গা হিম হয়ে আসে এখনো। ঐ চোখের অগ্নিবর্ষণের স্মৃতি তো মন থেকে ঝেড়ে ফেলা সম্ভব নয় কোন মতেই। নির্মল চরিত্রের মানুষ হয়েও এই মাঝবয়েসে ঐ শ্বেতকায়া জাদুকরীর কুহক মায়াতেই বা মজে গেলাম কি ভাবে?

বেশ মনে আছে, ছটফট করেছিলাম শয্যায়, মাথার চুল ছিঁড়েছিলাম দুহাতে, যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হাজির করতে না পারলে উন্মাদ হতে যে বাকী থাকবে না, হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করেছিলাম। সুপ্রাচীন রত্নখণ্ড নিয়ে 'সেই-নারী'র হেঁয়ালী ভরা কথাবার্তাগুলোর মানে কি হওয়া উচিত, মনের মধ্যে হাজার তোলাপাড়া করেও সদুত্তর খুঁজে পেলাম না। প্রায় একুশ বছর আগে লোহার বাক্সয় ভরে ভিন্সি সেই বস্তু রেখে গিয়েছিল আমার ঘরে—এখন তা লিও-র সম্পত্তি। তবে কি সব সত্যি? গল্পটা নিছক অলীক কাহিনী নয়? ভয়াবহ সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে অবিশ্বাস্য উপাখ্যানের ছত্রে ছত্রে? ভাঙামাটির পাত্রের লেখায় জালিয়াতি নেই? বিস্মৃত অতীতের কোনো বিকৃত মস্তিষ্কের অপকর্ম নয়? তাই যদি হয়, তাহলে কি লিও-ই সেই মানুষ যার প্রতীক্ষায় দু-হাজার বছর পথ চেয়ে বসে আছে 'সেই-নারী'—মৃত্যুর পর—পুনর্জন্ম নিয়েছে লিও-রূপে? অসম্ভব! পুরো ব্যাপারটাই স্রেফ উদ্ভট কপোলকল্পনা।

তবে দু হাজার বছর ধরে কোনো স্ত্রীলোক যদি বেঁচে থাকতে পারে, মৃতের পুনর্জন্মই বা সম্ভব হবে না কেন? সম্ভব! অবশ্যই সম্ভব! অসম্ভব বলা যায় না কোনমতেই।

দিশেহারা হয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করে খেই না পেয়ে শেষকালে লিও র কথা মনে পড়েছিল। জুতো খুলে মোজা পায়ে লম্ফ হাতে গিয়েছিলাম তার শোবার ঘরে। অবস্থা দেখে মোচড় দিয়ে উঠেছিল বুকের ভেতরটা। জ্বরে আতপ্ত গাল, চোখের নিচে কালো ছায়া নিঃশ্বাস সঘন। অবস্থা শোচনীয়, মৃত্যু সন্নিকটে, দুনিয়ায় নিঃসঙ্গ হতে চলেছি এই মধ্যবয়সে। বেঁচেও যদি থাকে, আয়েশাকে নিয়ে তার সঙ্গে লাগবে আমার টক্কর। আয়েশাকে যে ভালবেসে ফেলেছি—আয়েশা কিন্তু নিশ্চয় ভালবাসে তাকেই। যদি এই লিও দু-হাজার বছর আগে মৃত তার প্রাণের পুরুষ হয়, তাহলে যতদিন বাঁচব, প্রেমের ত্রিভুজে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবো। হে ভগবান! একী দুর্বিপাকে ফেললে আমাকে! কদাকার এই প্রৌঢ়কে কেন

ঐ নক্ষত্রসম যৌবনোচ্ছল স্ত্রীলোকটির প্রেমের ফাঁদে বন্দী করলে। যাই ঘটুক না কেন, 'সেই নারী' আমার বুদ্ধি যুক্তি তো কেড়ে নিতে পারেনি। লিও বাঁচুক। আমার প্রাণের চাইতেও প্রিয় লিও বাঁচুক, আমার পুত্রাধিক লিও সুখে থাকুক, আমার জীবন দিয়েও সে পথ পরিষ্কার করে যাবো— সে মনোবল এখনও আছে আমার।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিলাম শয়নকক্ষ ছেড়ে। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। আসবেও না। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে তাই হেঁটে গিয়েছিলাম গুহা বরাবর।

আচম্বিতে পাথরের দেওয়ালে সঙ্কীর্ণ একটা ফাঁক চোখে পড়েছিল— আগে যা দেখিনি। লম্ফের আলোয় দেখলাম, ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা সরু গুহাপথ। মন তখন এতই চঞ্চল যে কিছু একটা করার বাসনায় গুহাপথ কোথায় গেছে, দেখবার ইচ্ছায় ঢুকে পড়েছিলাম ভেতরে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে পেয়েছিলাম পাথর কেটে বানানো একটা সুড়ঙ্গ। ওপরকার গুহার ঠিক তলা দিয়ে সুড়ঙ্গপথ এগিয়ে গিয়েছে মূল গুহার তলা দিয়ে অনেক দূরে। কি জানি কিসের দুর্নিবার আকর্ষণে মোজাপরা পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়েছিলাম মৃত্যুপুরীর মতো নিস্তব্ধ সেই পাতাল সুড়ঙ্গ বরাবর। প্রায় পঞ্চাশগজ যাওয়ার পরেই দেখেছিলাম সমকোণে আর একটা গুহা গিয়েছে ডানদিকে। ঠিক এই সময়ে ঘটল একটা ভয়ানক ব্যাপার। হঠাৎ কোত্থেকে এক ঝলক হাওয়া এসে ফুস্ করে নিভিয়ে দিলে হাতের লম্ফ নিশ্ছিদ্র তমিস্রায় এক ইঞ্চি দূরের জিনিসও আর দেখতে পেলাম না। বিষম ভয়ে খাড়া হয়ে গেল গায়ের লোম। রহস্যনিবিড় এই পাতাল বিবরে আলো না নিয়ে আমি এখন যাই কোথায়? ফিরবই বা কিভাবে? ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিবিড় অন্ধকার ঠেলেই অন্ধের মতো একটু এগিয়ে পেরিয়ে এসে-ছিলাম সুড়ঙ্গের মোড়। তারপর শুরু হয়েছিল ভাবনা। ভাবনাটা একটা অদ্ভুত আলো নিয়ে। নতুন সুড়ঙ্গের বহু দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ক্ষীণ আলো। আগুনের প্রভা। অতিশয় ম্যাড়মেড়ে। আলো পাওয়া যাবে, এই আশায় বুক বেঁধে এগিয়েছিলাম সেই দিকেই। দেওয়াল ধরে, অন্ধকারে পা দিয়ে মেঝেতে গর্ত আছে কিনা পরখ করে নিয়ে, একটু একটু করে অগ্রসর হয়েছিলাম নিকষ আঁধারের বুকে অগ্নিময় সেই পাতাল প্রভার দিকে। মেপে মেপে তিরিশ পা যেতেই লক্ষ্য করেছিলাম আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছে একটা পর্দার আড়াল থেকে। পঞ্চাশ পা গিয়েই পর্দাটাকে দেখেছিলাম কাছেই। ষাট পা গিয়েই পৌঁছেছিলাম পর্দার সামনে।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখেছিলাম ওদিকের ছোট্ট পাতাল গহ্বরের

বিচিত্র দৃশ্য। কবরখানার মতোই দেখতে সেই বিবরের ঠিক মাঝখানে দাউ দাউ করে জলছে একটা সাদা আগুন। ধোঁয়ার নামগন্ধ নেই—শুধু একটা সাদা আগুনের লকলকে শিখা। বাঁদিকে ইঞ্চি তিনেক উঁচু পাথুরে চাতালে সাদা বস্ত্র চাপা দেওয়া একটা মড়া, মড়া ছাড়া নিশ্চয় কিছু নয়—মড়াকেই ওভাবে সাদা কাপড় ঢেকে রেখে দেওয়া হয়। আগুনের ওপর আমার দিকে পাশ ফিরিয়ে, মড়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে নতজানু হয়ে বসে একটি স্ত্রীলোক। সন্ন্যাসিনীদের মতো কালো ঘোমটা আর আলখাল্লায় ঢাকা তার আপাদমস্তক দূর থেকে মনে হল যেন নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে সাদা অগ্নিশিখার পানে। আচম্বিতে নিঃসীম নৈঃশব্দ্যে ফেটে পড়ে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে কালো বোরখা ছুঁড়ে ফেলে দিলে নিশীথরাতের রহস্যময়ী।

দেখলাম, 'সেই-নারী' সটান দেহে দাঁড়িয়ে লেলিহান অগ্নিশিখার সামনে!

শিহরণের পর শিহরণ তুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার শুধু সেই মুখ দেখে। মহা আতংকের দ্রিমি দ্রিমি ডম্বরু-ধ্বনি প্রলয় বাজনা বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল অণু পরমাণু শিরা উপশিরায়। হ্যাঁ, 'সেই-নারীর' এ-হেন মুখ আমি প্রথম দর্শনেও দেখিনি। পরনে এখনো সেই শ্বেত বেশ—যে-বেশ দেখেছিলাম তার মায়ামন্ত্রময় ছোট প্রকোষ্ঠে। কিন্তু থ হয়ে গেলাম শুধু মুখখানা দেখে—রূপরাশির জন্যে নয়। রূপ রয়েছে ঠিকই—সেই অলোকসাধারণ আশ্চর্য সৌন্দর্য এখনো ঝলমলিয়ে তুলেছে তার স্বর্গীয় অথচ নারকীয় মুখাবয়বকে। কিন্তু পাশাপাশি বিমূর্ত হয়েছে অবর্ণনীয় মনোবেদনা, অশান্ত আবেগ এবং লোমহর্ষক জিঘাংসা। মুখের পরতে পরতে তাথৈ তাথৈ প্রলয়-নাচন নেচে বেড়াচ্ছে আতান্তিক ভাবরাশি—লোল রসনায় বুঝি বিচ্ছুরিত হচ্ছে উর্ধ্বোত্থিত বেদনাবিকৃত চক্ষু তারকার মণিরন্ধ্র থেকে। ভাবরাশির সেই প্রচণ্ডতার বর্ণনা আমার এই সামান্য ভাষায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, ধরা পড়ে গেলে রক্ষে নেই। বুঝেও এক পা-ও নড়তে পারলাম না। আমার তখনকার নিশ্চেতন নিঃসাড় অবস্থার কারণ শুধু ঐ অপার্থিব আননের অকপট ভয়াবহতা!

মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত দু-পাশে নামিয়ে এনেই পরক্ষণেই শূন্যে উত্তোলন করল 'সেই-নারী'। সঙ্গে সঙ্গে লকলকে সাদা শিখাও অমোঘ আদেশ না মেনে যেন পারল না। হাত নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগুনও মাথা নুইয়ে যেন মাটিতে মিশে গেল—হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গে রুদ্র তেজে লকলকিয়ে ধেয়ে

গেল বিশাল উঁচু গহ্বরের ছাদ লক্ষ্য করে। রোমাঞ্চিত কলেবরে অভাবনীয় সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে হাঁটু ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল আমার। এখন যখন লিখছি, এখনো হাত কাঁপছে সেই দৃশ্য মনের চোখে ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। বিশ্বাস করুন, হে সুধী পাঠকপাঠিকা, বিশ্বাস করুন, আমি এতটুকু প্রবঞ্চনা বা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিচ্ছি না। সততা আমার প্রকৃতিগত—মিথ্যাকথন আমার চরিত্রে নেই।

লকলকে আগুনের আভায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল 'সেই-নারী'র ভয়াল মুখচ্ছবি—আরো বীভৎস, আরো পৈশাচিক ভাবাবেগে ছেয়ে গেল অমর্ত্য মুখখানি। প্রচণ্ড অগ্নিপ্রভায় স্পষ্টতর হয়ে উঠল বিশাল গহ্বরের প্রতিটি খাঁজ, প্রতিটি কোণ, প্রতিটি ভাঙা চোরা এবং দেওয়ালে ছাদে উৎকীর্ণ অজস্র সাংকেতিক লিপি।

আবার দুপাশে নেমে এল উত্থিত বাহু। সেই সঙ্গে কণ্ঠে ধ্বনিত হল সাপের হিসহিসানির সুরে আরবী ভাষায় স্বগতোক্তি। সে স্বর এমনই করাল যে রক্ত ছলকে উঠেছিল আমার বুকের মধ্যে।

'নিপাত যাক...নিপাত যাক...নিপাত যাক শয়তানী...অন্তহীন অবলুপ্তির অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হোক অস্তিত্ব।'

মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত দুই পাশে নেমে আসতেই মন্ত্রমুগ্ধ অগ্নি-নাগিনীর মতোই লেলিহান শিখা ফণা নামিয়ে গুটিয়ে আনল মেঝের কাছে। আবার হাত উঠল ওপরে, আবার আগুনের ফণা লকলকিয়ে ধেয়ে গেল ছাদের দিকে। আবার গুটিয়ে এতটুকু হয়ে গেল হাত নামিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে।

'চির অভিশপ্ত হয়ে থাকুক শয়তানীর স্মৃতি...মন থেকে চিরতরে মুছে যাক মিশরের সব কথা।'

আবার উঠল হাত, উঠল আগুন—নামল হাত, নামল আগুন!

'নিপাত যাক নীলনদের কন্যা, জাহান্নমে যাক তার রূপের দেমাক।'

'নিপাত যাক তার জাদুবিদ্যা—খসে যাক জাদুনিগড় আমার শক্তির সামনে থেকে।'

'নিপাত যাক, নিপাত যাক, নিপাত যাক সেই সুন্দরী যার ছলনার কারাগারে বন্দী আমার ভালবাসার মানুষ।'

আবার নেমে এল আগুন—ধিকিধিকি কাঁপছে পাথরের বক্ষ ঘেঁসে ভীরু খরগোশের মতো।

দুহাতে চোখ চাপা দিয়ে আর্তস্বরে হাহাকার করে উঠল 'সেই-নারী', উগ্রনাগিনী-গর্জন তিরোহিত হল কণ্ঠস্বর থেকে।

'লাভ কি অভিশাপ দিয়ে? এত শাপশাপান্ত করেও শয়তানীকে আজও তো নিকেশ করতে পারিনি।'

পরক্ষণেই আবার শুরু হয়ে গেল অভিশাপ-বর্ষণ—এবার আরো ভয়ানক আত্মিক শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে।

'জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাক আমার অভিশাপে—যেখানেই থাকুক না কেন—যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন—স্পর্শ করুক তাকে আমার অভিশাপ।

'নক্ষত্রখচিত মহাশূন্যের মাঝে ধেয়ে যাক আমার অভিশাপ—তার ছায়াটুকুও যদি কোথাও থাকে—ব্যোমমার্গে বিলীন হোক আমার অভিশাপে।

'ব্রহ্মাণ্ডের যে-লোকেই থাকুক তার অস্তিত্ব, সেইখানেই পৌঁছোক আমার অভিশাপ।

'মরলোকে পরলোকে যেখানে যেভাবে থাকুক না কেন, কর্ণরন্ধ্রে পৌঁছোয় যেন আমার অভিশাপ। বিষম ত্রাসে লুকোক গিয়ে আঁধারের বিবরে।

'তলিয়ে যাক নৈরাশ্যের অতল গহ্বরে—নিষ্কৃতি নেই...নিষ্কৃতি নেই সেখানেও—একদিন না একদিন আমার এই অভিশাপ কালসর্পের মতোই দংশন করুক তাকে।'

আবার ভূতল স্পর্শ করল আগুনের শিখা, আবার দুই করতলে চোখ আবৃত করল 'সেই-নারী'।

কণ্ঠে জাগরূক হল বুকফাটা বিলাপ—'লাভ নেই...লাভ নেই! কবরের আলয়ে যারা সুষুপ্ত, কি করে জাগাই তাদের? কেউ পারে না...কেউ পারে নি...আমারও ক্ষমতা নেই তাদের নিকটে যাওয়ার।'

আবার...আবার শুরু হয়ে গেল নারকীয় ক্রিয়া-অনুষ্ঠান।

'পুনর্জন্ম যদি হয়, তখনো যেন আমার এই অভিশাপ স্পর্শ করে তাকে। জন্ম মুহূর্তেই অভিশপ্ত হোক তার সারা জীবন।

'ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে শুরু করে কালনিদ্রা পর্যন্ত সারা জীবনটা জর্জরিত হয়ে থাকুক আমার এই কালজয়ী অভিশাপে।

'চরম প্রতিহিংসার সমাপ্তি ঘটুক চির-বিলুপ্তি ঘটিয়ে...বহুযুগ পরে...হাজার হাজার বছর পরেও আর তার কণিকামাত্রও যেন দেখা না যায় এ ভুবনের কোথাও।'

চলল এইভাবেই। প্রলয়াগ্নি উঠছে, নামছে—ধকধকে কাতর দুই চোখে নরকাগ্নির প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছে বিরামবিহীনভাবে। লক্ষ সর্পের হিসহিসানির মতো অশ্রুতপূর্ব করাল কণ্ঠস্বর-ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি ঘাত প্রতিঘাত তুলে ধেয়ে যাচ্ছে পাতালরন্ধ্রের দিকে দিকে। কী ভয়ংকর, কী

ভয়ংকর সেই গজরানি! কোনো মানবীর কণ্ঠে এমন অমানবিক চাপা হুংকার যে কল্পনাতেও আনা যায় না। বিষাক্ত স্বর খিঁচিয়ে তুলেছে অলৌকিক অগ্নিশিখাকেও। মুহুর্মুহু নিবিড় গভীর ছায়াপাত ঘটিয়ে চলেছে পাথরের চাতালে শোয়ানো বীভৎস সাদা আকৃতিটার ওপর।

অনেকক্ষণ পরে যেন শক্তি নিঃশেষিত হল 'সেই-নারী'র। স্তব্ধ হল পৈশাচিক অগ্নিভজনা—আঁধারলোকের বিদ্রোহী আরাধনা। কঠিন প্রস্তরে বসে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল হৃদয় মোচড়ানো যাতনায়। অব্যক্ত নৈরাশ্যে বুঝি শতধাবিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে রক্তাক্ত হৃদয়।

'আর কত বছর?...আর কত বছর দিন গুনব প্রতীক্ষায়? কবে অবসান ঘটবে দীর্ঘ দু-হাজার বছরের প্রতীক্ষার? অকথ্য মানসিক নিগ্রহ সহ্য করে গেলাম এই দু-হাজার বছরে...কত শতাব্দী এল, কত শতাব্দী গেল, মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে দীর্ঘ দুটি হাজার বছর কাটিয়ে দিলাম উন্মুখ প্রত্যাশায়। কিন্তু কই, স্মৃতির দংশন থেকে তো রেহাই পেলাম না! স্মৃতি! স্মৃতি! স্মৃতি! শতাব্দীর পর শতাব্দী কালশূন্য অন্তরের মহাশূন্যে অনাদি অনন্ত বর্তিকা হয়ে থেকেছে—ধিকি ধিকি জ্বলেছে—জ্বলবেও—আশার ছলনার একী উপহাস! একী পরিহাস! পারি না, পারি না, আর যে সইতে পারি না আমি! দীর্ঘ দুটি হাজার বছর আমার অমর সত্তাকে বিষ ছোবলে জর্জরিত করে চলেছে আমারই কামনা বাসনা, মহাপাপের গরল ধারায় তীব্র যন্ত্রণায় হাজার হাজার বছর ধরে শিউরে উঠছে অন্তরাত্মা! বিস্মৃতি তো কই আসছে না! কেন? কেন? কেন? হে নিঠুর, কবে তুমি দয়া করবে আমাকে তোমার সর্বশক্তি দিয়ে—আমার তো সব থেকেও কিছুই নেই তোমার করুণার প্রসাদে বঞ্চিত হওয়ায়? জানি না আমার করণীয় কী, জানি না সেই মিশরীয় শয়তানী এই মুহূর্তে রয়েছে কোথায়! তোমারই নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ঠাঁই নিয়ে এই মুহূর্তে আমার দুহাজারব্যাপী যন্ত্রণা তার শ্লেষ-বঙ্কিম আননে বিদ্রূপ-হাস্য এঁকে দিয়ে যাচ্ছে কিনা, তাই বা কে জানে! আমার অসহ্য স্মৃতির যাতনা তার হৃদয়ে অসহ্য পুলকের সঞ্চার ঘটাচ্ছে কিনা কে বলবে? কেন আমারও বিনাশ ঘটল না তোমারই সাথে—আমিই হনন করেছিলাম তোমাকে—সঙ্গে সঙ্গে চির-অন্ধকারে আমিও কেন নিক্ষিপ্ত হলাম না। হায়রে! তা তো হবার নয়! আমার যে মৃত্যু নেই—মরতে চাইলেও তো আমি মরতে পারব না! হায়! হায়! হায়! একী অনন্ত যন্ত্রণার নরকে রেখে গেল আমাকে!'

বলতে বলতে কঠিন প্রস্তরভূমিতে আছড়ে পড়ে আকুল কান্নায় আছাড়ি-

পিছাড়ি থেকে থাকে 'সেই-বারো'। স্তম্ভিত নয়নে তা দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল, কলজে বুঝি বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবার দু হাজার বছর ধরে জমিয়ে রাখা অনুশোচনার যাতনায়, দুঃসহ স্মৃতির বেদনায়।

আচমকা অশ্রুপাত থামিয়ে, হাহাকার স্তব্ধ করে উঠে দাঁড়াল রহস্যময়ী। বিস্রস্ত পোশাক ঠিক করে নিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়াল পাথুরে চাতালে শোয়ানো বস্ত্রাচ্ছাদিত মূর্তিটার সামনে।

'কালিক্রেটস!'

আর্তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নামটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন শেল নিক্ষিপ্ত হল আমার স্মৃতির পর্দায়—অষ্টবজ্রের যুগপৎ আঘাতে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আমার যুক্তিবুদ্ধির কঠিন নিগড়—'কালিক্রেটস! বেদনায় বুক চৌচির হয়ে হয়ে যায় যাক, তবুও আবার আঁখি দিয়ে দেখব তোমার মূরতি। বহু প্রজন্ম পূর্বে স্বহস্তে নিধন করেছিলাম যাকে, আবার দৃষ্টিপাত ঘটুক তার মুখাবয়বে।' কম্পিত হস্তে শববান আকৃতির ওপরে মেলে ধরা বস্ত্রের এক কোন শূন্যে তুলেই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে গেল শ্রীমতী।

আবার অমানবিক আকুতি ফেটে পড়ল অপার্থিব কণ্ঠস্বরে—'কালিক্রেটস! বলো, জাগাবো তোমাকে? পুরোনো দিনের মতোই কি আবার দাঁড়াতে চাও আমার সামনে? কে বলে তুমি মৃত? আমি পারি তোমার প্রাণহীন শুষ্কদেহে সরস সজীবতা ফিরিয়ে আনতে। বলো, কালিক্রেটস, বলো। বরতনুতে ফিরিয়ে আনবো কি দু-হাজার বছর আগেকার জীবনের জয়গান?'

বলতে বলতে সমস্ত দেহটা কঠিন হয়ে গেল শ্রীমতীর। আড়ষ্ট হাত দুটি মেলে ধরলে শায়িত মড়ার ওপর। নিষ্প্রভ নিথর হয়ে এল ভয়ংকর দুটি নয়ন।

সেকেণ্ড কয়েক এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সহসা নতজানু হয়ে বসে পড়ল চাতালের পাশে। অধর স্পর্শ করল মড়ার ওপরে ঢাকা বস্ত্রের ওপর। ভয়াবহ সেই দৃশ্য ক্ষণপূর্বে-দেখা অবিশ্বাস্য ভয়ংকর যাবতীয় দৃশ্যকেও ম্লান করে দিয়েছিল অপরিসীম বিভীষিকায়। পুঞ্জীভূত আতংকদেহিনী কামনার সিঞ্চন ঘটিয়ে চলেছে বিগতপ্রাণ এক দেহের ওপর। উন্মাদিনীর মতো চুম্বনে চুম্বনে নিঃশেষ করে আনছে নিজেকে! এ দৃশ্য দেখবার মতো মানসিকতা আর আমার ছিল না। দাঁড়িয়ে থাকতেও তাই পারলাম না। সারা শরীর তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। হাত-পা বশে নেই। চিত্ত আবিল। বুদ্ধি বিভ্রান্ত। যুক্তি অসাড়। তা সত্ত্বেও কি করে যে পেছন ফিরে, দেওয়াল ধরে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ে, নিশ্ছিদ্র

তমিস্রার মধ্যে দিয়ে পথ ভুলে গিয়েও স্রেফ কপাল জোরে সঠিক সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ে নিজের গুহাকক্ষে ফিরে এসেছিলাম, আজও তা আমার কাছে এক বিপুল প্রহেলিকা। শয্যায় আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় চৈতন্যের অবলুপ্তিই ঘটেছিল—নিদ্রা অমন প্রগাঢ় হয় না।

(১৫) বিচারসভায় আয়েশা

এর পরেই মনে পড়ছে, চোখ মেলেই দেখেছিলাম জব আমার জামা-কাপড় ঝেড়েঝুড়ে পাট করে সাজিয়ে রাখছে। বাইরের দিনের আলো পড়েছে ওর মুখে। জলপাত্রে গরম জল নেই দেখে গজগজ করতেও শুনলাম।

আমার গলা পেয়েই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল জব—'স্যার, রাতে ভাল ঘুম হয়নি মনে হচ্ছে? চোখ মুখের একী অবস্থা!'

'লিও কি রকম আছে?'

'বাঁচবে বলে মনে হয় না। উসটেন সেবা করছে দিনরাত। উন্মাদিনীর মতো চেহারা—দেখলে চিনতে পারবেন না। চাপাগলায় কাকে যেন অভিসম্পাতও দিচ্ছে, ভাষা তো ছাই বুঝি না—'

হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিলাম। খাবার আনল বোবাকালা একটি মেয়ে। গেলাম লিও-র ঘরে। অবস্থা সত্যিই খারাপ। কান্নাকাটি করছে উসটেন। ঠিক করলাম, আর নয়, এবার ডাকা যাক 'সেই-নারী'কে। দেখা যাক অসীম ক্ষমতার কেরামতি।

এমন সময়ে বিল্লালি এল ঘরে।

লিও-কে দেখে বললে—'আজ রাতেই মারা যাবে।'

'পিতা!'

'বেবুন, 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ মানতেই-হবে' তোমাকে বিচারসভায় থাকতে বলেছেন। গতকালের মতো আবার বেয়াদবি দেখিয়ে বোসো না। চৌচির হয়ে যাবে। এসো।'

গেলাম তার পেছন পেছন। যেতে যেতে দেখলাম, কাতারে কাতারে আমাহাগগার চলেছে দ্রুতপদে। কারও গায়ে ঢোলা পরিচ্ছদ, কারও পরনে চিতাচর্ম ছাড়া কিছু নেই। গুহা যেন সীমাহীন। এঁকে বেঁকে চলেছে তো চলেইছে। দেওয়ালজোড়া পাথর-খুদে-আঁকা ছবিরও শেষ নেই। বিশ পা অন্তর ডাইনে বাঁয়ে সমকোণে বেরিয়েছে একটা করে সুড়ঙ্গ। বিল্লালি বললে, অতীতে যারা নিবাস রচনা করেছিল এই পর্বত কন্দরে, তাদেরই সমাধিকক্ষ রয়েছে প্রতিটি সুড়ঙ্গ-র প্রান্তে।

অবশেষে শেষ হল দীর্ঘ গুহা। পৌঁছোলাম একটা পাথুরে মঞ্চের সামনে। বিল্লাদির এলাকায় যে পাথুরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে লড়েছিলাম, সেই রকমই দেখতে। তবে অনেক বড়। বুঝলাম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া জাতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্যে নির্মিত হয়েছে মঞ্চ। চারপাশে বিস্তর সুড়ঙ্গ রশ্মিরেখার মত বিচ্ছুরিত পাতালের অন্ধকারে। প্রতিটিই নাকি মড়াদের সমাধিতে যাওয়ার পথ। পুরো পর্বতটাই নাকি মড়ায় ভর্তি। হাজার হাজার বছরেও অবিকৃত প্রতিটি দেহ।

মঞ্চের সামনে গুম হয়ে বসে বিস্তর নারী পুরুষ। মঞ্চের ওপর একটা হাতীর দাঁতের কাজ করা স্থূল কাষ্ঠাসন। পায়ের কাছে পা রাখবার কাঠের টুল।

আচমকা 'হিয়া!' 'হিয়া!' ('সেই-নারী!' 'সেই নারী!') রব উঠতেই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে অবিকল মড়ার মতোই নিস্পন্দ হয়ে গেল অত লোক। সটান দেহে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি একা—সারি সারি মড়ার মধ্যে যেন জীবিত কেবল আমিই।

বাঁদিকের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল সারবন্দী রক্ষী। দাঁড়ালো মঞ্চের দুপাশে। তারপর এল কুড়িজন মূকবধির পুরুষ এবং আরও কুড়িজন বোবাকালা মেয়ে—প্রত্যেকের হাতে জলন্ত লম্ফ। সবশেষে এল সাদা বোরখা আবৃত একটি দীর্ঘমূর্তি—'সেই-নারী'। মঞ্চের কাষ্ঠাসনে বসে আমার সঙ্গে কথা বলল কিন্তু গ্রীক ভাষায়—যাতে আর কেউ বুঝতে না পারে।

'হোল্লি, বসো আমার পায়ের কাছে। ছাখো, কি সাজা দিই এদের।'

মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানিয়ে মঞ্চে উঠে বসলাম তার পায়ের কাছে।

'হোল্লি, ঘুম কি রকম হয়েছে?'

'ভালো না,' বলতে বলতে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল আমার। আয়েশার মতো ভয়ংকরীর কাছে আমার নৈশ অভিযান অজ্ঞাত হয়তো নেই।

হাসি খেলে গেল দুই ঠোঁটে—'আমারও হয়নি। স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে।'

'আমাকে?' উদাসীন থাকার চেষ্টা করেছিলাম।

'শুধু তোমাকে নয়,' ঝটিতি জবাব দিল আয়েশা। 'সেই সঙ্গে একজন পুরুষকে—যাকে আমি ভালবাসি, আর একজন নারীকে—যাকে আমি ঘৃণা করি।' কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল পরক্ষণেই। হেঁকে বললে আরবী ভাষায়—'নিয়ে এসো অপরাধীদের।'

আলো দুলে উঠল দীর্ঘ বিস্তৃত সুড়ঙ্গ পথে। রক্ষীরা পাহারা দিয়ে নিয়ে এল জনাবিশেক পুরুষ কয়েদীকে। দেখেই চিনলাম। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে

আমাদের প্রাণ যেতে বসেছিল এদের হাতেই।

আতংকে কাঠ বিশজনেই। নির্বিকার থাকার চেষ্টা করেও সহজ হতে পারছে না কেউই। মিনিট কয়েক থমথমে স্তব্ধতা নেমে এল বিচারসভায়। বোরখার আড়ালে আয়েশার চোখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বুঝলাম, একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে বিশজনের দিকে।

তারপর ধীর স্থির কণ্ঠের প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হল আমার দিকে।

'অতিথি, এদের চেনো?'

'হ্যাঁ, রানী, চিনি।'

'বলো তো কি-কি ঘটেছিল।'

সংক্ষেপে বিবৃত করলাম নরমাংসের ভোজ উৎসব এবং কি ভাবে নিগৃহীত হয়েছি এদের হাতে।

আয়েশার প্রশ্ন এবার নিক্ষিপ্ত হল বিল্লালির দিকে। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত অবস্থাতেই শুধু সাদা মাথাটা তুলে সায় দিলে সে। আর কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেওয়া হল না এরপর।

কিছুক্ষণ আর কোনো কথা নেই। শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ্য যেন দম আটকে বসে প্রত্যেকেই বিষম উৎকণ্ঠায়। স্থূল কাষ্ঠাসনে আসীন সাদা বোরখাবৃত আয়েশা। বস্ত্রাবরণ ফুঁড়ে যেন কিরণসম্পাত ঘটিয়ে চলেছে অলোকসামান্য রূপরাশি এবং অশ্রুতপূর্ব সর্বনাশা শক্তিপুঞ্জ। শক্তির বিচ্ছুরণ চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু যেন অদৃশ্য জ্যোতির্বলয় রচনা করেছে সর্বঅবয়ব ঘিরে। আয়েশাকে সামনাসামনি দেখেছি, কিন্তু বোরখা ঢাকা অবস্থায় তার সেই ভয়ংকর আকৃতি দেখে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল। এত ভয় পাইনি ঘোমটা খোলা মুখ দেখেও।

নৈঃশব্দ্যটা নিশ্চয় অকারণে নয়। নিমেষে নিমেষে অব্যাখ্যাত শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে চলেছিল অণুপরমাণুতে। অকস্মাৎ বিস্ফোরণ ঘটল তেজঃ-পুঞ্জের। চাপা কিন্তু আতীক্ষ্ণ গুরুগম্ভীর কিন্তু নিনাদী কণ্ঠস্বরে গম্‌গম্ করতে লাগল বিশাল গহ্বরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। অভলান্ত ক্রোধ বিদ্বেষ নিষ্ঠুরতায় গনগনে প্রতিটি শব্দ বজ্রশেলের মতোই ধূমায়িত ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল প্রতিটি অন্তরে।

'কুত্তার দল! নরকের কীট! সরীসৃপের বাচ্চা! মানুষখেকো অমানুষ! দু-দুটো অপরাধে অপরাধী তোরা। আমার অতিথিদের ওপর হামলা চালিয়েছিস। শুধু এই অপরাধেই তোদের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। তার চাইতেও বড় অপরাধ করেছিস আমার অবাধ্য হয়ে। তোদের পিতা বিল্লালিকে

খবর পাঠিয়েছিলাম, যেন কেশাগ্র স্পর্শ করা না হয় এদের। নির্দেশ দিয়েছিলাম অতিথি সৎকারে যেন কোনো ত্রুটি না থাকে! কিন্তু তোরা দল বেঁধে নেকড়ের মত মাত্র ক'টি বীরপুরুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলি। শৌর্যবীর্য এদের প্রশংসনীয়—নইলে নিহত হত প্রত্যেকেই তোদের হাতে। 'সেই-নারা'র ইচ্ছাই এ দেশের একমাত্র কানুন, তা কি তোদের শেখানো হয়নি শৈশব থেকে? জানিস না 'সেই-নারী'র নির্দেশ পালনে সামান্যতম অবহেলা ঘটলেও ধরাতল থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হয়? আমার কথাই আমার আইন—এ শিক্ষা কি তোরা পাসনি তোদের বাবা-মায়ের কাছে? জানিস না ইচ্ছে করলেই এই বিশাল পাহাড়ের সব কটা গুহা ধসিয়ে দিতে পারি তোদের মাথার ওপর? সূর্য ওঠাও বন্ধ করে দিতে পারি যে কোনো মুহূর্তে? জানিস, জানিস, সবই জানিস! কিন্তু অতিশয় দুরাত্মা বলেই অবাধ্য হয়েছিস আমার অমোঘ নির্দেশের। পাপাচার তোদের রক্তে মেদ মজ্জায়। মহাপাপ করেছিল তোদের পূর্বপুরুষ—নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছিল—আমি টিকিয়ে রেখেছি তোদের আমার শক্তি দিয়ে। পাপের ফোয়ারা এখনো শুকিয়ে যায়নি তোদের অণুপরমাণুতে—তাই ধৃষ্টতা দেখানোর দুঃসাহস হয়েছে আমার অবাধ্য হয়ে। বহু পুরুষ ধরে নিজেদের মধ্যেই লড়ে ধ্বংস হতে বসেছিল তোদের প্রজাতি—এখন লড়তে গিয়েছিস আমারই সম্মানীয় অতিথিদের সঙ্গে। তোদের জন্যেই প্রাণ গিয়েছে আমার অতিথিদের অনুচরের। একটা প্রাণের বিনিময়ে যাবে তোদের প্রত্যেকের প্রাণ। কিন্তু তার আগে জেনে যা যন্ত্রণা কাকে বলে। নিয়ে যাও এদের নিগ্রহ-গুহায়। সারা রাত চলুক অত্যাচার। তারপরেও যদি কেউ জীবিত থাকে, জল্লাদের হাতে তুলে দিও। অক্ষরে অক্ষরে পালিত হোক আমার আদেশ।'

কণ্ঠস্বর নিম্নখাদ থেকে শুরু হয়ে একটু একটু করে বৃদ্ধি পেয়ে উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আতংক-হাহাকারের ভয়াবহ গুঞ্জনে মুখরিত হয়েছিল সুবিশাল গুহা। নিশজন অপরাধী মৃত্যুপূর্ব অত্যাচারের কল্পনায় আর নির্বিকার থাকতে পারেনি। শিহরিত কলেবরগুলো দমাদম করে আছড়ে পড়েছিল প্রস্তরভূমিতে। করুণাপ্রার্থনা করেছিল আকুল কণ্ঠে। হৃদয়বিদারক সেই দৃশ্যে বিচলিত হয়েছিলাম আমিও। আয়েশাকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, প্রাণ নেওয়া হোক—কিন্তু এত নিষ্ঠুর ভাবে নয়। মন টলেনি আয়েশার।

বলেছিল—'তা হবার নয়, হোলি। নেকড়ের বাচ্চাদের দয়া করলে আর একটা দিনও নির্বিঘ্নে কাটাতে পারবে না তোমরা কেউই—প্রাণ যাবেই।

এদের চেনো না। বাঘের মতোই রক্ত লেহনে পটু এরা—এই মুহূর্তে লোলুপ তোমাদের রক্তের জন্যে। কি করে এদের শাসনে রেখেছি এখনো বুঝলে না? আতংক দিয়ে...স্রেফ আতংক দিয়ে। মুষ্টিমেয় রক্ষী আমার। বলপ্রয়োগে এদের বাগে রাখা কঠিন। কিন্তু বশে আছে ঐ আতংকের দরুন। ভয়ে কাঁটা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আমার শাসনও আছে। তাই তো আমাকে নির্দয় হতে হবে, হোল্লি। মরতে ওদের হবেই—ঠিক যেভাবে বলেছি, সেইভাবে।'

(১৬) কোর-য়ের কবরখানা

সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল মৃত্যুপথের পথিকদের আয়েশার হস্ত সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে। প্রস্তরভূমিতে বুক রেখেই ঘুরে গেল বিচার দেখতে যারা এসেছিল। মনুষ্যকীটের মতো বুকে সরে গেল বেশ দূরে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চম্পট দিলে বিচারসভা থেকে। যেন পালে পালে উধাও হল ভেড়ার দল।

বিশাল গুহায় এখন আমি, আয়েশা, মূকবধির নারীপুরুষ আর বাকী ক'জন রক্ষী ছাড়া আর কেউ নেই।

সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলাম না। আয়েশাকে বললাম লিও-কে দেখে যেতে। কিন্তু রাজী হল না আয়েশা। এ-ব্যাধিতে রাত ঘনিয়ে না এলে অথবা উষালগ্ন ছাড়া কেউ মরে না। সুতরাং এখন সে যাবে না। রোগের প্রকোপ আপনিই কমবে, আয়েশা ওষুধ প্রয়োগ করবে তারপর।

কি আর করা যায়। উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু যেতে দিল না আয়েশা। কথা আছে। সেইসঙ্গে দেখাবে অগুন্তি গুহার বিস্ময়।

গুহার বিস্ময় দেখবার মতো মন বা মেজাজ তখন আমার নেই। কিন্তু মুখে তা ব্যক্ত করতে পারলাম না। মঞ্চ থেকে নেমে এল আয়েশা। হাতের ইসারা করতেই দুজন বোবাকালা মেয়ে লম্ফ হাতে দাঁড়াল সামনে, দুজন পেছনে। বাদবাকী মূকবধির বিদায় নিল রক্ষীদের সঙ্গে।

মুখ খুলল আয়েশা—'হোল্লি, অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখার আছে এখানে—বিশেষ করে গুহায় গুহায় ছড়িয়ে আছে অনেক বিচিত্র বিস্ময়। যেমন ধরো ঐ বিরাট গুহাটা। এতবড় গুহা দেখেছো কখনো? সুদূর অতীতে এই গুহা এবং আরও অনেক আশ্চর্য গুহা পাথর কেটে বানিয়েছিল মানুষ। সাধারণ মানুষ নয় তারা। এই পাহাড় আর সমতলভূমিতে রাজত্ব করে গেছে সমুন্নত এক সভ্যতা। গুহা তাদেরই সৃষ্টি। আজ আর তারা কেউ নেই। মহাকাল নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে সুমহান সেই প্রজাতিকে। তাদেরই

এই শহরের নাম 'কোর'। মিশরবাসীদের মতো এরাও সভ্যতার শিখরে উঠেছিল হোলি, কিন্তু ভুল করেছিল একটি ব্যাপারে। যে ভুল করেছিল মিশরের মানুষও। সজীব মানুষ নিয়ে চিন্তা করত কম, মৃত মানুষ নিয়েই চিন্তা ছিল বেশী। এই যে গুহাটা দেখছো, এমনি আরও অনেক গুহা রয়েছে বিশাল পাহাড়ের মধ্যে, রয়েছে অগুন্তি সুড়ঙ্গ, বারান্দা, সাজানো গুহাকক্ষ। বলো তো কত বছর লেগেছে এত গুহা বানাতে? লেগেছে কত মানুষ?'

'লাখ লাখ তো বটেই,' বলেছিলাম সংক্ষেপে।

'ঠিক তাই। মিশরীয়দের চাইতেও প্রাচীন এরা। ঐ গুহাটা দেখলেই বুঝবে,' বলে পেছনের গুহাটা আঙুল তুলে দেখিয়েছিল আয়েশা। ইসারা করতেই মূকবধির মেয়ে চারটে লম্ফ তুলে ধরেছিল বিশেষ সেই গুহার দিকে।

গুহার সামনেই একটা প্রস্তর-মঞ্চ। মঞ্চের ওপর খোদাই করা এক বৃদ্ধের মূর্তি। বসে রয়েছে চেয়ারে। হাতে হাতীর দাঁতের দণ্ড। যে-চেয়ারে এতক্ষণ বসেছিল আয়েশা, এই চেয়ারটাও দেখতেও হুবহু সেই রকম। সূক্ষ্মতার বালাই নেই। স্থূল, গায়ে গতরে মোটা। চেয়ারের তলায় অসাধারণ হরফে উৎকীর্ণ একটা লিপি। তর্জমা করে শোনালো আয়েশা নিজেই— থেমে থেমে থেমে, দ্বিধার সঙ্গে—গড়গড় করে নয়।

লিপির মানে এই :

'রাজশহর 'কোর' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চার হাজার দু-শ উনষাট বছর পরে এই গুহা (সমাধিক্ষেত্র) সম্পূর্ণ করলেন কোর-নৃপতি তিনসো। তিন পুরুষ ধরে শহরবাসী এবং ক্রীতদাসেরা মেহনৎ করে এই সমাধিক্ষেত্র নির্মাণ করল ভাবী-কালের সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের জন্যে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক তাদের শিরে। মহারাজাধিরাজ তিনসো-র আকৃতি খোদিত হল উৎকীর্ণ-লিপির ওপরে। জাগরণের দিন না আসা পর্যন্ত এই সমাধিক্ষেত্রে যেন নিশ্চিন্ত নিদ্রা'য় মগ্ন থাকেন তিনি তাঁর সমস্ত ভৃত্য, প্রজা, অনুচর এবং অনুগতদের সঙ্গে।'

আয়েশা বললে—'দেখলে? এই গুহা শেষ হওয়ার চার হাজার বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজশহর—দূরের ঐ সমতলভূমিতে রয়েছে তার ধ্বংসস্তূপ, যেখানকার রাজপুরুষ এবং অনুচরদের কবরখানা এই বিশাল পর্বতকন্দর। দু-হাজার বছর আগে প্রথম যখন দেখেছিলাম অতিকায় এই

কবরখানা, তখনো কিন্তু ছিল এখনকার মতোই। হোল্লি, শহরের বয়স তাহলে কত হবে ভাবতে পারছো? সুপ্রাচীন সেই শহর কি ভাবে ধ্বংস হল, কিভাবে মহান প্রজাতি লোপ পেয়ে গেল, তা যদি জানতে চাও—এসো আমার সঙ্গে।'

প্রবেশপথের বাঁদিকের গুহায় ঢুকল আয়েশা। ইসারা করতেই লম্ফ তুলে ধরল মূকবধির মেয়েরা। কোর-নৃপতি তিনসো-র প্রস্তরমূর্তির পেছনে যে হরফের লিপি দেখেছিলাম, অবিকল সেই হরফে লাল রঙ দিয়ে একটা লিপি লেখা রয়েছে পাথরের দেওয়ালে। রঙ এখনো টাটকা, লেখাও সুস্পষ্ট। তর্জমা করে শোনালো আয়েশা:

'কোর-মহামন্দিরের পুরোহিত আমি। আমার নাম জুনিস। 'কোর' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চার হাজার আটশ তিন বছর পর সমাধিক্ষেত্রের প্রস্তরগাত্রে লিখে যাচ্ছি এই লিপিকা। পতন ঘটেছে কোর-শহরের! সুবিশাল কক্ষে আর অনুষ্ঠিত হবে না চমকপ্রদ ভোজসভা। একদা পৃথিবী-শাসন করেছিল যে 'কোর', আজ তার পতন ঘটেছে! আর কোনদিনই অজেয় সৈন্যবাহিনী এবং দুঃসাহসী সওদাগরগণ অগণিত সমুদ্রতরী সাজিয়ে রওনা হবে না দুনিয়ার দিকে দিকে। পতন হয়েছে 'কোর' মহানগরীর! অবসান ঘটেছে ব্যবসাবাণিজ্য এবং যুদ্ধাভিযানের। অনলস পরিশ্রমে বহু সহস্র বছরের প্রচেষ্টায় যে সব প্রণালী, সৌধ, বন্দর নির্মিত হয়েছিল, এখন থেকে সবই মহাশ্মশান হয়ে থাকবে। ক্ষুধিত নেকড়ে, রাতের পেঁচা, বুনো হাঁস বিচরণ করবে এইসব কীর্তির মধ্যে—কীর্তিনাশা মহাকালের প্রলয় নিদর্শন দেখতে এসে হয়তো উত্তরকালে বর্বরদের বাসস্থানও রচিত হবে ধ্বংসস্তূপে। পঁচিশমাস আগে শুরু শেষের সেদিনের। পঁচিশ মাস আগে মহানগরী 'কোর' এবং 'কোর'-শাসিত শত-শত শহরের ওপর পুঞ্জীভূত হয়েছিল সর্বনাশা এক মেঘরাশি। করাল মেঘপুঞ্জ থেকে প্রতিটি শহরে নেমে এসেছিল বিধ্বংসী মহামারী। কেউ রেহাই পায়নি মড়কের কালগ্রাস থেকে, কেউ না, কেউ না। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নারী, শিশু—প্রত্যেকেই একে-একে ঢলে পড়েছে বীভৎস মৃত্যুর কোলে। সর্বাঙ্গ মসীকৃষ্ণ হয়েছে সংক্রমণের শুরুতেই—তারপর এসেছে যন্ত্রণাময় মৃত্যু। দয়া করেনি কাউকে। যুবরাজ, ক্রীতদাস, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল—একই পরিণতি হয়েছে প্রত্যেকের, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস রুদ্রলীলায় মত্ত থেকেছে ভয়াবহ মহামারী—স্বর্গ থেকে আবির্ভূত নির্মম মৃত্যুদূত। যারা পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে, অনাহারে এবং দুর্ভিক্ষে তাদের প্রাণবিয়োগ ঘটেছে। যথাবিধি

সমাধিস্থ করাও সম্ভব হয়নি এত মৃতদেহকে। গুহার মেঝের তলদেশে বিশাল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে 'কোর'-সন্তানদের মৃতদেহ। না, সুপ্রাচীন পদ্ধতিতে কোনো মৃতদেহই রক্ষিত হয়নি। অবশেষে মুষ্টিমেয় জীবিত মানুষ সুমহান এই সভ্যতার একমাত্র ধ্বজাধারী স্বরূপ সমুদ্র উপকূলে গিয়ে জাহাজে চেপে রওনা হয়েছে উত্তরাভিমুখে। একদা যে প্রজাতিকে বলা হত বিশ্ব-বর্তিকা—এই তাদের শেষ পরিণতি। জানি না অন্য কোনো শহরে জীবিত মানুষ আর আছে কিনা। 'কোর'-কবরখানায় একমাত্র জীবিত পুরুষ কিন্তু আমি—এই লিপিকা-লেখক—পুরোহিত জুনিস। লিপিকা লিখে যাচ্ছি অসীম মনোবেদনায়। মৃত্যুর আগে লেখা থাক মহান নগরী 'কোর'-য়ের অন্তিম কাহিনী। একদা যে বিপুল সভ্যতার প্রাণ স্পন্দনে স্পন্দিত ছিল শত-শত 'কোর'-শহর, আজ সে-সবও জনশূন্য। মহাশহর 'কোর' মহাশ্মশানে পর্যবসিত হয়েছে। অগণিত প্রাসাদ খাঁ-খাঁ করছে। যুবরাজ, যুবরাণী, নগররক্ষী, সেনাধ্যক্ষ, সওদাগর এবং সুন্দরী কন্যারা একে-একে ঢলে পড়েছে মৃত্যুর মহাক্রোড়ে। মহামন্দিরের দেবতাকে ভজনা করার কেউ আর নেই—আমি পুরোহিত জুনিস, মৃত্যুর আগে লিখে গেলাম এই করুণ কাহিনী।'

হাজার হাজার বছর আগেকার হাহাকার যেন বিদীর্ণ করে দিয়ে গিয়েছিল আমার বক্ষপঞ্জর। অপরিসীম বিস্ময়ের বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্তম্ভিত দৃষ্টি মেলে চেয়েছিলাম রক্ত অক্ষরে লেখা লিপির দিকে। বিশাল জনপদ পরিণত হয়েছে মহাকবরখানায়—একমাত্র জীবিত পুরুষ মৃত্যুর পদচুম্বন করার পূর্বমুহূর্তে অসীম মনোবলে লিখে গিয়েছে হৃদয়বিদারক কাহিনী। ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হয়েছিল আমার সর্ব অবয়ব।

আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিল আয়েশা—'হোলি, কি মনে হয় তোমার? সমুদ্রপথে উত্তরাভিমুখে রওনা হয়েছিল যারা, মিশরীয় সভ্যতার জনক নয় কি তারা?'

'কি করে বলি? পৃথিবীর বয়স যে খুবই বেশী।'

'তা তো বটেই। খুবই বৃদ্ধ এই পৃথিবী, কে তার হিসেব রাখে বলো? যুগে যুগে এসেছে কত জাতি, জ্ঞান-শিল্প সম্পদ সমৃদ্ধ হওয়ার পর হারিয়ে গেছে মহাকালের গর্ভে—বিস্মৃতির অতলে। কেউ তা জানে না—সঠিক খবর কেউ রাখে না। অজস্র অবলুপ্তির একটাই কেবল প্রত্যক্ষ করছো এই পর্বত-কবরখানায়। হোলি, মহাকাল বড় নিষ্ঠুর। মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে হাজার হাজার বছরের মেহনতে—নিঃশেষে তা বিলীন করে দেয় তিলমাত্র কৃপা

না করে। ব্যতিক্রম ঘটে শুধু এই রকম ক্ষেত্রে—বিশাল গুহা বানিয়ে রেখেছিল 'কোর'-রের আদি মানুষরা, তাই তো অতীতের ইতিহাস জানতে পারলে। কে জানে, এ সবও হয়তো একদিন লয় পাবে ভূমিকম্প অথবা জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়লীলায়। এইভাবেই ধরাপৃষ্ঠে কত সভ্যতা এসেছিল—কত সভ্যতা আসবে—কেউ তা বলতে পারে না। সুদূর অতীতে জ্ঞানী হিব্রুরা এই কারণেই লিখে গেছিলেন, সূর্য-তলে নতুন কিছুই ঘটছে না—সবই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। তবে কি জানো, এদেশের সব মানুষ ধ্বংস হয়েছিল বলে আমার মনে হয় না। অগুন্তি শহরের কোথাও না কোথাও কিছু মানুষ টিকে গিয়েছিল নিশ্চয়। দক্ষিণ দেশ থেকে বর্বরদের আবির্ভাব ঘটেছিল পরবর্তীকালে, অথবা এসেছিল আমারই দেশের মানুষ আরব-রা। বিয়ে করেছিল এদেশের মেয়েদের। তাদেরই সন্তানসন্ততি গড়ে তুলেছিল যে বর্ণ-সঙ্কর জাতি—আজ তা আমাহাগ্গার নামে রাজত্ব করছে এখানে। কি শোচনীয় পরিণতি! সুমহান 'কোর'-প্রজাপতির এই অসভ্য নরখাদকরা পিতৃবর্গের অস্থিসজ্জিত সমাধিক্ষেত্রে বিচরণ করেও পশুরও অধম! থাক সে কথা, লিপিকায় যে বিশাল গহ্বরের কথা লেখা হয়েছে, চলো এবার তোমায় দেখাই সেই মহাকূপ। হোল্লি, এ-দৃশ্য অতীতে কখনো তুমি দেখোনি—চলো।'

মূল গুহার গা থেকে বেরিয়েছে একটা ছোট গুহা। আয়েশা আমাকে নিয়ে ঢুকল তার মধ্যে। পা দিলাম সিঁড়ির ধাপে। শেষ নেই, শেষ নেই সুদীর্ঘ সেই সোপান শ্রেণীর। অবশেষে পৌঁছোলাম সোপান তলে। প্রবেশ করলাম একটা পাতাল সুড়ঙ্গে। সিঁড়ির ধাপ অনেক—কিন্তু ওপরতলার পাথুরে মেঝে থেকে এই পাতালবিবর ষাট ফুটের নিচে নয়। বিবরগাত্রে অদ্ভুত ফুটো—উর্ধ্বদিকে প্রসারিত। হাওয়া যাতায়াতের এমন বিচিত্র ঘুলঘুলি কখনো দেখিনি। আচম্বিতে শেষ হয়ে গেল পাতাল সুড়ঙ্গ। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আয়েশা। ইসারা করতেই চারজন মূকবধির মেয়ে লম্ফ তুলে ধরেছিল মাথার ওপর। যে-দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে—তা জীবনে দেখিনি, দেখব বলেও মনে হয় না। এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি আয়েশা। দাঁড়িয়ে আছি একটা সুবিশাল গহ্বরের কিনারায়। কিনারা ঘিরে নিচু প্রস্তর-প্রাচীর। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার ওপর থেকেই শুরু হয়েছে গহ্বর—ঢালু হয়ে নামতে নামতে পাতালের কোন্ প্রদেশে পৌঁছেছে, তা বোঝাবার উপায় নেই—তলদেশ দেখে যা মনে হয়েছিল, লণ্ডনের সেন্ট পল-য়ের গম্বুজের নিচের অঞ্চল যত বড়—এই গহ্বরও তত

বড়। লক্ষ মাথার ওপর তুলে ধরায় দেখেছিলাম, মৃত ব্যক্তিদের অস্থি রাখার কাজেই লাগানো হয়েছে পেল্লায় গহ্বরটাকে। পিরামিড আকারে লাখে লাখে মড়ার হাড় পড়ে গহ্বরের মাঝখানে। ওপর থেকে গড়িয়ে নেমে এসেছে নিচে—মড়ার ওপর মড়া ছুঁড়ে ফেলায়। ঝকঝকে হাড়ের সে এক অতিকায় পিরামিড-পাহাড়! স্তূপীকৃত অস্থি দেখে যত না রোমাঞ্চিত হলাম, তার চাইতে বেশী হলাম মড়াগুলোর আশ্চর্যরকমের অবিকৃত অবস্থা দেখে। হাওয়া এখানে শুষ্ক। তাই পচন ধরেনি মাংসে। কেবল শুকিয়ে গেছে। চামড়া এখনো লেগে রয়েছে হাড়ের ওপর। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় পড়ে থাকা এই মড়াগুলোই কোটরাপ্রবিষ্ট চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে হাড়ের নানা দিক থেকে আমাদের পানে! মনুষ্যত্বের এ-হেন বীভৎস কদর্য হাস্যকর পরিণতি অতি-বড় দুঃস্বপ্নেও আসে না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম—'ঢের হয়েছে, আর দেখতে চাই না। মহামারীতে যারা মারা গেছিল, তাদের দেহ তো?'

'হ্যাঁ। মিশরীয়দের মতো 'কোর'-য়ের মানুষরাও মড়াদের মমী বানিয়ে রাখত। তাদের কলাকৌশল ছিল অনেক উন্নত ধরনের। মিশরবাসীরা শুধু মলম মাখাতো, 'কোর'-বাসীরা ধমনীতে ফুঁড়ে দিত আরক—রক্তের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে যেত শরীরের সব জায়গায়। মিশরীয়রা মৃতদেহের নাড়িভুঁড়ি আর মগজ চেঁচে বার করে নিত—এরা সেসব কিছুই করত না। এসো, দেখাই তোমাকে।'

সুড়ঙ্গ বেয়ে তখন আমরা ফিরে চলেছি। ডাইনে বাঁয়ে অজস্র সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ দেখেছিলাম। ঢুকিনি কোনোটাতেই। আচমকা সামনেই যে সুড়ঙ্গ পড়ল, তার সামনে দাঁড়িয়ে গেল আয়েশা। মেয়ে চারটেকে ইসারায় বললে লম্ফ নিয়ে ভেতরে যেতে। আমরাও ঢুকলাম ভেতরে। ছোট্ট একটা প্রস্তর কুঠরি। বিল্লালি এই রকমই একটা কুঠরিতে থাকতে দিয়েছিল আমাকে। তবে সেখানে ছিল পাথরের বেঞ্চি একটা—এখানে রয়েছে দুটো। বেঞ্চি না বলে খাট বলাই সঙ্গত। ওপরে শোয়ানো রয়েছে হলদে কাপড় ঢাকা দুটো মনুষ্য মূর্তি। ধুলোর পাতলা প্রলেপ পড়েছে। তবে খুব বেশী নয়। এত হাজার বছরে যত ধুলো জমা উচিত—সে রকম কিছুই নয়। কেন না, পাতাল বিবরে ধুলো হয়ে যাওয়ার মতো কোন বস্তুই নেই। পাথরের তাকে আর মেঝেতে রয়েছে কারুকাজ করা বিস্তর সুচিত্রিত ফুলদানি। অলংকার বা অস্ত্রজাতীয় সে রকম কিছুই দেখলাম না সমাধিকক্ষে।

'কাপড় তুলে ছাখো, হোলি,' বলেই অস্ফুট হেসে উঠল আয়েশা আমার

ভয়ার্ত মুখচ্ছবি দেখে। নিজেই সরিয়ে দিলে মড়া-ঢাকা কাপড়। দেখলাম আরও একটা কাপড় চাপা দেওয়া রয়েছে মড়ার ওপর। তবে আরও মিহি। এ কাপড়ও সরিয়ে দিলে আয়েশা। হাজার হাজার বছর পরে হিমশীতল মুখের ওপর নিবদ্ধ হল সজীব দুটি প্রাণীর দৃষ্টি।

বিস্ময়কর দক্ষতা এবং অত্যাশ্চর্য আরকপ্রভাবে দুটি মৃতদেহই অবিকৃত। হাজার হাজার বছর আগে যা ছিল, এখনো প্রায় তাই। পাহাড়ের এত নিচে সুগভীর নৈঃশব্দ্য সুরক্ষিত রেখেছে মৃতদেহ—ক্ষয়ক্ষতির আঁচড়টুকুও লাগেনি। তাপ, শৈত্য, আর্দ্রতার নাগালের বাইরে থেকেছে হাজার হাজার বছর। সুরভিত আরকের প্রভাব যে চিরস্থায়ী—তার চাক্ষুস প্রমাণ তো সামনেই।

ঘোমটার আড়াল থেকে ভেসে এল আয়েশার মর্মস্পর্শী স্বর—'হোলি, এই তো মানুষের পরিণতি। কবরের অন্ধকারে চিরন্তন বিস্মৃতি! সবারই যাত্রাপথের শেষ এইখানেই! এমন কি আমারও—এত বছর বেঁচে থাকার পরেও। আজ থেকে হাজার হাজার বছর পরে, মৃত্যুর তোরণপথে কুয়াশার আবর্তে হাজার হাজার বার তুমি বিলীন হয়ে যাবার পর একটা দিন আসবে যেদিন আমাকেও মরতে হবে। যে ভাবে তুমি মরবে, মরেছে এই এরা—ঠিক সেইভাবে। প্রকৃতির রহস্য করায়ত্ত করে বেশী বেঁচে থেকে তখন কি লাভ হবে বলতে পারো? প্রকৃতির জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে মৃত্যুকে হাজার হাজার বছর ঠেকিয়ে রাখার পরেও মৃত্যুই তো হবে আমার। মহাকালের ইতিহাসে দশ হাজার বছর অথবা দশদশে একশ বছরেরও কোনো মূল্য আছে কী? কিছু না, কিছু না......রোদের তাতে কুয়াশা যেমন মিলিয়ে যায়, এও ঠিক তাই। চকিতে কেটে যায় ঘন্টাখানেকের ঘুমের মতোই অথবা চিরন্তন প্রাণজ্যোতির একটি মাত্র ফুৎকারের মতো। দ্যাখো! হোলি মানুষের বিধিলিপি ত্যাখো! এ বিধিলিপি লেখা রয়েছে আমাদের ললাটেও—চিরনিদ্রা আসবে আমাদেরও। সে ঘুম আবার ভাঙবে, আবার ঘুম আসবে, এই ভাবেই চলবে কল্প কল্পান্ত ধরে স্থান, কাল, যুগের মধ্যে দিয়ে—যতদিন না মৃত্যু হচ্ছে বিশ্বের, মৃত্যু হচ্ছে বিশ্বের বাইরের বহু বিশ্বের, কিছুই যখন আর থাকবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, তখনও কি থাকবে জানো? সেই মহা-জ্যোতি যার নাম প্রাণ। অনন্ত, অব্যয় অম্লান!'

(১৭) নিভেও নিভল না প্রাণ

মূকবধিররা দীপশিখার আলোর পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে এল একটা সিঁড়ির তলায়। সিঁড়ি উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে আয়েশার ছোট্ট প্রকোষ্ঠে।

এই ঘরেই বিল্লালি বুকে হেঁটে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে।

ঘরের সামনে পৌঁছে বিদায় চেয়েছিলাম 'সেই-নারী'র কাছে। কিন্তু যেতে দেয়নি রানী। বলেছিল—'না, ভেতরে চলো। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার কথা শুনতে আমার বড় ভালো লাগে। দু-হাজার বছর কথা বলার মানুষ পাইনি। যা কিছু কথা হয়েছে নিজের নিজের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে, আর হয়েছে অসভ্য বর্বর এই ক্রীতদাসগুলোর সঙ্গে। আত্মচিন্তার জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটেছে ঠিকই, বহু গুপ্ত রহস্যের উদ্ঘাটন করেছি, কিন্তু আত্মচিন্তার গুরুভার আর সইতে পারছি না। ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত আমি। ফলে, দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে নিজেরই সঙ্গ। কারণ জানো? স্মৃতি যে বড়ই বেদনাময়, তিক্ততার বিষে আচ্ছন্ন করে দেয় চিত্তকে। তাই বলছি, পর্দা টেনে দিয়ে বসো আমার পাশে, ফলাহার করতে করতে কথা বলা যাক রুচিকর প্রসঙ্গ নিয়ে। এই ছাখো আবার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করছি তোমার সামনে। হোল্লি, দায়ী তুমি নিজেই, তুমিই তো জিদ ধরেছিলে আমার রূপরাশি দেখার জন্য। হুঁশিয়ার করেছিলাম, মনে পড়ে? এ রূপের প্রশংসা তুমি করবেই করবে—যতবড় দার্শনিকই হও না কেন! সৌন্দর্য উপভোগের মানসিকতা কিন্তু ছিল না সেকালের দার্শনিকদের। মূর্খের দল! ধিক্ তাদের দর্শন-প্রজ্ঞাকে!'

আর বিশেষ ভনিতা না করে উঠে দাঁড়িয়েছিল আয়েশা। ভূমিলুণ্ঠিত হয়েছিল অঙ্গাবরণ। মেঘের আড়াল থেকে যেন নিমেষে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তেজোময় সূর্যের। চক্ষু ঝলসানো সেই যন্ত্রণাময় উগ্র-মোহন রূপের দিকে তাকিয়ে আমার কিন্তু মনে হয়েছিল—খোলস খসিয়ে বেরিয়ে এল হিলহিলে এক সরীসৃপ। এত প্রখর সর্বাঙ্গের ঔজ্জ্বল্য যে তাকিয়ে থাকা যায় না।

অস্বাভাবিক মেজাজে দেখলাম আয়েশাকে। নতুন মেজাজের নতুন রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে অলৌকিক রূপরাশি। গ্রীক পুরাণের প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবীরানী অ্যাফ্রোডাইট যেন কুহক-বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণের কৌতুক-ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে চলেছে। দ্যুতিময় প্রাণবহ্নি যেন উচ্ছল ঝর্ণাধারায় কলকল নিনাদে গড়িয়ে পড়ছে সারা গা বেয়ে—অজস্র তরঙ্গভঙ্গে অপ্সরীর মতোই মোহময়ী করে তুলেছে অপরূপাকে। অস্ফুট হেসে, ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বঙ্কিম কটাক্ষ করতেই কিন্তু রাজরানীর গরিমা উবে গেল সর্ব অবয়ব থেকে। হাসি চঞ্চল দুই আঁখির মধ্যে সূর্য কিরণকেও-ম্লান-করে-দেওয়া নয়ন-দামিনী ঝলসে উঠল আমার পানে।

'হোল্লি, এমন জায়গায় বসো যাতে আমার এই রূপ তোমার নজরে না আসে। অনেক পুরুষের বুক ভেঙে গেছে, অনেক পুরুষের চৈতন্য লোপ

পেয়েছে—তোমারও সেই দশা হতে পারে—তোমার নিজের দোষেই। বসো। অনেক দিন শুনিনি রূপের প্রশংসা—শোনা যাক তোমারই মুখে। বলো তো সত্যিই আমি সুন্দরী কিনা? না, না, অত তাড়াতাড়ি জবাব দিতে যেও না। তাকিয়ে ছাখো পা থেকে মাথা পর্যন্ত, ছাখো সব কিছুই। চোখ বুলিয়ে যাও দেহের প্রতিটি রেখায়, সুঠাম দেহবল্লরীর কোনো অংশ যেন বাদ না যায়। আমার হাত, আমার পা, আমার চুল আমার দেহচর্মের শুভ্রতা—সব ছাখো, খুঁটিয়ে ছাখো। দেখে বলো, সৌন্দর্যের বিচারে আমার সামনে দীপশিখা তুলে ধরার মতো কোনো যোগ্যতা কি আছে পৃথিবীর অন্য কোনো সুন্দরীর? আমার অতুল রূপরাশির ভগ্নাংশের সমকক্ষও কেউ কি হতে পারে? আমার চক্ষুপল্লব, আমার ভ্রূভঙ্গি, আমার ঝিনুকসম কান—কোনোটার সঙ্গেই কি পাল্লা দিতে পারবে কেউ? দেখেছো? এবার ছাখো আমার কোমর! উঁহু, দাও, হাত দাও আমার হাতে, ধরো, জড়িয়ে ধরো। জোরে, আরো জোরে—আঙুলে আঙুল ঠেকাও। হোল্লি! হোল্লি! এবার কি বুঝছ?'

আর সইতে পারলাম না। হাজার হলেও আমি পুরুষ—আয়েশা কিন্তু নারীরও অধিক। সে যে কী, তা ঈশ্বর জানেন—আমার জানা নেই! আছড়ে পড়েছিলাম তার পদতলে। আকুল কণ্ঠে বলেছিলাম, মন-মন্দিরে একজন বরবর্ণিনীকেই পূজা করি—সে আয়েশা! সে আয়েশা! সে আয়েশা! জন্ম জন্ম ধরে উপাসনা করতে চাই তাকে এইভাবে—বিবাহ-বন্ধনেও আবদ্ধ করতে চাই এই মুহূর্তে। আমায় পৃথিবীর পুরুষশ্রেষ্ঠরা ঐ পদচুম্বন করতে ব্যাকুল হতে পারে, তা কি আমি জানি না? জানি, জানি, অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি করি!

পাগলের মতো হাউ-হাউ করে এমনি অনেক প্রলাপই বকে গেছিলাম। গুছিয়ে বলা দূরে থাক, উপযুক্ত শব্দ চয়নও করতে পারিনি। ঐ রকম বিহ্বল অবস্থায় শব্দ বেছে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলা যায় না।

আয়েশা শুধু বলেছিল—'সে কী হোল্লি! এত সহজে লুটিয়ে পড়লে পায়ে? আশ্চর্য! মিনিটের হিসেব রাখবারও দরকার হল না! বহু বছর এভাবে কোনো পুরুষকে আমার সামনে নতজানু হতে দেখিনি। ভালোই লাগল। এই আত্মপ্রসাদ, এই পুলক, এই হর্ষ শুধু নারী জাতিরই নিজস্ব সম্পদ।

'এখন বলো তো কি করতে চাও? নিজেই জানো না কি কাণ্ড করে ফেললে। আগেই বলেছি, তোমার জন্যে আমি নয়। একজনকেই ভাল-

বাসি আমি, সে পুরুষ তুমি নও। এত জ্ঞানী হয়েও এত বড় ভুল করলে কি করে? চোখ ভরে দেখতে চাও আমাকে, চুম্বন করতে চাও আমার অধরে? এই তো ইচ্ছে তোমার? বেশ তো, এসো—তাকাও দু' চোখ মেলে!' বলেই, আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছিল আয়েশা। কৃষ্ণচক্ষুর যোবাঞ্চকর মণ্ডলের আওতায় আকর্ষণ করেছিল আমার বিভ্রান্ত চাহনিকে। 'এসো, এসো, এই তো আমি, করো চুম্বন! সাধ অপূর্ণ রেখো না, হোল্লি। নাও, আশ মিটিয়ে নাও—কিন্তু মনে রেখো, তারপর থেকেই ব্যর্থ প্রেমের হুতাশনে জলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে! মৃত্যু ঘটবে শোচনীয়ভাবে!' বলতে বলতে আরও ঝুঁকে পড়েছিল অসাধারণ আননটি আমার দিকে—সুরভিত কেশ ঘষটে গিয়েছিল আমার ললাটে, মদির নিঃশ্বাসবায়ুতে আরক্ত হয়ে উঠেছিল আমার কপোল। বেশ বুঝলাম জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি একটু একটু করে। শক্তি বিলীন হচ্ছে সারা শরীর থেকে। তা সত্ত্বেও মুহ্যমানের মতো দু-হাত প্রসারিত করেছিলাম তাকে বাহুবন্ধনে বাঁধবার অভিলাষে—

ঠিক সেই মুহূর্তে আচমকা সিধে হয়ে গিয়েছিল আয়েশা। চকিত পরিবর্তন এসেছিল আপাদমস্তকে। ইস্পাতকঠোর হয়ে উঠেছিল কণ্ঠস্বর—'আর না, অবসান ঘটুক এই খেলার। হোল্লি, অত্যন্ত বিবেকবান সৎপুরুষ বলেই রেহাই পেয়ে গেলে আমার কাছে। নারী হলে বুঝতে এই পরিস্থিতিতে করুণা প্রদর্শন কত কঠিন। তোমার জন্যে আমি যখন নই, তখন আমার চিন্তা উড়ে যাক তোমার মন থেকে ছিন্নপত্রের মতো। কতোটুকু চেনো আমাকে? বড় জোর ঘণ্টা দশেক? এর মধ্যেই কামনাপাগল হয়ে গেলে? কাছে এসেও ভয়ে কুঁচকে গেলে? জলপাত্রে যেমন অজস্র প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়, ঠিক তেমনি বিভিন্ন মেজাজ ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায় এই আয়েশার বহিরঙ্গে। হোল্লি! হোল্লি! আমার স্বরূপ চিনে ওঠার ক্ষমতা তোমার কেন, বিশ্বের কোনো পুরুষের নেই। একজন ছাড়া, যার পথ চেয়ে বসে আছি আমি দীর্ঘ দুটি হাজার বছর। সেই একজনই চিনে উঠবে আমার অন্তরপ্রকৃতিকে—আমার বাইরের রূপ আর ছলনা ঝলসে দেবে তোমাদের চোখ, বিভ্রান্ত করবে তোমাদের চিত্ত। জল যেমন রকমারি ছায়া ফুটিয়ে তুললেও নিজে জলই থেকে যায়, আমার এই বাইরেটা সহস্র ছলনার মায়ারূপ দেখিয়েও নিজের সত্তা কখনো পাল্টায় না। সে যে কী সত্তা, তা তো তুমি জানো না হোল্লি। কাজেই অজানা আগুনের দিকে হাত বাড়াতে যেও না—পুড়ে মরবে। সংযত হও। যদি না পারো, ফের না হয় ঘোমটায় ঢেকে দিচ্ছি আগুনবরণ এই মুখ—জীবনে আর কিন্তু দেখতে

পারে না।'

কাজ হল তিরস্কারে। উঠে দাঁড়িয়েছিলাম টলতে টলতে। ধপ করে বসে পড়েছিলাম কৌচে—আয়েশারই পাশে। পাগলা হাওয়ার মতো প্রচণ্ড কামনা আমার সমস্ত সত্তায় নাড়া দিয়ে আচমকা বিদায় নিলেও ঝড়ে-কাঁপা গাছের মতোই কাঁপছিলাম তখনো। মিথ্যে বলেনি আয়েশা। সত্যিই একই অঙ্গে বহু মূর্তির বহু রূপ ফুটিয়ে তুলতে সে পারে। গত রাতে পাতাল-বিবরে শ্বেতঅগ্নির সামনে নারকীয় মেজাজে তাকে দেখেই সে শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল আমার। বেতপাতার মতো থরথর করে কাঁপছিলাম বলে মুখ ফুটে তা বলতেও পারলাম না। কবরখানার গভীরে মন্ত্রোচ্চারণের করাল মেজাজের পর এই মোহিনী মেজাজ, পরক্ষণেই ভিন্ন রূপ, ভিন্ন মূর্তি, ভিন্ন প্রকৃতি। আয়েশা! আয়েশা! প্রকৃতই তুমি অখণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত আদিম রহস্য!

গ্রীবা বেঁকিয়ে তাকিয়ে আমার বিধ্বস্ত আকৃতি সমীক্ষণ করতে করতে বলেছিল আয়েশা—'যাক, এবার কি করা যায় বলো তো? বিল্লালি যার নাম দিয়েছে সিংহ, তাকেই দেখে আসা যাক, কেমন? এতক্ষণে নিশ্চয় শক্তিহীন হয়ে এসেছে জ্বর। মৃত্যুর মুখ থেকেও ফিরিয়ে আনবো হোলি—ভয় কী? না, না, ম্যাজিক নয়—কোনো ম্যাজিকের আশ্রয় আমি নিই না, নেবও না। ম্যাজিক বলে কিছুই নেই এই বিশ্বসংসারে—আগেও বলেছি, আবার বলছি। আছে শুধু প্রকৃতির অজস্র নিয়ম—নিয়মের বাইরে কিছুই নেই—কিচ্ছু না। নিয়মকে যে জেনেছে, বুঝেছে—প্রকৃতির শক্তিকেও সে কাজে লাগাতে শিখেছে। হোলি, সেই শক্তি প্রয়োগ করেই দাওয়াই বানিয়ে আনছি এখুনি—যাও তুমি।'

গেলাম লিও-র ঘরে। উদ্বেগে ছটফট করছে উসটেন আর জব। হন্যে হয়ে খুঁজছিল আমাকে। দৌড়ে গেলাম শয্যার পাশে। শিউরে উঠলাম। লিও মারা যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার প্রাণপ্রিয় লিও মারা যাচ্ছে! জ্ঞান নেই, ঘন ঘন নিঃশ্বাসে বুক যেন ফেটে যাচ্ছে, ঠোঁট কাঁপছে, আপাদমস্তক শিউরে শিউরে উঠছে মুহুর্মুহু!

কি করব? চাইলাম উসটেনের পানে। নিঃসীম নৈরাশ্যের প্রবাহ তার দুই চোখে—অসীম অবসাদে বসে পড়েছে কৌচে। জব আর ধরে রাখতে পারল না নিজেকে। ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে—আড়ালে কেঁদে হাল্কা হওয়ার জন্যে নিশ্চয়। আমার ইচ্ছে হল সেই মুহূর্তে ছুটে যাই আয়েশার কাছে। একমাত্র সে-ই যদি পারে লিও-কে মৃত্যুর মুখ থেকে

ফিরিয়ে আনতে।

আচম্বিতে বিষম ত্রাসে রক্তহীন মুখে বেগে ঘরে ঢুকল জব। সত্যি সত্যিই খাড়া হয়ে গেছে মাথার চুল।

'মড়া! মড়া! স্যার, জ্যান্ত মড়া। পিছলে আসছে করিডর দিয়ে।'

ক্ষণেকের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছিলাম। মড়া আসছে মানে? পরক্ষণেই বুঝেছিলাম আয়েশাকে দেখেই মড়া ভেবে আঁৎকে উঠেছে জব। সাদা কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে থাকলে আয়েশাকে মড়ার মতোই দেখায়। আয়েশা হাঁটে মসৃণ ভঙ্গিমায়—যেন পিছলে যায় ভূমির ওপর দিয়ে। কফিনের মড়ার মতো অসাধারণ বস্ত্রাচ্ছাদিত সেই আয়েশার মসৃণ পথচলা দেখেই ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছে বেচারী জবের।

সহসা প্রবেশপথে আবির্ভূতা হল আয়েশা।

দেখেই 'ঐ এসেছে! ঐ এসেছে!' বলেই বিকট চিৎকার ছেড়ে ঘরের কোণে দৌড়ে গিয়ে দু-হাতে চোখ ঢেকে বসে পড়ল জব। ভয়াবহ আকৃতিটা আসলে কার, তা আঁচ করে নিয়েই তৎক্ষণাৎ কৌচ ছেড়ে লম্বমান হল উসটেন।

আমি বলেছিলাম—'এসেছেন শেষ মুহূর্তে। লিও মারা যাচ্ছে।'

'তাই নাকি? মারা গেলেও বাঁচিয়ে তোলার ক্ষমতা আমি রাখি। ঐ বুঝি তোমার ভৃত্য? নতুন মানুষকে ঐভাবেই বুঝি আপ্যায়ন করা হয় তোমাদের দেশে?'

'আপনার মড়ার পোশাক দেখে ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে।'

হেসে উঠলো আয়েশা।

'মেয়েটা কে? এর কথাই বলছিলে? দুজনকেই যেতে বলো বাইরে। সিংহের চিকিৎসা হবে শুধু তোমার সামনে।

হুকুম শুনেই যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল জবের—সাঁৎ করে উধাও হল বাইরে, বেঁকে বসল কিন্তু উসটেন। সভয়ে পর্যায়ক্রমে ভয়ংকরী রানী আর মুমূর্ষু লিও-র পানে চেয়ে বিষম উদ্বেগে ফিস্‌ফিস্ করে জানতে চেয়েছিল আমার কাছে—সে কেন বাইরে যাবে? স্বামীর মৃত্যুর সময়ে স্ত্রী-কে পাশে থাকতে হয়। তাই সে এখানেই থাকবে। কিন্তু 'সেই-নারী' কেন এসেছে এ-ঘরে? কি চায়?

গুহাকক্ষের অন্য প্রান্তে ধ্বনিত হয়েছিল আয়েশার কণ্ঠস্বর—'হোলি, মেয়েটা যাচ্ছে না কেন?'

কি জবাব দেব ভেবে না পেয়ে শুধু বলেছিলাম—'যেতে চাইছে না।'

সঙ্গে সঙ্গে লাট্টুর মতো বেগে ঘুরে গিয়ে উসটেনের দিকে এক হাত তুলে ধরে শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করেছিল আয়েশা, একটাই শব্দ। কিন্তু স্বরের প্রচণ্ডতায় এবং ব্যক্তিত্বের উগ্রতায় তা এতই ভয়াবহ যে অন্যথা করে কার সাধ্যি।

'যাও!'

নুকে হেঁটে আয়েশার পাশ দিয়ে বাইরে অন্তর্হিত হয়েছিল উসটেন।

অস্ফুট হাসির ঝংকার তুলে বলেছিল আয়েশা—'দেখলে? এইভাবেই এদের শেখাই বাধ্যতা। অবাধ্য হয়েছিল বলেই শিক্ষা দিলাম মেয়েটাকে। এসো, এবার দেখা যাক সিংহ-কে।'

মসৃণগতিতে মেঝের ওপর দিয়ে সত্যিই যেন হড়কে এসে লিও-র খাটের পাশে হেঁট হয়ে দাঁড়ালো আয়েশা—'রাজার মতোই চেহারা।'

বলে, দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল লিও-র মুখের ওপর।

পরক্ষণেই অতি-অপার্থিব আর্ত চিৎকারে বুঝি চৌচির হয়ে গিয়েছিল গুহাকক্ষের চার দেওয়াল। আয়েশার গলায় এমন বীভৎস আর্তধ্বনি কখনো শুনিনি—কারো গলাতেই শুনিনি সারা জীবনে।

ভয়ে আধখানা হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আমিও—'আয়েশা! আয়েশা! লিও কি মৃত?'

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঘিনীর মতো আমার দিকে ছিটকে এসেছিল আয়েশা।

কণ্ঠে জাগ্রত হয়েছিল রক্তজমানো ফিসফিসানি—যার তুলনা চলে কেবল উদ্যতফণা সর্পিণীর হিসহিসানির সঙ্গে।

'কুত্তা কোথাকার! আমার কাছেও গোপন করেছিলি?'

আতংকে আমার প্রাণ তখন গলায় এসে ঠেকেছে—'আ-আমি! কী-কী গোপন করলাম?'

নিমেষে স্বর সংবৃত করে নিয়েছিল আয়েশা—'তাই বলো! জানতে না—নিজেই জানতে না কাকে নিয়ে এসেছো আমার আলয়ে। হোলি! হোলি! এ-যে সে-ই! কালিক্রেট্‌স্! কালিক্রেট্‌স্! জানতাম সে ফিরে আসবেই! এসেছেও! কালিক্রেট্‌স্! আমার কালিক্রেট্‌স্! ফিরে এসেছে! ফিরে এসেছে!'

সাধারণ মানবীর মতোই বিপুল উচ্ছ্বাসে এবং হর্ষে, যুগপৎ উল্লাস এবং

রোদনে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল আয়েশা।

'কাল্লিক্রেট্‌স্! আমার কাল্লিক্রেট্‌স্!'

'ননসেন্স'—মনে মনে বলেছিলাম আমি—মুখে উচ্চারণ করার সাহস হয়নি। অন্য কোনো চিন্তা মাথায় আনবার মতো সময়ও নয় তখন। লিও মারা যাচ্ছে আর আয়েশা আনন্দে উদ্বেল হয়ে রয়েছে। উদ্বেগে ফেটে পড়ছি আমি।

তাই বলেছিলাম হুঁশ ফিরিয়ে আনার অভিপ্রায়ে—'কিন্তু আয়েশা, এখুনি উঠে পড়ে না লাগলে কাল্লিক্রেট্‌স্ তো আর সাড়া দেবে না আপনার ডাকে। দেখছেন না মৃত্যুর আর দেরী নেই?'

সচমকে বলেছিল আয়েশা—'ঠিক, ঠিক! কেন…কেন এত দেরী করলাম? আগেই আসা উচিত ছিল! হোলি! বড় ভয় করছে…হাত কাঁপছে। এই নাও…এই নাও ওষুধ…তুমিই ঢেলে দাও গলায়…এখনো যদি বেঁচে থাকে, ভালো হয়ে উঠবে দেখতে দেখতে...দেরী কোরো না… তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! দেখছো না, মারা যাচ্ছে আমার কাল্লিক্রেট্‌স্!' বলতে বলতে অঙ্গাবরণের আড়াল থেকে একটা মৃত্তিকাপাত্র বার করে কম্পিত হস্তে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল আয়েশা।

সত্যিই মারা যাচ্ছে লিও। সোনালী মাথা নড়ছে ডাইনে বাঁয়ে খুব আস্তে আস্তে—ঈষৎ ফাঁক হয়ে রয়েছে দু-ঠোঁট। ডাকলাম আয়েশাকে। মাথা না ধরলে ওষুধ গলায় ঢালি কি করে? আয়েশা নিজেই তখন কাঁপছে থর-থর করে। হাওয়ায় গাছের পাতা যেভাবে কাঁপে থির-থির করে, বিষম চমকে উঠলে ঘোড়ার গা যেভাবে কাঁপে থির-থির করে, সেইভাবে আপাদমস্তক কাঁপছে আয়েশার। তা সত্ত্বেও দু-হাতে চেপে ধরল লিও-র মাথা। জোর করে দাঁত ফাঁক করে গলায় উপুড় করে দিলাম মৃত্তিকাপাত্র। সঙ্গে সঙ্গে ফুস্ করে খানিকটা বাষ্প ঠিকরে গেল বাতাসে—যেন নাইট্রিক অ্যাসিডের ধোঁয়া। দেখে তো হাত পা হিম হয়ে এল আমার। বর্বর দেশের অজানা আরকের কার্যকারিতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় দেখা দিল মনে।

অন্তিম খেঁচুনিটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। মৃত্যু-নদী কি পেরিয়ে গেল লিও? হৃৎস্পন্দন যাও বা ঘটছিল এতক্ষণ, অকস্মাৎ তাও গেল বন্ধ হয়ে। থির থির করে কেবল কাঁপতে লাগল চোখের পাতা।

বলেছিলাম নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে—'শেষ?'

দু-হাতে চোখ চাপা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল আয়েশা। নিয়েছিলাম আমিও। লিও-র মরণ আর নাই বা দেখলাম দু-চোখ মেলে।

পরক্ষণেই চমকে উঠেছিলাম পাঁজর-খালি-করা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দে।

ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখলাম সেই অভাবনীয় দৃশ্য! জীবনের রঙ ঝলকে ঝলকে ফুটে উঠছে লিও-র মুখের পরতে পরতে—যে মুখ একটু আগেই কালো হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর ছায়ায়—এখন তাতেই জীবনের ঝলমলে পরশ!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরেছিল লিও।

অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলাম—'একী!'

ভাঙা গলায় জবাব দিয়েছিল আয়েশা—'টিকে গেল প্রাণ। আর একটা মুহূর্তও যদি দেরী হত—বাঁচানো যেত না!'

বলতে বলতে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়েছিল অমিতশক্তির অধিকারিণী। সামলে নিয়েছিল একটু পরেই।

বলেছিল—'দেখলে তো আমার ক্ষমতা? দু-হাজার বছর ধরে যার পথ চেয়ে বসে আছি বর্বর-অধ্যুষিত এই পর্বত অঞ্চলে, সে এসেছে টেরও পাইনি। সে এসেছে আমারই কাছে, রয়েছে আমারই কাছে, তিল তিল করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে—এত কাছে থেকেও আমি তা জানতেও পারিনি। ক্ষমতার দৌড় কদ্দুর বুঝতেই পারছো? অনেক জেনেও তাই কিছুই জানি নি এখনো—জ্ঞানের শেষ নেই—এই ঘটনাই তার চরম প্রমাণ নয় কী? শক্তির অহংকার আমাকে আর মানায় কী? এত শক্তি নিয়েও তো কই ঐ মুখখানা দেখেই সামলাতে পারিনি নিজেকে! প্রাণপ্রিয় কালিক্রেট্স্ আমারই অজ্ঞানতার জন্যে আবার আমাকে ছেড়ে চলেছে দেখে থামাতে পারি নি কাঁপুনি? মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে তাই তো ভেঙে পড়লাম কান্নায়! হোলি, আমিও মেয়েমানুষ—দুর্বল, অত্যন্ত দুর্বল! ক্ষমা কোরো আমার দুর্বলতা! মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে আর ফিরিয়ে আনতে পারতাম না, হোলি। সর্বশক্তিমান নিয়তি তাই তাঁর মহাশক্তির নমুনা হাজির করে দর্পচূর্ণ করে গেলেন আমার। বারো ঘন্টা একটানা ঘুমোবে কালিক্রেট্স্—বারো ঘন্টা পর দেখবে ব্যাধির ছায়াটুকুও আর নেই! শুধু প্রাণ নয়, ফিরে পাবে আমাকেও!'

সোনালী মাথায় হাত রেখে হেঁট হল আয়েশা। কোমল চুম্বন এঁকে দিলে লিও-র ললাটে।

মর্মস্পর্শী স্নিগ্ধসুন্দর সেই দৃশ্য শাণিত ছুরিকার মতোই ফালাফালা করে দিলে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে।

(১৮) 'দূর হও!'

মিনিট খানেক পরম সুখে আচ্ছন্ন হয়েছিল আয়েশার পরীর মতো সুন্দর মুখখানা। দেবীরানীর মতোই মাঝে মাঝে অপরূপা হয়ে উঠতো 'সেই-নারী'। মিনিট খানেকের জন্যে মোহাবিষ্ট অবস্থায় স্বর্গীয় সেই রূপসুধা বিস্মিত করেছিল আমাকে।

আচম্বিতে পাল্টে গেল মুখচ্ছবি। চিন্তা-চাবুকের অকস্মাৎ আঘাতে নিমেষমধ্যে ভয়ংকর হয়ে উঠল মুখ। পরীর মুখ আর নয়—একেবারে বিপরীত।

কথা বলতে গিয়ে স্বর কেঁপে গিয়েছিল—'হোল্লি, কি যেন নাম বললে মেয়েটার? উসটেন।—কে সে? কাল্লিক্রেটস-য়ের পরিচারিকা? না—'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিলাম—'বউ বলতে পারেন—আমাহাগ্গারদের সামাজিক নিয়মে।'

বজ্রগর্ভ মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল আয়েশার মুখে। থমথমে কালো মুখ। বয়েসে দু-হাজার বছর হলে কি হবে, ঈর্ষার খপ্পর থেকে মুক্তি পায়নি আয়েশার মতো মেয়েও।

বলেছিল—'তাহলে তো উসটেনকে মরতে হবে।'

শিউরে উঠেছিলাম আমি—'সেকী! সে যে মহা অপরাধ! অপরাধ করলে ফল কখনো শুভ হয় না। না, না, আপনার ভালোর জন্যেই এ-অপরাধ করবেন না।'

'মূর্খ! অপরাধ কাকে বলছো? পথের কাঁটা সরিয়ে দেওয়াকে অপরাধ বলে? তাহলে তো আমাদের প্রত্যেকের জীবনই টানা অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়। দুনিয়ায় দুর্বলের স্থান নেই—টিকে থাকে কেবল সবল। রোজই কত কিছু ধ্বংস করছি শুধু টিকে থাকার তাড়নায়। ফল ফলিয়ে গাছকে শুকিয়ে মরতে হয়, ফলে অধিকার জন্মায় সবলের। মৃতদেহ মাড়িয়ে পৌঁছোই শক্তির শিখর থেকে শিখরে. এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। কেড়ে নিই শিশুর মুখের গ্রাস। দুনিয়ার নিয়ম তাই। অপরাধের ফল শুভ হয় না বললে। অভিজ্ঞতার অভাব বলেই বলতে পারলে। অপরাধের মধ্যে থেকেই ঘটে অনেক শুভসূচনা। অত্যাচারীর নিষ্ঠুর রোষ পরম আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয় পরবর্তী যুগে যারা আসে তাদের কাছে। সাধু মানুষের কোমলতা দাসে পরিণত করে একটা জাতিকে।'

এ-জাতীয় কূটতর্কে অংশ নেওয়া যায়? বিবেক বলে তাহলে তো আর কিছুই থাকবে না ধরাতলে! শিকেয় উঠবে নীতি নামক বস্তুটা।

কিন্তু উলটেনকে তো বাঁচাতে হবে।

তাই বলেছিলাম—'আয়েশা, যার জায়গায় নিজেকে বসাতে যাচ্ছেন, তার জন্যেই কিন্তু আপনার কাল্লিক্রেট্‌স্‌কে আজ ফিরে পেয়েছেন। সে না থাকলে আমাহাগ্‌গারদের বর্শার খোঁচা থেকে লিও-কে বাঁচানো যেত না। সে না থাকলে তার এত সেবাও হত না। দু-হাজার বছর আগে এই মানুষটাকেই নাকি খুন করেছিলেন নিজের হাতে ঈর্ষার বশে। দু-হাজার বছর শোকেতাপে জ্বলে পুড়ে মরেছেন। আবার কি তাই চান? সেবার খুন করেছিলেন যাকে ভালোবাসেন—তাকে। এবার খুন করতে যাচ্ছেন, আপনার ভালবাসার পুরুষ যে নারীকে ভালবাসে—তাকে। মিশরীয় আমেনার্তাসকে ভালবাসত কাল্লিক্রেট্‌স্‌—আজ বাসে উলটেনকে।'

খপ করে আমার বাহু আঁকড়ে ধরে আতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিল আয়েশা—'তুমি জানলে কি করে? এ নাম তো তোমাকে বলিনি?'

'স্বপ্নে জেনে থাকতে পারি। 'কোর'য়ের গুহায় অনেক অদ্ভুত স্বপ্নই ভিড় করে ঘুমের ঘোরে। স্বপ্ন তো সত্যেরই ছায়া। দু-হাজার বছর প্রায়শ্চিত্ত করেছেন একটা খুন করে, আরও দু-হাজার বছর প্রায়শ্চিত্ত করার সাধ হয়ে থাকে যদি—খুন করতে পারেন উলটেনকে। লিও কিন্তু ভালবাসে উলটেনকে। অনেক সেবা যত্ন করেছে। খুনী আয়েশাকে সেকি আর ভালবাসতে পারবে?'

'পারবে, পারবে, হাজারবার পারবে। আমার ইচ্ছেতেই তা হবে: আমার ইচ্ছেতে তোমার মৃত্যু যেমন আটকানো যাবে না—তেমনি আমার প্রতি তার ভালবাসাও আটকানো যাবে না। তবে তোমার যুক্তির মধ্যে সত্যতা আছে। মেজাজ পালটে যাওয়ার আগেই নিয়ে এসো মেয়েটাকে আমার সামনে।'

বলে, ফিনফিনে কাপড়ের ঘোমটায় মুখ ঢেকে নিল আয়েশা।

কিছু তো কাজ হল। তাড়াতাড়ি গেলাম বাইরে। মাটির প্রদীপের পাশে গুটিসুটি মেরে বসেছিল উলটেন। আমার ডাক শুনেই ধড়মড়িয়ে উঠে এল।

'মারা গেছে?' বলতে বলতেই সে কী কান্না।

'না, উলটেন। 'সেই-নারী' বাঁচিয়ে দিয়েছে। এসো ভেতরে।'

আমাহাগ্‌গারদের রীতি অনুযায়ী বুকে হেঁটে ভেতরে এসেছিল উলটেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে হুকুম দিয়েছিল আয়েশা। জানতে চেয়েছিল, লিও

তার কে হয়।

'স্বামী,' বলেছিল উসটেন আড়ষ্ট দেহে দাঁড়িয়ে।

'কিভাবে? কে দিয়েছে তাকে তোমাকে?'

'সমাজের নিয়মে। কেউ দেয়নি। নিজেই নিয়েছি।'

'সমাজের নিয়ম এক্ষেত্রে খাটে না। বিদেশীকে স্বামী করতে পারো না। জানতে না বলেই ক্ষমা করলাম। নইলে মারা পড়তে। বাড়ী যাও। আর কোনোদিন এর দিকে তাকাবে না। এর কথা ভাববে না। এর নাম করবে না। এর কথা কাউকে বলবে না। যদি অন্যথা ঘটে, মারা পড়বে, যাও।'

উসটেন নড়ল না।

'দূর হও!'

মুখ তুলল উসটেন। আবেগে বিকৃত মুখ।

বললে ধরা গলায়—'না, যাবো না। স্বামীকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। যাকে ভালবাসি, তাকে ছেড়ে নড়ব না। ছেড়ে যেতে বলার আপনি কে? কি অধিকার আছে আপনার?'

ঈষৎ কেঁপে উঠল আয়েশা। থরহরি কম্পমান হলাম আমি। না জানি এবার কি বিপর্যয় ঘটে।

বলেছিলাম ল্যাটিন ভাষায়—'দয়া করুন। মাথার ঠিক নেই।'

'দয়াই করছি,' ল্যাটিন ভাষাতেই শীতল কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল আয়েশা—'দয়া না করলে এতক্ষণে মরে কাঠ হয়ে যেত।—দূর হও, মেয়ে! আর দেরী করলে মারা পড়বে ঐখানেই!'

'যাবো না! যাবো না! যাবো না! আমার স্বামীকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না! বিয়ে করেছি পছন্দ করে, বাঁচিয়ে রেখেছি বুক দিয়ে—ছেড়েও যাবো না কোথাও। ক্ষমতা যদি থাকে, মারুন আমাকে—কিন্তু স্বামীকে তুলে দেবো না আপনার হাতে—'

এত দ্রুত ছিটকে এলো আয়েশা যে ভাল করে দেখতেও পেলাম না কি ঘটে গেল। মনে হল যেন নিমেষমধ্যে উসটেনের সামনে পৌঁছে তার মাথায় শুধু হাতখানা ছুঁইয়ে দিয়েছিল আয়েশা। আতংকে টলে উঠে পেছিয়ে গিয়েছিল উসটেন তৎক্ষণাৎ।

দাগটা দেখলাম তখনি।

তিন আঙুলের তিনটে ছাপ।

উসটেনের ব্রোঞ্জ-রঙীন চুলের ওপর তুষারশুভ্র তিনটে আঙুলের ছাপ।

আয়েশার আঙুলের ছাপ!

'একী!' অমানুষিক শক্তির ভয়াবহ প্রকাশ দেখে রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল আমার। ক্রুর হেসে উঠেছিল আয়েশা।

'নির্বোধ মেয়ে! আমার শক্তি দেখার সাধ হয়েছিল, তাই না? হত্যা করতে পারি কিনা যাচাই করে নেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল? হোলি, আয়নাখানা ধরো ওর সামনে—দেখুক চুলের ওপর আমার শক্তির ছাপ—যে শক্তি প্রাণটাও কেড়ে নিতে পারে চক্ষের নিমেষে।'

লিও-র আয়নাটা এনে ধরেছিলাম উসটেনের সামনে। ধবধবে সাদা তিন আঙুলের ছাপ দেখে কাঁপতে কাঁপতে মেঝের ওপর বসে পড়েছিল উসটেন।

বিদ্রূপতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিল আয়েশা—'কী? এখন যাওয়া হবে তো, না মরবে? চুলের ঐ সাদা দাগ কিন্তু চিনিয়ে দেবে তোমাকে যেখানে থাকো না কেন। সব চুল যদ্দিন না সাদা হয়ে আসছে, তদ্দিন থাকবে ঐ দাগ। সাদা হাড়গুলো যখন পড়ে থাকবে কবরে—থাকবে তখনো। দূর হও।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বুকে হেঁটে বিষম ভয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল উসটেন।

'হোলি, দাগিয়ে দিলাম মেয়েটাকে সারাজীবনের মতো আতংকের মধ্যে রাখব বলে--নইলে মেরেই ফেলতাম। যা দেখলে, তার মধ্যে ম্যাজিক কিছুই নেই। প্রাকৃতিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। শোনো. কাল্লিক্রেট্‌স্‌কে এখন থেকে আমার ঘরের কাছাকাছি রাখা হবে। তুমিও থাকবে তোমার চাকরকে নিয়ে আমার কাছেই। মেয়েটার সম্বন্ধে কোনো কথা যেন কাল্লিক্রেট্‌স্‌ না জানতে পারে। কোথায় গেল, কেন গেল. কিভাবে গেল—তোমার মুখ দিয়ে যেন না বেরোয়। হুঁশিয়ার!'

উধাও হল আয়েশা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

রাত কাটালাম লিও-র ঘরে। মড়ার মতই পড়ে রইল লিও. নড়তেও দেখলাম না, উদ্ভট দুঃস্বপ্নে ভরে রইল আমার ঘুম।

বারো ঘন্টা পরে লিও-র রোগমুক্তি ঘটবে বলেছিল আয়েশা। নিজে এল ঠিক সেই সময়ে, মুখে ঘোমটা।

'হালি, এখুনি জাগবে কাল্লিক্রেট্‌স্‌।'

মুখের কথা শেষ হতে না হতেই আড়মোড়া ভাঙল লিও। খাটের পাশেই নারীমূর্তি দেখে উসটেন ভেবে জড়িয়ে ধরল আয়েশাকেই। মুখ চুম্বন করেই আরবী ভাষায় ফেটে পড়ল উল্লাসে—'কি হল উসটেনের? দাঁত ব্যথা? মুখে কাপড় চাপা দিয়েছো কেন শুনি?' পরক্ষণেই হাঁক পাড়ল ইংরেজিতে—

'জব ব্যাটাছেলে গেলি কোথায় ? খিদের নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেল যে !'

'এই তো আমি ! এই তো আমি !' খাবারের থালা হাতে খুশীতে ডগমগ জব এগিয়ে এসেও থমকে গিয়েছিল আয়েশাকে দেখে। মড়ার মতো আকৃতি দেখে জবের ধারণা হয়ে গিয়েছিল আয়েশা আসলে চলমান মড়া ছাড়া কিছুই নয়। ভয়ের চোটে কাছে ঘেঁসত না। 'এই ভদ্রমহিলা একটু সরে গেলেই—'

ভদ্রমহিলা ? সম্বিৎ ফিরেছিল লিও-র পাশেই স্থির নিষ্কম্প নির্বাক আয়েশাকে দেখে—'আরে গেল যা। এ আবার কে ? উসটেন কোথায় ?'

মুখ খুলল আয়েশা, রজতনূপুরের নিক্কণ ধ্বনিত হল কণ্ঠে।

'উসটেন গেছে একজনের সঙ্গে দেখা করতে, আমি আছি তার জায়গায়—তোমার সেবাদাসী।'

মার্জিত কণ্ঠস্বর শুনে লিও তো হতবাক। বুদ্ধিমানের মতো তখন আর কোনো কথাই বলেনি। জবের হাত থেকে সুরুয়া নিয়ে একচুমুকে শেষ করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল পাশ ফিরে। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়—আয়েশার সামনেই। প্রশ্নে প্রশ্নে আমাকে নাজেহাল করে দিলেও উসটেন সম্বন্ধে কিছু বললাম না। পরিচয় দিলাম কেবল আয়েশার—'কোর'-য়ের রানী বলে।

পরের দিন একেবারেই সেরে উঠল লিও। ওষুধের ক্ষমতা দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম দিন কয়েকের মধ্যে ক্ষতস্থান মিলিয়ে যাওয়ায়। শরীর আগের মতোই। কালব্যাধিতে মরতে বসেছিল কে বলবে, উসটেন কোথায় জানতে চাওয়ায় বলেছিলাম, আমার জানা নেই। প্রাতরাশ খেয়ে একদিন তাকে নিয়ে গেলাম আয়েশার ঘরে। যখন তখন ঘরে যাওয়ার অধিকার পেয়েছিলাম আগেই।

সাড়ম্বরে লিওকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল আয়েশা, সুমধুর বচনে বলেছিল, তার জন্যেই জীবন ফিরে পেয়েছে লিও—পেয়েছে আরও অনেক কিছু—যা আর যাবার নয়।

ঐ একটি কথার মধ্যেই বলা হয়ে গেল সব কথা। কিছুই বুঝল না লিও। অবাক হয়ে ইংরেজিতে বলেছিল আমাকে—'মেয়েটা তো খাসা কথা বলে। ভব্যতা জানে। বেশ আরামের জায়গা যা হোক। অমন বাহু ক'টা মেয়ের থাকে ?'

আয়েশা বলেছিল, লিও-র খিদমৎ খাটতে এক পা-য়ে খাড়া এ দেশের প্রতিটা মানুষ, এমন কি আয়েশা নিজেও। এই মুহূর্তে কোনো বাঞ্ছা আছে কী ?

'আছে বইকি,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল লিও—'উসটেন কোথায়?'

'কে জানে কোথায়। বর্বরদের মেয়ে তো—রুগীদের ধারে কাছে থাকতে চায় না, খুশী হলে ফিরে আসবে—নাও আসতে পারে।'

'অদ্ভুত!' ইংরেজিতে আমাকে বলেছিল লিও। তারপরেই বলেছিল আয়েশাকে—'উসটেন আর আমার মধ্যে একটা, ইয়ে, মানে মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো তো, তাই—'

গানের মতো মিষ্টি সুরে অস্ফুট হেসে উঠে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল আয়েশা।

(১৯) 'এনে দাও কালো ছাগল!'

এরপর কথা বিশেষ জমল না। আয়েশা নিজেই দেখলাম প্রাণ খুলে কথা বলছে না। তার পরিচয় আমার জানা বলেই মনের দরজা হু-হাট করে দিয়েছিল আমার কাছে। বিরাম ছিল না কথার ফুলঝুরি বর্ষণে। কিন্তু লিও-র সামনে মেপেমেপে কথা বলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—আত্ম পরিচয় গোপন করা।

কথায় কথায় বলেছিল, সেইদিনই রাতে এক মজাদার নাচের আসর বসছে আমাদের সম্মানে। শুনে অবাক হয়েছিলাম। আমাহাগ্গারদের মতো গোমরামুখোরা নেচে মজা করতে পারে? পরে জেনেছিলাম, এরকম ভয়াবহ মজাদার নাচের অনুরূপ নাচ বিশ্বের কোনো সভ্য বা অসভ্য সমাজে নেই।

ওঠবার সময়ে আয়েশা আমাদের সবাইকে নিয়ে গেল গুহার বিস্ময় দেখাতে। বিল্লালিও গেল সঙ্গে।

ফিরে এলাম চারটের সময়ে।

ছটার সময়ে আয়েশার ঘরে গেলাম। এবার জব-ও এল সঙ্গে। এমনিতেই বেচারী ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত আয়েশাকে দেখলে, সেদিন মূর্চ্ছা যায় আর কী জলের ওপর ছবি ফুটে ওঠা দেখে। লিও-রও ভালো লাগেনি। হলুদ চুলে আঙুল চালিয়ে শুধু বললে—'গায়ে কাঁটা দিচ্ছে যে!'

ঘণ্টাখানেক অব্যাহত ছিল রোমাঞ্চকর এই কৌতুকক্রীড়া। শেষের দিকে অংশ নেয়নি জব। তারপর বোবাকালারা এসে ইসারায় জানালে, বিল্লালি বাইরে অপেক্ষা করছে। উঠে দাঁড়াল আয়েশা, কালো বোরখায় ঢেকে নিলে সারা অঙ্গ।

রীতি অনুযায়ী বুকে হেঁটে ঢুকল বিল্লালি। নাচের আসর প্রস্তুত, এখন গেলেই হয়।

উঠে দাঁড়ালাম। নাচ হবে মূল গুহার সামনে খোলা প্রস্তর উপত্যকায়।

গুহামুখ থেকে পনেরো পা যেতেই পেলাম তিনখানা চেয়ার। বসলাম। একটু পরেই দেখলাম চারদিক থেকে বিশাল মশাল ঘাড়ে দৌড়ে আসছে গোটা পঞ্চাশ কালো ছায়ামূর্তি। মশালের আগুন যে এত বড় হয় ভাবতাম না। লকলকে শিখা ছুটে যাচ্ছে গজখানেক উঁচুতে।

মশালগুলো যে আসলে কি বস্তু, লিও-ই তা প্রথম দেখেছিল। ভয়ে বিস্ময়ে সেকী চিৎকার—'মড়া! মড়া! মড়া জ্বলছে!'

সত্যিই তাই। কবরখানার মড়াগুলোকে কাঁধে করে বয়ে এনে মশালের মতো জ্বালিয়ে নিয়েছে ছায়ামূর্তিরা। জ্বলন্ত মানুষ-মামী নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের সামনে বিশ গজ দূরে আড়াআড়িভাবে ফেলে ধুনি সাজিয়ে দিলে। আলকাতরার পিপেও এত জোরে, এত বিকট শব্দে জ্বলে না।

মামী-চিতার বিশাল অগ্নিকুণ্ড স্তম্ভিত করে তুলেছিল আমাকে আর লিও-কে। কিন্তু এতটুকু বিচলিত হতে দেখলাম না আয়েশাকে।

নূপুর-নিক্কণের হাসি হেসে বলেছিল—'হোলি, অদ্ভুত নাচ দেখাবো কথা দিয়েছিলাম—কথা রাখলাম। শুরুতেই একটা শিক্ষাও পেলে। ভবিষ্যৎ কি নিয়ে আসবে তোমার ললাটে, তা তোমার জানা নেই। বেঁচে থাকো শুধু আজকের দিনটার জন্যেই—ভবিষ্যৎ থাকবে ভবিষ্যতে—শেষ পর্যন্ত তো ধুলো হয়ে যাবে এই নশ্বর দেহ। তখন? ঐ যে যাদের মড়া জ্বলছে দাউ দাউ করে, এককালে সমাজের শিরোমণি ওরা ছিল প্রত্যেকেই। খানদানী ঘরের মেয়েপুরুষ। কেউ কি তখন কল্পনাও করতে পেরেছিল একদিন এইভাবে তাদের দেহ নিয়ে মশাল জ্বালানো হবে? যাক গে, নাচ প্রস্তুত নাচিয়েরাও আসছে—ছাখো কি হয়!'

একদল পুরুষ আর একদল নারী দুদিক থেকে এল লাইন দিয়ে—দু-লাইনে দাঁড়ালো অগ্নিকুণ্ডের দিকে পেছন ফিরে আমাদের সামনে। তারপর যে বীভৎস তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে গেল, পৈশাচিক ক্যানক্যান নাচও সে তুলনায় কিছু নয়। উদ্দাম, উল্লোল দেহভঙ্গিমার মধ্যে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেল—হাত-পা ছোঁড়া মধ্যে দিয়ে কবরখানার গুহাগাত্রের অনেক অতীত ছবিকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে বর্তমানে। যাদের অস্থিমজ্জায় অতীতের বিবাদ, এ নাচ তাদেরই সাজে। বিকট নাচের শেষ এইখানেই। বিকটতর এবং বিকটতম অংশ দেখতে হয়েছিল এরপরেও।

নেচেকুঁদে বেদম হয়ে পড়ার পরেই ঘটল প্রথম ঘটনাটা। আচম্বিতে লাইনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা গায়ে গতরে ভারী মেয়ে। শক্তির পরীক্ষা দিয়ে গেছে এতক্ষণ ধরে সব চাইতে উদ্দামভাবে নেচে। তারপরে

চেঁচাতে চেঁচাতে এল শক্তিমন্তী এই মেয়েটিই।

'এনে দাও, এনে দাও একটা কালো ছাগল!'

সে আবার কী!

মেয়েটা ততক্ষণে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে পাথুরে জমির ওপর। ভূতে পেয়েছে যেন। আছড়ে আছড়ে পড়ছে, ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে—হাত পা ছুঁড়ছে। প্রচণ্ড খেঁচুনির সঙ্গে সঙ্গে চলছে আকাশফাটা চিৎকার :

'এনে দাও এনে দাও একটা কালো ছাগল!'

দৌড়ে এল অন্যান্য পুরুষ আর নারীরা লাইন ছেড়ে সমস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে—'শয়তানের ভর হয়েছে! শয়তানের ভর হয়েছে! আনো! আনো! একটা কালো ছাগল আনো! রক্ত পান করলেই ঠাণ্ডা হবে!'

'আনো! আনো! তাড়াতাড়ি আনো! কালো ছাগল আনো আমার জন্যে!'

'এই যে আনছি! এই যে আনছি, শয়তান! ব্যস্ত হয়ো না—আনছি এখুনি!'

হিড়হিড় করে টেনে আনা হল একটা কালো ছাগল। আগেই এনে রাখা হয়েছিল নিশ্চয় খোঁয়াড় থেকে। ওদিকে মেয়েটাকে নিয়ে চলছে হুটোপাটি, এদিকে ছুরীর এক কোপেই একবার মাত্র 'ব্যা' করে ডেকেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল কালো ছাগল। বিদ্যুৎবেগে একটা মেয়ে মাটির পাত্র ভরে নিলে তাজা রক্তে, দৌড়ে গিয়ে ধরল শয়তানে পাওয়া মেয়েটার সামনে। চোঁ-চোঁ করে পাত্র খালি করে দিয়ে হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। আড়মোড়া ভেঙে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিমায় ফিরে গেল লাইনে। শয়তান তৃপ্ত হয়েছে রক্তপান করে—আর কী!

হেলেদুলে নাচিয়েরা চত্বর খালি করে দিয়ে চলে যেতেই ভাবলাম বুঝি শেষ হল মজাদার নাচের আসরের। এমন সময়ে কানে ভেসে এল হট্টগোল। ফিরে দেখি বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের ছাল গায়ে দিয়ে রকমারি ভঙ্গিমায় আগুনের চারধারে জড়ো হচ্ছে আর একদল নাচিয়ে। প্রথমে আঁৎকে উঠেছিলাম। লাফাতে লাফাতে হাজির হয়েছিল একটা বেবুন। আগুন ঘিরে সে কী নাচ। তারপরেই পর-পর এল সিংহ, ছাগল, ষাঁড়, ইম্পালা হরিণ এবং আরও অনেক জানোয়ার, এমন কি পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিরাট পাহাড়ি সাপের ছাল সেলাই করা একটা মেয়েও এল কিলবিলিয়ে—লম্বা ল্যাজটা অবশ্য স্থির হয়ে রইল পাথরের ওপর।

তারপরেই শুরু হয়ে গেল বন্য বর্বর শ্বাপদ গর্জনের পর গর্জন আর উন্মত্ত

লম্ফনের পর লম্ফন। বাতাস যেন ফালা ফালা হয়ে গেল বিকট হিংস্র গজরানিতে আর সাপের হিসহিসানিতে। সেই সঙ্গে ব্যা-ব্যা করে ডেকে চলল ছাগল।

কাঁহাতক এই উন্মত্ততা দেখা যায়? আয়েশাকে বললাম, অগ্নিকুণ্ডের জলন্ত মড়া দেখে আসছি লিও-কে নিয়ে। রাজী হয়ে গেল আয়েশা। আগুনের বাঁ দিক দিয়ে উল্টো দিকে গিয়ে গোটা দুই জলন্ত মড়া দেখেই আশ মিটে গিয়েছিল দুজনেরই। ফিরে আসতে যাচ্ছি, এমন সময়ে লক্ষ্য করলাম একটা চিতাবাঘ দলছাড়া হয়ে নাচতে নাচতে চলে এসেছে আমাদের খুব কাছে। নাচতে নাচতে যাচ্ছে এমন একটা দিকে যেখানে ছায়া বেশ নিবিড়, আলো কম। কৌতূহল পেয়ে বসল আমাকে আর লিও-কে। গেলাম পেছন পেছন। অগ্নিকুণ্ড থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে অন্ধকার জায়গাটায় পৌঁছোতেই শুনলাম উসটেনের উল্লাসধ্বনি:

'মালিক! আমার মালিক! পেয়েছি তোমাকে!'

'উসটেন! কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন?'

'বেবুন কিছু বলেনি তোমাকে? চলো পালাই—এখুনি। 'সেই-যার-আদেশ-মানতেই-হবে' দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। মৃত্যু! মৃত্যু! মৃত্যু এখানকার বাতাসে! চলো, পালাই এখুনি!'

বাধা দিতে গিয়েছিলাম, বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। লিও-কে তো চিনি। মেয়েদের ব্যাপারে বড় দুর্বলচিত্ত। কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে উসটেনের সঙ্গে চম্পট দিলে। আয়েশা বড় সাংঘাতিক মেয়ে।

কিন্তু উসটেন কি আমার কথা শোনে? লিও-র বুকে দু-বাহু মেলে ঝাঁপিয়ে পড়তেই মাথা থেকে খসে গেল চিতাচর্ম—অমনি তারার আলোয় ঝকঝক করে উঠল আয়েশার তিন আঙুলের তিনটে মার্কা!

শিউরে উঠেছিলাম। তারপরেই গায়ের রক্ত জল হয়ে গেছিল ঠিক পেছনেই রুপোর নূপুর-নিক্বণের মতো অস্ফুট হাসি শুনে।

স্বয়ং আয়েশা এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। সঙ্গে বিল্লালি আর দুজন বোবা-কালা পুরুষ।

পরিণতিটা কল্পনা করেই কাঠ হয়ে গেলাম আমি। প্রথম শিকার হব তো আমিই।

উসটেন লিও-কে ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে নিজের চোখ চাপা দিতেই লাজুক মুখে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল লিও।

(২০) বিজয়িনী আয়েশা

কিছুক্ষণ অসহ্য নীরবতা। নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করল আয়েশা নিজেই।

খুবই নরম অথচ ছুরীর মতো ধারালো গলায় বললে লিওকে—'জীবন-প্রভু, মহামান্য অতিথি, লজ্জায় রক্তিম হয়ে গেলে যে! দৃশ্যটা কিন্তু অপূর্ব! চিতার সঙ্গে সিংহ!'

ইংরেজিতে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল লিও—'ধুত্তোর!'

'উসটেন, চাঁদের আলো তোমার মাথায় না পড়লে কিন্তু চিনতেও পারতাম না।' আঙুল তুলে দিগন্ত দেখালো আয়েশা। ঝকঝকে রুপোর থালার মতো চাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে—'নাচ শেষ! মশাল পুড়ে ছাই! নিস্তব্দ চারিদিক! প্রেমের উপযুক্ত সময় নির্বাচন করেছিলে ঠিকই, কিন্তু আমি যে তোমাকে আদেশ দিয়েছিলাম এ-মুলুক ছেড়ে বিদেয় হতে। এতবড় অবাধ্যতা যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না, উসটেন।'

ককিয়ে ওঠে উসটেন—'মারতে চান মারুন, রঙ্গ করবেন না।'

'সেকী কথা! ভালবাসার তপ্ত চুম্বনের পরেই এত তাড়াতাড়ি চাও কবরের কনকনে ঠাণ্ডা?' ইসারা করেছিল আয়েশা। মুহূর্তের মধ্যে একজন মূক-বধির পুরুষ বাহু আঁকড়ে ধরেছিল উসটেনের। সঙ্গে সঙ্গে শার্দূলের মতো হুংকার ছেড়ে লাফিয়ে পড়েছিল লিও। ছিটকে পড়েছিল বেচারা বোবা-কালা অনুচর। হাত মুঠো করে রুখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল লিও—চোয়ালের হাড় কঠিন।

আবার অস্ফুট হেসে উঠেছিল আয়েশা—এ সেই হাসি যা শুনলে [illegible]ঝঙ্কে পাহাড়ি ঝর্ণার কলতান কানে বাজে, লোমকূপে লোমকূপে জাগে রকম্ভ রোমাঞ্চ।

'মহামান্য অতিথি, আছাড়টা মারলে ভালই। এই সেদিন যার আঙুল নাড়বারও ক্ষমতা ছিল না, এখন তার বাহুর এই শক্তি সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু আমার কথা শোনো। গায়ের জোর দেখাতে যেও না। উসটেনের ক্ষতি করার জন্যে হাত চেপে ধরেনি আমার ভৃত্য, নিয়ে যাবে আমার ঘরে। বড় ঠাণ্ডা এখানে। যার প্রতি তোমার এত অনুগ্রহ—তার কল্যাণ আমিও চাই।'

লিওর হাত চেপে ধরে জোর করে টেনে আনলাম একপাশে। খানিকটা হতভম্ব হয়েই বাধা দিল না লিও। স্তূপীকৃত মামীভস্মের পাশ দিয়ে রওনা হলাম গুহামুখের দিকে। আগুন তখন নিভে এসেছে। নাচিয়েরা অদৃশ্য হয়েছে। প্রস্তর-উপত্যকা খাঁ-খাঁ করছে।

পৌঁছোলাম আয়েশার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে। বুকের ভেতর বিষাদের পাষাণ চেপে বসেছিল এরপর যা ঘটতে চলেছে তা কল্পনা করে।

কৌচের নরম গদার ওপর দেহভার ন্যস্ত করেছিল আয়েশা। জব আর বিল্লালিকে বিদেয় দেওয়া হয়েছিল আগেই। জলন্ত প্রদীপ ঘরে রেখে চলে গেল মূকবধিররা। রইল শুধু একটি মেয়ে। আয়েশার প্রিয় পরিচারিকা। আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে রইলাম আয়েশার সামনে। উসটেন একটু তফাতে।

'হোল্লি, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলাম বলেই এই মেয়েটার প্রাণ নিইনি। কিন্তু হুকুম দিয়েছিলাম তল্লাট ছেড়ে চলে যেতে। এখন দেখা যাচ্ছে তা হয়নি। সত্যি বলো, আজ রাতের ঘটনায় তোমার হাত আছে কিনা।'

'কিছুই জানতাম না। ঘটে গেল হঠাৎ।'

'বিশ্বাস করলাম। পুরো দোষ তাহলে উসটেনের।'

তেড়ে উঠেছিল লিও—'ওর আবার দোষ কী? স্ত্রী স্বামীর কাছে আসবে, এর মধ্যে দোষের কি আছে? যেমনি জঘন্য দেশ, তেমনি জঘন্য বিচার। দোষ যদি ওর হয়ে থাকে, তাহলে একই দোষের ভাগীদার আমিও। ম্যাডাম, ফের যদি আপনার চাকর ওর গায়ে হাত দিতে আসে তো ছিঁড়ে দু-টুকরো করে ফেলবো।'

মিথ্যে হুমকি যে নয় তা লিও-র দাঁত কিড়মিড় শুনেই মালুম হয়ে গেল। অসুরের মত ক্ষমতা যার গায়ে, রাগলে সে রক্ষে নেই।

জবাব দিল না আয়েশা। থমথমে নীরবতা অব্যাহত রইল সেকেণ্ড কয়েক। তারপর বললে উসটেনকে—'এবার বলো তোমার কি বলার আছে। নগণ্য পালক তুমি, শুকনো খড়ের মতো উড়িয়ে দিতে পারি আমার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দিয়ে। তা সত্ত্বেও ধৃষ্টতা দেখিয়েছো কামনার তাড়নায়। বলো, কেন আমার অবাধ্য হলে?'

আচমকা ঋজু দেহে দাঁড়িয়ে গেল উসটেন। মাথা থেকে খসে পড়ল চিতাচর্ম।

'কবরের বিভীষিকাকে ডরাই না বলেই সাহস পেয়েছি আপনার ইচ্ছেকে পায়ে মাড়িয়ে যেতে। মৃত্যুর চেয়ে ভালবাসা অনেক বড় বলেই সাহস পেয়েছি আপনার আদেশকে তুচ্ছ করতে। যাকে ভালবাসি, তাকে ছেড়ে বাঁচতে চাই না বলেই বেছে নিয়েছি মৃত্যুর পথ। ঝুঁকি নিয়েছিলাম বলেই জানতে পারলাম, এখনো বঞ্চিত হইনি তার ভালবাসা থেকে। আলিঙ্গন

পেয়েছি ভালবাসা এখনো অম্লান আছে বলেই।'

কৌচ ছেড়ে উঠতে গিয়েও আবার বসে পড়ল আয়েশা।

উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে উসটেনের স্বরের তীব্রতা—'অতি-প্রাকৃতিক্ কোনো ক্ষমতা আমার জানা নেই আপনার মতো। রানীও নই আপনার মতো। অমর নই আপনার মতো। কিন্তু মেয়েমানুষের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। আপনার ঐ ঘোমটার আড়ালেও কি আছে, মেয়েমানুষের চোখে তা অদৃশ্য থাকে না!

'আমি জানি আপনি যে-পুরুষকে নিজেই ভালবাসেন, তার জন্যে বিনা দ্বিধায় প্রাণ নিতে পারেন আমার মতো পথের কাঁটার। অন্তরায়কে ধ্বংস করতে কোনো দ্বিধা নেই আপনার মতো নিঠুরা মহিলার। মরতে হবে জেনেও তাই সত্যি কথা বলে যেতে ভয় পাচ্ছি না। আমার মনের মানুষকে যেদিন দেখেছিলাম, সেইদিনই অদ্ভুতভাবে জেনেছিলাম আমার পরিণতি কি হবে। মৃত্যুর খাদে তলিয়ে যেতে হবে চিরতরে। সেই হবে আমাদের বিয়ের উপহার। সেই উপহারই পেতে চলেছি এখন। তার আগে বলে যাই, অপরাধের ফল পাবেন আপনি নিজেও। যা চাইছেন, তা কোনোদিনই পাবেন না। শোচনীয় হবে আপনার শেষ পরিণতি। যত সুন্দরীই হোন না কেন, আমাকে হত্যা করেও পাবেন না আমার প্রাণের পুরুষকে—জন্ম-জন্মান্তরে সে শুধু থাকবে আমার জন্যেই—আপনার জন্যে নয়। এ জীবনে কোনদিনই তাকে স্বামীরূপে পাবেন না—চোখে চোখে তাকাতে পারবেন না। মহাপাপের করাল অন্ধকার গ্রাস করবে আপনাকে, তারপর যা ঘটবে তা আমি দেখতে পাচ্ছি দিব্যচোখে—'

ভবিষ্যৎ-দর্শনের অলৌকিক ক্ষমতা যেন সহসা আশ্রয় করেছিল উস-টেনকে। যেন দৈববাণী জাগ্রত হতে যাচ্ছিল আতীক্ষ্ণ কণ্ঠের মধ্যে। কিন্তু শেষটুকু আর শোনা হল না—কোনোদিনই না।

আচম্বিতে ছোট্ট ঘরটা যেন চৌচির হয়ে গিয়েছিল চাপা ক্রোধ আর আতংকের মিশ্র গর্জনে।

সচমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছিলাম কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে আয়েশা। এক হাত সামনে বিস্তৃত—উসটেনের দিকে। আচম্বিতে বাকরোধ ঘটেছে উসটেনের। দু-হাতে সবলে মাথা খামচে ধরে বুকফাটা চিৎকার করে উঠেই লাট্টুর মতো দু-বার ঘুরপাক খেয়েই দড়াম করে চিৎ হয়ে পড়ল মেঝেতে। দৌড়ে গিয়েছিলাম আমি আর লিও। দেখলাম দেহ নিষ্প্রাণ। আয়েশার ভয়াবহ ইচ্ছাশক্তি অথবা রহস্যময় কোনো বৈদ্যুতিক শক্তির আকস্মিক

আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে প্রাণের আধার।

কি যে ঘটে গেল, ক্ষণেকের জন্যে লিও তা বুঝতে পারেনি। তারপরেই ভয়াবহ হয়ে উঠল তার মুখচ্ছবি। সিংহনাদ ছেড়ে ছিটকে গিয়েছিল আয়েশার দিকে। আয়েশার নজর ছিল সেদিকে। লিওকে ধেয়ে আসতে দেখেই আবার একহাত বাড়িয়ে ধরেছিল তার দিকে। অদৃশ্য ধাক্কায় ভয়ানকভাবে ঠিকরে গিয়ে টলতে টলতে আছড়ে পড়ত যদি না আমি আঁকড়ে ধরতাম দু-বাহুর মধ্যে।

মৃদুস্বরে বলেছিল আয়েশা—'মহামান্য অতিথি, ক্ষমা করবেন। এ আঘাত আমার বিচারের চাবুক বলতে পারেন।'

'শয়তানী! পিশাচিনী! তোকে করব ক্ষমা? খুনী কোথাকার! খুনের বদলা নেব খুন দিয়ে।'

মধু ঝরে পড়ে যেন আয়েশার কণ্ঠে—'আরে না, তুমি কে তা জানো না বলেই এখনো রেগে আছো! দু-হাজার বছর পরে ফিরে এসেও চিনতে পারছো না আমাকে। কাল্লিক্রেট্‌স্! তুমিই আমার সেই কাল্লিক্রেট্‌স্! দু-হাজার বছর পথ চেয়ে থেকেছি তোমার! আজ তুমি এসেছো ফিরে—কিন্তু ঐ মেয়েটা এসে দাঁড়িয়েছিল তোমার আর আমার মাঝে—তাই তো সরিয়ে দিলাম পথের কাঁটা।'

'কাল্লিক্রেট্‌স্! কে তোর কাল্লিক্রেট্‌স্? আমি অন্ততঃ নই! কাল্লিক্রেট্‌স্ আমার পূর্বপুরুষ! কিন্তু তোর মতো পিশাচিনীর জীবনপ্রভু হবে তার বংশধর? ধিক্! ধিক্ তোকে! নরকের শয়তানীর স্বামী হতেও রাজী—তোর নয়!'

শ্লেষ-তীক্ষ্ণ হাসি রণরণিয়ে ওঠে আয়েশার কণ্ঠে—'এখুনি অবশ্য অন্য কথাই শোনা যাবে তোমার গলায়, এখুনি লুটিয়ে পড়বে আমার পায়ে। ঘটুক সেই দৃশ্য ঐ মড়ার সামনেই। ছাখো, কাল্লিক্রেট্‌স্, ছাখো আমার সেই মুখ!'

বলেই, মুখের ঘোমটা সরিয়ে লিওর চোখে নিজের জলন্ত চাহনি মেলে ধরল আয়েশা।

মুহুর্মুহু ভাবান্তর ঘটে গেল লিওর মুখের পরতে পরতে। বিস্ময়, প্রশংসা, বিহ্বলতা। শিথিল হল হাতের মুঠি, কোমল হল চোয়ালের হাড়। ওর দ্বিগুণ বয়স আমার। ঠিক এই ভাব-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকেও। বুঝলাম, কি অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের আলোড়ন বন্যার মত ধেয়ে চলেছে ওর প্রতিটি অণুপরমাণুর মধ্যে দিয়ে। শক্তি! শক্তি! রহস্যময় শক্তি

মোহময় নৃত্য নেচে চলেছে মগজের কোষে কোষে।

অস্ফুট কণ্ঠে শুনেছিলাম বিস্ময়োক্তি—'কে তুমি? মানবী, না, দেবী?'

'সামান্যা মানবী। শুধু তোমার জন্যেই কাল্লিক্রেট্‌স্—শুধু তোমার জন্যে।' হস্তীদন্তশুভ্র দু-বাহু লিও-র দিকে লীলায়িত ভঙ্গিমায় প্রসারিত করে বলেছিল আয়েশা।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল লিও। চুম্বকের টানে যেন একটু একটু করে এগিয়ে গেল প্রসারিত দু-বাহুর আমন্ত্রণে। হঠাৎ চোখ পড়ল ভূলুণ্ঠিত উসটেনের নিষ্প্রাণ দেহের ওপর। থর থর করে কেঁপে উঠল সর্বাঙ্গ। দাঁড়িয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

'খুনী! তুমি খুনী। আমার ভালবাসার মানুষকে যে খুন করে, তার কাছে যাবো আমি? না! না! না!'

নিশীথরাতে বৃক্ষমর্মর জাগিয়ে দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল যেন নৈশ-সমীরণ—আশ্চর্য সুরে ফিসফিস করে বললে আয়েশা—'কিছুই না…কিছুই না…কাল্লিক্রেট্‌স্! তুচ্ছ ঐ ব্যাপারে তোমার অন্তত: বিচলিত হওয়া সাজে না। পাপ যদি করে থাকি, সে পাপ তোমারই জন্যে। অপরাধ যদি করে থাকি, সে অপরাধ তোমাকেই ভালবাসি বলে। অন্যায় যদি করে থাকি, সে অন্যায় তোমাকেই কাছে পাওয়ার জন্যে। ভুলে যাও সেই অপরাধ, সেই অন্যায়, সেই পাপ—পাপ-অন্যায়-অপরাধ মাড়িয়ে এসো!…এসো!…এসো!…'

সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যেই ঘটে গেল যা ঘটবার।

আপ্রাণ লড়েছিল লিও নিজের সঙ্গে। ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে, মুখের পরতে পরতে প্রকাশ পেয়েছিল মনের সঙ্গে প্রাণান্তকর লড়াই-দৃশ্য। কিন্তু পারেনি…পারেনি…পারেনি! মায়া-চুম্বকের আকর্ষণ এড়োনোর ক্ষমতা বিশ্বের কোনো মানবের নেই—লিওরও নেই। যেন অদৃশ্য লৌহনিগড় তিল তিল করে তাকে টেনে এনেছিল মোহময়ীর দিকে—গলায় ইস্পাত শেকল পরিয়ে যেন তাকে টেনে আনা হয়েছিল একটু একটু করে। অলোকসামান্যা রূপসীর কেন্দ্রীভূত ইচ্ছাশক্তি আর কামনার প্রচণ্ডতা প্রবেশ করেছিল লিওর রন্ধ্রে রন্ধ্রে—অবশ বিবশ মোহাচ্ছন্ন করে তুলেছিল তাকেও। তাই পরক্ষণেই দেখেছিলাম যে মেয়ে প্রাণ দিয়ে গেল শুধু তারই জন্যে—সেই মেয়েরই মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশেষে নিজেকে সঁপে দিল লিও আয়েশার বাহুবন্ধনে।

চেয়ে থাকতে পারিনি। ক্ষণপরেই চোখ তুলে দেখেছিলাম, লিওর

প্রশস্ত বুকে এলিয়ে রয়েছে আয়েশার সুগঠন। মূর্তি—নিবিড় হয়ে গেছে দুজনের অধরোষ্ঠ। এইভাবেই দয়িতার প্রাণঢালা প্রেমের পুরস্কার দিয়ে গেল লিও ভিন্সি দয়িতারই রক্তরঞ্জিত খুনীর আলিঙ্গনে।

সহসা সর্পিনী-গতিতে বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে খসিয়ে এনে শ্লেষতীক্ষ্ণ হাসিতে ভেঙে পড়েছিল বিজয়িনী আয়েশা।

'কিগো কাল্লিক্রেট্‌স্‌! বলেছিলাম না, এখুনি লুটিয়ে পড়বে আমার পায়ে? দেখলে তো কত তাড়াতাড়ি ফলে গেল কথাটা! কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে গেল নাকি?'

গুটিয়ে উঠেছিল লিও লজ্জায়, বেদনায়, বিবেকের তাড়নায়।

আবার অস্ফুট হেসে উঠে বোবাকালা মেয়েটাকে ইসারা করেছিল আয়েশা। এতক্ষণ সে বেচারী বিস্ফারিত চোখে দেখছিল অভাবনীয় এই দৃশ্য। বাইরে গিয়ে ডেকে নিয়ে এল দুজন পুরুষ মূকবধিরকে, তিনজনে মিলে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল উসটেনকে। দু-হাতে চোখ ঢাকা দিলে লিও।

ক্ষণে ক্ষণে যার মেজাজ পালটে যায়, সেই আয়েশা এবার তন্ময় হয়ে গেল আরবী স্তোত্রপাঠে! সুপ্রাচীন আরব দেশের বাসিন্দারা যেভাবে যে-ঢঙে আবাহন জানাতো সুদূর অতীতে—ঠিক সেই ভাবে, সেই ঢঙে, সেই উচ্চারণে যেন মন্ত্রের ইন্দ্রজাল রচনা করল আয়েশা ছোট্ট ঘরখানির মধ্যে।

রোমাঞ্চকর অতি-বিচিত্র স্তোত্রপাঠ স্তব্ধ হল একসময়ে।

'কাল্লিক্রেট্‌স্‌, জানি এখনো সংশয় আছে তোমার মনের মধ্যে। কিন্তু আমি যে প্রতারণা করিনি, সত্যিইযে তুমি দু-হাজার বছর পরে ফিরে এসেছো আমার কাছে—তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখাই চলো। হোলি, তুমিও এসো।'

দুজনে দুটো লম্ফ নিয়ে গেলাম আয়েশার পেছন পেছন। প্রকোষ্ঠের পেছন দিকে একটা পর্দা তুলে ধরতেই দেখা গেল এক সার সিঁড়ি নেমে গেছে পাতাল প্রদেশে। পাথরের ধাপ। কিন্তু ক্ষয়ে চুন হয়ে গেছে। এক একটা ধাপ সাড়ে সাত ইঞ্চি পর্যন্ত ক্ষয়েছে। মূল উচ্চতাটা আঁচ করে নিলাম—অজস্র গুহার বিস্তর সিঁড়ি মাড়িয়েছি এই কদিনে—কোনো সিঁড়িকে ক্ষইতে দেখিনি এভাবে।

'হোলি, সিঁড়ি ক্ষয়েছে কার পায়ের ঘষটানিতে জানো? আমার পায়ের। দু-হাজার বছর ধরে এই সিঁড়ি বেয়ে উঠেছি আর নেমেছি। আমার এই লঘু চরণেও কঠিন শিলা ক্ষয়ে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে!'

কতবার ওঠানামা করার ফলে গ্র্যানাইট ক্ষয়ে যায় এইভাবে, ভাবতে

গিয়ে মাথা ঘুরে গিয়েছিল আমার। জবাব দিতে পারিনি। স্তম্ভিত হয়ে ভেবেছিলাম, তাহলে কি সবই সত্যি? সত্যিই কি অপরূপা এই মানবীর বয়স দু-হাজার বছরেরও বেশী?

সিঁড়ি শেষ হয়েছে একটা সুড়ঙ্গে। সুড়ঙ্গের শেষে পর্দা ঝোলানো একটা দরজা। তাকিয়েই বুঝলাম এই সেই প্রবেশপথ যার আড়াল থেকে লেলিহান সাদা অগ্নির ভয়ানক দৃশ্য দেখেছিলাম আমি কদিন আগে।

(২১) মৃত এবং জীবিতের মিলন

ঘরের মাঝখানে পাথরে দেবে-যাওয়ার মতো ছোট্ট একটা গর্ত। এই-খান থেকেই ধূমহীন সাদা আগুনকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে দেখেছিলাম গুহার ছাদ পর্যন্ত। এখন আগুন নিভে গেছে।

গুহাকক্ষের দুদিকে দুটো পাথরের বেদী। সমাধিবেদী। একটায় শোয়ানো কাপড় ঢাকা একটা মড়া। আর একটা শূন্য। কিন্তু ক্ষয়ে পাতলা হয়ে এসেছে।

আয়েশা আঙুল তুলে ক্ষয়ে যাওয়া বেদীটা দেখিয়ে বললে—'দু-হাজার বছর ধরে এই প্রস্তর শয্যায় শুয়ে ছটফট করেছি আমি। সিঁড়ির ধাপের মতো তাই পাথরও ক্ষয়ে এসেছে। ওদিকের পাথরে শুয়ে আমার প্রিয়তম। দু-হাজার বছর ধরে তার মৃতদেহ আগলে রেখে দিয়েছি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি। কাল্লিক্রেট্‌স্‌, দু-হাজার বছরেও আমি মরিনি—দেখতেই পাচ্ছো। অদ্ভুত জিনিসটা এবার দেখবার জন্যে প্রস্তুত হও—দু-হাজার বছর আগে মৃত তোমার নিজের দেহ দেখবার জন্যে মনকে তৈরী করো, ভয় পেও না।'

জবাব দিলাম না কেউই। ভয়ার্ত চোখে দেখলাম আয়েশা হাত রাখল মড়ার আচ্ছাদনের ওপর। বললে আবেগ থরথর কণ্ঠে—'দু-হাজার বছর আগে মৃত আর দু-হাজার পরে জীবিতের মিলন ঘটুক এবার। মহাকালের বিপুল ব্যবধান কিন্তু কাউকেই কেড়ে নিয়ে যেতে পারেনি আমার কাছ থেকে। কঠোর শীতল প্রস্তর শয্যায় আগলে রেখেছি তোমারই দু-হাজার বছর আগেকার শুষ্ক কঠিন দেহমন্দিরকে—ছাখো, কাল্লিক্রেট্‌স্‌, স্বচক্ষে ছাখো সুদূর অতীতের সেই নশ্বর দেহ!' একটানে মড়ার আচ্ছাদন অপসারণ করে-ছিল আয়েশা। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রস্তর শয্যায় শুয়ে আর একজন লিও ভিন্সি। হুবহু এক আকৃতি। শুধু যা বয়স বেশী। অলৌকিক দৃশ্যটা দেখে আঁৎকে উঠে অজান্তেই সরে এসেছিলাম পেছনে। চোখ তুলেছিলাম সজীব লিও-র দিকে। একই লিও। জীবন্ত। চোখ ফিরিয়েছিলাম মড়ার

দিকে। একই লিও। মৃত।

লিও নিজেও নিস্পন্দ। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন কোটর থেকে। মিনিট তিনেক দাঁড়িয়ে রইল এইভাবে। তারপর বললে ভাঙা গলায়—'ঢেকে দিন। এখানে আর নয়—বাইরে যাবো।'

'উঁহু! আরও অনেক কিছুই যে দেখার আছে কাল্লিক্রেট্‌স্‌। আমার মহাপাপের নিদর্শন আগে দেখাই। হোল্লি, মৃতদেহের বুকের কাপড়টা সরিয়ে দাও—জীবনপ্রভু ভয় পেয়েছে। নিজের দেহই স্পর্শ করতে চাইবে বলে মনে হয় না।'

আমার তখন হাত কাঁপছে। হেঁট হয়ে মড়ার বুক থেকে কাপড় সরিয়ে দিলাম। মড়া তো নয়—যেন ঘুমিয়ে আছে। বুকের বাঁদিকে দেখলাম একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। তীক্ষ্ণাগ্র ছুরি বা বর্শার ক্ষত।

আয়েশার বিষণ্ণ কণ্ঠ ধ্বনিত হল কানের কাছে—'আজ যে মেয়েটাকে হত্যা করলাম, কাল্লিক্রেট্‌স্‌, সেই মেয়েটাই ছিল মিশরীয় আমেনার্তাস। আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সে। তুমি আমাকে ছেড়ে তার কাছেই যেতে চেয়েছিলে। আমেনার্তাসের শক্তি ছিল—আমি তখনো জানতাম না আমার মধ্যেও যে-শক্তি হঠাৎ এসেছে, তা সেই শক্তির চেয়ে বেশী। রাগে ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে তাই তোমার কোমরের ছুরি টেনে নিয়ে বধ করেছিলাম তোমাকে। আমেনার্তাসের গায়ে হাত দেওয়ার সাহস ছিল না। ছুরি দিয়ে হত্যা করার প্রয়োজন ছিল না। আমার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেই প্রাকৃতিক শক্তি দিয়ে প্রাণ হরণ করতে পারতাম তোমার। প্রচণ্ড ক্রোধে কিন্তু আত্ম-বিস্মৃত হয়েছিলাম। প্রাণজ্যোতিতে নেয়ে উঠে আমি যে অপার শক্তির আধার হয়ে গেছি, তা জানা ছিল না বলেই সাধারণ খুনীর মতোই খুন করেছিলাম ছুরিকাঘাতে। কাল্লিক্রেট্‌স্‌, আমার কাল্লিক্রেট্‌স্‌, তারপর আছড়ে পড়েছিলাম তোমার প্রাণহীন দেহের ওপর। দু-হাজার বছর ধরে সমানে দিনে-রাতে হাহাকার করে গেছি তোমার এই দেহের সামনে। কেঁদে বুক ভাসিয়েছি দীর্ঘ দুটি-হাজার বছর। এই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তখন তোমার জীবন কেড়ে নিয়েছিলাম, এখন তোমাকে দেব অনন্ত জীবন। দেব সুখ, সম্পদ, দীর্ঘ আয়ু—যা পৃথিবীর মানুষের কল্পনার বাইরে। কাল্লি-ক্রেট্‌স্‌, এই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষার কাহিনী, আমার ভালবাসার পুরস্কার।'

মুহ্যমানের মতো ফিরে এলাম নিজেদের গুহাকক্ষে। লিও যেন কি রকম হয়ে গেছে। নিজের সুপ্রাচীন মৃতদেহ দেখে যেন নিজের মধ্যে আর

নেই। চৈতন্য অসাড়। জবকে মড়ার মতো ঘুমোতে দেখলাম। আমি ভাবতে লাগলাম, যা দেখলাম, তা অবিশ্বাস করি কি করে? ভাঙা মৃৎ-পাত্রের সব কথাই কি তাহলে সত্যি? সত্যিই কি রহস্যময়ী আয়েশার বয়স দু-হাজার বছরেরও বেশী? লিও-ই কি অতীতের কালিক্রেট্‌স্? দু-হাজার বছরের দুস্তর ব্যবধান পেরিয়ে এসে মিলন ঘটল জীবিত এবং মৃতে?

আচমকা হাহুতাশে ভেঙে পড়েছিল লিও। আয়েশার সম্মোহনী প্রভাবের বাইরে এসে সম্বিৎ ফিরে আসায় বিবেক-দংশনে নিতান্তই কাতর হয়ে পড়েছে। যাকে ভালবেসেছিল, তার হত্যা স্বচক্ষে দেখার পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই হত্যাকারীর বাহু লগ্ন হয়েছে এবং আমৃত্যু চুম্বকের টানে ছুঁচের মতো এখন থেকে যেতে হবে তার কাছেই। পরিত্রাণ নেই, মুক্তি নেই!

বিবশ দেহে বিকল মস্তিষ্কে বসে রইলাম আমি। যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারলাম না অবিশ্বাস্য অথচ স্বচক্ষে দেখা ঘটনাটার।

(২২) জবের দূরদর্শন ক্ষমতা

পরের দিন সকাল নটায় ঘরে এল জব। জ্যান্ত ফিরে এসেছি দেখে সেকী খুশী। উসটেনের শোচনীয় মৃত্যু কাহিনী শুনে খুব একটা ভাবান্তর ঘটল না অবশ্য। দুজনের কেউ কাউকে দেখতে পারত না। বরং খুশীই হল মৃত্যুর খপ্পর থেকে আমরা রেহাই পাওয়ায় এবং উসটেনের ওপর দিয়ে চোট যাওয়ায়।

সকালে উঠেই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিল লিও। স্নায়ুর ওপর গতরাতের ধকল কাটিয়ে ওঠাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ধকল কম যায়নি জবের স্নায়ুর ওপর দিয়েও। ম্রিয়মাণ কণ্ঠে জানালে, সারারাত স্বপ্ন দেখেছে মৃত বাবাকে। আমাহাগ্গারদের অনেকে যেমন সারা গা-ঢাকা পোশাক পরে, সেই রকম পোশাক ছিল বাবার গায়ে। ডাইনীদের দেশে জবের আগমন ভাল চোখে দেখেনি বাবা। লিও যে-ডাইনীর খপ্পরে পড়েছে, রেহাই নেই তার কবল থেকে। নিজে যেমন ডাইনী, লিও-কেও শেষ পর্যন্ত একটা পিশাচ বানিয়ে ছাড়বে। জবের কপালেও মৃত্যুই আছে। নইলে মরা বাবাকে হঠাৎ এই বর্বরদের বেশে স্বপ্নে দেখতে যাবে কেন? সাধের দেহটা রেখে যেতে হবে এইখানেই—এই হল স্বপ্নের আদৎ ব্যাখ্যা।

ধমক লাগালাম বটে, কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল। কুসংস্কার আমার মনে নেই। কিন্তু যে-সব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডকারখানা ঘটে চলেছে পরের পর,

ভিত নড়ে গেছে আমার মতো কঠোর যুক্তিবাদী মানুষের বুদ্ধির বনেদের।
লিও ফিরে আসতেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রাত-রাশ খেয়ে বেরিয়ে এলাম এক চক্কর। আমাহাগ্‌গারদের ক্ষেতখামার এবং এবং কৃষিপদ্ধতি দেখলাম। ফিরে আসতেই বিল্লালি এসে জানালে, আয়েশা কৃপা করেছেন—দেখা করতে চান আমাদের সঙ্গে।

মূকবধিররাই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আমাদের আয়েশার প্রকোষ্ঠে। তারা বিদেয় হতেই অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে লিও-র মুখ চুম্বন করল আয়েশা। তারপর নরম চোখে তাকিয়ে বললে—'কাল্লিক্রেট্‌স্‌, তুমি কিন্তু অমর নও। আমিও নই। কিন্তু আমি যেমন মহাকালের নিষ্ঠুর শর প্রতিহত করে প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর আছি, ঠিক সেভাবেই গড়ে তুলতে চাই তোমাকে। জলের ওপর থেকে সূর্যরশ্মি যেভাবে ঠিকরে যায়, বয়সের আঘাত ঠিকরে যাবে সেইভাবেই তোমার ওপর থেকে—মহাকালের ছাপ পড়বে না দেহে। এখন কিন্তু যে অবস্থায় আছো, ঐ অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমার দেহসম্ভোগ সম্ভব নয়। তেজে পূর্ণ আমি—তুমি নও। তাই জলে ছাই হয়ে যাবে। সইতে পারবে না। আমার রূপের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকাও সম্ভব নয় তোমার পক্ষে—চোখ টাটিয়ে যাবে। তাই বরং ঘোমটায় মুখ ঢেকে নেওয়াই ভালো।'
ঘোমটা অবশ্য দিল না আয়েশা। বলে গেল একই রকম প্রেমনিবিড় স্বরে—'যতটুকু সহ্য করতে পারবে, আপাততঃ পাবে সেইটুকুই, তার বেশী নয়। কিন্তু তুমি যখন আমার, যুগ যুগ থাকবে আমারই, তখন আমার মতোই শক্ত করে গড়ে নেব তোমাকে। আমার মতোই কালজয়ী করব তোমাকে কাল রাতেই। হ্যাঁ, কাল রাতেই। আজই রওনা হব এখান থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার একঘণ্টা আগে—কাল রাতে পৌঁছোবো প্রাণজ্যোতির মহা-মন্দিরে। প্রাণঝর্ণায় নেয়ে ওঠার পর স্ত্রীত্বে বরণ করতে পারবে আমাকে—আমার পতি হবার যোগ্যতা অর্জন করবে তখনি—এখন নয়।'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল লিও। অদ্ভুত বক্তৃতার জবাব কি হওয়া উচিত ভেবে পেল না।

অস্ফুট হেসে আয়েশা বললে আমাকে—'হোল্লি, সেকালের দার্শনিকদের মতো মূর্খ তুমি নও। অসার দর্শন নিয়ে দিন কাটাও না। রমণীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে জানো। তোমাকে পছন্দ সেই কারণেই—পছন্দ তোমার কথাবার্তার জন্যে। তাই ঠিক করেছি, তোমাকেও চিরযৌবন দেব।'

সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম প্রস্তাবটা। চিরযৌবনের কোনো প্রয়োজন নেই আমার। আকাঙ্খার কি শেষ আছে এই সংসারে? আকাঙ্খার

মই বেয়ে উঠতে উঠতে সবচেয়ে উঁচু ধাপে পৌঁছেও কি অবসান ঘটে আকাঙ্খার? তারপর তো এমন আকাঙ্খা এসে পাগল করে দেয় মানুষকে যে-আকাঙ্খার নাগাল ধরা যায় না। অঢেল সম্পদ, অঢেল শক্তি পাওয়ার পরেও কি সম্পদ আর শক্তির আকাঙ্খা ফুরিয়ে যায়? যায় না। সুতরাং কি দরকার হাজার হাজার বছর বেঁচে থেকে? সীমিত জীবনই ভালো।

আসল কথাটা অবশ্য মুখের ওপর বলতে পারলাম না। আয়েশাকে যে আমি দেখেছি। যতদিন বাঁচব, ঐ রূপ চোখের সামনে জলজল করবে। হাজার হাজার বছর না-পাওয়ার যন্ত্রণা, স্মৃতির বৃশ্চিক-দংশন কি সহ্য করা যায়?

বিষয়ান্তরে চলে এল আয়েশা। লিওকে বললে মোহময় স্বরে—'কাল্লিক্রেট্স্, কাল রাতে বলছিলে, কাল্লিক্রেট্স্ তোমারই পূর্বপুরুষ—তুমিই তার বংশধর। কিন্তু তুমি তা জানলে কি করে? বড় কম কথার মানুষ তুমি। কিন্তু বলতেই হবে জানলে কি করে দু-হাজার বছর আগেকার গোপন কাহিনী।'

মৃৎপাত্রের ভাঙা টুকরোয় পাওয়া কাহিনী শুনিয়েছিল লিও। মিশর দেশের মেয়ে আমেনার্তাস তার পূর্বপুরুষ। তারই নির্দেশে এই দু-হাজার বছর ধরে অনেকেই চেষ্টা করেছে এখানে আসতে, আয়েশাকে খুন করতে। কিন্তু কেউ পারে নি।

তন্ময় হয়ে শুনল আয়েশা। হেসে বললে—'কিন্তু তুমি তো পেরেছো, কাল্লিক্রেট্স্। তুমি তো এসেছো আমেনারতাসের অভিলাষ পূর্ণ করতে। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার ছাখো—আমেনারতাসই তোমাকে পাঠিয়ে দিলে তারই স্বামীকে নিজের বংশধর করে আমার কাছে। বিচিত্র ব্যাপার নয় কি? এসেছো যখন, কাজটা মিটিয়ে নাও। তোমার হাতের পাশেই রয়েছে ভারী ছুরি। এই আমি বসলাম তোমার পায়ের কাছে। বুকের কাপড় সরিয়ে দিচ্ছি—এইখানে ধুকধুক করছে আমার হৃৎপিণ্ড। কাল্লিক্রেট্স্, আমূল বসিয়ে দাও ছুরি। তৃপ্ত হোক তোমার মনোবাসনা, পালিত হোক আমেনার-তাসের লিখিত আদেশ, প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাক আমার মহাপাপের। দেরী কেন? নাও, তুলে নাও ছুরি। আমি প্রস্তুত।'

বিষণ্ণ চোখে চেয়ে থেকে দু-হাতে আয়েশাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে লিও—'আয়েশা, আমার পক্ষে তো এ কাজ সম্ভব নয়। কাল রাতে যাকে হত্যা করলে, তার মৃত্যুর বদলা নেওয়ার জন্যেও এ কাজ করতে আমি পারব না। কারণ আমি তোমারই মুঠোয়, তোমার গোলাম ছাড়া কিছুই নই।'

স্মিত মুখে বললে আয়েশা—'মারতে পারবে না আমাকে, শুধু আমাকে

ভালবাসতে আরম্ভ করেছো বলে—অন্য কোনো কারণে নয়। যাক সে কথা। তোমার দেশের গল্প বলো। বিদ্যায় বুদ্ধিতে অনেক উন্নত সে দেশের মানুষ, তাই না? রোমের মতোই বিশাল সাম্রাজ্য। অমন দেশে ফিরে তুমি যাবেই, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। কোর-এর এই গুহায় থাকবার মানুষ তুমি নও। আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি কাল্লিক্রেট্স্। দীর্ঘ দুটি হাজার বছর তোমার প্রতীক্ষায় থেকেছি জঘন্য এই গুহা দেশে। মন চায় ছুটি। ছেলে মানুষের মতোই ছুটি উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়ব তোমার সঙ্গে—তোমার স্ত্রী হওয়ার পর। যাওয়ার পথ? সে ভাবনা আমার। পথ আমি বাৎলে দেব। তারপর যাবো ইংলণ্ডে। রাজা তুমি হবেই, এখানকার এই গোমড়া-মুখোদের নয়—তামাম ইংলণ্ড লুটিয়ে পড়বে তোমার পায়ে—'

আঁৎকে উঠেছিলাম আমি আর লিও দুজনেই। বলে কী আয়েশা!

'আয়েশা, ইংলণ্ডে কিন্তু রানী রয়েছেন,' বলেছিল লিও।

'তাতে কী? সিংহাসনচ্যুত করব।'

'কী সর্বনাশ! সে তো মহা অপরাধ! মুখে আনাও পাপ!'

আয়েশা তো অবাক—'এ আবার কি কথা! এ রকম রানী ভক্তি তো কখনো দেখিনি। প্রজারা রানীকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়েছে বহু যুগে বহুবার—আঁৎকে ওঠার কি আছে?'

বুঝিয়ে বললাম সে-যুগ আর নেই। রাজারাজরাদের হামবড়া রাজত্বের যুগ গত হয়েছে। এখন গণতন্ত্রের যুগ। সমাজের সব চাইতে কম শিক্ষিত নিচু শ্রেণীর প্রজাদের ভোটেই যিনি নির্বাচিত হন, দেশ শাসনের ভার থাকে তার ওপর। স্বেচ্ছাচারিতার কাল ফুরিয়েছে বলেই দেশের জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত মানুষ শ্রদ্ধা করে সিংহাসনে আসীন মানুষকে।

'তাই বলো। গণতন্ত্রই তো অত্যাচারীর জন্ম দেয়। আগেও দেখেছি। গণতন্ত্রের নিজস্ব কোনো সুস্পষ্ট ইচ্ছে না থাকলে অত্যাচারীর অভ্যুত্থান ঘটবেই। দেশের লোককেও দেবতাজ্ঞানে পুজো করতে হবে তাকে।'

'তা ঠিক। অত্যাচারী আমাদের দেশেও আছে বইকি,' না মেনে পারলাম না।

'থাকুক। অত্যাচারীদের জাহান্নমে পাঠিয়ে কাল্লিক্রেট্স্‌কে দিয়ে দেশ শাসন করাবো আমি।'

'অত সোজা নয়, আয়েশা। প্রাকৃতিক শক্তি বর্ষণ করে এখানে প্রজা নিধন করা চলে—ইংলণ্ডে নয়। সে-দেশে আইনকানুন, আদালত, ফাঁস-কাঠ আছে।'

'আইনের ভয় আমাকে দেখিও না, হোলি। আইনের ওপরে আমি। আমি যদি তাই হই, কালিক্রেট্‌স্‌ হবে তাই। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে যেমন ঠিকরে যায় উত্তুরে বাতাস, মানুষের তৈরী আইন তেমনি পালাবার পথ পাবে না আমাদের সামনে। হোলি, হাওয়ায় পাহাড় মাথা নিচু করে না—পাহাড় মাথা নিচু করায় হাওয়াকে।

'যাক, যাওয়ার জন্যে তৈরী হও। দিন তিনেকের মতো জিনিসপত্র সঙ্গে নিও—বেশী না। চাকরটাকে নিয়ে যেও। ফিরে এসে বিদায় জানাবো 'কোর'-য়ের প্রাচীন সভ্যতাকে।'

(২৩) সত্য দেবীর মন্দির

তৈরী হতে বেশী সময় লাগেনি। জামাকাপড় আর বাড়তি বুট নিয়েছিলাম হাতব্যাগে। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে রিভলবার আর এক্সপ্রেস রাইফেল। গুলিবারুদ যথেষ্ট নিয়েছিলাম বলেই পরে তা কাজে লেগেছিল। প্রাণরক্ষে পেয়েছে একাধিকবার। ভারী রাইফেল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র রেখে গিয়েছিলাম।

নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট কয়েক আগে আয়েশার ঘরে গিয়ে দেখলাম কালো আলখাল্লা পরে সে প্রস্তুত।

রওনা হওয়ার আগে আয়েশাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, যাচ্ছি বটে, কিন্তু প্রাণঝর্ণার ব্যাপারটায় আমার অন্ততঃ বিশ্বাস নেই আদৌ।

হেসে বলেছিল আয়েশা—'হোলি, সেকালের ইহুদীদের মতোই বড় অবিশ্বাসী তোমার মন। যা জানা নেই, তাতে বিশ্বাস আসে না। চলো, আর দেরী করা ঠিক হবে না। কে জানে ভাগ্যে কি আছে।'

'তা তো বটেই। কেউই জানে না কার ভাগ্যে কি আছে।'

গুহামুখে একটা পাল্কী নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ছ-জন বেহারা। শুধু আয়েশার জন্যে। বিল্লালি আর আমরা যাবো পায়ে হেঁটে। জেনে খুশীই হয়েছিলাম।

শুরু হল অভিযান ধু-ধু প্রান্তরের ওপর দিয়ে, কৃষিক্ষেত্রের আশপাশ দিয়ে। সুউন্নত 'কোর'-সভ্যতার বহু নিদর্শন দেখলাম যাওয়ার পথে। সুপ্রাচীন ধীমান মানুষরা বিশাল এই অঞ্চলকে শুধু জলশূন্যই করেনি—মেহনৎ, বুদ্ধি এবং কারিগরি-কৌশল দিয়ে অপরূপ সাজিয়েছিল। এমন একটা জায়গায় রাজধানী স্থাপনের দূরদৃষ্টির জন্যে তাদের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

ঘন্টাখানেক হাঁটবার পর বিশাল নগরীর ধ্বংসস্তূপ দেখতে পেলাম। ব্যাবিলন, থিব্‌স্ বা সেকালের অন্য কোনো শহরের মতো বিরাট নয়। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বড় জোর বারো বর্গ মাইল পরিমিত জায়গা জুড়ে নির্মিত শহর। প্রাচীরের উচ্চতা চল্লিশ ফুটের বেশী ছিল না কোনো কালেই—কয়েক জায়গায় তা ভেঙে গেছে, মাটিতে বসে গেছে। গুহা থেকে কেটে আনা নিখুঁত মাপের পাথর দিয়ে তৈরী পাঁচিল। ঝেজেঘষে পরিষ্কার করা। পাঁচিলের পাশে ষাট ফুট চওড়া পরিখা। এখনো জল রয়েছে। সূর্য ডোববার মিনিট কয়েক আগেই ভাঙা সেতুর স্তূপ পেরিয়ে অতি কষ্টে উঠলাম পাঁচিলের মাথায়। বেশ চওড়া পাঁচিল। ওপর থেকে পড়ন্ত সূর্যের লাল আভায় মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তৃত ভাঙা থাম, মন্দির, বেদী, রাজপ্রাসাদের বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমার নেই। জমকাল দৃশ্য নিঃসন্দেহে—বহু জায়গায় সবুজ হয়ে রয়েছে আগাছায়, শ্যাওলায় আর গাছগাছড়ায়।

সামনেই বিস্তৃত শহরের মূল সড়ক। খুব চওড়া। টেমস নদীর পাড়ে যে রাস্তা—তার চাইতেও চওড়া। চাঁচাছোলা যে-ধরনের পাথর দিয়ে পাঁচিল তৈরী হয়েছে, সেই ধরনের পাথর দিয়েই রাস্তা বাঁধানোও হয়েছে। পাথরের জোড়ে ঘাস আর আগাছা গজিয়েছে বটে—কিন্তু খুব বেশী নয়। মাটির অভাবে।

একটু পরেই পৌঁছোলাম সারি সারি পেল্লায় স্তম্ভশ্রেণীর সামনে। প্রায় চল্লিশ বিঘে জায়গা জুড়ে একটা বিরাট মন্দির। চৈনিক বাক্সের কায়দায় বিস্তর প্রাঙ্গণ একটার মধ্যে একটা। এক একটা চত্বর থাম দিয়ে ঘেরা। থামসুদ্ধ চত্বর ঘিরে আবার একটা চত্বর। থাম দিয়ে ঘেরা এটাও। এই-ভাবে চত্বরের মধ্যে চত্বর ছোট হয়ে এসেছে মাঝের বিপুল মন্দিরের চারদিকে।

বিশাল এই মন্দিরের বড় বড় থামের সামনে এসে আয়েশা নেমে দাঁড়াল পাল্কী থেকে। এক-একটা থাম প্রায় সত্তর ফুট উঁচু, তলার দিকের ব্যাস আঠারো থেকে বিশ ফুট।

লিও দৌড়ে এসেছিল আয়েশার পাশে।

আয়েশা বললে—'কাল্লিক্রেট্‌স্, দু-হাজার বছর আগে এইখানে বিশ্রাম নিয়েছিলাম তুমি, আমি আর আমেনার্তাস। তারপর থেকে আর কাউকে আসতে দিইনি—নিজেও আসিনি। জানি না সব ভেঙে পড়েছে কিনা।' চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ভাঙা চাতালে উঠে গিয়ে নির্নিমেষে চেয়ে রইল ভেতরের অন্ধকারের মধ্যে। যা খুঁজছে, তা যেন মনে পড়ে গেল একটু পরেই।

দেওয়ালের ধার ঘেঁসে বাঁদিকে কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ডাকল মূকবধির দুজন মোটবাহককে। হাতের ইশারায় লক্ষ জানিয়ে এগিয়ে যেতে হুকুম দিয়ে ফিরে দাঁড়ালো আমাদের দিকে।

বললে—'এই সেই জায়গা।'

আমহাগ্গাররা সব সময়ে সব জায়গায় মালসাভর্তি আগুন নিয়ে যায় দেখেছিলাম। আয়েশার হুকুম শুনেই বোবাকালা একজন অনুচর মালসার আগুনে মমীর টুকরো জ্বালিয়ে নিয়ে ঢুকল ভগ্নস্তূপের মধ্যে। আগুনের উৎস যতই বিকট হোক, আলোয় দেখা গেল চারিদিক।

পেছন পেছন গেলাম আমরা, খানিকটা জায়গা সাফসুতরো করে নিয়ে খেতে বসলাম। আমরা খেলাম ঠাণ্ডা মাংস। ময়দার রুটি আর ফল খেল আয়েশা—এই দুটি খাদ্য ছাড়া আর কিছুই ওকে কখনো খেতে দেখিনি। খেতে খেতেই পাহাড় টপকে আধখানা চাঁদ উঠল আকাশে। রুপোলী আলোয় উদ্ভাসিত হল ধ্বংসস্তূপ।

রানীর মতো আড় হয়ে শুয়ে বিশাল থামের ওপর দিয়ে চাঁদ দেখতে দেখতে আয়েশা বললে—'কাল্লিক্রেট্স্, এখানে কেন আনলাম তোমাকে জানো? জায়গাটা চিনিয়ে দেওয়ার জন্যে। যেখানে বসে আছো, ঠিক ঐখানেই দু-হাজার বছর আগে এনে রেখেছিলাম তোমার মৃতদেহ। এখান থেকে নিয়ে গেছিলাম 'কোর'-রের গুহায়। বীভৎস! ভাবলেও এখনো গা কি রকম করে! আমার নিজের হাতে মারা মড়া বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম নিজেই!

লাফিয়ে উঠে সরে বসেছিল লিও।

স্মৃতিচারণের সুরে তখনো বলে চলেছে আয়েশা—'খেয়ে নাও, তারপর অভূতপূর্ব যে দৃশ্য কোনো মানুষ কখনো দেখেনি—দেখবে সেই দৃশ্য। চাঁদের আলোয় মরা শহরের দেবতার মন্দির।'

উঠে পড়লাম তৎক্ষণাৎ। চাঁদনি রাতের সেই দৃশ্য কি করে যে ভাষায় ফুটিয়ে তুলব ভেবে পাচ্ছি না। ভগ্নস্তূপ যে এত জমকালো হয়, তা না দেখলে প্রত্যয় হবে না। না দেখলে উপলব্ধি করার শক্তি নেই কোনো মানুষের। প্রাঙ্গণের পর প্রাঙ্গণ, স্তম্ভের পর স্তম্ভ—প্রতিটি সুচারুভাবে খোদত, প্রতিটিতে বিস্ময়কর কারুকার্যের স্বাক্ষর—তলা থেকে ওপর পর্যন্ত, কিন্তু খাঁ-খাঁ করছে সব কিছুই—বিরাট বিরাট কক্ষগুলোয় কীটপতঙ্গ নিশাচর প্রাণী পর্যন্ত নেই। নিঃঝুম এই পুরী প্রকৃতই মৃত—প্রাণের প্রবেশ নেই কোথাও। অভিশপ্ত মহানগরীর মৃত্যুকঠিন নৈঃশব্দ্য কিন্তু আরও প্রকা

করে তুলেছে অতীতের প্রাণময়তা। সৌন্দর্য এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল একদা —গমগম করত এখানকার প্রাঙ্গণ, উঠোন, অলিন্দ, কক্ষ—বড় প্রিয়, বড় আদরের ছিল এখানকার প্রতিটি ধূলিকণা—আজ তা একেবারেই নিঃসঙ্গ। তাই অতীতের সেই সুখময় সুমহান স্মৃতি যেন আজও বিধৃত এখানকার প্রতিটি ধূলিকণায়—স্মৃতিভারে থমথম করছে করছে বাতাস! জোরে কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেললাম প্রত্যেকেই—পবিত্র নৈঃশব্দ্য ভঙ্গের অপরাধে না জানি কি সাজাই পেতে হয়। আয়েশা নিজেও অকস্মাৎ বোবা মেরে গিয়েছে দু-হাজার বছর আগেকার স্মৃতিভারে। ফিসফিস করে কথা বলছি যে-টুকু না বললেই নয়। প্রতিটা ফিসফিসানি চাপা বিলাপ গুঞ্জনের মতো থাম থেকে থামে প্রতিহত হয়ে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে দূর হতে দূরে বোবা বাতাসের অতলে।

বিমুগ্ধ দৃষ্টির ক্লান্তি ঘটত না সারা রাতেও—আয়েশাই যতি টানল অবশেষে।

বললে—'চলো এবার দেখাই তোমাদের বিস্ময় আর লাবণ্যের পাথুরে ফুল যেখানে রয়েছে—সেখানকার মূল বেদী। মহাকালকে বিদ্রূপ করে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই মূর্তি—ঘোমটার আড়ালে সৌন্দর্য গোপন করে রেখে আজও কৌতূহল নিবিড় করে তুলছে প্রতিটি মানুষের মনের কন্দরে।'

একদম মাঝের প্রাঙ্গণে পৌঁছোলাম। চৌকোনা চত্বর। এক-একদিক পঞ্চাশ গজ লম্বা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা আজও যে শিল্প সৃষ্টি করতে অক্ষম, দাঁড়ালাম তার মুখোমুখি। এবং চমৎকৃত হলাম। অপূর্ব! অপূর্ব! চত্বরের মাঝে রয়েছে প্রায় বিশ ফুট ব্যাসের কালো পাথরের একটা বিশাল প্রস্তর গোলক। গোলকের নিচে চৌকোনা প্রস্তর বেদী। গোলকের ওপর একটা ডানাওলা মূর্তি। চাঁদের নরম আলোয় অতিকায় অপরূপার দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল আমার হৃৎপিণ্ড।

মূর্তিটা ধবধবে সাদা পাথরের। এত হাজার বছর পরেও শুভ্রতা ম্লান হয়নি। খাঁটি মার্বেলের ওপর নরম চাঁদের আলো ঠিকরে গিয়ে যেন অস্পষ্ট জ্যোতির্বলয় রচনা করেছে পুরো মূর্তি ঘিরে। উচ্চতায় খুব বেশী নয়— বড় জোর বিশ ফুট। কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম দুটি কারণে। প্রথম, মূর্তির সৌন্দর্য। এত লাবণ্য, এত সুষমা, এত স্বর্গীয় স্নিগ্ধতা যে সুকঠিন শিলার বুকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব, তা কোনোদিন ভাবতেই পারিনি। তদুপরি চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত সূক্ষ্ম কারুকার্যময় মূর্তির প্রতিটি অংশে দেবলোকের মাহাত্ম্য বিধৃত করে রেখেছে ভাস্কর।

দ্বিতীয় কারণটা সত্যিই অসাধারণ।

বস্ত্রের আবরণ নেই মূর্তির কণ্ঠদেশ থেকে পাদদেশ পর্যন্ত। একেবারেই নিরাবরণা। মুখটাই কেবল বস্ত্রাচ্ছাদিত। খুব মিহি ওড়নার মত আবরণে ঢাকা মুখ। পাথর যে এত পাতলা হয় এবং সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে সুন্দরীর মুখের আদল দেখা যায়—তা জানলাম সেইদিন।

নির্বাক বিস্ময়ে বহুক্ষণ সেই অসামান্য সৃষ্টির পানে তাকিয়ে থাকার পর দৃষ্টি সরিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম—'কার মূর্তি?'

'হোল্লি, তোমার অন্ততঃ তা আন্দাজ করা উচিত ছিল। কল্পনার আশ্রয় নিলেই পারতে। সত্য...সত্য দেবী দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর ওপর। বুঝলে? পৃথিবীর সন্তানদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে—'এসো...ঘোমটা সরাও...দেখে যাও সত্যের মুখ।' তলার বেদীতে লেখা আছে সত্যের বন্দনা। শোনো, পড়ে শোনাচ্ছি।'

মুখে মুখে অনুবাদ করে গেল আয়েশা।

'আমার অতীব সুন্দর এই আনন অবলোকন করার মতো কেউ কি নেই এই বিশ্বে? অবগুণ্ঠন অপসারণ করে দেখে যাক অনিন্দ্যসুন্দর এই মুখশ্রী। এ কাজ যে করবে, আমি তার কাছেই বাঁধা পড়ব। জ্ঞান, শান্তি, সুসন্তান এবং মহৎ কর্ম সে পাবে আমার কৃপায়।'

অমনি নিনাদিত হল একটা কণ্ঠস্বর—'তোমাকে যাচ্ঞা করে অনেকেই। কিন্তু তুমি তো কুমারী—চিরকুমারী থাকবে অনন্তকাল! তোমার ঐ অবগুণ্ঠন অপসারণ করার পর জীবিত থাকার মতো পুরুষ আজও কোনো নারীর গর্ভে আসেনি—আসবেও না। হে সত্য দেবী, এ অবগুণ্ঠন অপসৃত হয় শুধু মৃত্যুর আবির্ভাবেই।'

দু হাত বাড়িয়ে কেঁদে ফেলল সত্য দেবী। বাস্তবিকই তাকে গ্রহণ করার মতো, ঘোমটা সরিয়ে তার মুখ দেখার মতো কেউ তো নেই দুনিয়ায়।

তর্জমা শেষ করে বললে আয়েশা—'এই হল সত্য। বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ, বড় দুর্লভ। তার মুখ দেখার সাহস কারো নেই, তাকে গ্রহণ করার মতো বুকের পাটা কারো নেই। তা সত্ত্বেও অতীতের 'কোর'-বাসিন্দারা এই সত্য দেবীকেই উপাসনা করে গেছে পরম নিষ্ঠায়। সত্যকে কোনোদিনই পাওয়া যাবে না জেনেও বানিয়েছে সত্যের মন্দির। অব্যাহত রেখেছে সত্যানুসন্ধান—সত্যের ভজনা।'

বললাম বিষণ্ণ কণ্ঠে—'এই মুহূর্তে আমার দুনিয়ার মানুষের লক্ষ্যও তাই।'

(২৪) তক্তার ওপর দিয়ে

পরের দিন ভোরের আগেই মূকবধিররা ঘুম থেকে তুলে দিলে আমাদের। বাইরে এসে দেখলাম পাল্কীতে ওঠবার জন্যে দাঁড়িয়ে আয়েশা। মালপত্র গোছগাছ করছে বিল্লালি। ঘুম কি রকম হয়েছে জানতে চাইল লিও।

আয়েশা বললে—'খুবই খারাপ, কাল্লিক্রেট্‌স্‌, খুবই খারাপ! দুঃস্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন। যেন অনেক অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে আমার জীবনে। বিরাট ক্ষতি হতে চলেছে আমার নিজের। ভেবে পাচ্ছি না, আমার অমঙ্গল হবে কি ভাবে? অপশক্তির অনেক উর্ধ্বে আমি। আমাকে তো অমঙ্গল স্পর্শ করতে পারে না। অথচ—'হঠাৎ নারীসুলভ কোমলতায় আর্দ্র হয়ে এল কণ্ঠস্বর—'কাল্লিক্রেট্‌স্‌, এমনও তো হতে পারে, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, কিন্তু তুমি জেগে রইলে? তখন নিশ্চয় আমার কথা তোমার মনে পড়বে? আমার কথা ভাববে? তাই না, তাই না কাল্লিক্রেট্‌স্‌? বহু শতাব্দী পর আবার আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার স্মৃতি নিয়ে তুমি পথ চেয়ে থাকবে না?'

জবাব শোনার তর সয়নি কিন্তু। তাড়াতাড়ি মালপত্র উঠিয়ে রওনা হয়েছে তৎক্ষণাৎ, দিন শেষ হওয়ার আগেই গিয়ে পৌঁছোতে হবে দূরের ঐ নীলিমার রাজ্যের প্রাণঝর্ণার পাদদেশে।

বিশাল ভগ্নস্তূপের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সূর্য উঠেছিল আকাশে। বিমর্ষভাব কেটে গিয়েছিল আয়েশার। প্রাতরাশ খেতে বসে বলেছিল ফূর্তি-উচ্ছল কণ্ঠে—'সত্যিই ভুতুড়ে ঐ ধ্বংসস্তূপ, অপদেবতাদের আস্তানা, শুনেছিলাম আগেই, হাড়ে হাড়ে টের পেলাম কাল রাতে। কখনো এরকম গা ছমছম করেনি, এত অমঙ্গল ভিড় করেনি স্বপ্নের মাঝে। শুয়েছিলাম ঠিক সেই জায়গাটাতেই যেখানে দু-হাজার বছর আগে শুইয়ে রেখেছিলাম তোমার মৃতদেহ। কাল্লিক্রেট্‌স্‌ এই শেষ, জীবনে এই অলক্ষুণে জায়গায় আর থাকব না।'

দুটো নাগাদ পৌঁছোলাম গগনচুম্বী আগ্নেয়গিরির সানুদেশে। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলাম, শীর্ষদেশ দেড় হাজার থেকে দু-হাজার ফুট উঁচুতে। একদম খাড়াই পাহাড়। গা বেয়ে ওঠা কোনমতেই সম্ভব নয়।

বিল্লালিকে হুকুম দিলে আয়েশা, মালপত্র আর বোবাকালাদের নিয়ে এখানেই থাকতে হবে কাল দুপুর পর্যন্ত—ফিরে না আসা পর্যন্ত।

সবিনয়ে বিল্লালি জানালে, কাল দুপুর কেন, চুল পেকে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে।

জবকেও নিয়ে যেতে চায়নি আয়েশা। এমন দৃশ্য দেখতে হতে পারে, যা সইবার ধাত নেই ওর। বেঘোরে প্রাণ যাওয়ার চাইতে বাইরে থাকাই ভাল।

শুনেই আঁৎকে উঠেছিল জব। নরখাদকদের সঙ্গে থাকতে সে রাজী নয় কোনমতেই। নির্ঘাৎ মাথায় গরম পাত্র চাপিয়ে ডিনার খেতে বসে বসে যাবে। অনেক দুঃসহ দৃশ্য সে দেখেছে, আরও একটু না হয় হয় দেখবে—কিন্তু আমাদের সঙ্গছাড়া হবে না কিছুতেই।

নাচার হয়ে আয়েশা বলেছিল—'বেশ, তাহলে চলুক। মরলে মরবে নিজের দোষে। বয়ে নিয়ে চলুক লম্ফ আর এই তক্তাখানা।'

ষোল ফুট তক্তাটা আগেই দেখেছিলাম। পাল্কীর মাথায় বাঁধা ছিল। বুঝিনি কেন আনা হয়েছে সঙ্গে। এখনও বুঝলাম না।

অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় টপাটপ লাফ দিয়ে পাহাড় বেয়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট ওপরে উঠে গেল আয়েশা। ছোট্ট একটা চাতালে পৌঁছোনোর পর দেখলাম, ফুলের পাপড়ির মতো চাতালটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে ভেতর দিকে। ঢাল বেয়ে গজ পঞ্চাশেক নামবার পর দেখলাম, নিচের দৃশ্য আর দেখা যাচ্ছে না, পাহাড়ের ওপর থেকেও কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। এইখানে ডান দিকে রয়েছে একটা গুহা। প্রকৃতিনির্মিত গুহা। এবড়োখেবড়ো প্রবেশপথ। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে প্রচণ্ড বেগে পাথর ফাটিয়ে যেন গ্যাস বেরিয়ে গেছে। 'কোর'-বাসিন্দাদের গুহা কিন্তু এরকম নয়। তারা গুহা বানায় পরিষ্কার ভাবে—মেপে জুপে—নিয়মিত ছকে।

একটা লম্ফ হাতে নিয়ে পেছন পেছন গেলাম আমি। আমার পেছনে লিও আর জব। গুহার মেঝে আলগা নুড়ি আর বড় বড় গোলপাথরে ছাওয়া। এমনই দুর্গম যে পা ফেলা মুস্কিল। এছাড়াও রয়েছে বিস্তর গর্ত—বেকায়দায় পড়লে পা ভাঙবেই।

প্রায় সিকি মাইল পথ যাওয়ার পর গুহা শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাসের ঝাপটায় নিভে গেল দুটো লম্ফই।

আয়েশাই হাত ধরে নিয়ে গেল আমাদের সামনের দিকে। যা দেখলাম তা রক্ত জমিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কালো পাথরের বিশাল একটা খাদ। গুহার মুখ থেকে একটা চাতাল কার্নিশের মত ছুঁচোলো হয়ে ঝুলছে সেই খাদের ওপর। অতল খাদের তলদেশ দেখা যাচ্ছে না। প্রবল হাওয়ায় ভারসাম্য বজায় রাখাই কঠিন। মোরগের পায়ের পেছনে যেভাবে প্রত্যঙ্গ বেরিয়ে থাকে, ঠিক সেইভাবেই পাথর-প্রত্যঙ্গ ছুঁচোলো হয়ে ঠেলে রয়েছে শূন্যে।

মাত্র কয়েক ফুট চওড়া সঙ্কীর্ণ এই খোঁচা-চাতালের ওপর দিয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সটান দেহে এগিয়ে গেল আয়েশা।

আলসেটা প্রায় পঞ্চাশ গজ লম্বা—ছুঁচোলো প্রান্তে টেবিলের মতো এতটুকু একটা চাতাল। আয়েশা দৃপ্ত পদক্ষেপে চলেছে সেইদিকেই। এদিকে তলার অন্ধকার খাদ, মাথার ওপরকার আকাশ আর প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ায় আমাদের অবস্থা কাহিল। জব তো চার হাত পায়ে বুকে হাঁটতে শুরু করে দিলে। সে আর লিও তক্তাটা বয়ে আনছে। আমিও বেগতিক দেখে হামাগুড়ি দিতে লাগলাম। বাজনার তারের মতো গুম-গুম করে বেজে চলেছে যে সরু পাথর দারুণ হাওয়ার ঝাপটায়, তার ওপর দিয়ে যাওয়া নিতান্তই বাতুলতা। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে।

গেলও তাই। হঠাৎ একটা মারাত্মক হাওয়ার ঝাপটায় আয়েশার কালো আলখাল্লা গা থেকে খুলে গিয়ে পৎ-পৎ করে নিশানের মত উড়তে উড়তে মিলিয়ে গেল নিতল গহ্বরে। আশ্চর্য দক্ষতা বটে আয়েশার। অপূর্ব কৌশলে সামলে নিল নিজেকে। প্রাণে ভয়ডর একেবারেই নেই। শ্বেতবসনা পরীর মতো দাঁড়িয়ে রইল হু-হু দামাল হাওয়ার মাঝে।

টেবিলের মতো ছোট্ট চাতালটায় পৌঁছে দেখলাম, বহু নিচ থেকে একটা শংকুর মতো পাহাড় উঠে এসেছে ছুঁচোলো চাতালের ঠিক সামনে। চুড়োর নিকটতম কিনারাটা রয়েছে প্রায় ষোল সতেরো গজ দূরে। একটা অতিকায় গোলাকার প্রস্তর খণ্ড হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে এই কিনারার ওপরেই। গোল পাথরের এদিকের প্রান্ত টেবিলের মতো চাতাল থেকে বারো ফুট দূরে।

দেখেই তো গুটিয়ে উঠেছিল জব। সর্বনাশ! তক্তা ফেলে ফাঁকটুকুর ওপর দিয়ে যেতে হবে নাকি?

করতেও হল তাই। লিওর হাত থেকে তক্তা নিয়ে ফাঁকের ওদিকে গোল পাথরের গায়ে ঠেকিয়ে দিলে আয়েশা। পরমুহূর্তেই পা রাখল তক্তায়।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে আমাকে—'শেষবার যখন এসেছিলাম, গোল পাথরটা এত দোলেনি। এখন দেখছি তলা আলগা হয়ে গেছে—বেশ নড়-বড়ে। কাজেই আগে যাচ্ছি আমি—আমার কিস্সু হবে না। তোমরা আসবে পরে।'

বলেই আর একটা কথাও না উচ্চারণ করে লঘু চরণে তক্তা পেরিয়ে গোল পাথরের ওপর পৌঁছে গেল আয়েশা।

তক্তা কিন্তু দুলছে দারুণভাবে। হাওয়ায় কাঁপছে থরথর করে। দেখেই তো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল আমার। নির্ভীক স্বরে ওপার থেকে ঝোড়ো হাওয়ার গজরানির ওপর গলা চড়িয়ে আয়েশা বললে আমাকে চলে আসতে। বললে—'পাথর ঠিকই আছে, হোল্লি। গোলপাথরের ওদিকে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি আমি। তোমাদের চাপে তাহলে পাথর গড়িয়ে যাবে না—ভয় নেই। চলে এসো।'

চলে এসো বললেই কি যাওয়া যায়? নিচে অতলস্পর্শী খাদ, দুলন্ত তক্তা, হাওয়ার ঝাপটা, নড়বড়ে গোল পাথর—এক পলকে দৃশ্যটা দেখে নিতেই পা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

টিটকিরি দিলে আয়েশা—'পথ ছেড়ে দাও, হোল্লি, পথ ছেড়ে দাও কাল্লিক্রেট্‌স্‌কে—ওর সাহস আছে।'

আর সহ্য হল না। আয়েশার চোখে ভীরু কাপুরুষ হয়ে থাকার চাইতে মৃত্যু ভাল। দাঁতে দাঁত কামড়ে হন্‌ হন্‌ করে হেঁটে পৌঁছে গেলাম ওপারে—সোজা হয়ে অবশ্য নয়—তক্তা দুলছে তখন ভীষণভাবে।

পরমুহূর্তেই এল লিও—সটান দেহে। উল্লাসে ফেটে পড়ল আয়েশা—'সাবাস কালিক্রেট্‌স্‌, সাবাস!'

এরপর জবের পালা ছোট্ট চাতালে মুখ গুঁজরে পড়ে সেকী চিৎকার। অসম্ভব! ঐ তক্তা বেয়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। নির্ঘাৎ পড়ে যাবে নিচে।

আমি আর লিও অনেক বোঝালাম। ভয়ের কিছু নেই। তক্তা দুলছে বটে, হাওয়ার ঝাপটা আছে বটে—কিন্তু আমরা তো এলাম।

বিকট চিৎকার করে তক্তা আঁকড়ে ধরে এগিয়ে এসেছিল জব। দু-পা দু-পাশে ঝুলিয়ে থপথপ করে আসতে গিয়ে আরো ভীষণভাবে দুলে উঠেছিল তক্তা। গোল পাথরের কাছাকাছি আসতেই তক্তার প্রান্ত হড়কে গিয়েছিল গোল পাথর থেকে। হাত বাড়িয়ে লিও খপ করে জবকে ধরে হ্যাঁচকা টানে তুলে আনলেও তক্তা রাখা যায় নি—ছিটকে গিয়েছিল অন্ধকার খাদের দিকে।

'ফিরব কি করে?' বিষম ভয়ে বলেছিলাম আমি।

'আমি জানি কী! প্রস্তুত হও মরবার জন্যে।' সমান চেঁচিয়ে জবাব দিয়েছিল লিও।

আয়েশা কিছু বলেনি। আমার হাত খামচে ধরে এগিয়েছিল গোল পাথরের ওদিকে।

(২৫) প্রাণঝর্ণা

আয়েশা বলেছিল, হামাগুড়ি দিয়ে আসতে পেছন পেছন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হুকুম তামিল করতে গিয়ে হড়াৎ করে পিছলে নেমে যেতেই চার হাত পায়ে পাথর খামচে ধরে বিকট চিৎকার করে উঠেছিলাম প্রাণের ভয়ে—অভয় দিয়েছিল আয়েশা। বলেছিল, নির্ভয়ে হাত-পা ছেড়ে দিতে।

কি আর করা যায়। হাত ঢিলে দিতেই গোল পাথরের ঢালু গা বেয়ে নেমে এলাম শূন্যপথে। চকিতে মনে হয়েছিল, সাঙ্গ হতে চলেছে ভবলীলা। কিন্তু তার বদলে পা ঠেকল শক্ত পাথরে। বাতাসের উথালি পাথালি দামালপনা নেই একেবারে। ঝোড়ো হাওয়ার হুহুংকার শুনছি মাথার ওপর। ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করার আগেই হুড়মুড় আওয়াজ শুনলাম ওপরদিকে—পরক্ষণেই দড়াম করে পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল লিও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুজনেরই মাথার ওপর বিকট চিৎকার করে আছড়ে পড়ল জব। ফলে, তিনজনেই ঠিকরে গেলাম প্রস্তরভূমিতে। উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই শুনলাম আয়েশা লম্ফ জ্বালানোর হুকুম দিচ্ছে। কপালক্রমে লম্ফ অটুট আছে, তেলের বাড়তি পাত্রও ভাঙেনি।

মোম দেশলাই বার করে ফস করে কাঠি ঘষে জ্বালিয়ে দিলাম পলতে—খুশী মনেই জ্বালালাম, অভাবনীয়ভাবে প্রাণটা টিকে যাওয়ায়।

মিনিট দুয়েক লাগল আলো জ্বলতে। প্রশান্ত মুখে দাঁড়িয়ে আয়েশা। দু-হাত জড়ো করা বুকের ওপর। আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটা চৌকোনা প্রস্তরকক্ষে। এক-এক দিকের মাপ দশ ফুট। মাথার ওপর ছাদ রচনা করেছে দুলন্ত গোল পাথরটা। পেছন দিকটা শংকুর মতো পাথর খুবলে বানিয়ে নেওয়া। দেখে খুব একটা পুলকিত হলাম না। এরকম প্রকোষ্ঠ কখনো দেখিনি। অর্ধেক মানুষের হাতে গড়া, অর্ধেক গড়েছেন প্রকৃতি দেবী। জায়গাটা কিন্তু বেশ নিরিবিলি। মাথার ওপর হাওয়া গজরাচ্ছে বটে, এখানে বিরাজ করছে নিবিড় প্রশান্তি।

আয়েশা বললে—'অদ্ভুত ঘর, তাই না হোলি? কিছু বুঝলে?'

'না।'

'একজন পরমজ্ঞানী সাধুর নিবাস ছিল এখানে। বারোদিন অন্তর একবার করে যেত বাইরে জল, খাবার আর তেল আনতে—হাতে যেটুকু ধরে—রেখে যেত ভক্তরা পাহাড়ের বাইরে। নাম তার নূট। 'কোর'-সন্তানদের সমস্ত জ্ঞান ছিল তার মধ্যেও। কিন্তু বিলাসবৈভব ত্যাগ করে ঠাঁই নিয়েছিল পাহাড়চূড়ার এই নিভৃত কন্দরে। কেন জানো? নূট-য়ের মতো অতবড়

দার্শনিক, সন্ন্যাসী আমি আর দেখিনি। প্রকৃতির বহু গুপ্ত রহস্য সে জেনেছিল এবং দক্ষতাও অর্জন করেছিল। যে প্রাণঝর্ণা দেখাতে তোমাদের নিয়ে এসেছি, এই প্রাণঝর্ণা তারই আবিষ্কার। এ-ঝর্ণায় স্নান করলে প্রকৃতির আয়ু লাভ করা যায়—অন্তরের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, দেহের প্রতিরোধ শক্তি বেড়ে যায়, মনের অসাধারণ শক্তি জাগ্রত হয়, এই বিশ্বের যাবতীয় প্রাণের উৎস এই প্রাণঝর্ণা। যেখানে যতটুকু প্রাণের অস্তিত্ব দেখবে, সব কিছুর মূল কিন্তু ঐ প্রাণঝর্ণা। হোলি, নূট ছিল কিন্তু তোমারই মতো। বলত, অমর হওয়া মহাপাপ। জন্ম যখন হয়েছে, মরতেও তখন হবে। এতবড় গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করেও তাই সে গোপন করে রেখেছিল—কাউকে বলেনি। প্রাণঝর্ণায় যাওয়ার এই প্রবেশপথ আগলে বসে থাকত দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। আমাহাগ্‌গাররা তাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করত, খাবারদাবার এনে রেখে যেত পাহাড়ের নিচে—যেখানে দাঁড় করিয়ে এলাম বিল্লালিকে। এদেশে প্রথম এসে নূটের গল্প শুনে ছুটে এসেছিলাম দেখা করতে। কিভাবে এসেছিলাম এদেশে, সে গল্প বলব আর একদিন। তক্তা পেতে যে ফাঁক পেরিয়ে এলাম নির্ভয়ে, সেদিন কিন্তু ঐ ফাঁক পেরোতে গিয়ে ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল আমার। দেখা পেয়েছিলাম নূট-য়ের। আমার রূপযৌবন বাক্‌চাতুরী দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গেছিলাম প্রাণঝর্ণার পাশে। স্নান করতে কিন্তু দেয়নি নূট। জোর করতে গেলে খুন হয়ে যেতে পারি, এই ভয়ে সে-চেষ্টাও করিনি। কিন্তু প্রাণঝর্ণার গুপ্তকথা জেনে নিয়েছিলাম। মনে মনে জানতাম, নূটের বয়স হয়েছে। একদিন তো মারা যাবেই। তার কিছুদিন পরেই দেখা হল কাল্লিক্রেট্‌স্‌ আর আমেনার্তাসের সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই বুভুক্ষা জাগল প্রাণে—স্বামী যদি করতে হয়, কাল্লিক্রেট্‌স্‌কেই করব—আর কাউকে নয়। প্রাণঝর্ণায় নেয়ে উঠে অনন্তকাল বাঁচবো দুজনে। নিয়ে এলাম ওকে এখানে—মিশরীয় আমেনার্তাস সঙ্গ ছাড়ল না—এল সঙ্গে। এসে দেখি নূট মারা গেছে। তিনজনে গেলাম প্রাণঝর্ণার পাশে। আমি নেয়ে উঠে আগুনের মতো রূপ নিয়ে আহ্বান জানালাম কাল্লিক্রেট্‌স্‌কে। কিন্তু আমার সেই চোখ ধাঁধানো রূপ দেখে ভয় পেয়ে আমেনার্তাসকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলে তুমি। কাল্লিক্রেট্‌স্‌, রাগে ঈর্ষায় উন্মাদ হয়ে গেছিলাম। ছুটে গিয়ে তোমারই ছোরা টেনে নিয়ে তোমার বুকে বসিয়ে দিয়েছিল'ম। তখনও জানতাম না প্রাণঝর্ণায় নেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি। শুধু চোখের শক্তি অথবা মনের শক্তি দিয়ে বুক বিদীর্ণ করে দিতে পারি যে কোনো প্রাণীর। প্রাণঝর্ণার পাশে গুঁড়িয়ে উঠে

লুটিয়ে পড়লে তুমি। আছড়ে পড়ে হাহাকার করতে লাগলাম আমি। কালা আমেনার্তাস মিশরের দেবদেবীদের নামে অবিরাম অভিশাপ দিয়ে গেল আমাকে। শুধু গায়ে হাত দেয় নি—আমিও দিইনি—ইচ্ছাশক্তি দিয়ে বধ করার ক্ষমতা ভেতরে এসেছে জানতাম না বলেই আমেনার্তাসকে প্রাণে মারিনি। দুজনে মিলে তোমার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম 'কোর'-এর সমাধিগুহায়। আমিই আমেনার্তাসকে লোকজন দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম জলাভূমির বাইরে। এখন তো জানলাম, পরে ছেলের মা হয়েছিল, স্বামী হত্যার কাহিনী লিখে গিয়েছিল, প্রতিহিংসা নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল ভাবীকালের বংশধরদের।

'কাল্লিক্রেট্স্, সবই খুলে বললাম তোমাকে। মহাপাতকী আমি। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, তা বলার ক্ষমতা আমার নেই। প্রাণঝর্ণায় স্নান করলে আয়ু দীর্ঘতর হয়, জীবন উজ্জ্বলতর হয়—কিন্তু অনন্তকাল কেউ বাঁচে না। নূট-য়ের মুখেই শুনেছিলাম। আমিও অমর নই। তাই জীবন মৃত্যুর এই বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে তোমার মুখেই শুনতে চাই তোমার ক্ষমা আমি পেয়েছি কিনা। যে পাপ করেছিলাম দু-হাজার বছর আগে, তার সাজা পেয়েছি। যে পাপ করেছি মাত্র দুদিন আগে উসটেন আমায় অভিসম্পাত দিচ্ছিল বলে, তার জন্যে আমি অনুতপ্ত। তার সাজা কপালে কি আছে জানি না—কিন্তু তোমার ক্ষমা পেলাম কিনা, শুনতে চাই তোমার মুখে। যাই করি না কেন, সবই কিন্তু তোমার জন্যে, কাল্লিক্রেট্স্, শুধু তোমার জন্যে। সামান্যা মানবী আমি, প্রেমে উন্মাদিনী হয়ে ভুলের পর ভুল, পাপের পর পাপ করেছি—প্রায়শ্চিত্ত করেছি এবং করব—কিন্তু তোমার ক্ষমা কি পাবো না?'

স্পষ্টতঃ দেখলাম বিচলিত হয়েছে লিও। চোখে জল এসে গেছে আয়েশার পাঁজর-ভাঙা হাহাকার আর আকুতি শুনে। এতদিন সে যাকে ভালবেসে এসেছে সর্প-আকৃষ্ট পক্ষীর মতো, সেই মুহূর্তে দেখলাম তার প্রতি নিখাদ ভালবাসা অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে।

আয়েশার মুখের সাদা ওড়না সরিয়ে দিয়ে বলেছিল গাঢ় কণ্ঠে—'আয়েশা, উসটেনের মৃত্যুর জন্যে ক্ষমা করলাম তোমাকে—পাপ যদি করে থাকো—সাজা দেবার ভার বিধাতার। আমার দিক দিয়ে শুধু বলব, আমি তোমাকে ভালবাসি প্রতিটি রক্তকণিকা দিয়ে—বাসব যতদিন বাঁচব।'

আয়েশা বললে—'জীবনপ্রভুর ক্ষমা যখন পেলাম, ভালবাসার প্রতিশ্রুতি যখন পেলাম—তখন বিনিময়ে আমিও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যে পাপজীবন

কাটিয়েছি, এখন থেকে তার পরিবর্তন ঘটবে। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এখন থেকে অপশক্তিকে পায়ে মাড়িয়ে দৈবশক্তিকেই কেবল আরাধনা করে যাবো। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, বাঁকাপথে না চলে এখন থেকে সোজা পথে চলবো। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, জ্ঞানের তারকা সামনে রেখে এখন থেকে সত্যানুসন্ধানকে জীবনব্রত করব। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, শ্রদ্ধা আর সম্মানে আমৃত্যু তোমার আরাধনা করে যাবো। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—না, আর কোনো প্রতিশ্রুতি নয়। কথার কোনো দাম নেই। আয়েশা যদিও মিথ্যে বলে না—তবুও প্রতিশ্রুতির ইতি ঘটুক।

'এবার হোক আমাদের বিয়ে। হোল্লি, তুমি সাক্ষী। এই অন্ধকার আমাদের বিয়ের চাঁদোয়া। কা'ল্লক্রেট্স্. আজ থেকে তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। বাতাসে উড়ে যাক বিয়ের অঙ্গীকার—উড়ে যাক বিশ্বের সর্বত্র—উড়ে যাক দেবতাদের দেবালয়ে।

'চলো, এবার যা করতে এসেছি, সেই কাজে যাওয়া যাক,' বলে একটা লম্ফ তুলে নিয়ে জ্বলন্ত ছাদ-ঢাকা কক্ষের কোণের দিকে এগোলো আয়েশা।

গেলাম আয়েশার পেছন পেছন। শংকুর দেওয়ালে একটা সিঁড়ি চোখে পড়ল। সঠিকভাবে বলতে গেলে, খোঁচা খোঁচা পাথর এমনভাবে বেরিয়ে আছে যে সিঁড়ির ধাপের মতো ব্যবহার করা চলে। পাহাড়ী ছাগল স্যামেয়ের মতো অক্লেশে টপাটপ লাফ দিয়ে নেমে চলল আয়েশা একটা খোঁচা থেকে আরেকটা খোঁচায়। পদানুসরণ করলাম আমরা ঠিকই, কিন্তু বিলক্ষণ হাস্যকরভাবে। পনেরো ষোল ফুট নামবার পর পৌঁছোলাম একটা ঢালু অঞ্চলে। প্রায় খাড়াইভাবে পাহাড় নেমে গেছে অনেক নিচে। খুবই ঢালু—প্রথম দিকে গিয়েছে বাইরের দিকে, তারপর ভেতরের দিকে—উলটোনো শংকুর ভেতরে যেমন দেখা যায়। প্রকাণ্ড এই ঢাল দেখে প্রথমে হৃৎকম্প উপস্থিত হলেও দেখলাম, কষ্টেসৃষ্টে নামা যায়। লম্ফের আলোয় ধীরগতিতে অগ্রসর হলাম তিনজনে আয়েশার পেছন পেছন—পথের শেষ কোথায় আঁচ করতে পারলাম কিছুতেই। ঢুকেছি আগ্নেয়গিরির জঠরে—পৌঁছোবো কোন্ অজ্ঞাত রহস্যের মাঝখানে, ভেবে ভেবে দিশে না পেয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। নামবার সময়ে একটা ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার ছিলাম। অদ্ভুত গড়নের পাথরগুলো দেখছিলাম এবং চিনে রাখছিলাম। পথের নিশানা তো এরাই। এ রকম অসাধারণ আকৃতির অত্যাশ্চর্য পাথর আর কোথাও দেখা যায় বলে আমার মনে হয় না। কতকগুলো গোল পাথর মধ্যযুগীয় দৈত্যমুণ্ডের মতো—জলের নালা হিসেবে যে ধরনের কিম্ভূতকিমাকার মুণ্ড

বাড়ীর ছাদে নির্মিত হত, পাতালরন্ধ্রে তারাই যেন উৎকীর্ণ রয়েছে বিশাল বিশাল গোল পাথরের বুকে। অমানবিক কটমটে চাহনি মেলে দেখে যাচ্ছে নিষিদ্ধ অঞ্চলে আমাদের প্রবেশের স্পর্ধা।

আধঘন্টার মত এইভাবে বিদঘুটে পাথরের পর পাথর দেখতে দেখতে প্রাণ হাতে নিয়ে নেমে এলাম কয়েক-শ ফুট। উলটো করে বসানো শংকুর গোড়ায় পৌঁছোলাম বলেই মনে হল। মিনিট খানেক পরেই বুঝলাম অনুমান অভ্রান্ত। ফানেলের সরু প্রান্তে রয়েছে একটা সঙ্কীর্ণ পথ। এত সঙ্কীর্ণ যে হেঁট হয়ে পেছন পেছন লাইন দিয়ে যেতে হল চারজনকে। পঞ্চাশ গজ পথ এইভাবে ঘাড় হেঁট করে পেরিয়ে আসার পর আচমকা এসে পড়লাম একটা সুবিশাল গুহায়। দুপাশ দেখা যাচ্ছে, ছাদ দেখা যাচ্ছে না। জায়গাটা যে গুহা ছাড়া কিছুই নয়, তা বুঝলাম পায়ের আওয়াজের প্রতিধ্বনি ফিরে আসায় এবং বাতাস রীতিমত ভারী অনুভূত হওয়ায়। সূচীভেদ্য থমথমে নিস্তব্দতার মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলাম বহু মিনিট। নরক-বিবরে যেন শোভাযাত্রা করে চলেছি দেহহীন দিশেহারা কয়েকটি আত্মা। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে আয়েশা। অদূরেই দেখা যাচ্ছে তার শ্বেতবসনা মূর্তি প্রেতচ্ছায়ার মতো। আচম্বিতে প্রবেশ করলাম আর একটা সংকীর্ণ সুড়ঙ্গে। সুড়ঙ্গের শেষে আবার একটা গুহা-গহ্বর— আগের চাইতে ছোট। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় দেখা যাচ্ছে গুহার গা এবং ছাদ। পায়ের তলায় অজস্র গর্ত এবং ছোট বড় বিস্তর নুড়ি এবং ভাঙা পাথর। প্রথম যে গুহা দিয়ে ঢুকেছিলাম আগ্নেয়গিরিতে, সেখানকার মেঝেও এইরকম বিপজ্জনক ছিল। একই রকম ভাবে পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে নিশ্চয় ঠিকরে গেছে বিস্ফোরক গ্যাস। এই গুহার পর আবার একটা সুড়ঙ্গে ঢুকলাম। সুড়ঙ্গের শেষে দেখা গেল ক্ষীণ আলোকপ্রভা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুনলাম আয়েশাকে।

'হোলি, জননী পৃথিবীর জঠরে প্রবেশের পথ এই রকমই হওয়া উচিত, তাই না? ধরিত্রী মা প্রতিটি গাছ, প্রতিটি প্রাণীকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে রেখেছে যে প্রাণ ঝর্ণার পরশে—এবার দেখবে সেই অত্যাশ্চর্য প্রাণের উৎস! প্রস্তুত হও, নবজীবন পাওয়ার জন্যে মনকে তৈরী করো।'

বলেই দ্রুত চরণে ধেয়ে গেল আয়েশা। অত জোরে ছোটা তো সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে—পাতালবিবরের ঐ রকম বিপজ্জনক গুহায় তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রাণ খোয়াতে রাজী নয় কেউই। কৌতূহল আর আসন্ন

বিভীষিকার সংমিশ্রণ-আরকে কানায় কানায় পূর্ণ আমাদের মনপাত্র। পরমাশ্চর্য এমন কিছুই হয়ত দেখব যা প্রাণপাখীকে খাঁচা-ছাড়া করার পক্ষে যথেষ্ট। যতই এগোই সুড়ঙ্গপথে, ততই জোরালো হয়ে ওঠে আলোকরশ্মি। তমালকালো রাতে লাইটহাউসের আলো যেমন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে জলের অন্ধকারে—ঠিক সেইভাবে। শুধু আলো নয়, সেই সঙ্গে কানে আসছে একটা আত্মা-কাঁপানো গুরু-গুরু গুম-গুম ধ্বনি। ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠছে ভয়াবহ দ্যুতি—সেই সঙ্গে বাজ পড়ছে যেন গাছের মাথায়, মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে মহীরুহের পর মহীরুহ। অবশেষে পৌঁছোলাম সুড়ঙ্গের প্রান্তে এবং দেখলাম—

যা দেখেছিলাম, তারপর সভয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করেছিলাম। এখনও করছি। তিনি সহায় না হলে নিতান্তই অসহায় এই লেখনীর পক্ষে সম্ভব হবে না যথাযথ বর্ণনা হাজির করার।

তৃতীয় গুহা-গহ্বরটা লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট। পায়ের তলায় মিহি সাদা বালির আস্তরণ, দেওয়াল মসৃণ। স্বাভাবিক কারণে—কিসের প্রতিক্রিয়ায় কঠিন শিলাগাত্র এত তেলতেলে হতে পারে, তা বুঝে উঠিনি, জানতেও পারিনি। আগের দুটো গুহা-গহ্বরের মতো আঁধার ভরা নয় এই গুহা গহ্বর। নরম গোলাপী দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল। এত সুন্দর আলো জীবনে কোথাও দেখিনি। গুহা-গহ্বরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আলোকদ্যুতি দেখিনি, কানের-পর্দা-ফাটানো বুকের-রক্ত-ছলকানো সেই বজ্রনাদও আর শুনিনি। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে উপভোগ করেছিলাম অত্যাশ্চর্য গোলাপী প্রভা—উৎস কোথায়, তা ভেবে পাইনি। আচমকা ঘটল একটা ভীষণ এবং সুন্দর ব্যাপার। গুহা-গহ্বরের দূর প্রান্তে সহসা শোনা গেল বজ্রধ্বনি। যেন পাহাড়ের পর পাহাড় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘষটানি লাগছে, পাহাড়ের ওপর পাহাড় আছড়ে পড়ছে। আওয়াজটা এমনই লোমহর্ষক এবং ভয়াবহ যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে আরম্ভ করেছিলাম আমরা প্রত্যেকেই। জব তো ধপ করে বসে পড়ে মুখ লুকোলো দু-হাঁটুর মধ্যে। পরমুহূর্তেই গুহাগহ্বরের দূর প্রান্তে আবির্ভূত হল একটা ভীষণাকার মেঘপুঞ্জ অথবা অগ্নিস্তম্ভ। রামধনুর মতো অজস্র বর্ণে ঝলমলে' বিদ্যুৎ-বহ্নির মতোই প্রদীপ্ত। প্রায় চল্লিশ সেকেণ্ড ধরে লেলিহান অগ্নিশিখা চক্রাকারে আবর্তন খেয়ে চলল ধীর গতিতে। অগ্নিস্তম্ভ বন্ বন্ করে ঘুরছে ...ঘুরছে...ঘুরছে...কিন্তু মন্থর গতিবেগে। হুতাশনের হুহুংকারে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে বুঝি কর্ণপটহ। আস্তে আস্তে কমে এল কর্ণবধিরকারী ভয়ানক

তীব্র শব্দলহরী…আস্তে আস্তে একেবারেই তিরোহিত হল ভীষণ আওয়াজ …আস্তে আস্তে উধাও হয়ে গেল লকলকে অগ্নিস্তম্ভ—গেল কোন্ চুলোয়, তা জানি না। অদ্ভুত নরম গোলাপী প্রভা রেখে গেল গুহা গহ্বরে।

আয়েশার উল্লাস-রোমাঞ্চে শিহরিত কণ্ঠস্বর কানের ওপর আছড়ে পড়েছিল পরমুহূর্তেই—'কাছে এসো…কাছে এসো! কাছ থেকে দেখে নাও প্রাণের ফোয়ারা আর হৃৎপিণ্ডকে—ধরণীর বুকে ধুকপুকিয়ে চলেছে যে হৃৎপিণ্ড পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের পূর্ব মুহূর্ত থেকে—এসো তার কাছে, দু-চোখ ভরে দেখে নাও এই সেই উপাদান যা আহরণ করে অব্যাহত রয়েছে ভূগোলকের শক্তিধারা, সমুজ্জ্বল রয়েছে ভূপৃষ্ঠ। যে-উপাদান থেকে বঞ্চিত হলে কেউ বাঁচতে পারবে না পৃথিবীতে, চাঁদের মতোই ঠাণ্ডা হয়ে মারা যাবে মহীতল।'

গোলাপী প্রভায় গোলাপী অবয়ব নিয়ে এগিয়ে গেলাম সবাই আয়েশার পেছন পেছন। গেলাম গুহার দূর প্রান্তে। পা কাঁপছে, বুক কাঁপছে, সাহস উবে যাচ্ছে। তবুও গেলাম চুম্বকের টানে লোহার মতো। লেলিহান অগ্নিশিখা বন্‌বন্ করে ঘুরতে ঘুরতে যেখান দিয়ে অন্তর্হিত হয়েছে, হৃৎস্পন্দন যেখানে প্রবলতর, এসে দাঁড়ালাম তার পাশে। যাওয়ার সময়ে ঘটল একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। পা কাঁপছিল, বুক কাঁপছিল, সাহস উবে যাচ্ছিল প্রথম দিকে। যতই অগ্রসর হয়েছি মুহ্যমানের মতো হৃৎস্পন্দনের দিকে, ততই তিরোহিত হয়েছে ভয় পাওয়ার সমস্ত লক্ষণ। পা আর কাঁপেনি, বুক আর কাঁপেনি, সাহস আর উবে যায় নি। বরং একটা চমকপ্রদ বন্য মহোল্লাসের অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে। অত্যুগ্র প্রাণ-শক্তির পরম প্রসাদ সিঞ্চিত হয়েছে দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুতে, সঞ্জীবনী ধারার অমৃত পরশে হিল্লোলিত হয়েছে সর্বাঙ্গ, চেতনার মূল পর্যন্ত। স্বাভাবিক অবস্থার শক্তির উজ্জ্বলতম মুহূর্তও সেই অনুভূতির তুলনায় নিতান্তই ক্ষীণ, নিষ্প্রভ এবং নিস্তেজ।

গুহাপ্রান্তে পৌঁছে তাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে প্রাণোচ্ছল প্রভায় আলোকিত মুখে অট্টহেসে উঠেছিলাম প্রত্যেকেই। এমন কি জবও হেসে উঠেছিল প্রাণ খুলে বিপুল প্রাণশক্তির অমৃত পরশ পেয়ে। হপ্তাখানেক তার মুখে হাসির আভাসও দেখিনি। সেদিন কিন্তু স্বর্গীয় মাদকতায় মস্তিষ্ক এবং হৃদয় উত্তাল হয়ে ওঠায় হো-হো করে পরমানন্দে হেসে গিয়েছিল জব—আমি আর লিও যেন সপ্তম স্বর্গের সুখে বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম—অতি সাবলীলই প্রকাশ ঘটেছিল হাসির মধ্যে।

নতুন সত্তার চমকপ্রদ প্রাণবীর্যে যখন আত্মহারা প্রত্যেকেই, ঠিক সেই সময়ে আবার বহুদূর থেকে ভেসে এল ভয়াবহ গুঞ্জনধ্বনি। একটু একটু করে বেড়েই চলল ভয়ংকর আওয়াজটা। সেই রকমই পাহাড়ের ওপর পাহাড় আছড়ে পড়ার ভীষণ আওয়াজ আর লক্ষ বজ্রের কানফাটা গজরানি মিলেমিশে এক হয়ে গিয়ে এমন আতংকসঞ্চারী শব্দ পরম্পরা বয়ে নিয়ে এল শিহরিত কর্ণরন্ধ্রে যা যুগপৎ ভয়ংকর অথচ চমকপ্রদ। শব্দজগতে এ-ধরনের শব্দ যে সম্ভব হয়, তা স্বকর্ণে না শুনলে কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। একটু একটু করে ক্রমশঃ কাছে চলে এল দূরায়ত শব্দলহরী···আরো কাছে···আরো ···আরো...তারপর এসে গেল একেবারেই সামনে চক্রাকারে আবর্তিত অগ্নিরাশি···অমরলোকের বিদ্যুৎ-অশ্ববাহিত অদৃশ্য শকটের বজ্র চক্র ঘূর্ণিত হচ্ছে যেন চোখ ধাঁধানো দীপ্তি বিকিরণ করে। সেই সঙ্গে ঘুরছে ঝলমলে বহুরঙা রামধনু-রঙীন মেঘপুঞ্জ—অত্যাশ্চর্য সেই বর্ণ সমাহারের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়—অথচ চোখ সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও লোপ পায়। বজ্রগর্ভ সেই অকল্পনীয় অগ্নিস্তম্ভ বজ্রনাদে সমস্ত গুহা কাঁপিয়ে আমাদের বিস্ফারিত চক্ষুর সামনে কিছুক্ষণ ধীর গতিতে চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে রাজকীয় মহিমায় একটু একটু করে উধাও হয়ে গেল—কোথায় গেল, তা বলতে পারব না।

সে দৃশ্য এমনই বিস্ময়কর এবং মুগ্ধকর যে একমাত্র আয়েশা ছাড়া বাকী ক'জন বালিতে মুখ লুকিয়ে বসে পড়েছিলাম। একমাত্র আয়েশাই দু-হাত আগুনের দিকে বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল নিষ্কম্পদেহে, প্রদীপ্ত চোখে, দেবী-রূপিণী কায়ায়।

প্রাণঝর্ণা দূরে সরে যেতেই ধ্বনিত হল আয়েশার কণ্ঠস্বর।

'কালিক্রেটিস, সময় হয়েছে। মহা-অগ্নি এলেই এবার স্নান করবে আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে। জামাকাপড় খুলে নিও—নইলে পুড়ে যাবে। কিন্তু তোমার গায়ে আঁচটুকুও লাগবে না। ভয় কেটে গেলেই আগুনের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবে, নিঃশ্বাসের সাথে আগুন টেনে নেবে, বুক ভরে গ্রহণ করবে, হৃৎপিণ্ড ভরিয়ে তুলবে প্রাণঝর্ণার অমৃত ধারায়। সারা গা হাত-পায়ে মেখে নেবে—শরীরের প্রতিটি অংশ ঘিরে যেন আগুন নেচে নেচে লেহন করে যায়। অগ্নিপ্রসাদের কণামাত্রও যেন নষ্ট না হয়। বুঝেছো?'

'বুঝলাম। কিন্তু ভয় পাচ্ছি আগুনের চেহারা দেখে। কাপুরুষ আমি নই। কিন্তু সংশয় কাটছে না—এরকম চেহারার আগুন শেষ পর্যন্ত কি কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে, তা তো জানি না। যদি পুড়ে ছাই হয়ে যাই, তাহলে

তোমাকে তো হারাবো। তা সত্ত্বেও, বলছো যখন, দাঁড়াবো আগুনের মধ্যে।'

মিনিটখানেক তন্ময় হয়ে চিন্তা করে নিয়ে আয়েশা বললে—'এ সংশয় তোমাকে মানায় না। কিন্তু আমি নিজে আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি সংশয়মুক্ত করি তোমাকে, তাহলে তুমি আসবে তো আমার পাশে? দাঁড়াবে আগুনের মধ্যে?'

'নিশ্চয়। পুড়েও যদি যাই, তাহলেও যাবো।'

'তাহলে আমিও যাবো,' সোল্লাসে বলেছিলাম আমি।

'সেকী কথা!' হেসে উঠেছিল আয়েশা—'তুমি তো দীর্ঘদিন বাঁচতে চাও না। ব্যাপারটা কী?'

'চেখে দেখতে চাই আগুনের স্বাদ কি রকম—তারপরেই বেঁচে থেকে দেখতে চাই বাঁচার মতো বাঁচা কাকে বলে।'

'সাধু, সাধু! তবে তাই হোক। দ্বিতীয়বার দাঁড়াবো আগুনের মাঝে—দেখা যাক রূপ আর আয়ু আরো বাড়ে কিনা। নাও যদি বাড়ে, ক্ষতি তো হবে না। দাঁড়াবো আরো একটা কারণে—গভীরতর কারণে, প্রথমবার যখন নেয়ে উঠেছিলাম প্রাণঝর্ণার অগ্নিধারায়, তখন আমার অন্তর বিষিয়ে ছিল ঈর্ষা, ঘৃণা, বিদ্বেষে—মূল কিন্তু সেই মিশরীয় মেয়েটা—আমেনার্তাস। ফলে, ঈর্ষা, বিদ্বেষের স্থায়ী ছাপ পড়েছে আমার অন্তরে—দু-হাজার বছর ধরে চেষ্টা করেও তা মুছে ফেলতে পারিনি—জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এখন আমার মনে সুখ ছাড়া কিছুই নেই। বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে তাই আবার নেয়ে উঠব অগ্নিধারায়—মুছে যাক অতীতের ঈর্ষা, ঘৃণা, বিদ্বেষ—পবিত্র হোক অন্তর—যাতে আমার কাল্লিক্রেট্‌স্‌ রের পাশে দাঁড়ানোর যোগ্যতা পাই হাজার হাজার বছরের জন্যে। কাল্লিক্রেট্‌স্‌ তোমাকেও বলব, মনকে শুদ্ধ করে নিয়ে তবে ঢুকবে আগুনের মধ্যে। গ্লানি যেন না থাকে মনের মধ্যে—নীচতা, দীনতা বিসর্জন দাও হৃদয় থেকে—তাহলেই হাজার হাজার বছর বজায় থাকবে তেজোময় মনের জারসাম্য।

'প্রস্তুত হও। প্রস্তুত হও। মৃত্যুর তোরণ পেরিয়ে প্রবেশ করেছিলে এই ছায়ার দেশে—এবার প্রস্তুত হও গরিমা-তোরণ পেরিয়ে প্রাণ-লোকে প্রবেশের জন্যে! প্রস্তুত হও! প্রস্তুত হও! প্রস্তুত হও!'

(২৬) যা দেখলাম

ক্ষণেক নৈঃশব্দ্য। অগ্নি-প্রাকার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করছে আয়েশা। পরস্পরকে জাপটে ধরে দাঁড়িয়ে আমরা। নিস্তব্ধ। নিথর

অবশেষে বহুদূর থেকে ভেসে এল সেই শব্দ। প্রথমে অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি। বৃদ্ধি পেল একটু একটু করে। আবার সেই পাহাড়ের ওপর পাহাড় আছড়ে পড়ছে যেন অনেক দূরে, গুরুগম্ভীর নিনাদে যেন বিদীর্ণ হচ্ছে পর্বতজঠর। আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রবেগে পাতলা ওড়না নিক্ষেপ করল আয়েশা। কটিদেশের স্বর্ণ-বন্ধনী শিথিল করে দিয়ে মাথা ঝাঁকাতেই কৃষ্ণ কেশ পরিচ্ছদের মতো আবৃত করল সর্বঅঙ্গ। কালো চুলের তলদেশ থেকে পরিধেয় খুলে ফেলে দিলে পায়ের কাছে। কাঞ্চন কটি-বন্ধনী ফের এঁটে নিলে কোমরে সুদীর্ঘ কালো চুলের ওপর দিয়ে। দাঁড়িয়ে রইল নিরাবরণা আদিম মানবী ঈভ-য়ের মতো। গোড়ালী পর্যন্ত লুটিয়ে পড়া গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ-বরণ কেশ ছাড়া অন্যাবরণ বলতে রইল না কিছুই।

পাহাড়ের ওপর পাহাড় আছড়ানোর, প্রচণ্ড ঝড়ে মড়মড় করে বিশাল বনস্পতির পর বনস্পতি উপড়ে পড়ার, দীর্ঘ ঘাসছাওয়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধেয়ে যাওয়া মাতাল হাওয়ার হুহুংকারের মত অবর্ণনীয় শব্দনিচয় কিন্তু এগিয়ে আসছে তো আসছেই। লক্ষ লক্ষ বজ্র মুহুর্মুহু গজরে উঠছে, মেদিনী পৃষ্ঠে যেন আছড়ে পড়ছে, প্রলয়ংকর রুদ্রনৃত্যে উন্মত্ত হয়ে এগিয়ে আসছে··· আসছে···আসছে। তারপরেই দেখা গেল প্রখর দ্যুতি। আলোর ঝলক। অগ্নিস্তম্ভের প্রথম নিশানা। ঘন ঘন আলোর তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে গোলাপী শূন্যতার মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত আগুনের থাম থেকে। প্রথমে দেখা গেল এই ছিটকে ছিটকে যাওয়া আলোর তীর, তারপরেই আবির্ভূত হল স্তম্ভের প্রান্তদেশ। ঘুরে দাঁড়াল আয়েশা সেইদিকে মুখ করে। দু-পাশে হাত ছড়িয়ে সাদরে আহ্বান জানালো মহাকায় মহাভয়ংকর অথচ অতি সুন্দর প্রাণঝর্ণাকে। পাক-খাওয়া আগুনের থাম কিন্তু এগিয়ে এল ধীরগতিতে— আস্তে আস্তে লেপটে ধরলে আয়েশার সর্বাঙ্গ। লকলকে শিখায় শিখায় ঢেকে গেল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। পরম আদরে সর্বাঙ্গ যেন চুম্বন করে যাচ্ছে লেলিহান অগ্নিশিখা। আয়েশাও পরমানন্দে পরম আবেশে আগুনের পরশ বুলিয়ে নিচ্ছে সারা গায়ে, আঁজলা ভরে আগুন নিয়ে ঢালছে মাথায় গায়ে, হাঁ করে নাক মুখ দিয়ে আগুন টেনে নিয়ে উদ্দীপ্ত করছে ফুসফুসকে। ভয়াবহ অথচ বিস্ময়াবহ সেই দৃশ্যের ছবি আমার বিস্ফারিত দুই চক্ষুর মধ্যে দিয়ে মনের পটে আঁকা হয়ে গেছে স্থায়ীভাবে—মৃত্যু পর্যন্ত থাকবে অম্লান।

ওর অকস্মাৎ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যটা উজ্জ্বলতম ছবি হয়ে রয়েছে মানসপটে। আগুনস্নানে পরিতৃপ্ত। দাঁড়িয়ে গিয়ে দু-বাহু বাড়িয়ে

দিয়েছে আমাদের দিকে। অধরোষ্ঠে খেলা করছে স্বর্গীয় হাসি। দৈবীশক্তি উপচে পড়ছে চোখে মুখে। যেন স্বয়ং অগ্নিদেবী।

আয়েশা অপরূপা, সে কথা হাজারবার বলেছি এই উপাখ্যানে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার যে আগুন-কন্যা রূপ দেখেছিলাম, তার বর্ণনা দিই কি করে? দেবলোক থেকে অপ্সরী অবতীর্ণ হয়ে পাশে দাঁড়ালেও অত সুন্দরী মনে হত না আয়েশার রূপের তুলনায়। এত লাবণ্য এত সুষমা ত্রিভুবনে কারো অঙ্গে নেই। মনের মধ্যে ছবিটাকে কল্পনা করতে গিয়েও অসাড় হয়ে আসছে আমার হৃৎপিণ্ড। যে-কটা বছর বাঁচব, তার অর্ধেক বিলিয়ে দিতে পারি আর একবার সেই রূপসুধা পানের বিনিময়ে।

আচমকা এল একটা পরিবর্তন এই অমর্ত্য রূপরাশির ওপর। এল এত অতর্কিতে যে ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অবর্ণনীয় একটা পরিবর্তনে সহসা আচ্ছন্ন হয়ে গেল অলোকসাধারণ মুখাবয়ব। পরিবর্তনটা যে আদতে কী, তার ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিতেও অপারগ আমার এই দুর্বল লেখনী। শুধু বলব, বিচিত্র একটা পরিবর্তনে আচমকা ছেয়ে গেল সুন্দর মুখটা। মিলিয়ে গেল হাসি, সে জায়গায় আবির্ভূত হল শুষ্ক, কঠোরতা! পলকে পলকে বেড়েই চলেছে রুক্ষ কাঠিন্য। সুগোল সুডৌল মুখশ্রী সহসা সহস্র উদ্বেগের চিন্তারেখায় আবিল হয়ে উঠল চোখের সামনেই—বিপুল উৎকণ্ঠার অভিব্যক্তি ঘটছে মুখের পরতে পরতে। নিষ্প্রভ হয়ে এল হীরক-উজ্জ্বল দুই চক্ষু, লালায়িত ভঙ্গিমা তিরোহিত হল ঋজু দেহ থেকে।

দু চোখ রগড়ে ফের তাকিয়েছিলাম। আলোর ঝলকানিতে চোখে ধাঁধা লেগেছে ভেবেছিলাম, অত্যুগ্র দীপ্তি দৃষ্টিভ্রান্তি ঘটিয়েছে মনে করেছিলাম। চোখ থেকে হাত সরাতেই দেখেছিলাম, নিনাদিত অগ্নিস্তম্ভ গুরুগম্ভীর শব্দে ধীরে ধীরে পাক খেতে খেতে আয়েশার ওপর থেকে সরে গিয়ে উধাও হয়ে গেল ধরিত্রী মায়ের মহাপাতালের অজানা কন্দরে—আজও জানি না কোথা থেকে তার আবির্ভাব—কোথায় আছে সেই রহস্যময় কন্দর—প্রাণঝর্ণার উৎস।

আগুন আর নেই। রয়েছে শুধু গোলাপী প্রভা। তারই মাঝে একাকিনী দাঁড়িয়ে আয়েশা।

পরমুহূর্তেই পা বাড়িয়েছিল আয়েশা। এগিয়ে এসেছিল লিওর দিকে—কাঁধে হাত রাখার অভিপ্রায়ে। বিমূঢ় চাহনি মেলে আমি কিন্তু লক্ষ্য করেছিলাম, পদক্ষেপ আর আগের মতো দৃপ্ত নয়। বিস্ফারিত চাহনি নিক্ষেপ করেছিলাম আয়েশার বাহুর ওপর। একী! বাহুও তো আর আগের মতো

সুডৌল সুন্দর নয়! শীর্ণ অস্থিসার হয়ে আসছে চোখের সামনেই! সবেগে চাহনি নিক্ষেপ করেছিলাম তুলনাহীন মুখখানির দিকে। হায় ভগবান! একী দেখছি! হু-হু করে জরার ছাপ পড়ছে মুখে…বুড়িয়ে যাচ্ছে মুখ আমার চোখের সামনেই! দৃশ্যটা লিও-রও চোখ এড়োয়নি নিশ্চয়, পেছিয়ে গিয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

'কি হল কাল্লিক্রেট্‌স্?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল আয়েশা। যুগপৎ বিস্ময় এবং আতংক অসাড় করে তুলেছিল আমার স্নায়ুতন্ত্র। আয়েশার কণ্ঠে কোথায় সেই স্বরমাধুর্য? কোথায় সেই রজতনূপুর নিক্কণ? কোথায় সেই রোমাঞ্চ জাগানো সুগভীর ঝঙ্কার? এ রকম চড়া, কর্কশ, ভাঙা স্বর তো ওর কণ্ঠে কখনো শুনিনি!

বিমূঢ় হয়েছিল আয়েশা নিজেও—'কি হল বলো তো কাল্লিক্রেট্‌স্? চোখে ধোঁয়া দেখছি কেন? আগুনের ধর্ম কি আর নেই আগের মতো? প্রাণের সূত্র কি পালটায় কখনো? কাল্লিক্রেট্‌স্! কাল্লিক্রেট্‌স্! বলো! বলো! চুপ করে থেকো না! কি হয়েছে আমার চোখে? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না কেন?' বলতে বলতে দু-হাতে মাথা চেপে ধরেছিল আয়েশা—সেই সঙ্গে চুল। কী ভয়ংকর! স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে চুলের রাশ খসে পড়েছিল মেঝেতে!

ভাঙা গলায় বিকট চেঁচিয়ে উঠেছিল জব। মহা আতংকে যেন ছিঁড়ে দু-টুকরো হয়ে গিয়েছিল বাক্‌যন্ত্র। কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল অক্ষিগোলক। ফেণা গড়িয়ে পড়েছিল কষ বেয়ে।

'দেখেছেন?…দেখেছেন?…দেখেছেন?…দেখেছেন?…দেখেছেন? দেখেছেন?…'বিরামবিহীন ভয়ার্ত চিৎকারের অবসান ঘটেছিল কলজে-ছেঁড়া ভয়াবহ আর্তনাদে—'শুকিয়ে, কুঁচকে, ছোট্ট হয়ে যাচ্ছে যে মেয়েটা!'

ব্যস! এর বেশী আর চেঁচাতে পারেনি জব। দেহ এবং মনের সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়ে অকল্পনীয় দৃশ্যটাকে ভাষায় প্রকাশ করেই লুটিয়ে পড়েছিল মেঝেতে। প্রবল খেঁচুনির ফলে গাঁজলা বেরিয়ে এসেছিল মুখ দিয়ে।

মিথ্যে বলেনি জব। লিখতে গিয়ে এখনও হাত কাঁপছে থর থর করে। সত্যি সত্যিই গুটিয়ে কুঁচকে ছোট্ট হয়ে যাচ্ছে আয়েশা। সোনার কটিবন্ধনী ঢিলে হয়ে নিতম্বর ওপর দিয়ে পিছলে গিয়ে খটাস করে পড়ে গেল পায়ের কাছে। তবুও কিন্তু বিরাম নেই ছোট হয়ে যাওয়ার। ক্ষুদ্রতর হচ্ছে আয়েশা। সেইসঙ্গে পালটে যাচ্ছে গায়ের রঙ। ধবধবে সাদা চেকনাই

তিরোহিত হয়ে সে জায়গায় দেখা যাচ্ছে নোংরা বাদামী আর হলদেটে চামড়া—ঠিক যেন কালজীর্ণ বিবর্ণ শুষ্ক পার্চমেন্ট কাগজ।—মাথায় হাত ছোঁয়ালো আয়েশা। শিউরে উঠলাম হাতের চেহারা দেখে। মৃণালভুজ আর তাকে বলা যায় না—এ-বাহু এখন মিশরীয় মমীর বাহু। সুরক্ষিত না থাকলে মমীর আঙুল বেঁকে যায়, শকুনির নখরযুক্ত থাবার মতো দেখায়। আয়েশার হাত এখন তাই। কি ধরনের পরিবর্তনের ঢেউ মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ছে সর্বাঙ্গে, এতক্ষণে তা হৃদয়ঙ্গম করে এবার আয়েশা হাহাকার করে উঠল আতীক্ষ্ণ কণ্ঠে। একবার…দুবার…বার বার! পাকসাট খেয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। অব্যাহত রইল কিন্তু বিষম চিৎকার! তীক্ষ্ণ, তীব্র, কর্কশ উচ্চনিনাদী বিলাপ ধ্বনিতে যেন চৌচির হয়ে গেল পাতালবিবর!

অসাড় মস্তিষ্ক আমারও। দেহ নিস্পন্দ। ভুলে গেছি চোখের পাতা ফেলতে। শুধু দেখছি, আরো ছোট হয়ে যাচ্ছে আয়েশা। যতি নেই, বিরতি নেই, পলকে পলকে ছোট্ট হয়ে আসছে আয়েশার বরতনু। অবশেষে সমাপ্ত হল ছোট হওয়া। তখন সে আকারে বানর সমান। লক্ষ লক্ষ কুঞ্চন দেখা দিয়েছে চামড়ায়। বিকৃত মুখে অবর্ণনীয় বয়সের ছাপ। এরকম চেহারা আমি কখনো দেখিনি। বিশ্বের কেউ দেখেনি। ভয়াবহ মুখাবয়বে করাল মহাকাল ভয়াল কবর রচনা করেছে চামড়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আকারে দেহটা এখন মাস দুয়েকের শিশুর মতো। করোটির আকার আয়তন প্রায় আগের মতোই।

আস্তে আস্তে স্তব্ধ হল আর্ত চিৎকার, প্রায় নিথর হয়ে এল পাকসাট খাওয়া দেহটা। চোখ বড় বড় করে তখনও তাকিয়েছিলাম বলেই দেখতে পেলাম, একেবারে নিস্পন্দ হয়নি আয়েশার দেহ। কাঁপছে থির থির করে —হাওয়ায় গাছের পাতার মতো। সেই আয়েশা—যার মতো লাবণ্যবতী, যার মতো গরবিনী, যার মতো সৌন্দর্যবতী নারী আর কখনো দেখিনি—আমাদের পায়ের কাছে পড়ে তার প্রায়-নিস্পন্দ গুটিসুটি পাকানো দেহবল্লরী —পাশেই পড়ে তারই স্তূপাকার মেঘবরণ চুল। কিন্তু আকার আয়তনে এখন সে বৃহৎ বাঁদরী ছাড়া কিছুই নয়—অতিশয় কদাকার বানরী—কি পরিমাণ কুৎসিত, তা ভাষায় প্রকাশ করাও দুঃসাধ্য! অথচ এই সেই নারী—সেই একই নারী—অপরূপা অলোকসামান্যা সেই-নারী-যাঁর-আদেশ-মানতেই-হতো একদা এ তল্লাটের আপামর জনসাধারণকে!

দেখলাম মারা যাচ্ছে আয়েশা। প্রণতি জানিয়েছিলাম পরমকারুণিককে। জীবিত যদি থাকত, বাঁচত কি নিয়ে? অস্থিসার বাহুতে ভর দিয়ে কদর্য

দেহটা ঈষৎ উত্থিত করে অন্ধের মতো চারপাশে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ—কচ্ছপের মতো মাথা দোল খেয়েছিল একপাশ থেকে আরেক পাশে। দেখতে পাচ্ছে না তা বুঝলাম চোখের অবস্থা দেখে। শ্বেত চক্ষুর ওপর গজিয়ে উঠেছে শক্ত আঁশের মতো আস্তরণ। বিলুপ্ত হয়েছে দৃষ্টিশক্তি! কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর! মানুষের চোখের এহেন অবস্থা যে অতিবড় দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না! চোখে দৃষ্টি না থাকলেও বাক্‌শক্তি তখনো যায় নি।

বললে কর্কশ কাঁপা গলায়—'কাল্লিক্রেট্‌স্! ভুলো না আমাকে। কাল্লিক্রেট্‌স্, আমার মৃত্যু নেই, আবার ফিরে আসব, আবার সুন্দরী হব। কথা দিচ্ছি, কাল্লিক্রেট্‌স্, আ-বা-র ফিরে আসব। সত্যি! সত্যি! সত্যি! আ-আ-আ—!'

মুখ থুবড়ে পড়েই নিস্পন্দ হয়ে গেল আয়েশা।

বিশ শতাব্দী আগে ঠিক যে জায়গাটায় পুরোহিত কাল্লিক্রেট্‌স্‌কে হত্যা করেছিল আয়েশা, নিজেই মুখ থুবড়ে পড়ল সেখানে এবং প্রাণ বিয়োগ ঘটল তৎক্ষণাৎ।

স্নায়ু আর সইতে পারেনি। নিঃসীম আতংক প্রায় মেরে এনেছিল আমাদেরও। বালি-ছাওয়া মেঝের ওপর আছড়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিলাম দুজনেই।

জানি না কতক্ষণ পড়েছিলাম এইভাবে। বেশ কয়েক ঘণ্টা নিঃসন্দেহে। চোখ মেলে দেখেছিলাম হাত পা ছড়িয়ে লিও আর জব পড়ে রয়েছে পাশেই। স্বর্গলোকের উষালগ্নের মতো ফিকে গোলাপী প্রভায় ঝিলমিল করছে গুহা-গহ্বর। চিরাচরিত পথে চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে প্রাণঝর্ণার বজ্র-চক্র। জ্ঞান ফিরে পেয়েই দেখেছিলাম দূরে সরে যাচ্ছে সুবিশাল অগ্নিস্তম্ভ। কদাকার আকৃতটাও পড়ে রয়েছে পাশে। কুঞ্চিত হলদেটে পার্চমেণ্ট কাগজে মোড়া একটা অতি-কুৎসিত কাঠামো। দুঃস্বপ্ন মনে হলেও মর্মান্তিক সত্য! মোহনী অপরূপা 'সেই-নারী যাঁর-আদেশ-মানতেই-হবে'র দেহপিঞ্জর ছিল এই আকৃতি কিছুক্ষণ আগেও!

কিন্তু কলজে-কাঁপানো এ-হেন পরিবর্তনটা ঘটল কি ভাবে? প্রাণের সিঞ্চন ঘটিয়ে এসেছে যে অগ্নিঝর্ণা এতকাল ধরে, পালটে গেল কি তার ধর্ম? স্বভাব? প্রকৃতি? মাঝে মাঝে কি এইভাবেই প্রাণ-সার বর্ষণ না করে মৃত্যু-সার বর্ষণ করে যায় অত্যাশ্চর্য এই অগ্নিস্তম্ভ? এমনও তো হতে পারে প্রাণশক্তিতে সম্পৃক্ত ছিল আয়েশার দেহ, দ্বিতীয়বার প্রাণঝর্ণার সংস্পর্শে আসায় প্রাণস্ফূর্তি আর সয়নি? উবল ভোজ বিপরীত ক্রিয়া ঘটিয়েছে?

প্রথমবারের চমকপ্রদ প্রাণশক্তিকে নিস্তেজ করে দিয়েছে দ্বিতীয়বারের প্রাণশক্তি—হাজার হাজার বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও? হ্যাঁ, ঠিক তাই। এ ছাড়া আয়েশার অকস্মাৎ এবং ভয়াবহ পরিবর্তনের আর কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। সুদীর্ঘ দুটি হাজার বছরের পুরো প্রতিক্রিয়া নিমেষে কার্যকরী হয়েছে দেহযন্ত্রের ওপর—ঠেকিয়ে রাখা জরা মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রাস করেছে সুদীর্ঘকালজয়ী নশ্বর অণুপরমাণুকে। বিশ শতাব্দী ধরে কোনো নারীকে যদি অসাধারণ কোনো প্রক্রিয়ায় সজীব রাখা যায়, বিশ শতাব্দী বয়স হওয়ার পর তার মৃত্যু ঘটলে কলেবরের পরিণতি যে এই রকমটা দাঁড়াবে, সে বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় নেই আমার মনের মধ্যে।

কিন্তু এ তো গেল আমার মনগড়া ব্যাখ্যা। আসলে কি ঘটেছে, তা কেউ জানে না, কেউ জানে না। তামাম দুনিয়া জুড়ে দু-হাজার বছর ধরে কত পরিবর্তনই তো ঘটেছে, আয়েশা কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেনি। সজীব সমাধির মধ্যে নিজেকে বন্দিনী করে রেখেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। অমর যৌবন, দেবদুর্লভ রূপ, শতাব্দীসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার দিয়ে এই আয়েশাই কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারতো সমাজ ব্যবস্থায়, এমন কি মানব জাতটার চরম নিয়তিকেও পালটে দিতে পারত। চিরন্তন কানুনের প্রতিকূলে গেছিল সে, বাধা দিয়েছিল আবহমান কালের নিয়মকে—অসীম শক্তিমতী হয়েও ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীতে আবদ্ধ রেখেছিল নিজেকে। তাই বিলীন হয়ে যেতে হল নিমেষমধ্যে—নিরতিসীম লাঞ্ছনা, ধিক্কার আর কদর্য উপহাসের মধ্যে দিয়ে! নিষ্ঠুর মহাকাল এক আছাড়েই তাকে পাঠিয়ে দিলে যেখানে তার থাকার কথা—সেখানেই। সব অহংকারের শেষ—যেখানে—সেখানেই।

মিনিট কয়েক এই সব ভয়াল ভয়ংকর সম্ভাবনাময় আবিল চিন্তাধারায় আকুল হয়েছিলাম। সেই ফাঁকে অবশ দেহের লুপ্ত শক্তি একটু একটু করে ফিরে এসেছিল প্রাণোচ্ছল ফূর্তিউচ্ছল পরিবেশে। সঙ্গীদের কথা মনে পড়তেই টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম তাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার অভিলাষে। তার আগে অবশ্য ফিনফিনে অঙ্গাবরণ আর ওড়না কুড়িয়ে নিয়ে ঝটিতি ঢেকে দিয়েছিলাম ভয়াবহ আকৃতিটা। একদা এই ওড়না দিয়েই ভুবনমোহন রূপরাশি আবৃত করে রাখত আয়েশা—যে-রূপ পুরুষের মস্তিষ্ক বিকৃত করে দেয়—তা ঢেকে রাখত অসীম যত্নে। সেই ওড়না দিয়েই তাড়াতাড়ি ঢেকে দিলাম কদাকার মুখাবয়ব—নিজেও তাকাতে পারলাম না সেদিকে। পাছে লিও দেখে ফ্যালে, তাই ওর জ্ঞান ফেরার আগেই দৃষ্টিপথের আড়ালে রেখে দিলাম বিকট আকৃতিটাকে।

সুরভিত কালো চুল স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল পাশেই বালির ওপর। ডিঙে গেলাম। মুখ থুবড়ে পড়েছিল জব। শোয়ালাম চিৎ করে। হাতটা শিথিলভাবে এলিয়ে পড়তেই সন্দেহ হয়েছিল। চকিতে তীক্ষ্ণ চাহনি নিক্ষেপ করেছিলাম মুখে। আর কোনো সন্দেহ রইল না। মারা গেছে জব। উপর্যুপরি বহু আতংক বেচারা সয়েছে। হৃৎপিণ্ডের অবস্থা কাহিল হয়ে এসেছিল আগেই। শেষের এই ভয়াল দৃশ্য আর সহ্য হয়নি। নিদারুণ আতংকে শূন্য হয়েছে প্রাণপিঞ্জর। মুখের দিকে তাকিয়েই তা বুঝলাম। আতংক-বিকট সে মুখচ্ছবির বর্ণনা আর দিতে চাই না।

ফিরলাম লিও-র দিকে। মারা যায়নি—অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। জ্ঞান ফিরে এল অল্প আয়াসেই। উঠে বসল। আরেকটা ভয়াবহ ব্যাপার লক্ষ্য করলাম তখনি। লিও-র চুল বরাবরই লালচে সোনালী। কিন্তু এখন তা ধূসর হয়ে যাচ্ছে। সাদাটে হয়ে আসছে। খোলা হাওয়ায় বেরোনোর পর দেখেছিলাম, একেবারেই সাদা হয়ে গেছে। তুষারশুভ্র। বয়সও বেড়ে গেছে যেন বিশ বছর।

মাথা একটু পরিষ্কার হওয়ার পর এবং বীভৎস স্মৃতি মনের মধ্যে জাগরূক হওয়ার পর শুধিয়েছিল শূন্যগর্ভ নিষ্প্রাণ স্বরে—'করণীয় কি এখন?'

অগ্নিস্তম্ভ আবার বজ্রনাদে সামনে এসে গেছিল ঠিক সেই সময়ে। আঙুল তুলে দেখিয়ে বলেছিলাম—'যদি মন চায়, ঢুকতে পারো ভেতরে। নইলে চেষ্টা করে দেখা যাক বাইরে বেরোতে পারি কিনা।'

অস্ফুট হেসেছিল লিও। বলেছিল—'গেলে যদি মৃত্যু হয়, তাহলে ঢুকতে পারি। দোষটা আমারই। আমি দ্বিধায় না পড়লে এ ঘটনা ঘটত না। আমার মনে সন্দেহ দেখা না দিলে, আয়েশা অগ্নিপ্রবেশ করত না আমাকে দ্বিধামুক্ত করার জন্যে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ঠিক ঐ রকমটি নাও ঘটতে পারে। অমর হয়ে যেতে পারি। আমি তা চাই না। দু হাজার বছর ধরে তার পথ চেয়ে বসে থাকতে চাই না। মরতে চাই যথাসময়ে—তার বেশী দেরীও নেই। মরে মিলিত হতে চাই তার সঙ্গে। যা খুশী করো, যেখানে খুশী নিয়ে চলো। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। যদি মন চায়, ঢুকতে পারো আগুনে।'

কিন্তু আমার উৎসাহে তখন ভাঁটা পড়েছে, আয়ুকে টেনে লম্বা করার কোনো ইচ্ছাই আর নেই। তাছাড়া, আগুনের স্বরূপ যখন জানা নেই, কপালে কি ঘটবে, তাও আঁচ করতে পারছি না। আয়েশার পরিণতিটাও মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কেন যে এমন হল, তাও অজ্ঞাত।

কাজেই বললাম—'বাবা লিও, ঐ দুজনের যা অবস্থা হয়েছে, এখানে থাকলে সেই একই হাল হবে আমাদেরও।' আঙুলে তুলে দেখালাম জবের আড়ষ্ট দেহ আর সাদা কাপড় ঢাকা আয়েশার দেহ—'চলো, পালাই। কিন্তু লণ্ঠনে আর তেল নেই মনে হচ্ছে।' বলে তুলে নিয়েছিলাম একটা লণ্ঠন। ভুল নেই অনুমানে।

উদাসীন স্বরে লিও বলেছিল—'তেলের পাত্রে এখনো একটু থাকতে পারে—যদি ভেঙে গিয়ে না থাকে।'

তেল ছিল পাত্রে। কাঁপা হাতে ঢেলে নিয়েছিলাম। কপাল ভালো, পলতে পুড়ে শেষ হয়ে যায়নি। তেল ভরবার সময়ে আবার বজ্রনাদে আবির্ভূত হয়েছিল অগ্নিস্তম্ভ ঘুরপাক খেতে খেতে। শেষ নেই, শেষ নেই এর আবর্তনের। যদ্দুর মনে হয়, একই চক্রাকার পথে বারবার ঘুরে আসছে একই অগ্নিস্তম্ভ।

নির্নিমেষে চেয়েছিল লিও। বললে—'আর তো জীবনে দেখা হবে না। আর একবার দেখে যাওয়া যাক।'

অগত্যা অলস কৌতূহলে কালক্ষেপ করলাম কিছুক্ষণ। অক্ষরেখার চতুর্দিকে পাক খেয়ে আর গুরুগুরু গুমগুম নিনাদে গুহা-গহ্বর প্রকম্পিত করে, লেলিহান অগ্নিশিখার শায়ক নিক্ষেপ করতে করতে আবার আবির্ভূত হল অগ্নিস্তম্ভ, ধীরগতিতে বজ্রচাকার রাজকীয় মহিমায় গড়িয়ে গেল সামনে দিয়ে ঘূর্ণমান আকারে। জানি না কত হাজার বছর ধরে ধরণীর জঠরে চলছে এই কাণ্ড, চলবে কত হাজার বছর, জানি না মরজগতের কোনো চক্ষু এই দৃশ্য আদৌ আর দেখতে পাবে কিনা, বিস্ময়ে রোমাঞ্চে আতংকে মোহাবেশে অভিভূত হবে কিনা—দূরায়ত গুঞ্জনধ্বনির ক্রমবর্ধিত গুরুগম্ভীর নিনাদ শ্রবণ করে কখনো শিহরিত হবে কিনা। অপার্থিব এই মহান্ দৃশ্য দেখে গেলাম আমরাই শেষবারের মত—আর কেউ আসবে না আমাদের পরে··· কেউ না···কেউ না···কেউ না।

একটু পরেই দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল লক্ষ বজ্রের ধ্বনি, পাহাড়ে পাহাড় আছড়ানোর শব্দ, মিলিয়ে গেল আলোক-শায়ক এবং প্রখর দীপ্তি।

পেছন ফিরে রওনা হলাম আমি এবং লিও।

(২৭) লাফ দিলাম

গুহার পর গুহা পেরিয়ে এলাম নির্বিঘ্নে। শংকুর ঢালু অঞ্চলে পা দেওয়ার পর দুটো অসুবিধের সম্মুখীন হলাম। প্রথম অসুবিধেটা ঢালু পাথর বেয়ে ওঠার ঝকমারি। প্রাণ বেরিয়ে যায় আর কী। দ্বিতীয় অসুবিধেটা

পথ চিনে নেওয়ার ঝামেলা। রাশি রাশি গোলপাথর ছড়ানো চারিদিকে। নিবিড় অন্ধকারে টিমটিমে আলোয় কতটুকুই বা আর দেখা যায়। ভাগ্যিস নিচে নামবার সময়ে কৌতূহলবশে রাক্ষুসে মুগুর মতো গোলপাথরগুলো দেখতে দেখতে নেমেছিলাম। ঐ স্মৃতিটুকুই সম্বল করে হাঁচড়পাঁচড় করে উঠতে লাগলাম বটে, কিন্তু মনের মধ্যে খুব একটা উৎসাহ বা জোর পেলাম না কেউই। নিঝুম মেরে রয়েছি দুজনেই। কথা বলার স্পৃহা নেই একেবারেই। একবার তো একটা বিরাট ফাটলের মধ্যে আর একটু হলেই পড়ে পা ভেঙে ফেলতাম। নৈরাশ্য আর অবসাদে অবস্থা আরো শোচনীয়। মরা আগ্নেয়গিরির এই জঠর থেকে জীবনে আর কোনোদিন বেরোতে পারব না—দুঃসহ এই চিন্তাটাই কেড়ে নিয়েছিল মনের সব শক্তি। পাথর চিনে চিনে এগোলেও পথ ভুল করলাম বহুবার। ঘন্টা তিন-চার এইভাবে দিশেহারা হয়ে পাহাড় বেয়ে উঠেছিলাম বলেই মনে হয়। ঘড়ি ছিল না সঙ্গে। সঠিক সময়ের হিসেব রাখতে পারিনি। সহায় একমাত্র সহজাত অনুভূতি। শেষের দুঘন্টায় একেবারেই পথ হারালাম। নিঃসীম তমিস্রায় মনে হল নিশ্চয় পাশের কোনো শংকু পর্বতের ফানেলে ঢুকে পড়েছি। হঠাৎ একটা পাথর দেখে খেয়াল হল, এ পাথর তো নামবার সময়ে দেখেছি। পাথরটার পাশ দিয়ে ডানদিকে সোজা চলে গিয়েছিলাম একটু আগেই। হঠাৎ কেন জানি চেয়েছিলাম পেছনে—স্রেফ কপালজোর। দেখেই খটকা লেগেছিল। পেছিয়ে গিয়ে দেখি এই সেই বিদঘুটে পাথর যা নামবার সময়ে দেখেছিলাম এবং অবাক হয়েছিলাম। তখন দেখেছিলাম ওপর থেকে। এখন দেখলাম পাশ থেকে। বেশ বড় পাথর বলেই প্রথমবার চিনতে পারিনি। দৈব সহায় না হলে এই পাথরকেই পাশ কাটিয়ে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসব কেন? মুক্তি পেলাম স্রেফ এই পাথরটার দৌলতেই।

আর বেশী মেহনৎ করতে হয়নি। খোঁচা খোঁচা পাথর বার করা প্রাকৃতিক সিঁড়ির সন্ধানও পেয়ে গেলাম একটু পরে। ফিরে এলাম ওপরকার সেই পাথর-ঘরে—যে-ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে দার্শনিক তাপস নূট।

ভয়াবহ চিন্তাটা পেয়ে বসল এর পরেই। তক্তা তো নেই। জব এমন নাড়িয়েছিল খাদ পেরোনোর সময়ে বসে বসে থপথপিয়ে আসতে গিয়ে, তক্তা ঠিকরে গেছে খাদের তলায়। বিশাল গোল পাথরের কিনারা থেকে প্রায় এগারো বারো ফুট ব্যবধান টপকে ওদিকের সরু পাথরের চাতালে পৌঁছোই কি করে? লাফিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই। কিন্তু চল্লিশের ওপর বয়স আমার। দেহে মনে ক্লান্ত। আমার পক্ষে তো সম্ভব হবে না। লিও

পারবে। কম বয়স। খেলাধুলোয় বেশ নামও করেছে। কলেজ জীবনে বিশ ফুট লাফিয়ে পার হয়ে যেতে দেখেছি।

সমাধান বাৎলে দিল লিও। আগে লাফাবো আমি। বড়বড়ে গোল পাথরের ভারসাম্য বজায় রাখবে সে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে।

লাফাবার আগে লিওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিলাম কপালে। ছোট-বেলায় এমন চুমু খেয়েছি বহুবার—বড় হয়ে এই প্রথম এবং এই শেষ। কারণটা মনে মনে তো জানি, বড় জোর আর মিনিট দুই আমার আয়ু। আদরের লিওর সঙ্গে ইহলোকে আর আমার দেখা হবে না।

খাদের ধার থেকে বেশ খানিকটা পেছিয়ে এসেছিলাম। হু-হু হাওয়া যাতে পেছন থেকে ঠেলা মেরে ছিটকে দেয় শূন্যের মধ্যে দিয়ে, সেই সুযোগের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর দমকা হাওয়া গোঁ-গোঁ করে আছড়ে পড়তেই তীরবেগে দৌড়ে গিয়েছিলাম তেত্রিশ চৌত্রিশ ফুট—কিনারায় পৌঁছেই সর্বশক্তি দিয়ে লাফ মেরেছিলাম এগারো বারো ফুট দূরের চাতাল লক্ষ্য করে। হাওয়ার ঠেলায় যতই সুবিধেই হোক না কেন, চাতালের কাছাকাছি পৌঁছেই বুঝলাম সর্বনাশ হয়েছে। পা আর পৌঁছোবে না চাতালে। হাত আর দেহটা আছড়ে পড়তেই দু-হাতে একটা খোঁচা খামচে ধরে আর্তনাদ করে উঠেছিলাম বিকট গলায়। স্রেফ হাতের জোরে ঝুলে ছিলাম খোঁচা ধরে—শরীরটাকে টেনে তোলার ক্ষমতাও আর ছিল না। বেশ বুঝলাম, বড় জোর মিনিটখানেক ঝুলে থাকতে পারব এইভাবে—তারপর তলিয়ে যেতে হবে নিতল গহ্বরের অন্ধকারে। সেই আধমিনিটের ভয়াবহ চিন্তায় মস্তিষ্ক অসাড় হয়েছিল কতখানি, তা অনুমান করে নিতে বলব পাঠকপাঠিকাদের।

কানে ভেসে এসেছিল লিও-র ভীষণ চিৎকার। পরক্ষণেই দেখেছিলাম শূন্যপথে মাথার ওপর দিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে তার দেহ। পাহাড়ী ছাগলের মতোই বিরাট লাফ মেরে বারো ফুট ব্যবধান টপকে চাতালের বেশ খানিকটা ভেতরে ঢুকে ইচ্ছে করেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল লিও—পাছে পতনের বেগ সামলাতে না পেরে ছিটকে যায় খাদের মধ্যে। আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সরু ছুঁচোলো পাথরটা—আর একটু হলেই আমার আঙুল খসে পড়ত খোঁচা পাথরটা থেকে। একই সঙ্গে গুড়-গুড় গুম-গুম আওয়াজ শুনে ঘাড় কাৎ করে দেখেছিলাম, এত হাজার বছর পরে অবশেষে দার্শনিক নূট-রের পবিত্র আলয় এবং প্রাণঝর্ণার প্রবেশ-পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল মানুষের কাছে। বিরাট গোল পাথরটা হাওয়াতেই দুলছিল,

আমি লাফিয়ে আসায় আরো দুলে উঠেছিল, বিষম আতংকে সর্বশক্তি দিয়ে লিও প্রচণ্ড লাফ মারায় তা ভয়ানকভাবে টলমল করতে করতে গড়িয়ে গেল খাদের অন্ধকারে। কয়েক-শ টন ওজনের বিশাল পাথর আছড়াতে আছড়াতে কোথায় যে নেমে গেল ভগবান জানেন। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির গমগমে আওয়াজে মনে হল কানে তালা লেগে যাবে।

লিখতে অনেকটা সময় গেল বটে, কিন্তু এত ব্যাপার ঘটে গেল এক সেকেণ্ডের মধ্যেই। স্নায়ুকে স্থির রেখেছিলাম ঐ অবস্থায় কি করে, তা আমি নিজেই জানি না।

আচমকা লিওর দু হাত চেপে বসেছিল আমার কব্জিতে। শুয়ে পড়েছে চাতালে। দুহাতে খামচে ধরেছে আমার ডান কব্জি।

'কাকা, এলিয়ে দাও শরীর—খোঁচা ধরে থেকো না—ছেড়ে দাও! নইলে দুজনেই তলিয়ে যাবো।'

শান্ত সংযত স্বর লিওর। ধড়ে প্রাণ ফিরে এসেছিল আমার। ওর দুহাতের মধ্যে ডান কব্জি ছেড়ে দিয়ে ঝুলতে লাগলাম ভীষণ খাদের ওপরে। ভয়ংকর মুহূর্ত! লিও শক্তিমান পুরুষ নিঃসন্দেহে। কিন্তু পারবে কি আমাকে টেনে তুলতে?

সেকেণ্ড কয়েক ঝুলে থেকেছিলাম শূন্যে। নির্বাক দুজনেই। তারপরেই শুনেছিলাম লিওর বাহুর হাড় আর পেশীর পট্-পট্ মট্-মট্ শব্দ। আসুরিক শক্তিবলে একটু একটু করে টেনে তুলছে আমাকে। আমি তখন একেবারেই এলিয়ে দিয়েছি নিজেকে। দিয়েছিলাম বলেই বেঁচে গিয়েছিলাম। একটু পরেই হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেল চাতালের কিনারা। লিও কিন্তু ছাড়ল না। বুক পর্যন্ত টেনে তুলতেই চাড় মেরে নিজেই উঠে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম চাতালে। পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল লিও। বাতাসে যেভাবে গাছের পাতা কাঁপে থির থির করে, সেইভাবে কাঁপতে লাগল দুজনের দেহ। দর দর করে ঘাম ঝরতে লাগল সর্বাঙ্গে। হাঁপাতে লাগলাম হাপরের মতো।

আধঘন্টার মতো এইভাবে উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম দুজনে। তারপর উঠে পড়ে এগিয়েছিলাম সরু পাথর বেয়ে গুহামুখের দিকে। ঝোড়ো হাওয়ার কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু শুরু হয়েছিল নতুন বিপদ। নড়বড়ে গোল পাথর আছড়ে পড়ার সময়ে আমাদের লণ্ঠনও গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে তারার আলোটুকুই সম্বল। কিন্তু গুহার অন্ধকারে যাবো কি করে? মেঝে ভর্তি তো ফাটল, গর্ত আর রাশি রাশি

পাথর। গোদের ওপর বিষফোড়া, খাবার জল তো নেই। নুট-রের ঘরে শেষবারের মতো জল খেয়েছি। এতটা পথ তেষ্টা নিয়ে যাই কি করে? এই অন্ধকারের মধ্যে? বিপদসঙ্কুল মেঝের ওপর দিয়ে?

স্রেফ আন্দাজে হাতড়ে যেতে হয়েছিল গুহার মধ্যে দিয়ে। কতবার যে মুখ থুবড়ে পড়লাম, সারা হাত পা মুখ রক্তারক্তি হয়ে গেল, তার হিসেব নেই। জ্ঞান হারানোর মতোই ঘুমিয়েও পড়েছিলাম দুজনে—কত ঘন্টা সে খেয়ালও নেই। হাত বুলিয়ে বুঝেছিলাম রক্ত জমে গেছে চুলে, মুখে। রাস্তা হারিয়েছি মনে করে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। গুহার দেওয়াল ধরে অন্ধের মতো পথ চলেছি, উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এগিয়েছি। মৃত্যুর আর দেরী নেই জেনে কিন্তু নির্বিকার হয়ে গেছি। যতক্ষণ পারি দেখাই যাক না, তারপর না হয় পাথরের মধ্যে পড়ে থাকবে ক'খানা হাড়। এইভাবেই টলতে টলতে হুমড়ি খেতে খেতে অকস্মাৎ দেখেছিলাম দিনের আলো। প্রথম গুহামুখের মধ্যে দিয়ে আলো ঢুকছে। লিও তখন আর পারছে না। সারা মুখ রক্তে মাখামাখি। দুজনে দুজনকে ধরে হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে এসেছিলাম বাইরে। খোলা আকাশের তলায় ফুলের পাপড়ির মতো ঢালু পাথরের গোড়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল লিও। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম আরও পঞ্চাশ কি ষাট গজ। পাহাড়ের কিনারায় পৌঁছোতেই দেখেছিলাম একজন মূকবধির অবাক হয়ে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। অত ভোরে বোধহয় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিল, আমাদের দেখেই আঁৎকে উঠে ভোঁ দৌড় দিয়েছিল আরো দু-শ গজ দূরে। বাস্তবিকই আমাদের তখনকার বীভৎস আকৃতি দেখে মানুষ বলেই চেনাও কঠিন।

কপাল ভাল, বিল্লালিকে হন্ হন্ করে আসতে দেখলাম আমাদের দিকে। দূর থেকে চিনতে পারেনি। কাছে এসে ভীষণ অবাক হয়ে বলেছিল—'আরে বেবুন যে! সিংহ, তোমার চুল সাদা হল কি করে! একী অবস্থা হয়েছে তোমাদের? শূওরটা কোথায়? কোথায় 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ-মানতেই-হবে'?'

'মারা গেছে দুজনেই,' বলেছিলাম ক্ষীণকণ্ঠে—'আমরাও মারা যাব আপনার সামনেই যদি কথা না বাড়িয়ে এখুনি খাবার আর জল না দেন।'

'মারা গেছেন? অসম্ভব! 'সেই-নারী'র মৃত্যু নেই।' বলেই বিল্লালি সামলে নিয়েছিল নিজেকে একজন মূকবধির হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে। নিয়ে গিয়েছিল আমাদেরকে ওর সাময়িক ডেরায়। ভাগ্যক্রমে তখন সুকন্যা

রান্না হচ্ছিল। গরম গরম সুরুয়া নিজের হাতেও খেতে পারিনি—বিল্লালি খাইয়ে দিয়েছিল। মূকবধিরদের দিয়ে গায়ের রক্ত ময়লা সাফ করিয়ে দিয়েছিল। সুগন্ধি ঘাসের বিছানায় শুইয়ে দিতে না দিতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মড়ার মতো।

(২৮) পাহাড় পেরিয়ে

সর্বাঙ্গে পেটাই কার্পেটের মতো আড়ষ্ট অনুভূতি নিয়ে চোখ মেলে দেখেছিলাম চিন্তিত মুখে লম্বা সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বিল্লালি চেয়ে আছে আমার দিকে। লিও তখনো ঘুমোচ্ছে। মুখখানা থেঁৎলে যেন জেলি হয়ে গেছে।

শুনলাম ঘুমিয়েছি একটা দিন, একটা রাত।

'বেবুন, খুলে বলো কি হয়েছে। 'সেই-নারী' মারা গেছেন, এ-খবর যদি ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে আমাহাগ্গাররা তক্ষুনি গরম পাত্র চাপাবে তোমাদের মাথায়—হাড়গোড়গুলো খালি ফেলে রাখবে। ভীষণ রেগে আছে তোমাদের দুজনের ওপরেই। তোমাদের জন্যেই তাদের জাতভাইদের অমানুষিক নির্যাতন করে মেরেছেন 'সেই-নারী'। তিনি আর নেই শুনলে তোমাদেরও রক্ষে নেই।'

বিল্লালির পীড়াপিড়িতে বলতে হল সব কথাই—কিছু বাদসাদ দিয়ে। আয়েশার আসল পরিণতি কি হয়েছে, তা বললে তো বুঝবে না। তাই বললাম, সে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু বুড়োর ধূর্ত চোখ দেখেই বুঝলাম, কথাটা বিশ্বাস হয়নি। আয়েশা নাকি মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায় এমনিভাবে। বিল্লালির বাবার আমলে উধাও হয়ে গেছিল বারো বছরের জন্যে। তারও আগে শোনা যায়, নিপাত্তা ছিল পুরো এক পুরুষ। একটা মেয়ে রানীগিরি ফলিয়েছিল সেই সময়টা। আয়েশা আচমকা ফিরে এসেই খতম করেছিল তাকে। এ ঘটনা নাকি ঘটেছিল বেশ কয়েক-শ বছর আগে। শুনলাম বটে, কিন্তু একবর্ণও বিশ্বাস করলাম না। বিশ্বাস করাতেও চাইলাম না যে আয়েশা আর কোনো দিনই ফিরে আসবে না আমাহাগ্গারদের রানী হতে।

শুধু জানতে চাইলাম, কি ভাবে দেশে ফেরা যায়।

কাজটা খুবই কঠিন, জানালে বিল্লালি। চুপিসাড়ে বার করে নিয়ে যেতে হবে পাহাড়ের ওপর দিয়ে। গরু ছাগল চরানোর পথ একটা আছে সেখানে—আগেই বলেছিল বিল্লালি। ঘাসজমির পর পড়বে জলাভূমি। তিনদিন যাবে জলা পেরোতে। তারপর নাকি দিন সাতেক পরে পাওয়া যাবে একটা

বিরাট নদী। সেই নদী গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে। সঠিক জানে না বিল্লালি—শোনা কথা। জলাভূমি পার করে দিয়েই সে ফিরে আসবে—তারপর আর যেতে পারবে না। খুবই ঝুঁকির ব্যাপার যদিও—কিন্তু যেহেতু একদিন তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম আমি, তাই এ যাত্রায় আমার আর লিও-র প্রাণও সে বাঁচিয়ে দেবে। বাকীটা নির্ভর করছে আমাদের ভাগ্যের ওপর। 'কোর' এলাকায় যাতে নরখাদক আমাহাগ্গাররা আমাদের ফলার করে না বসে, তার জন্যেই বুড়ো বয়েসেও সঙ্গে যাবে। জলা ভূমি পেরিয়ে আবার ফিরে আসতে ছ-দিনের কষ্ট ভোগও করবে।

আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলাম, ফিরে এসে 'সেই-নারী' তার পুরস্কারও দেবে।

কথা রেখেছিল বিল্লালি। আমাদের বিশ্রাম নিতে বলে তক্ষুনি গিয়েছিল পাল্কী আর লোকজন আনতে। মাঝরাতে এল বেশ কিছু লোক আর পাল্কী। ভোর রাতে ফিরে এল বিল্লালি। পাল্কী বেহারাদের ভয় দেখিয়ে এনেছে। 'সেই-নারী'র হুকুম, গোপন পথ দিয়ে আমাদের তল্লাট পার করে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আর দেরী নয়। রওনা হতে হবে এখুনি।

সামান্য খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পাহাড়ের মাথা দিয়ে যাওয়ার সময়ে রাস্তা খারাপ বলে পাল্কী ছেড়ে দিয়ে হেঁটেছিলাম। ঘাস জমি আর জলা ভূমি পেরিয়ে এসে সজল চোখে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল বিল্লালি।

রিভলবার, এক্সপ্রেস রাইফেল, দু-শ কার্তুজ, কম্পাস আর জামাকাপড় নিয়ে আমরা রওনা হয়েছিলাম জামবেসি-র দিকে। অশেষ দুর্ভোগ সয়ে একশ সত্তর মাইল দক্ষিণে গিয়ে ছ-মাস বন্দী ছিলাম একদল অসভ্য জংলীর হাতে। লিও-র সাদা চুল অথচ তারুণ্যে ভরা মুখলাবণ্য দেখে ওরা ওকে মনে করেছিল অতি-প্রাকৃতিক জীব। ছ-মাস পরে পালাই দুজনে। অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখা পাই একজন দো-আঁসলা পর্তুগীজের। হাতীর দাঁত খুঁজতে এসেছিল জঙ্গলে। তারই কৃপায় অনেক কষ্ট সয়ে পৌঁছোই দেলাগোয়া উপসাগরে—'কোর' জলাভূমি থেকে বেরিয়ে আসার ঠিক আঠারো মাস পরে। পরের দিনই কপাল খুলে গেল। একটা স্টীম বোট যাচ্ছিল ইংলণ্ডে। উঠে বসলাম জাহাজে। হাস্যকর অথচ ভয়ানক অ্যাডভেঞ্চার-অভিযানে রওনা হয়েছিলাম যেদিন, সেই দিন থেকে ঠিক দু-বছর পরে পৌঁছোলাম সাদাম্টন জেটিতে। এখন এই কাহিনী লিখছি কেম্ব্রিজে আমার প্রিয় ঘরে বসে। লিও শুয়ে রয়েছে আমার কাঁধে মাথা দিয়ে। আজকাল ও আর বেশী কথা বলে না। দিনরাত গুম মেরে থাকে। বাইশ বছর আগে বন্ধুবর ভিন্স

মৃত্যুর আগে লোহার বাক্স এই ঘরেই রেখে গিয়ে সূচনা করেছিল যে অসম্ভব অবিশ্বাস্য উপাখ্যানের, তার ইতি টানলাম সেই ঘরেই।

কিন্তু সত্যিই কি শেষ করতে পারলাম আশ্চর্য এই কাহিনী? আয়েশা বলেছিল, সে ফিরে আসবে। বিল্লাশিও বলেছিল, 'সেই-নারী' আবার ফিরে আসবে। মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই তার!

মরেও যে মরে না, 'সেই-নারী-যাঁর-আদেশ-মানতেই-হবে' আবার কি আসবে ফিরে তার অতুল রূপ আর অমিত শক্তির ইন্দ্রজাল দেখাতে?

কে জানে!*